ডাক্তার

বিধান রায়ের জীবন-চরিত

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়

প্রণীত

প্রখ্যাত জীবনীকার

ঋষি দাস

কর্তৃক

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা ৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ
১লা জুলাই : ১৯৫৭
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
মহালয়া : ১৯৬০

প্রচ্ছদপট
শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

বিএয়বেন্দ্র
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅবানন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

বাংলার যুবশক্তিকে

"আজকের দিনে আমার প্রতিদান দেবার কিছুই নেই। আপনারা বলেছেন আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন, যাতে দেশের কাজ করতে পারেন। আমিও স্বীকার করি বেঁচে থাকার পক্ষে আমার কোন দাবি নেই। শুধু যেন দেশের কাজের জন্য বেঁচে থাকি। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' দেশের কাজেই আমি যেন বেঁচে থাকি।"

বিধানচন্দ্র রায়

একাশীতিতম জন্ম-মৃত্যুদিনে বিধানচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত শেষ বাণী

বিধানচন্দ্র রায়

প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্য আজ আমাদের উৎসাহ দেয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, জীবনী-সাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের আজ বিশেষ অভাব। সেই অভাববোধ হইতেই জীবনচরিত ও আত্মচরিত প্রকাশ করা আমার প্রকাশনা-বৃত্তির একটি অঙ্গ বলিয়া আমি গ্রহণ করি। আমি প্রকাশনা-বৃত্তি গ্রহণের প্রথমেই বাংলা ভাষায় 'গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত' প্রকাশ করিয়া মহাত্মাজীকে উপহার দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার প্রকাশিত 'নোয়াখালিতে গান্ধীজী' পুস্তকে তিনি বাংলা ভাষায় 'আশীর্বাদ মো. ক গান্ধী' লিখিয়া দিয়া আমাকে এবং আমার প্রকাশনাকে ধন্য করিয়াছেন।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠান হইতে আমরা মনীষী রোমাঁ রোলাঁর 'মহাত্মা গান্ধী', 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন', 'বিবেকানন্দের জীবন', ঋষি দাসের 'বার্নার্ড শ', 'শেক্‌স্‌পীয়র', 'গান্ধী চরিত', 'লোকমান্য তিলক', 'আবুল কালাম আজাদ', 'গিরিশচন্দ্র', 'নজরুল', সুকুমার রায়ের 'সীমান্ত গান্ধী', প্রভাত বসুর 'জওহরলাল,' ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'আমাদের গান্ধীজী', 'বন্দী-জীবন,' সুশীল রায়ের 'মনীষী-জীবন-কথা' ১ম ও ২য় খণ্ড, অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাসের 'ভক্ত কবীর', মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থের 'মহামতি বিদুর', এবং 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিত' ও 'ঋষি রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনচরিত ও আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া পাঠকদের হাতে দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছি।

জীবনী-পাঠে আমরা যেমন মানুষটিকে চিনিতে পারি, তদপেক্ষা বেশী ভালভাবে জানিতে পারি সেই যুগের এবং সেই সময়ের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও মানুষকে। জীবনই ইতিহাস সৃষ্টি করে। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ব-রচিত জীবনচরিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত, রামতনু লাহিড়ীর জীবনী, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্রের জীবনী পাঠে যেমন মানুষকে জানিতে পারি, সেরূপ জানিতে পারি তখনকার সামাজিক অবস্থাকে।

আমি নিজে বিধানচন্দ্রের মতো পুরুষসিংহের নিকট খুব কমই গিয়াছি। একবার আর্তত্রাণের কাজে ইং ১৯৪৪ সালে গিয়াছিলাম। পরে যাই ইং ১৯৪৭ সালে আমার সাহিত্যিক বন্ধু ধীরেনবাবুকে সঙ্গে লইয়া 'আমাদের গান্ধীজী' পুস্তক দিতে। পুস্তকখানি পাইয়া তিনি গান্ধীজীর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব দেখাইলেন, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ইং ১৯৫০ সালে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার লাউদহ গ্রামে

তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করেন। সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া ওঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটে।

ইং ১৯৫২ সালে কোন একটি বিশেষ ব্যাপারে তাঁহাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিঠি দিই। সেই চিঠির বিষয় আলোচনার জন্য কয়েকদিন পরেই ইং ১৯৫২ সালের ২৯শে জুন রবিবার দ্বিপ্রহরে বিধানচন্দ্র আমাকে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়িতে ডাকিয়া পাঠান।

ঐ দিনে পাকিস্তান হইতে আগত ইঞ্জিনীয়াব বলিয়া পরিচয় দিয়া একটি যুবক বলে, সে পূর্বদিন শিয়ালদহ স্টেশনে সারারাত্রি না খাইয়া কাটাইয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া ডাঃ রায় তাহাকে নিজের পকেট হইতে পঁচিশ টাকা সাহায্য করেন। ঐ যুবক একটি চাকুরির জন্য দরখাস্তে সবিশেষ লিখিয়া আবেদন জানাইলে তিনি তাহার চাকুরির ব্যবস্থাও করিয়া দেন। ডাক্তার রায় যে কত দয়ালু, সেদিন তাহা জানিলাম।

দুইদিন পরে ১লা জুলাই ডাঃ রায়ের জন্মদিন। একটি দৈনিকের তরফ হইতেই একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নিজের জীবনী সম্পর্কে তিনি কিছু বলিতে চান না, জানিতে পারিলাম। আমি অনেকগুলি প্রশ্ন করিতে এই কর্মব্যস্ত মানুষটি এমন সস্নেহে আমাকে উত্তর দিলেন যে, শ্রদ্ধায় আমার মাথা অবনত হইল। আর আমাকে বলিলেন, "তুমি তো রবীন্দ্রভক্ত, শিক্ষাব্রতীর 'রবীন্দ্র সংখ্যা' প্রকাশ কর। আচ্ছা দেখ, তুমি রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতা বেছে দিতে পার যাতে বোঝায়, আমার জীবনও ফুরিয়ে আসছে আর কাজও ফুরিয়ে আসছে।" শুনিলাম কিছুদিন পরে উনি চক্ষু-চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাইতেছেন। সেই সময়ে দমদম বিমানঘাঁটিতে বহু গণ্যমান্য শুভানুধ্যায়ী ফুলের তোড়া ইত্যাদি লইয়া শুভকামনা ও বিদায় দিতে গিয়াছিলেন, আর আমি গিয়াছিলাম ওঁর আদিষ্ট কবিগুরুর কয়েকটি কবিতা লইয়া। কর্মনিষ্ঠ মানুষটি যখন প্লেনে উঠিতে যাইতেছেন, সেই সময়ে হাত বাড়াইয়া আমার নিকট হইতে কবিগুরুর সেই কবিতাগুলি পকেটে লইয়া প্লেনে উঠিলেন। তাহার সঙ্গে আমার একটি ছোট চিঠিও ছিল। আমার সেই ক্ষুদ্র চিঠির উত্তর পাইলাম—"প্রিয় প্রহ্লাদ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" আমার মনপ্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

আর একদিনের ঘটনা বলি, একটি গ্রামের মহিলাকে চিকিৎসার জন্য দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে পূর্বে ইং ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময়ে দেখাইয়াছিলাম। প্রায় ১২ বৎসর পরে পুনবায় দেখাইতে যাওয়ায় তিনি মহিলাটির নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং কোথায় বাড়ি তাহাও বলিলেন। শুনিয়া আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। ডাঃ রায়ের নিকট কত রোগীই না প্রতিদিন আসে। অথচ এই নগণ্য রোগীর নাম ইত্যাদি কি করিয়া মনে রাখিলেন? এই বয়সেও কিরূপ আশ্চর্য স্মরণশক্তি!

এইভাবে দিনে দিনে তাঁহার এবং তাঁহার কর্মশক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে।

আমার ইচ্ছা হইল ডাঃ রায়ের মত বহুগুণশালী বিরাট পুরুষের জীবনী প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে পাঠের সুযোগ দিতে।

সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের ডাঃ রায় সম্পর্কে প্রবন্ধ সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। নগেনদা আমার পূর্বপরিচিত। আমরা ওঁর লিখিত 'ফরাসী বীরাঙ্গনা'র প্রকাশক। ওঁকে ডাঃ বিধানচন্দ্রের জীবনী লিখিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই। নগেনদা আমার অনুরোধে এই বয়সে প্রায় এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই জীবনচরিত লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আজ শ্রদ্ধেয় বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে এই পুস্তক ভগবানের অনুগ্রহে প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ সমস্যাসঙ্কুল প্রদেশ। প্রার্থনা করি, এই প্রদেশের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান ও উন্নতির জন্য পরমেশ্বর বিধানচন্দ্রকে দীর্ঘজীবী করুন।

১লা জুলাই, ১৯৫৭।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আজ আর 'কর্মযোগী বিধানচন্দ্র' ইহজগতে নেই। তাঁহার জীবন, কর্ম ও বাণী আমাদের পাথেয় স্বরূপ রেখে গেছেন। আমরা যেন তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে পারি। তাঁর অমর আত্মা শান্তিলাভ করুন এই প্রার্থনা।

মহালয়া, ১৩৬৭। শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

গ্রন্থকারের নিবেদন

"শিক্ষাব্রতী" সম্পাদক এবং কলিকাতার বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীমান্ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক একদিন ডাঃ বিধান রায়ের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবিত কার্যের ভার আমি নিলাম। সাগরোপম বিরাট চরিত, ইহার সমস্ত মহিমা কেমন করিয়া সুষ্ঠুরূপে ফুটাইয়া তুলিব, এই চিন্তা হইল। বহু বান্ধব বহু ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, অনেকে বিধানচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াও পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে এত বড় কার্যভার সুসম্পন্ন করা আমার মত ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইত না। তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বিশেষ করিয়া শ্রীমান্ আলোকনাথ চক্রবর্তী আমার গ্রন্থের প্রুফ আদ্যোপান্ত দেখিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আজ ডাঃ রায়ের শুভ ষট্সপ্ততিতম জন্মদিন। এই শুভদিনে তাঁহার কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহার হস্তে এই পুস্তকখানি অর্পণ করিতে পারিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি। ইতি

১লা জুলাই, ১৯৫৭ নগেন্দ্রকুমার গুহরায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত' গ্রন্থখানি বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদর পাইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু পরিবর্ধন করা হইয়াছে এবং একটা নূতন অধ্যায়েব সংযোজন করা হইয়াছে। আমাব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জয়তিলক (রানাজী) আমাকে যথেষ্ট সাহায্য কবিয়াছে। তাহাকে সস্নেহে আশীর্বাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থেব সপ্তদশ অধ্যায়ে ভুল-ক্রমে লেখা হইযাছে যে, দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ গান্ধীজীকে কলিকাতায় জানানো হইয়াছিল। পক্ষতপক্ষে তাঁহাকে ওই শোকসংবাদ জানানো হয খুলনায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাযেব নিকট হইতে তিনি ওই মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়াছিলেন ববিশাল হইতে খুলনা শহরে পৌছিযাই। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ভুলক্রমে 'Iron man' স্থলে man of iron মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবাব পূর্বেই বিধানচন্দ্রেব মহাপ্রযাণ হইয়াছে তাঁহাব একাশীতিতম জন্মদিনে। আমাদেব শোকাতুব হৃদয়ের বেদনা প্রকাশের ভাষা নাই।

মহালয়া

১১ই আশ্বিন, ১৩৬৭

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়

Tele : 'BIPISEESEE' Phone : 47 3214 / 47 3214

West Bengal Pradesh Congress Committee

Sri Atulya Ghosh
President

'Congress Bhawan'
59-B, Chowringhee Road,
Calcutta-20

ডাঃ বিধানচন্দ্র একজন সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি। সমাজসেবা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। এইরূপ একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনীর বহুল প্রচার প্রয়োজন। শ্রীমান্ প্রহ্লাদ বাংলাভাষায় বাংলার এই সুসন্তানের জীবনী প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায় আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছে।

অতুল্য ঘোষ

আচার্য বিধানচন্দ্র রায় শ্রীচরণেষু

আধেক ভাঙ্গা বাংলা মায়ের হে বীর কর্ণধার,
তোমায় নমস্কার।
সামলে নিয়ে ভগ্নতরী করছ পারাপার
অথৈ পারাবার।
জলের কুমীর বাড়ায় গলা, ডাঙ্গায় হাঁকে বাঘ
তোমার যারা যাত্রী যেন সবাই শিশু-ছাগ—
শুধুই জানে চ্যাচাতে আর করতে জানে রাগ,
কান্না জানে আর।
এদের দিয়ে কেমন করে টানাও তুমি দাঁড়,
ওগো কর্ণধার॥
লাখো-ফুটো বঙ্গনায়ের হে বীর কর্ণধার,
তোমায় নমস্কার।
পদে পদেই তোমায় দেখি বিপুল বাধা-ভার,
নিত্য হাহাকার।
হালটি তুমি ছেড়ো নাকো যতই আসুক ঝড়,
ভাঙ্গা তরীর চেয়ে হাঙর-কুমীর ভয়ঙ্কর;
ওঠে উঠুক যতই কেন ব্যাকুল আর্তস্বর—
করবে তুমিই পার।
তুমি গেলে দিকে দিকে বাধবে মহামার,
ওগো কর্ণধার॥
অবসাদের নির্ভরসার নিবিড় অন্ধকার,
ওগো কর্ণধাব,
সাতটি বছর কাটল ক্রমে, খুলছে উপর দ্বার—
আভাস মেলে তার।
হচ্ছে মধুকরের ডিঙ্গা ভগ্নতরী খান,
আশার ভাষায় উঠছে ভ'রে অভাগাদের প্রাণ,
তুমিই তাদের প্রতিষ্ঠা দাও, করলে যাদের ত্রাণ
করছ যাদের পার—
শতায়ু হও এই আশিসই মাগছি বিধাতার
জানিয়ে নমস্কার।

—সজনীকান্ত দাস

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

যেই পথে যাত্রা তব সেই পথ দুর্গম বন্ধুর,
কুসুমে আস্তীর্ণ নয়, নয় তাহা ছায়ায় মেদুর।
যে আসনে বসিয়াছ নয় তাহা গজদন্তাসন,
সিংহদন্তাসন তুমি সাধ ক'রে করেছ বরণ।
খণ্ডিত বিক্ষত দুঃস্থ নিঃস্ব দেশে দায়িত্বের ভার
স্বহস্তে নিয়েছ তুমি, অসামান্য বীরত্ব তোমার।
মান, যশ, ধন, স্বস্তি কিছুরই তো ছিল না অভাব
স্বেচ্ছায় গোলাম হ'লে এ জাতির, হইয়া নবাব।

অনুর্বর উষরতা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, রোগ, শোক,
লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা কর্মহীন নিরাশ্রয় লোক,
তুষ্টিহীন পুষ্টিহীন জনারণ্যে জ্বলে দাবানল
বিদ্রোহী বিরোধিকণ্ঠ ছিদ্রান্বেষী করে কোলাহল,
প্রতিবেশী প্রতিযোগী, জনতার নিত্য নব দাবি—
হে পুরুষসিংহ, তাই অবাক হইয়া শুধু ভাবি,
শত বাধা বিঘ্ন সহ একা তুমি যুঝিছ কেমনে,
যৌবনের তেজ তুমি কোথা পেলে সায়াহ্ন-জীবনে?
কি অসীম ধৈর্য তব কী শক্তির জীবন্ত ভাণ্ডার,
খড়্গিচর্মবর্মাবৃত মহাশূর, তোমা নমস্কার।
জীবনচরিতে তব র'বে দীপ্ত উৎসর্গের কথা
স্বাধীন ভারতে তুমি বিসর্জিলে নিজ স্বাধীনতা।
বাঙ্গালীর চির ধর্ম স্বজাতিরে ছোট ক'রে দেখা,
যথার্থ স্বরূপ তার আঁকে চিত্রে কবি শুধু একা।
লোকে তোমা দেখে রাষ্ট্রচালনার নানাবিধ কাজে,
আমি দেখিতেছি তোমা তব জ্যোতির্বলয়ের মাঝে।
সমগ্র জীবন তব প্রতিভাত হয় নেত্রে মম,
দূর হতে দেখি তাহা নীলকান্ত-মহীধর সম।

যা দেখেছি লোকভয়ে করিব না তাহারে গোপন,
শুনাইবে বহুকর্ণে হয়ত তা স্তুতির মতন।

প্রাণাচার্য, ব্যক্তি হতে বৃত্তি তব জাতিতে বিতত
আর্ত্ত দেশ নিরাময় করিবার ধরিয়াছ ব্রত।
বহু দূরে রহ তুমি, আমি তব পরিচিত নহি।
কাণ্ডারী, তরীতে তব আমি দীন নগণ্য আরোহী।
আমি এ বঙ্গের কবি, এ বঙ্গেরে আমি ভালবাসি।
তার বরপুত্র তুমি তাই আমি তোমারে উপাসি।

—কালিদাস রায়

পিতা প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে পুত্রগণ—সুবোধ, সাধন, বিধান,
কন্যা সরোজিনী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ
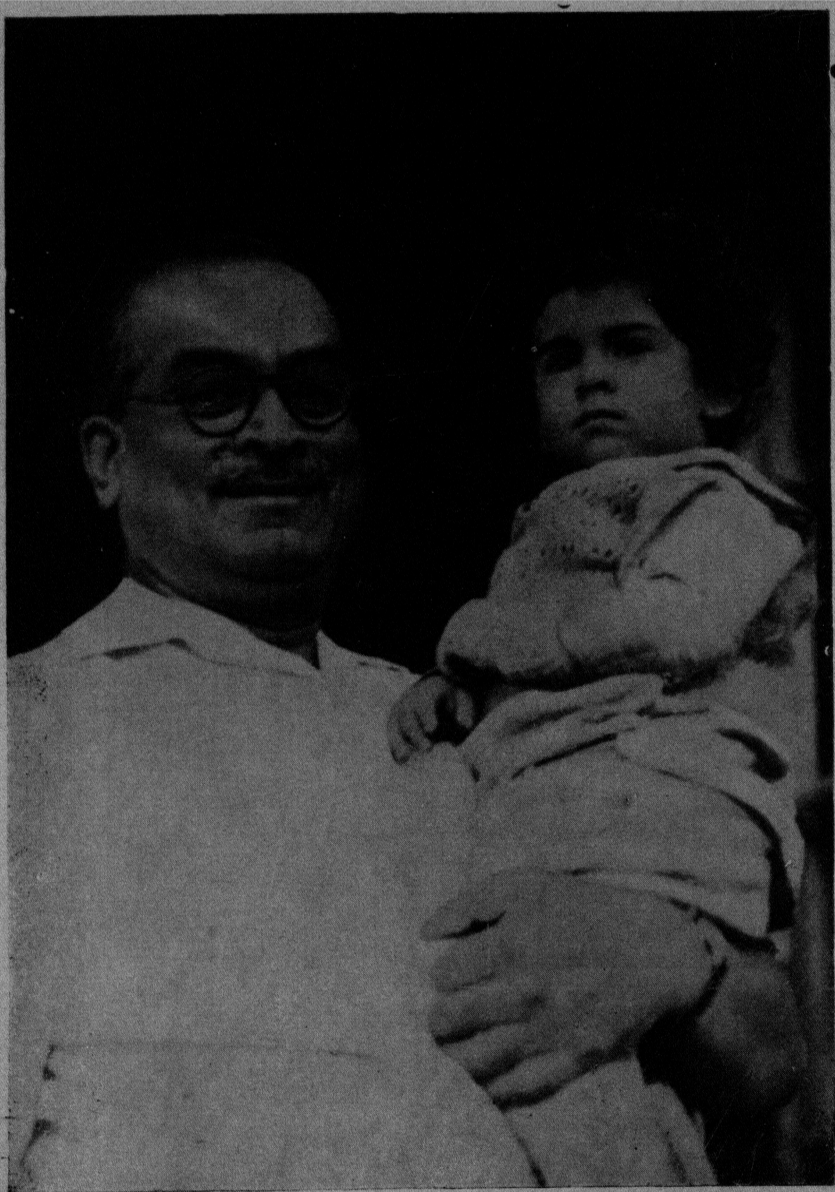
যৌবনে বিধানচন্দ্র
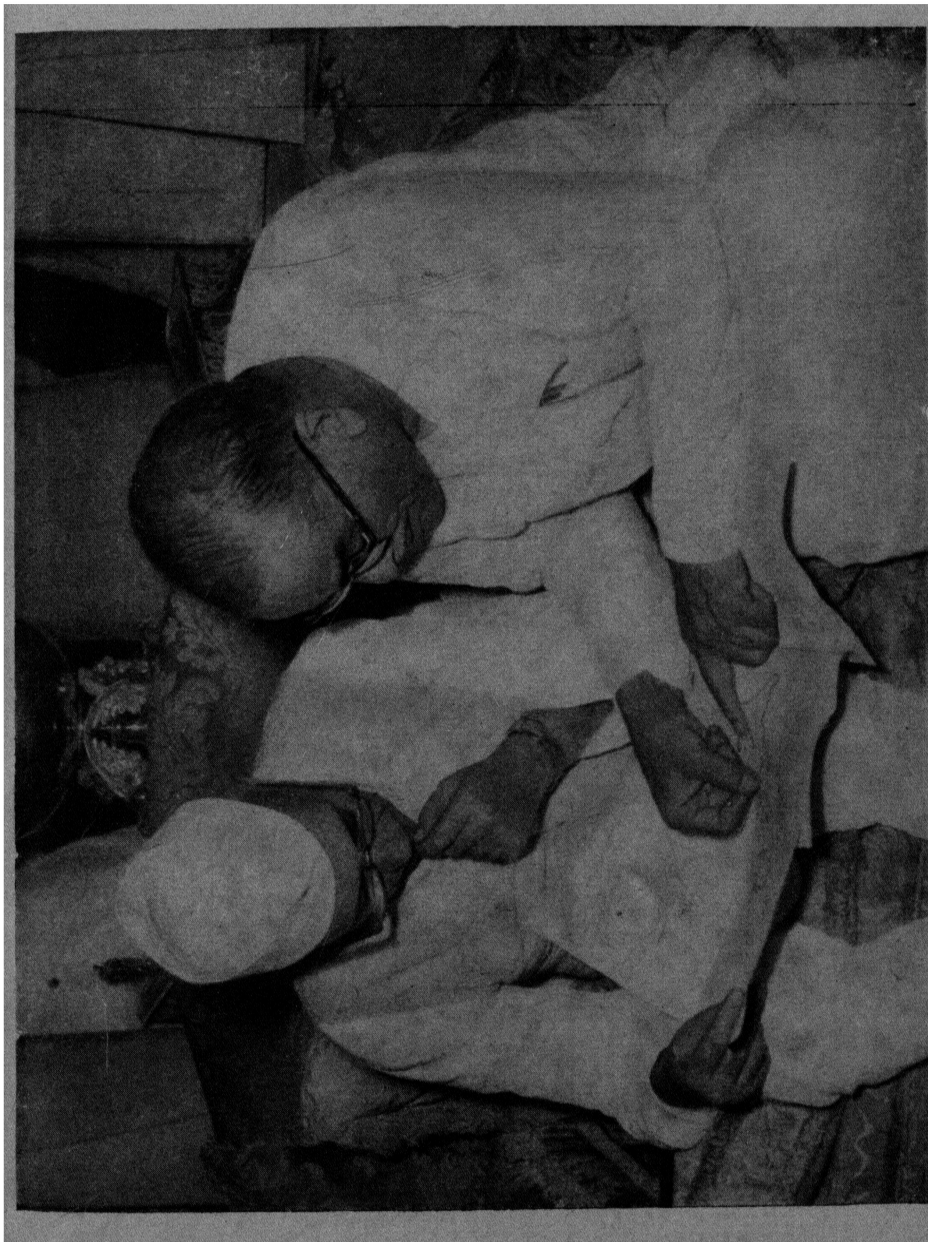
পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আলোচনারত বিধানচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলাল
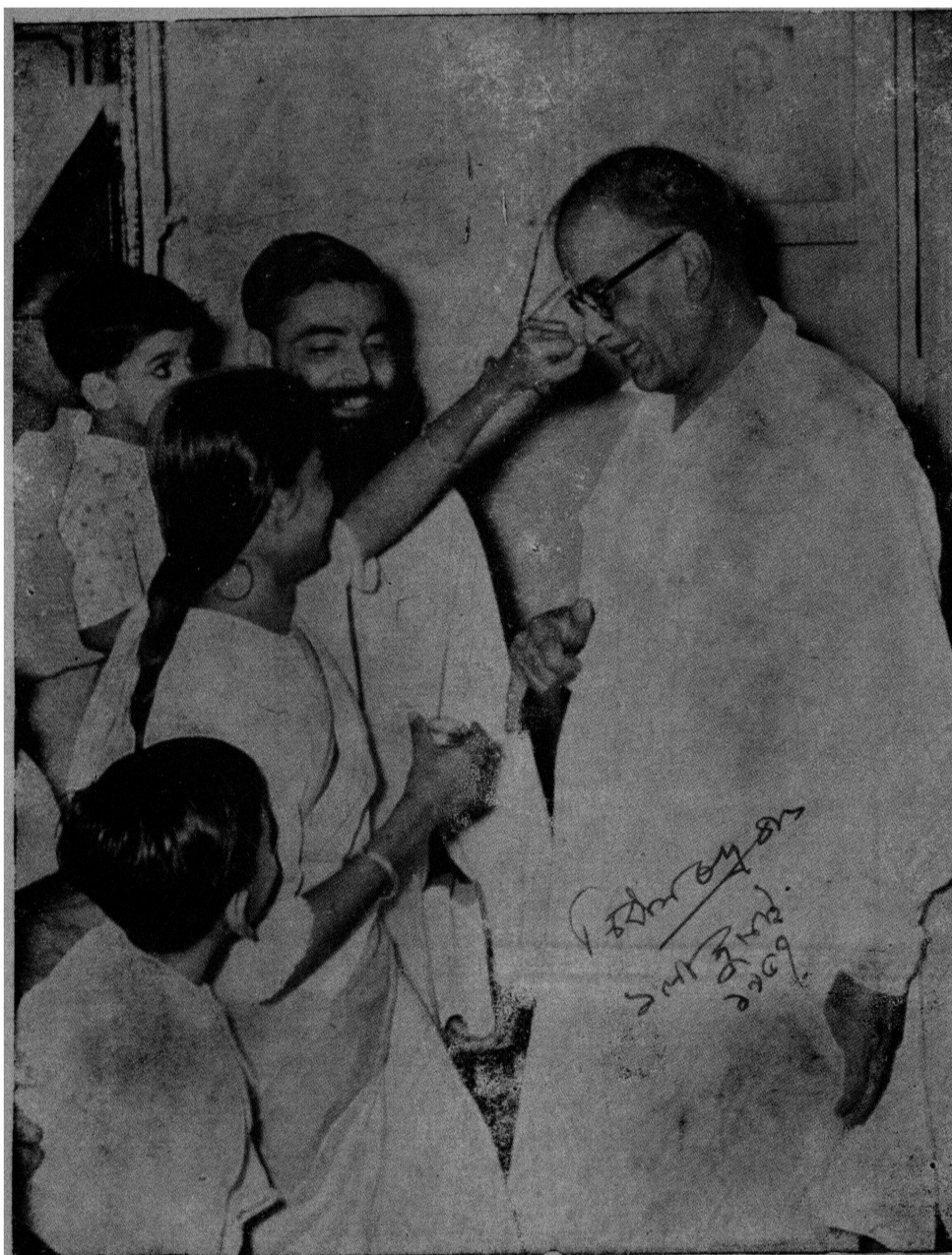
৭৬তম জন্মদিনে নিজ বাসভবনে বিধানচন্দ্র

১

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিবরণ

রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির অবদান : হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মাতা অঘোরকামিনী এবং পিতা প্রকাশচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম। তরুণ বয়সে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। পতি-পত্নী উভয়ে একান্ত নিষ্ঠার সহিত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের পদাঙ্কানুবর্তন করিয়া ধর্মসাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তানেরাও সেই ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্মজীবনে পুণ্যাত্মা মাতা-পিতার অনুসৃত পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। বিধানচন্দ্রের জীবনের উপর মাতাপিতার প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং বিধানচন্দ্রকে জানিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিবরণ জানা আবশ্যক।

রামমোহন রায়ের অবদান

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, ইংরেজ-রাজত্ব আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতকের ষষ্ঠ দশকে। কোন দেশ কখনও পরবশ্যতা স্বীকার করিয়া দাস-জাতিতে পরিণত হইতে পারে না, যদি সেদেশের অধিবাসীরা নানা দিক দিয়া অধ:পতিত হইয়া না পড়ে। এক জাতির অধঃপতনের সুযোগে অপর জাতির অভ্যুত্থান সহজেই ঘটিয়া থাকে। তৎকালে ভারতবাসী গৃহ-বিবাদের ফলে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, জাতীয় সংহতির অস্তিত্ব ছিল না, সমগ্র জাতি আত্মপরায়ণ হওয়ার ফলে জাতীয় স্বার্থবোধ লোপ পাইয়াছিল এবং ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ অতীতের মহিমময় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। দেশ ও জাতির সেই চরম দুর্গতির দিনে অষ্টাদশ শতকের অষ্টম দশকে ইংরেজ-শাসনের প্রথম ভাগে (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে, মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভাব হয় রাজা রামমোহন রায়ের। তখন সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল হিন্দু জাতি। বিরাট হিন্দুসমাজে সতীদাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রতি অন্যায় আচরণ, নারী জাতির ন্যায্য অধিকার হরণ এবং ওই প্রকারের আরও নানা সামাজিক অবিচার ও কুসংস্কারের

আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় অসামান্য প্রতিভা-বলে ওই সমুদয় অপসারণের পথ সুগম করেন। কিন্তু এইজন্য তাঁহাকে প্রবল ও বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। সতীদাহের মতো একটা বর্বরোচিত নৃশংস প্রথার কলঙ্ক ও কুফল হইতে তিনি মুক্ত করিলেন হিন্দুসমাজকে। এই ভয়ংকর ও নৃশংস প্রথা দূরীকরণের জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে হয়। বলা চলে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তাঁহার এই সংগ্রাম তীব্রতা অর্জন করিয়াছিল। রামমোহন হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস এবং হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই আত্মীয়-সভাই পরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ফলেই ইংরেজ সরকার ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ নিবারক আইন পাস করিল। ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে এক শ্রেণীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু ইহার মাসাধিক কাল পরেই (১৮৩০ খ্রীঃ ১৭ই জানুআরি) পূর্বোক্ত আইনের প্রতিবাদে 'ধর্মসভা' নামে একটা সমিতি স্থাপন করে। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর বিরোধী প্রতিষ্ঠান রূপে দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল এই 'ধর্মসভা'। এই সংস্থার পশ্চাতে ছিলেন বহু সনাতনপন্থী ও গোঁড়া হিন্দু জমিদার ও শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁহারা এই সংস্থাকে অকৃপণ-হস্তে অর্থসাহায্য করেন। ধর্মসভা সতীদাহ-প্রথা-নিবারক আইন রদের জন্য ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলেও আবেদন করে। অবশ্য এই আবেদন শেষ পর্যন্ত নাকচ হয়। 'ধর্মসভা' সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, যেসব হিন্দু হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান মানিয়া চলিবে না, তাহাদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বিতাড়িত করা হইবে। তাহারা নানাভাবে ভীতিপ্রদর্শনও করিতে থাকে। রামমোহন রায়কে যে কিরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা পূর্বোল্লিখিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াও অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। সেকালের হিন্দুসমাজের অধঃপতিত অবস্থার একটা বাস্তব চিত্র উহাতে পাওয়া যাইবে।

একেশ্বরবাদী এবং সমাজ-সংস্কারার্থী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে এক নবযুগের প্রবর্তন হইল। অদূর ভবিষ্যতে রামমোহন রায় যুগপ্রবর্তক বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া হিন্দুধর্মের নবরূপ প্রকাশ পাইল। তাঁহার আয়ুষ্কাল (১৭৭২ খ্রীঃ —১৮৩৩ খ্রীঃ) ছিল মাত্র ৬১ বৎসর। জীবদ্দশায়ই তিনি হিন্দুজাতির সমাজ-জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গোড়াপত্তন করিয়া যান। তৎকালীন ইউরোপে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বিপ্লবী বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এইরূপে তিনি ভারতে জাতীয়তা, স্বাধীনতা ও বিপ্লবী চিন্তাধারার

মূল প্রবর্তক হইয়া উঠেন। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজ ভারতের নবজাগরণের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায়।

দেবেন্দ্রনাথের অবদান

মহামানব রামমোহনের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে উত্তরকালে যাঁহারা সশ্রদ্ধ-সমাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণে আসিবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) নাম। তিনি রামমোহনের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং রামমোহনের যুগোপযোগী আদর্শ ও ভাবধারাকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কলিকাতার অভিজাত বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়াও দেবেন্দ্রনাথ ভোগের পথ ছাড়িয়া ত্যাগের পথ ধরিলেন। দ্বারকানাথ আভিজাত্যের তাগিদে যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন, তেমনই দেশ, ধর্ম, জাতি, সমাজ এবং অন্যান্য কল্যাণ-কর্মেও দান করিতেন মুক্তহস্তে। বিলাত-প্রবাস-কালে তাঁহার মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা। কলিকাতার লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান 'ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল্ সোসাইটি'কে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই দানশীলতায় তৎকালে তাঁহার প্রশংসা দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দ্বারকানাথ তাঁহার উইলে দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য একলক্ষ টাকা দান করার ব্যবস্থা করিয়া যান।

সে-কালে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবহমাণ তরঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবন প্লাবিত হইতেছিল। ইহাতে সুফলের সঙ্গে কুফলও কম হয় নাই। ভদ্রসমাজে মদ্যপান, পতিতা নারীর নৃত্য-গীতাদি দূষণীয় আমোদ-প্রমোদ সামাজিক রীতির মতোই প্রচলিত হইয়াছিল। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে পিতাপুত্র একসঙ্গে বসিয়া মদ্যপান করা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজাত কিংবা ভদ্র পরিবারের সন্তানদের চরিত্র যৌবনেই কলুষিত হইয়া পড়িত। দেবেন্দ্রনাথকেও কলুষের আবর্তে পড়িতে হইয়াছিল। তৎসম্পর্কে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী'র পরিশিষ্ট (সতীশচন্দ্র কর্তৃক লিখিত) হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

"দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে লিখিয়াছেন, 'এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম।' ইহা কোন্ সময়? এবং 'এতদিন' বলিতে কতদিন বুঝিতে হইবে?

"আমাদের ধারণা, ১৮৩৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৮৩৫ সালে পিতামহীর মৃত্যু পর্যন্ত, ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথের বিলাসের আমোদে মগ্ন থাকিবার সম্ভাবনা।

"এই অবস্থায় বিলাসের আবর্তে পতিত হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথকে দোষী করা যায়

না; বরং আশ্চর্য হইতে হয় যে, এমন অবস্থা হইতেও ঈশ্বর তাঁহাকে এত শীঘ্র ধর্মের দিকে টানিয়া লইলেন।”

এই সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন:

“...আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই, এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন, ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন; এবং তাহার পরে সেই আনন্দময়, স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নতুন জীবন প্রদান করিলেন। তাহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।”

মহর্ষি পাইয়াছিলেন দীর্ঘ জীবন (১৮১৭ খ্রীঃ—১৯০৫ খ্রীঃ), সেই জীবনকে তিনি সার্থক করিয়াছিলেন ধর্মসাধনায়, একেশ্বরবাদ প্রচারে, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবায় এবং জাতি ও সমাজের নানাবিধ কল্যাণ-কর্মের অনুষ্ঠানে। তাঁহারই সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—যাঁহার লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষার অবদান নিখিল বিশ্বে ভারতের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে এবং জাতীয় অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হইয়াছে। পিতার যত্ন ও শিক্ষা-গুণে পুত্রের প্রতিভা ও মনীষা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে শতদল পদ্মের মতো রূপে, রসে ও গন্ধে। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল, বিধিবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া যাইতে পারেন নাই। সেই অসম্পূর্ণ দুঃসাধ্য কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কালোপযোগী সংস্কারও করিয়াছিলেন। এই সমুদয় কারণে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই।

মহর্ষি ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র পক্ষ হইতে একখানি পত্রিকা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে (১৭৬৫ শক, ভাদ্র) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু নিজে সমস্ত লেখা দেখিয়া দিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজে পত্রিকাখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিল। এই সম্বন্ধে মহর্ষি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন:

“...আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষত: ব্রাহ্মসমাজে

বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।

"পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাহাকে মনোনীত করিলাম।...

"ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল, তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।..."

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতকটা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে, যে মানুষ যে কার্যের উপযোগী, যেন তাহার হস্তে সেই কার্যই আসিল। তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সবশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গ-সাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্রসকলের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।..."

অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বারো বৎসরকাল কৃতিত্ব ও সুনামের সহিত ওই পত্রিকার সম্পাদকতা করেন।

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উত্থানের যুগে বাংলাদেশে ফিরিঙ্গী মিশনারীদের কর্মতৎপরতাও বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য যে সকল পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করিতেন, তাহা ধর্মের আদর্শ ও নীতির বিরোধী তো ছিলই, বেআইনীও ছিল অনেক স্থলে। কিন্তু রাজার জাতি বলিয়া শাসকগণ; এমন কি আদালতের বিচারকগণ পর্যন্ত, তাহাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন। এই কারণে বিদেশী মিশনারীরা দণ্ডিত হইতেন না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হইল যে, সকলে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিলে মিশনারীদের মতো অবৈতনিক বিদ্যালয় হিন্দু বালকদিগের জন্য সহজেই স্থাপিত হইতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার হিন্দুদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া হিন্দু বালকগণের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলিকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বাড়িতে গিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে,—পাদরিদের বিদ্যালয়ে হিন্দু বালকদের পড়িতে দেওয়া উচিত নহে এবং হিন্দুদের অগৌণে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কবার সময় আগত। তাঁহার আহ্বানে সকলেই সাড়া দিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুপ্রধানগণও দেবেন্দ্রনাথের মহান চেষ্টাকে সফল কবার জন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে মহানগরীর বিশিষ্ট ও মান্যগণ্য হিন্দুদিগের একটি সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে প্রায় এক সহস্র হিন্দু উপস্থিত হইলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী হইতে শুনাইতেছি :

"স্থির হইল যে, পাদরিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া, তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল।

"এই সভা হইতে 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

রাজনারায়ণ বসুর অবদান

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আশ্রয় করিয়া যে সকল ব্রাহ্ম প্রথম জীবনেই নিজ নিজ অধ্যাত্ম জীবন গড়িয়াছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের উন্নয়নে মহর্ষির সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০ খ্রীঃ) এবং কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রীঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র রাজনারায়ণের বয়ঃকনিষ্ঠ।

দুইজনেই উনিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। উভয়েই মহর্ষির প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :

"ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সহাধ্যায়ীরা আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রন্থ সংকলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোকসকল থাকিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সংকলনের অনেক দিন পূর্বে লিখি। দেবেনবাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ি পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থা-দর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণবাবু ইংরাজিতে উপনিষদ তর্জমা করেন এবং শ্যামাচরণবাবু বক্তৃতা করেন। শ্যামাচরণবাবু যেদিন সমাজে বক্তৃতা করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন হইত।...

"ব্রাহ্মসমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্গাচরণবাবু ও শ্যামাচরণবাবু তাঁহাদের কার্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস, এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজি অনুবাদকের কর্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। ঐ কার্য ছয় মাস করিলে তৎপর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্যে নিযুক্ত হই।...উপনিষদের অনুবাদকের কার্য করিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও আমি তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিতাম। সন্ধ্যায় উপনিষদ্ তর্জমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইতাম। দেবেন্দ্রবাবু আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। সে সকল বন্ধুত্বের কার্য কখনই ভুলিবার নয়।"

রাজনারায়ণবাবু পরে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কার্যে নিযুক্ত হন। মেদিনীপুর জেলা-স্কুলে তিনি পনেরো বৎসরের কিছু অধিক কাল প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তৎপূর্বে তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনের গতি ছিল বহুমুখী। ধর্ম-সাধনা ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা তাঁহার যে প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের জন্যও তিনি কম কাজ করেন নাই। গোঁড়া হিন্দুদিগের মধ্যে সেকালে এমন হিন্দুও ছিলেন—যাঁহারা ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। উদার ও প্রগতিশীল হিন্দুগণ সেই ভ্রান্ত

মতের সমর্থন করিতেন না। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মগণও ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। রাজনারায়ণ তৎকালের বাংলা দেশের অন্যতম আদর্শ শিক্ষাব্রতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। মেদিনীপুরে তিনি যে সকল কার্য করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জাতীয় প্রগতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। দুরারোগ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রধান শিক্ষকের পদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তিনি লিখিয়াছেন :

"আমি পনেরো বৎসর কয় মাস ঐ কর্ম করি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের যে সকল কার্য করি তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে : (১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতিসাধন। (২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃসংশোধন ও উন্নতিসাধন। (৩) জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা সংস্থাপন। (৪) সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন। (৫) বক্তৃতা, ধর্ম-তত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্ম সাধনা। (৬) Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj নামক লেকচর প্রণয়ন।"

রাজনারায়ণ তাঁহার সম্পাদিত কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন নাই। মেদিনীপুরের জনসাধারণের পক্ষে অবসর গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি :

"অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিক বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান নিবারণী সভাও আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভমেন্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্ঞানগভ উপদেশ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।"

পূর্বোক্ত অভিনন্দন-পত্রে রাজনারায়ণের অনুষ্ঠিত আরও সৎকর্মাবলীর বিবরণ আছে। তাহার স্থাপিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' বঙ্গীয় যুবসমাজের মধ্যে স্বাজাতিকতার ভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই সভার দেশপ্রেমিক সদস্যগণ 'good night' না বলিয়া 'সু-রজনী' বলিতেন। পয়লা জানুআরি দিবসে পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা না জানাইয়া পয়লা বৈশাখ জানাইতেন; ইংরাজি বাংলা না মিশাইয়া কেবল বাংলাতে কথাবার্তা বলিতেন। স্বদেশীয় সঙ্গীত, ব্যায়াম, খেলাধুলা, বাংলা ভাষার অনুশীলন, সামাজিক কুপ্রথা পরিহার ও সুপ্রথাগুলির রক্ষা, বিদেশীয় আচার ও বেশভূষা বর্জন ইত্যাদির প্রতি এই সভা দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বনামধ্যাত

দেশভক্ত ও সমাজসেবক নবগোপাল মিত্র যে 'হিন্দু-মেলা' (চৈত্রমেলা বা জাতীয় মেলা নামেও পরিচিত) স্থাপন করিয়া স্বদেশীয় নর-নারীকে স্বাজাতিকতার ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, উহার প্রেরণা আসিয়াছিল 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র বিবরণী ও অনুষ্ঠান-পত্র হইতে। ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। বাঙালীর জাতীয় জীবন গঠনে রাজনারায়ণ ও নবগোপালের অবদান স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ভারতের অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পুনরায় একটা আদর্শ জাতি-রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য রাজনারায়ণ যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, উহা তাহার 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। তিনি কেবল চিন্তানায়ক, সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন না, একজন উচ্চশ্রেণীর সংগঠন-কর্মীও ছিলেন। তাহার সংগঠনী প্রতিভার নিদর্শন রহিয়াছে মেদিনীপুরে তাহার অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর মধ্যে। এই সমুদয় কার্য জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক ছিল। ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই তিনি লিখিতে ও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যা এগারোখানা, তন্মধ্যে 'Old Man's Hope' ব্যতীত অপরগুলি ধর্ম সম্বন্ধে লেখা। বাংলা ভাষায় বিবিধ বিষয়ে রচনা ও ভাষণের দ্বারা তিনি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহার বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা তেরখানা। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় হইল 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত', 'সেকাল আর একাল', 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা', 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা', 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। সেই সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত লেখক। ভারত-বিশ্রুত বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র এবং 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক নির্বাসিত নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার অন্যতম জামাতা।

ধর্ম, দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় রাজনারায়ণের অবদান স্মরণীয় হইয়া আছে। জীবিতকালেই (১৮২৬ খ্রীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর—১৯০০ খ্রীঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর) তিনি তাহার কর্মাবদানের ফল—জাতীয় অগ্রগতি দেখিয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র সেনের অবদান

কলিকাতা মহানগরীর কলুটোলা অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী বৈদ্যবংশের শিক্ষিত প্রগতিশীল যুবক কেশবচন্দ্র উনিশ বৎসর বয়সে (১৮৫৭ খ্রীঃ) আদি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া উহার সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহার ধর্মজীবন ও

কর্মজীবনের গোড়াপত্তন হইল এইখানেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন, উদার মনোভাব, সুদূরপ্রসারী মননশীলতা, গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি এবং ব্রাহ্মধর্মে অবিচলিত বিশ্বাস কেশবচিত্তে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। কেশব ছিলেন মহর্ষির অন্যতম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী। নবীন সাধক, চরিত্রবান ও প্রতিভাশালী যুবক কেশবচন্দ্রের মধ্যে মহর্ষি দেখিতে পাইলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ লক্ষণ। অল্পকালমধ্যেই নবদীক্ষিত তরুণ মহর্ষির স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এক বৎসর পরেই তাঁহার কলেজের শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। তৎকালে তিনি হিন্দু-কলেজে পড়িতেন। প্রায় দুই বৎসর কাল কেশব কলেজের পাঠাগারে বসিয়া দর্শন, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ করেন। তাঁহার ধর্মানুরাগ ও ভক্তি-বিশ্বাস মহর্ষিকে এমনই মুগ্ধ করিল যে, তিনি তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়া বসাইয়া দিলেন আচার্যের আসনে। তখন কেশবচন্দ্রের বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। তৎপূর্বে যাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের আসনে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ ছিল ছয় বৎসরের জন্য। তাঁহার সুগভীর ভগবদ্‌ভক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অসামান্য বাগ্মিতা তাঁহাকে সহজেই অতিশয় জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি অধিকতর সংস্কার সাধন এবং দ্রুত অগ্রগমনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অনুগামীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ও তাঁহার অনুগামীরা সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির প্রচলনের পক্ষপাতী এবং উপবীত ধারণের বিরোধী ছিলেন। ফলে প্রধান ব্রাহ্মদের সহিত নবীন ব্রাহ্মদের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং মহর্ষির সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ দেখা দেয়। তখন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ হইতে অপসারিত হন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামীরা এখন পৃথক ধর্মীয় সংস্থা গড়িয়া তোলেন। ইহার নাম হয় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। এখন দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

কেশবচন্দ্রের কর্মশক্তি, অসামান্য বাগ্মিতা ও ভগবদ্ভক্তি তাঁহার প্রগতিশীল সংগঠনকে অতিশয় জনপ্রিয় করিয়া তোলে। কেশবচন্দ্র শ্রীচৈতন্যের ভগবৎ-প্রেম ও ভাবাবেগের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং ভগবানের নামগান ও সংকীর্তন এখন ব্রাহ্ম-উপাসকদের উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্র স্ত্রীলোকদেরও

ব্রাহ্মসমাজের সদস্যা হইবার অধিকার দেন। ইহা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল এবং জাতির সামগ্রিক জাগরণে এক নবশক্তি যোগাইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ ভক্তিভাজন শিষ্যের মতানৈক্য ঘটিলেও কিছুমাত্র মনান্তর ঘটে নাই, তাঁহাদের পারস্পরিক স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত সমাজের মধ্য দিয়া কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল দেশদেশান্তরে। বিদ্যার্থী জীবনের সমাপ্তির পরে তাঁহার কর্মবহুল জীবনের স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সকল সমাজসংস্কারমূলক ও জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন. তাহাতে জাতীয় অগ্রগতির পথে পূর্বাবধি সৃষ্ট বিঘ্ন-বিপদ অনেকাংশে অপসারিত হইয়া যায়। তাঁহার নিঃস্বার্থ নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টার ফলে নবভারত ও নূতন জাতিগঠনের যে সমস্ত উপাদান সঞ্চিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি আশানুরূপ কাজে লাগাইয়া যাইতে পারেন নাই, কেন না, তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর—১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুআরি পর্যন্ত। কিন্তু জাতি গঠনের পুণ্যকর্মে নিরত উত্তরসাধকগণ সেই সকল উপকরণের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে নবভারত ও নবজাতি গড়িয়া তোলার সুকঠিন কার্য যে ত্বরান্বিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অধঃপতিত ভারতে আদর্শ মানুষ গড়িতে হইলে প্রথমেই যে সমাজদেহকে কুসংস্কার-ব্যাধি হইতে মুক্ত করা আবশ্যক, তাহা কেশবচন্দ্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণে তিনি বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদসাধন ইত্যাদি কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহার সফলতা কম হয় নাই। পুরুষ জাতির মতো নারী জাতিকে শিক্ষাদানের সফল কর্মপ্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে জাতিগঠনের কার্য যে প্রচুর গতিবেগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কেশবচন্দ্রের বহুমুখী লোকহিতকর কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক বিবরণ প্রদত্ত হইল:

(১) অল্পবয়স্কের জন্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন; (২) কলুটোলার সান্ধ্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; (৩) বিধবা-বিবাহ নাটক রচনা ও অভিনয়; (৪) পাঞ্জাব দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠন ও সাহায্য দান; (৫) বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া নিবারণ কেন্দ্র স্থাপন, (৬) কলুটোলায় শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; (৭) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন; (৮) প্রথম অসবর্ণ বিবাহ এবং প্রথম অসবর্ণ বিধবা বিবাহ সম্পাদন; (৯) দরিদ্র ও অসহায়দিগের জন্য শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন; (১০) প্রথম মদ্যপান নিবারণ অভিযান, (১১) দাতব্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠান স্থাপন; (১২) গণশিক্ষার জন্য এক পয়সা

মূল্যের সরল ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ, (১১) শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন।

এই সকল কার্যাবলী সম্পন্ন হইয়াছিল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মাত্র উনিশ বৎসরের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা এবং প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া যিনি এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কর্মশক্তি ও সংগঠনী প্রতিভা যে অসাধারণ,—ইহা সহজেই বুঝা যায়। ওই সমুদয় কার্যের ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্রের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, স্বদেশানুরাগ এবং স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় মিলিবে। তিনি ধর্মপ্রচারকরূপে যখন গ্রেট ব্রিটেনে যান, তখন তাহার বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর। তথায় আট মাস থাকিয়া ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের প্রধান প্রধান চৌদ্দটি নগরে তিনি প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করিয়া শিক্ষিত সমাজ ও বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা অর্জন করেন। তাহার বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইত। কেশবচন্দ্রের প্রচারের ফলে গ্রেট বৃটেনের মতো প্রগতিশীল স্বাধীন দেশেও ভারতের মর্যাদা স্বীকৃতি পাইল। জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে তাহা কম সহায়ক হয় নাই। সেণ্ট্ জেমস হলে অন্যূন পাঁচ সহস্র ইংরাজ নরনারীর সমাবেশে তিনি সুরাপান নিবারণ বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বৃটিশরাজের সুরা ব্যবসায়ের উপর তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছিল। 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য' বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি ভারত-প্রবাসী নীচ শ্রেণীর ইংরাজদের নিরীহ ভারতবাসীর উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করেন, এবং উহারা যে সুসভ্য ইংরাজজাতির কলঙ্ক, সে মন্তব্য তিনি নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া বোম্বাই নগরে অবতরণ করিলে তথাকার অধিবাসীরা কেশবচন্দ্রকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই মহানগরীতে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-সভায় তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিতার সহিত ঘোষণা করেন:

"ইংলণ্ড যদি ভারতীয়গণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ম্যানচেস্টার এবং ইংরাজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ভারতে শাসন করিবে বলিয়া স্থির করে, তাহা হইলে আমি বলি—এই মুহূর্তেই বৃটিশ-শাসন বিনাশ করিয়া দিন।"

তৎকালীন কোন রাজনীতিক নেতাও বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ওইরূপ স্পষ্ট, তেজোদীপ্ত ও নির্ভীক উক্তি করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। ওই ঘোষণার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে—স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত কেশবের মর্মবেদনা এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহাত্মক মনোভাব। তাঁহার বক্তৃতাবলীতে অনুরূপ উক্তি আরও কত রহিয়াছে। বিলাতে প্রচারকালে তিনি এক সভায় ইংরাজ

জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"আমি আপনাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, আমার স্বদেশবাসীগণকে বিজাতীয়করণের দুরভিসন্ধি যেন আপনারা পোষণ না করেন।"

স্বদেশ ও স্বজাতির হিতচিন্তায় কেশবচন্দ্র কিভাবে মগ্ন থাকিতেন, উহার নিদর্শন তাঁহার রচনামালায়ও মিলিবে। নব্য ভারত ও নব্য জাতি গঠন করিতে হইলে সবশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে যে একতার প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। বাঞ্ছিত ঐক্য সাধনের জন্য কি পন্থা অনুসরণ করা সমীচীন, সেই চিন্তা তাঁহার মনে ও মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছিল। কেশবচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' সংবাদপত্রের ১২৮০ সালের (১৮৭৪ খ্রীঃ মার্চ) ৫ই চৈত্রের সংখ্যায় 'ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা লাভের উপায় কি?' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেন। তাহা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি:

"যদি ভাষা এক না হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয়, তবে তাহার উপায় কি? সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হিন্দী ভাষা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দী ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে একতা অনায়াসে শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে।"

আজ স্বাধীন ভারতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতালাভের প্রায় তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে দূরদর্শী কেশবচন্দ্র হিন্দীকে ভারতের সর্বজনীন ভাষা বা Lingua franca-রূপে গ্রহণ করার জন্য স্বদেশবাসীর নিকট প্রস্তাব করেন। আরও যে দুইজন সমসাময়িক বাঙ্গালী মনীষী একই সময়ে একই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ রচনার মাধ্যমে অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন হইলেন ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু এবং অন্যজন হিন্দু ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরের কৃপা, মাতৃভূমি এবং ব্রাহ্মসমাজ—এই তিন জায়গায় আমাদের স্বাধীনতা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।" এই স্বতঃস্ফূর্ত বাণীর মধ্য দিয়া মাতৃভক্ত সন্তানের যে আলেখ্যখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেশমাতৃকার সেবকমাত্রের চিত্তকেই আকর্ষণ করিবে। ব্রাহ্ম-সমাজের মাঘোৎসবের প্রস্তুতিস্বরূপ তিনি যে কয়েকটি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন, তন্মধ্যে 'মাতৃভূমি দিবস' পালন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

কুচবিহারের নাবালক মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের নাবালিকা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ হওয়ায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। কেশব-বিরোধী ব্রাহ্মদের অভিযোগ এই যে, কেশবচন্দ্র স্বয়ং আচার্য হইয়াও তাঁহারই রচিত বিবাহ-বিধি ভঙ্গ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের পক্ষের কথা এই

যে,—ওই বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ, বিধাতার অভিপ্রায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল'।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

পূর্বোক্ত বিবাহের মাসচারেক পরে (১৮৭৮ খ্রীঃ মে) কেশব-বিরোধী ব্রাহ্মগণ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' পরিত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন নূতন সমাজ—যাহার নাম হইল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম যোগদান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি: শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা), শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, গুরুচরণ মহলানবিশ, কালীশঙ্কর সুকুল, নবদ্বীপচন্দ্র দাশ। এই নবগঠিত সমাজ নূতন উদ্যমে ও উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। কেশবচন্দ্র যেমন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি মন্দির (কেশব সেন স্ট্রীটে নির্মাণ করাইয়াছেন এবং তৎসংলগ্ন একটা পাঠাগারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও তেমনই একটি মন্দির (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, বর্তমান নাম বিধান সরণী) নির্মাণ করাইয়াছে: সেই সঙ্গে একই প্রাঙ্গণের মধ্যে পাঠাগার, প্রচারক-মণ্ডলীর জন্য আশ্রম ইত্যাদিও স্থাপিত হইয়াছে। সু-সাহিত্যিক সুবক্তা মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ধর্মচর্চার সঙ্গে সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, নরনারীকে সমান অধিকার দান, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, ছাত্রগণের নৈতিক চরিত্র গঠন, সুরাপান নিবারণ ইত্যাদি জনহিতকর কার্যও এই সমাজের সেবকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিয়া সুলভ মূল্যে বাংলা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রতিষ্ঠার সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত উহার সম্পাদনা করিয়াছেন। 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'—এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক ত্রিবাণী লইয়া পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইত। উহার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও নীতি প্রচারের ব্যবস্থা ছিল, এবং দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দেওয়া হইত মদ, আফিং, গাঁজা, চরস ইত্যাদি খাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে। 'সঞ্জীবনী' বিদেশী শাসকবর্গের অত্যাচার, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিত এবং দেশবাসীকে প্রেরণা দিত স্বদেশ ও স্বজাতির নিঃস্বার্থ সেবায়। জাতীয় অগ্রগতি সাধনে পত্রিকাখানির দান যথেষ্ট। ওই কার্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-স্থাপিত ও সম্পাদিত 'নব্য ভারত' মাসিক পত্রিকার অবদান এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-স্থাপিত ও সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' মাসিক পত্রিকার অবদান উল্লেখযোগ্য।

সরলা দেবীর 'ভারতী' এবং কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রিকার অবদানকেও আমরা ভুলিতে পারি না।

বাংলার প্রাচীন জন-প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন' (ভারতসভা) স্থাপন ও গঠনের কার্যে অগ্রণী ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কালীশঙ্কর সুকুল প্রমুখ স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মগণ। প্রধানতঃ ইঁহাদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহাকে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থারূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের যে নয়জন নেতা নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইজনই (কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু) ব্রাহ্ম। জাতিগঠনে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অবদানও যে কম নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বহু প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ অনুগামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও কেশবচন্দ্রের কর্মোদ্যোগ শিথিল হয় নাই। কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যার বিবাহ কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার বহু অনুগামীর বিচ্ছেদের আশু কারণ হইলেও কেশবচন্দ্রের ধর্মীয় মতামতও এই বিচ্ছেদের পশ্চাতে ছিল। ধর্মীয় বিষয়ে কেশবচন্দ্রের অত্যধিক ভাবাবেগ, ভাবসমাধি প্রভৃতি তাঁহার যুক্তিবাদী প্রগতিশীল অনুগামীদের পীড়িত করিত। কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঘনিষ্ঠতাও তাঁহাদের পছন্দসই ছিল না। রামকৃষ্ণ একেশ্বরবাদী ছিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দু বহু দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতার সহিত তাহার কোনও বিরোধ ছিল না। তাহার নিকট যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী, যিনিই জগৎপিতা, তিনিই জগন্মাতা। কেশবচন্দ্রও অনুরূপভাবে ধর্মসমন্বয়ের কথা বহু পূর্ব হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন। ব্রহ্মকে ব্রহ্মস্বরূপিণী মাতৃরূপে কল্পনাও ব্রাহ্মদের নিকট নূতন ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যখন আচার্য ছিলেন, তখন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দেও উপাসনাসংগীতের মধ্যে মাতৃ-সংগীতও স্থান পাইয়াছিল। স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু প্রাধান্য পায় নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠতার পরে উহা ক্রমেই প্রাধান্য পাইতেছিল। এখানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ এই যে, বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র ও মাতা অঘোরকামিনী কেশবচন্দ্রেরই অনুগামী ছিলেন। বিধানচন্দ্রের জন্মের কয়েক মাস পরে মাঘোৎসবের সময়ে প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী ঘনিষ্ঠভাবে কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হন। তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি এবং অসামান্য চরিত্রবল কেশবচন্দ্রকে মুগ্ধ করে। কেশবচন্দ্র যে তাঁহাদিগকে বহু পূর্ব হইতেই ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে কেশবচন্দ্র দীর্ঘ নির্জনবাসের পর Behold the Light of Heaven of India শীর্ষক বক্তৃতায় তাঁহার নব উপলব্ধির কথা ঘোষণা করেন। ইহাতে তিনি ধর্মসমন্বয়ের কথাই বলেন। বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের সহিত

অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মধর্মের একটি সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াস ইহাতে প্রকাশ পায়। ঐ সময় একটি নিবন্ধে তিনি লেখেন: "Their (Hindu) idolatry is nothing but the worship of divine attributes materialised... If we are to worship Him in all his manifestations, we shall name one attribute Lakshmi, another Saraswati, another Mahadeva, etc., etc.…" তিনি এই ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টার নাম দেন New Dispensation বা নববিধান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দেই রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহার নববিধানে তিনি তাঁহার অনুগামীদের বলেন: "The believer in the new dispensation is required to worship God as the possessor of all those attributes, represented by the Hindus as innumerable or three hundred and thirty millions." ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ধর্মসমন্বয়ের চিন্তা কেশবচন্দ্রের মধ্যে প্রকাশ পাইলেও তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে নববিধানের কথা ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'বিধান' রাখিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ এই নববিধানের প্রভাবেই হইয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী যে মাতৃরূপেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন এবং জগন্মাতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশচন্দ্রের আত্মজীবনী অঘোর-প্রকাশের পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন।

২

বংশ-পরিচয়

বিধানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশে। সুতরাং বংশ-পরিচয় প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সেই স্মরণীয় বীরপুরুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্জয় অধিনায়ক প্রতাপাদিত্যের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

অমিতবল মহাপরাক্রমশালী সম্রাট আকবরের (১৫৪২ খ্রীঃ—১৬০৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে যুগল-প্রতাপের অভ্যুদয়ে পরাধীন ভারতের মুমূর্ষু অধিবাসিগণের মধ্যে কিছুকালের জন্য প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল। উত্তর ভারতে রাজপুতানার পার্বত্য অঞ্চল হইতে ভারতবাসী শুনিতে পাইল—বীরকেশরী মহারানা প্রতাপের সিংহ-গর্জন, আর পূর্ব ভারতে বঙ্গ-গগনে দেখিতে পাইল—বঙ্গসূর্য মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উদয়। প্রতাপাদিত্য ছিলেন বাংলার বারো-ভুঁইঞা বা দ্বাদশ ভৌমিক রাজগণের অন্যতম। বারো-ভুঁইঞার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ছিলেন। তাঁহাদিগের ভিতরে পারস্পরিক সহানুভূতি বা মনের মিল তেমন ছিল না; কিন্তু মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করা ছিল তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁহারা প্রয়োজনমতে ঐক্যবদ্ধ হইতেন। মোগলের আক্রমণে বঙ্গদেশে পাঠানেরা হীনবল হইয়া পড়িতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে শাসনক্ষমতাও তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছিল। তৎকারণে পাঠান রাজগণকে নির্ভর করিতে হইত ভৌমিক রাজগণের সাহায্যের উপর। এইভাবে দুইটি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদে একটা স্বার্থের সম্বন্ধও গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঠান ভূপতিগণের বিপৎকালে ভুঁইঞা-রাজগণ তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ সসৈন্যে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। তৎকালে বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিত—তাহাদিগের সাধারণ শত্রু মোগল, আরাকানী মগ, পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে।

বঙ্গদেশের উপর প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে (১১৯৮ খ্রীঃ) এবং তৎকালে মুসলমান-রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়। আক্রমণকারী মুসলমানেরা অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারে নাই। নিখিল বঙ্গ তো দূরের কথা, কেবল পূর্ববঙ্গের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রায় দেড়শত বৎসর লাগিয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার পরে চতুর্দশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ দিল্লীর সুলতানের (মুহম্মদ বিন্ তুঘলকের) প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একই সময়ে অনুরূপ

ঘোষণা করিলেন অযোধ্যা, মালব, গুজরাট, মথুরা ও বিদর প্রভৃতি অঞ্চলের শাসন-কর্তারাও। সেই সময় হইতে বাদশাহ্ আকবরের বঙ্গবিজয় পর্যন্ত (১৫৭৬ খ্রীঃ) প্রায় ২৩৮ বৎসর বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্বমুক্ত স্বতন্ত্র শাসনের যুগ বলিলে ভুল হইবে না। তৎকালে সুশাসনের অভাব এবং নানাবিধ বিশৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বীর্য ও শক্তিহীন হইয়া যায় নাই। বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংগ্রামশীলতার অভাব ছিল না। তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনায় যেমন দক্ষ ছিলেন, রণক্ষেত্রেও সৈনিক এবং সেনাধিনায়করূপে তেমনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

যে বারো-ভুঁইঞার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে শাসনদক্ষতা, শক্তি, সাহস ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এই ছয় জন—(১) ঈশা খাঁ মসনদ আলি (খিজিরপুর বা কত্রাভূ), (২) প্রতাপাদিত্য (যশোহর বা চ্যাণ্ডিকান), (৩) চাঁদ রায় ও কেদার রায় (শ্রীপুর বা বিক্রমপুর), (৪) কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় (বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ) (৫) লক্ষ্মণমাণিক্য (ভুলুয়া), (৬) মুকুন্দরাম (ভূষণা বা ফতেহাবাদ)। ইঁহারা মোগলদিগের দিগ্‌বিজয়ের প্রধান ও প্রবল অন্তরায় ছিলেন। এই ভৌমিক রাজগণের মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার সুশাসন-ব্যবস্থা, সংগঠনী প্রতিভা, স্বদেশপ্রেম, রণনৈপুণ্য, ক্ষাত্রতেজ, বিদ্যানুরাগ, দানশীলতা ইত্যাদি বহুবিধ গুণের জন্য।

মহারাজ আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এবং যে পাঁচজন কায়স্থকে বঙ্গদেশে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিরাট গুহ অন্যতম। ইনি বঙ্গীয় গুহবংশীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বিরাট গুহের নবম পর্যায়ে আশ্ বা অশ্বপতি গুহ। যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ (বসু) রায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমাজ সমীকরণ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থগণের 'বাকলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আশ্ গুহকে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই আশ্ গুহের এক প্রপৌত্র রামচন্দ্র। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, কিন্তু আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে থাকায় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কোন কাজেই লাগিতেছিল না। এইজন্য তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণা লাভের আশায় বাকলা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী নগর সপ্তগ্রামে। ইহা গৌড়ের অধীন একটি শাসন-কেন্দ্র এবং সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। তথায় তিনি আশ্রয় পাইলেন পূর্ববঙ্গবাসী, বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শ্রীকান্ত ঘোষের গৃহে। সুদর্শন, সুশ্রী, উদ্যমশীল, কৃতবিদ্য ও ধীমান যুবক অল্পকালমধ্যেই ঘোষ মহাশয়ের স্নেহানুগ্রহ পাইলেন। তিনি যুবককে রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন। কর্মদক্ষতার জন্য কিছুকাল পরেই যুবকের পদোন্নতি হইল। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দেশত্যাগী যুবকের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যসত্যই প্রসন্না হইলেন।

শ্রীকান্ত ঘোষের এক কন্যার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ হইল। তৎপূর্বে বাক্‌লাতে শচীবর বসুর কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। সেই স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। মাতৃভাষা ব্যতীত সংস্কৃত এবং পারসীক ভাষায়ও ভ্রাতৃত্রয় কৃতবিদ্য হইয়া আসিলেন সপ্তগ্রামে। তিনজনই রাজকীয় দপ্তরে উচ্চপদে নিযুক্ত হইলেন। যথাসময়ে তিন সহোদরেরই বিবাহ হইল। ভবানন্দের এক পুত্র—শ্রীহরি, গুণানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র জানকীবল্লভ। শিবানন্দের তিন পুত্র। তৃতীয় ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহই যশোহরে আসেন নাই। তাঁহারা পূর্ব বাসস্থান বাক্‌লাতে চলিয়া যান এবং তথায় বসবাস করেন। শ্রীহরি পরবর্তীকালে 'বিক্রমাদিত্য' নামে যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং জানকীবল্লভ 'রাজা বসন্ত রায়' নামে খ্যাত হন। শ্রীহরি ছিলেন জানকীবল্লভ অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। উভয়ে সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সৌভ্রাত্র এমন গভীর ছিল যে, তৎকালে অনেকেই সেইজন্য তাঁহাদিগকে তুলনা করিতেন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে।

সপ্তগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তা গৌড়ের অধীন থাকিতে সম্মত ছিলেন না বলিয়া শিবানন্দের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটে। তখন রামচন্দ্রকে ৬৫ বৎসর বয়সে আত্মরক্ষার জন্য গৌড়ে চলিয়া যাইতে হয়। তিনি সঙ্গে লইলেন কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানন্দকে, আর পরিবারের অন্যান্যেরা রহিয়া গেলেন সপ্তগ্রামেই। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীঃ) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্র পরবর্তী ৪০ বৎসরকাল সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত রাজসেবা করিয়া আসিয়াছেন। পিতার মত শিবানন্দের কর্মদক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার খ্যাতিও রাজধানী গৌড়ে সুবিদিত ছিল। সুলতান হুসেন শাহের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ্ সেই সমুদয় বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্রের পুত্রগণকে পুনরায় রাজসরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হইল। যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন তিনিই।

পাঠান বীর শের শাহ্ গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ্‌কে বঙ্গের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলাদেশ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার অধিকারও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। পরবর্তী কয়েক বৎসর চলিল রাষ্ট্রবিপ্লব। যুদ্ধের পর যুদ্ধ ঘটিতে লাগিল এবং রাজার পর রাজা বসিতে লাগিলেন রাজতক্তে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে বিহারের শাসনকর্তা সুলেমান কররানি বাংলাদেশ জয় করিয়া রাজ্যে অরাজকতা দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। বিদ্রোহী পক্ষে যোগদান না করায় ভবানন্দ, গুণানন্দ এবং শিবানন্দকে পুরস্কৃত করিলেন সুলেমান। ভবানন্দ মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। অপর দুই ভ্রাতাও রাজকীয় দপ্তরে উচ্চপদ পাইলেন। সুলেমানের দুই পুত্র ছিলেন—একজনের নাম বয়াজিদ এবং

অপর জনের নাম দাযুদ। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জানকীবল্লভ তখন তরুণ যুবক, রাজপুত্রদ্বয়ও তাঁহাদের সমবয়স্ক। মন্ত্রী ভবানন্দের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত রাজবাড়িতে একত্র থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেন, একসঙ্গে বেড়াইতেন এবং খেলা করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির ভাব জন্মে। ইহার ফলে যশোহর রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল। সুলেমানের মৃত্যুর পরে দাযুদ যখন সিংহাসনে আসীন হইলেন, তখন বাল্যবন্ধু শ্রীহরি এবং জানকীবল্লভকে রাজকীয় দপ্তরে উচ্চপদ দিলেন। নবীন সুলতান শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' এবং জানকীবল্লভকে 'বসন্ত রায়' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। বিক্রমাদিত্য পাইলেন প্রধান মন্ত্রীর পদ।

শ্রেষ্ঠ কুলীন উগকণ্ঠ বসুর কন্যার সহিত শ্রীহরির বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার পিতা ভবানন্দ যখন সপরিবারে গৌড়ে বাস করিতেছিলেন, তখন ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা ইহার সামান্য পরেই অল্পবয়সে শ্রীহরির ঔরসে উল্লিখিত বসু দুহিতার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। ইনিই বিশ্ববিশ্রুত প্রতাপাদিত্য—যিনি ভাবীকালে যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং যাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপ মোগল সম্রাটকেও বিচলিত করে।

দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ভবানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, মোগলের সঙ্গে দাযুদের যুদ্ধ অনিবার্য। সুতরাং তিনি গৌড় হইতে দূরবর্তী কোন নিরাপদ অঞ্চল বাছিয়া লইয়া তথায় বাস-সংস্থান করা স্থির করিলেন। নির্বাচিত হইল দক্ষিণবঙ্গে এক নদীবহুল অরণ্য অঞ্চল।

মোগলের সহিত দাযুদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পলায়নের পূর্বে দাযুদ গৌড়ের অপরিমিত ধনরত্নাদি বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইয়া দেন। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্ত রায় ওই সমুদয় নৌকায় করিয়া যশোহরে লইয়া আসিলেন। দেবানুগ্রহে যশোহর রাজ্যের ধনভাণ্ডার ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মোগল সম্রাট আকবর তাঁহার রাজস্ব-সচিব ও অন্যতম সেনাপতি টোডরমল্লকে বঙ্গবিজয়ে সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে পাঠাইয়াছিলেন। দাযুদের পতনের পরে তিনি রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির জন্য বিক্রমাদিত্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহা কোন সূত্রে অবগত হইয়া বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশ ছাড়িয়া টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহের রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিলেন। রাজকীয় দপ্তরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিক্রমাদিত্য টোডরমল্লকে বুঝাইয়া দিলেন এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদিতে সাহায্য করিলেন। সম্ভবতঃ টোডরমল্লেরই সুপারিশে সম্রাট আকবর বিক্রমাদিত্যকে সামন্ত-রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ হইল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব এবং তিনি বাদশাহকে যথারীতি রাজস্ব

প্রদান করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রায় সহ যশোহরে ফিরিয়া আসিলেন এবং কালোপযোগী সমারোহ ও উৎসবানুষ্ঠান সহকারে যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হইলেন। দীর্ঘকাল পরে দক্ষিণবঙ্গ অরাজকতা হইতে অব্যাহতি পাইল এবং প্রজাগণ শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে শাসনকার্য চালাইতেন রাজা বসন্ত রায়।

মহারাজকুমার প্রতাপাদিত্য কিরূপ পরিবেশে বাল্য হইতে কৈশোরে ও কৈশোর হইতে যৌবনে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার জীবন কিভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তৎসম্পর্কে সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :

"প্রতাপাদিত্য পরম রূপবান ছিলেন বলিয়া কথিত হন। তিনি বাল্যকাল গৌড়নগরে অতিবাহিত করিয়া, যে সময় পুরস্ত্রীগণ যশোহরে গমন করেন, সেই সময় তাহাদিগের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। গৌড়নগরে অবস্থানকালেই বালক প্রতাপাদিত্য পারস্যভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। তিনি অল্পকালের মধ্যে পারস্যভাষা যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যাস করেন। প্রতাপাদিত্য যশোহর নগরে উপনীত হইয়া, উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পৌরষজনক বিদ্যাতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হন। তিনি শরচালনা ও অশ্বারোহণে এরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে এ বিষয়ে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না।"

প্রতাপের জন্মপত্রিকায় লিখিত ছিল যে, তিনি পিতৃদ্রোহী হইবেন। ইহাতে তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত প্রভৃতির মনে অশান্তি ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। প্রতাপের সহিত ব্যবহারে ও কথাবার্তায় গুরুজনদের সেই প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ পাইত। তাহার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁহারা তিরস্কার করার কালে তাঁহাকে পিতৃদ্রোহী বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। গুরুজনদের এইরূপ আচরণে প্রতাপের মনে প্রতিক্রিয়া হইল। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্ত রায় তাহার মতিগতি ও কার্যাদি হইতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে রাজদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। আকবরের মতো মহাপরাক্রমশালী ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলে যে সুনিশ্চিত সর্বনাশের মুখোমুখি হইতে হইবে, ইহাও তাঁহারা জানিতেন। পিতা ও পিতৃব্য পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রাজ্যশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের অজুহাতে প্রতাপকে মোগল সম্রাটের তৎকালীন রাজধানী আগ্রায় পাঠানো হইবে। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া সম্রাটের অসীম শক্তি ও প্রতাপের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলে যুবক প্রতাপাদিত্যের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এই প্রকার ধারণা তাঁহাদের জন্মিল।

পিতার আদেশে প্রতাপ কয়েকজন বন্ধু এবং অনুচরবর্গকে লইয়া আগ্রায় গেলেন। অল্পকালমধ্যেই তিনি সম্রাটের এবং আমির-ওমরাহ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী প্রভৃতির

প্রীতিভাজন হইলেন। ঘন ঘন বাদশাহের দরবারে যাইয়া এবং উজিরদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মুষ্টিমেয় মুসলমান বিদেশ হইতে আসিয়া এই দেশেরই হিন্দু মন্ত্রী ও রাজকর্মচারিগণের সাহায্যে ও সহযোগিতায় বিরাট ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বিদেশীর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য হিন্দুজাতির ঐক্য, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির অভাবই যে দায়ী, এই ধারণাও তাঁহার মনের মধ্যে জাগিল। রাজপুতানার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত মিশিয়া তিনি শুনিলেন মহারানা প্রতাপ সিংহের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কাহিনী। রানা প্রতাপের অপূর্ব ত্যাগ, দুঃখবরণ, মহান সংকল্প ও বীরত্বের কাহিনী তাঁহাকে নূতন প্রেরণা দিল। রাজভক্ত পিতা যে উদ্দেশ্যে পুত্রকে আগ্রায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

পিতার হাত হইতে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে আনিতে না পারিলে স্বাধীনতা লাভের পথ যে সুগম হইবে না, তাহা প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারিলেন। সেইজন্য তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। আগ্রায় অবস্থানকালে রাজকীয় দপ্তরে জমা দিবার জন্য যশোহর হইতে তাঁহার নামে যে রাজস্ব প্রেরিত হইত, তাহা তিনি জমা দিলেন না। রাজস্ব অনাদায়ের কথা প্রতাপ কৌশলে সম্রাটের কানে লাগাইলেন। সম্রাট তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বসন্ত রায়ের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিলেন। সম্রাট প্রতাপকে বলিয়া দিলেন যে, যদি তিনি বাকী রাজস্ব শোধ করার ব্যবস্থা অল্পদিনের ভিতর করিতে পারেন, তবে যশোহর রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার উপর প্রদত্ত হইবে। প্রতাপ সম্রাটের আদেশ পালন করিয়া রাজ্যশাসনের ফরমান পাইলেন। সম্রাটের আদেশে বিশ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া তিনি যশোহর নগরে প্রবেশ করিলেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় অবস্থা বিবেচনায় প্রতাপের কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না।

প্রতাপাদিত্যের সিংহাসনে আসীন হইবার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। প্রতাপ মোগলের প্রভুত্ব-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সমস্ত চিন্তা ও শক্তি নিয়োগ করিলেন। রাজ্যের বহু স্থানে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত হইল। সমর্থ অধিবাসিগণকে সাহসী ও রণকুশল সৈনিকরূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। সেই সঙ্গে সময়োপযোগী প্রচার দ্বারা জনগণকে সংগ্রামশীল ও স্বাধীনতা-প্রিয় করিয়া তোলা হইল। ইতিমধ্যে ঘটিয়া গেল এমন একটা ঘটনা—যাহার ফলে প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হইয়া রহিল। পিতৃব্য ও পিতৃব্যের পরিবারের সহিত প্রতাপের শত্রুতা চলিতেছিল। সেই অবস্থায় বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধে প্রতাপ নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাড়িতে গেলে বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায়ের সহিত প্রথমে প্রতাপের সংঘর্ষ ঘটে। গোবিন্দ প্রতাপকে লক্ষ্য

করিয়া তাব নিক্ষেপ করেন, লক্ষ্যচ্যুত হওয়ায় প্রতাপের প্রাণ রক্ষা পায়। প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে তরবারির দ্বারা গোবিন্দের শিরশ্ছেদ করেন। পরে সেই সংঘর্ষে বসন্ত রায় এবং তাঁর আরও সাতটি পুত্র নিহত হন। বসন্ত রায়ের সহধর্মিণী অবশিষ্ট পুত্র বালক রাঘবকে কচু-বনে লুকাইয়া রাখিয়া আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। সেই পুত্রটি উত্তরকালে কচু রায় বলিয়া অভিহিত হন।

এ বাক্ত শোচনীয় ঘটনার পরে বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসু এবং প্রধান প্রধান কর্মচারী প্রতিশোধ লইবার আশায় বসন্ত রায়ের পরম বন্ধু হিজলীপতি ঈশা খাঁ মসনদ আলির শরণাপন্ন হইলেন। ইহার অল্পকাল পরেই ঈশা খাঁর সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঈশা খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গেই হিজলী অধিকার করিয়া তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে কেদার রায়, চাঁদ রায় প্রতাপের সহিত সম্পাদিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া স্বাধীন হইবার জন্য উদ্যোগী হন। প্রতাপ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান করেন। তাঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইলেন; এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভবিষ্যতে এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বদেশে অনিষ্ট সাধন করিবেন না। প্রতাপ তাঁহাদিগকে অধিকৃত রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। সিংহাসনে আসীন হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধুমধামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

মহারাজের সুশাসনে বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি আরাকান-নৃপতির সহিত সন্ধি করিয়া পর্তুগীজ জলদস্যুগণের উপদ্রব বন্ধ করিলেন। প্রতাপের রাজ্যের মধ্যে যে সকল সামন্ত রাজা ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে কেবল অধীনতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গীয় জমিদারগণের প্রায় সকলেই প্রতাপের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এদিকে রূপরাম বসু কচু রায়কে সঙ্গে লইয়া গেলেন আগ্রায় মোগল বাদশাহের শরণ লইতে। তাঁহাদিগের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন স্থানীয় চতুর লোকও গেলেন। বাদশাহের দরবারে রূপরাম প্রতাপের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ আনিলেন। প্রতাপ যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও তিনি জানাইলেন।

প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রথম মোগল অভিযান হইল রাজমহলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শের খাঁর অধিনায়কত্বে। তুমুল যুদ্ধের পর প্রতাপের সৈন্যের হস্তে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল।

প্রতাপাদিত্যের হস্তে শের খাঁর পরাজয়-বার্তা মোগল সম্রাটের নিকট পৌঁছিলে, তিনি ইব্রাহিম খাঁকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া পুনরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর এইবারেও মোগল-বাহিনীর পরাজয় ঘটিল।

সম্রাট আকবর প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান এবং মোগল-বাহিনীর পরাজয় সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হন। পরবর্তী অভিযান পরিচালনার্থ তিনি মনোনীত করিলেন আজিম খাঁ নামে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতিকে। তিনি বিপুল বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া প্রতাপ-বিজয়ের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতাপের গোপনীয় উপদেশ মতে তাহার অধীনস্থ পাটনার এবং রাজমহলের কর্মচারিগণ আজিম খাঁকে কোন প্রকার বাধা না দিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মোগল সেনাপতি মনে করিলেন যে, এতদূর পর্যন্ত যখন তিনি বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তখন প্রতাপের রাজ্য জয় করিতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইবে না, আজিম বঙ্গদেশে পৌঁছিয়া বর্তমান কলিকাতার নিকটে শিবির সংস্থাপন করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। প্রতাপ দুর্ধর্ষ বাহিনী লইয়া রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন শত্রু শিবির। ভয়াবহ সংগ্রামের পর মোগল বাহিনী পরাজিত হইল। অনুমান বিশ হাজার মোগল সৈন্যকে নিধন ও বন্দী করা হইল। সেনাপতি আজিম খাঁও নিহত হইলেন সেই যুদ্ধে।

মোগল সম্রাট এইরূপ পরিস্থিতিতে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যের বাইশজন আমিরকে রাজদরবারে আহ্বান করিলেন। ইহারা সকলেই অভিজ্ঞ সাহসী যোদ্ধা। সম্রাটের মুখে দুর্ধর্ষ প্রতাপের মোগল বাহিনীর বিপর্যয়ের কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই প্রতাপ দমনের জন্য বঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সহস্র সহস্র সৈন্য লইয়া বাইশজন আমির বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। মহারাজের বাহিনীর সঙ্গে মোগল বাহিনীর বহুদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিল। এবারও মোগল বাহিনীর পরাজয় হইল। ইতিমধ্যে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হইল (১৬০৬ খ্রীঃ), তাহার পুত্র জাহাঙ্গীর বসিলেন মসনদে। তিনি সেনাপতি মানসিংহকে বিপুল বাহিনী সহ বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। রাজপুত সেনাপতি রূপরাম বসু প্রমুখ বহু বাহিনী সঙ্গে আসিলেন। সেই সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন দেশদ্রোহীও যোগ দিলেন। তাহারা নানা প্রকার গোপনীয় সংবাদাদি দান করিয়া মানসিংহকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রতাপাদিত্যের বাহিনীর সহিত মোগল বাহিনীর ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কখনও প্রতাপের পক্ষে জয়, কখনও মানসিংহের পক্ষে জয়, এইভাবে জয়-পরাজয়ের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া চলিল ভয়াবহ যুদ্ধ। ভাগ্য-লক্ষ্মী প্রতাপের প্রতি বিমুখ হইলেন। বীরত্ব ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রতাপের প্রধান প্রধান সেনানীরা মৃত্যুবরণ করেন। প্রতাপের জ্যেষ্ঠ-পুত্র ঊনবিংশ-বর্ষীয় উদয়াদিত্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিলেন। প্রতাপাদিত্য বন্দী হইলেন শত্রু-হস্তে। সেই সঙ্গে অস্তমিত হইল বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য। এই সমুদয় দুঃসংবাদ যখন দুর্গমধ্যে পৌঁছিল, তখন প্রতাপের মহিষী শরৎকুমারী আপন কর্তব্য স্থির

করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পূর্বের অভিসন্ধি অনুসারে বিপৎকালে কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। দুর্গের ভিতরে পরিখায় পূর্ব হইতে একখানি আবৃত নৌকা প্রস্তুত ছিল। মহারানী অন্যান্য স্ত্রী-পরিবার ও শিশু-সন্তানসহ সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে ঐ খাল বাহির হইয়া গিয়াছিল, তথায় একটি গুপ্ত দ্বার ছিল। উহা খুলিয়া দিলে নৌকা-পথে পলায়ন করা যাইত। পূর্বেই বলিয়াছি ঐ ভিতরের খাল গিয়া বাহিরের যে বিস্তীর্ণ পরিখায় মিশিয়াছিল, তাহার নাম কামারখালি, উহা অল্প দূরে গিয়া যমুনায় মিশিয়াছিল। যমুনা-প্রবাহের প্রবল উচ্ছ্বাসে কামারখালি তখন প্রশস্ত নদীতে পরিণত হইয়াছিল। এখনও তাহার খাত বর্তমান যমুনার খাত অপেক্ষাও প্রশস্ত আছে।

"অবিলম্বে গুপ্তদ্বার উন্মোচিত হইল। রাজ-পরিবারের জীবনবাহিনী তরণী সেই পথে বাহিত হইয়া বাহিরে কামারখালিতে পড়িল। সেইখানে তরণীর তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইল। পরিবারবর্গ ও শিশু-সন্তানসহ যশোহরের মহারানী জাতি মান রক্ষা করিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মোগলের হস্তে সতীত্ব-ধর্ম জলাঞ্জলি না দিয়া, প্রকৃত রাজপুত ললনার মত যশোহর-পুরীর কুললক্ষ্মীগণ যমুনা-জলে জীবনাঞ্জলি দিলেন। এইবার যশোহর-রাজলক্ষ্মী প্রকৃতভাবে অন্তর্হিত হইলেন। ধূমঘাট দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোণে জহর-ব্রতের চিতাচত্বরের মত সেই স্থান এখনও প্রদর্শিত হয়। মহারানী শরৎকুমারীর নামে এখনও তাহার নাম 'শরৎখানার দহ'।"

কবি ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' কাব্য হইতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও বন্দী হইবার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"পাতসাহী ঠাটে কেবা যুঝে আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ-আদিত্যে লৈল॥"

মানসিংহ বন্দী প্রতাপাদিত্যকে মোগল বাদশাহের নিকট লইয়া যাইতে পারেন নাই। পথিমধ্যে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হইল। কাহারও কাহারও মতে বিষপানে প্রতাপ মৃত্যুবরণ

৩

বিধানচন্দ্রের পিতামাতা

বিধানচন্দ্র তাঁহার জীবনে যেসকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ লিউকিস, মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাম বার বার করিয়াছেন। কিন্তু মহামানব ও পরিপার্শ্বের প্রভাব সকলকে সমানভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। সূর্যের আলোক যেমন মৃত্তিকায় পড়িয়া বিচ্ছুরিত হয় না, কিন্তু দর্পণে পড়িলে বহুগুণে উজ্জ্বল হইয়া বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি মহামানব ও পরিপার্শ্বের প্রভাব অপাত্রে পড়িলে তাহা বিশেষ সুফল প্রসব করে না; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়িলে তাহা নবরূপে উদ্ভাসিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বিধানচন্দ্রের চরিত্র শৈশবে ও বাল্যকালে এমনভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ মানব সকল ও উত্তম পরিপার্শ্বের প্রভাব এবং গ্রহণীয় আদর্শসমূহ তাহা অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শৈশবে ও বাল্যকালে তাঁহার চরিত্রকে ঐরূপ ক্ষমতা দান করিয়া গঠনের জন্য তাহার পিতামাতাই দায়ী ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা কেবল অসাধারণ চরিত্রের অধিকারীই ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন জীবনের বহুদিক্ হইতে অনন্যসাধারণ এক পুরুষ ও এক রমণী। সত্যই, তাঁহাদের জীবন ছিল যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। সহিষ্ণুতায়, সংযমে, ধৈর্যে, স্বার্থহীনতায়, পরহিতব্রতে এবং ধর্মপ্রাণতায় তাঁহারা একালের মানুষ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা যেন এক কল্প-লোকের দুই নরনারী পথভ্রষ্ট ও যুগভ্রষ্ট হইয়া এযুগে ও এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই বিধানচন্দ্রের জীবনকে জানিতে হইলে, তাঁহার পিতামাতার জীবনকেও জানিতে হইবে।

বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বহরমপুর শহরে—পিতার কর্মস্থলে। প্রকাশচন্দ্রের পিতা প্রাণকালী রায় সেখানে কালেক্টারিতে কাজ করিতেন। "পরোপকার ও শুদ্ধাচারের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।" প্রকাশচন্দ্রের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে। পূর্বপুরুষের জমিদারির বেশির ভাগই হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল; প্রাণকালী রায়ের সময়েও কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল।

পিতার মৃত্যুর পরে প্রকাশচন্দ্রের সেজদাদা পূর্ণচন্দ্র বদলি হইয়া গেলেন যশোহরে। বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রকাশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৬৪

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। এফ এ. পড়িবার জন্য তিনি আবার বহরমপুরে গেলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি কিংবা মার্চ মাসে তাঁহার বিবাহ হইল স্বগ্রামের কুলীন জমিদার বিপিনচন্দ্র বসুর কন্যা অঘোর-কামিনীর সঙ্গে। বরের বয়স আঠারো বৎসর এবং কনের বয়স দশ বৎসর। তখন ছিল বাল্যবিবাহের যুগ। এফ এ. পরীক্ষায় (বর্তমানের উচ্চ মাধ্যমিক) উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাশচন্দ্র বি এ পড়িতে থাকেন, কিন্তু সংসারে বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ বাধিতে থাকায় তাঁহার পক্ষে আর বি. এ পাস করা সম্ভব হয় নাই। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার বড়দাদা শরৎচন্দ্র ও মেজদাদা পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই। সাংসারিক বিবাদ, অশান্তি, অভাবাদির মধ্য দিয়া অঘোরকামিনীকে পরমেশ্বর যেন নিজ হাতে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল কিংবা মে মাসে অর্থাৎ ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে। সুতরাং তৎকালে তাঁহাকে বালিকা বধূ বলা যাইতে পারে। তাঁহার পিতৃকুল এবং স্বামিকুল—উভয় কুলই ছিল এককালে বিত্তবান ও সুখী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভাগ্যদোষে বালিকা বধূকে পড়িতে হইল দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অগ্নিকুণ্ডে। স্বর্ণ যেমন অনলে দগ্ধ হইয়া গ্লানি-মুক্ত হয়, অঘোরকামিনীও তেমনই খাঁটি সোনা হইয়া অর্থাৎ হিন্দু পরিবারের আদর্শ গৃহিণীরূপে নিজেকে গড়িয়া লইয়া বাহির হইলেন। এ সময় পরমেশ্বর যেন নিজ হাতে তাঁহাকে সর্ব অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাঁহার ঈশ্বর নির্ভরতা, শ্রমশীলতা, ধৈর্য, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি আদর্শ গৃহিণীর উপযোগী গুণাবলী পরিস্ফুট করিয়া দিলেন। উত্তরকালে এই সমুদয় গুণই তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনায়, সমাজ-সেবায় ও পরোপকারব্রত-পালনে সহায়ক হইয়াছিল। বালিকা বধূ থাকাকালে একবার অঘোরকামিনী স্বগ্রামের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। আহারের সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, যাঁহারা দামী শাড়ি অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের আদর যত্ন হইতেছে যথেষ্ট আর যাঁহাদের বেশ ভূষা সাধারণ, তাঁহাদের কোনপ্রকার সমাদর হইতেছে না। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র বলিয়া ব্যবহারের বৈষম্যে তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, দরিদ্র বলিয়া ওইরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি কখনও করিবেন না। সেই সংকল্প তিনি জীবনে কোনদিন ভঙ্গ করেন নাই। তাঁহার পুত্র বিধানচন্দ্রের মধ্যেও এই গুণ বিশেষভাবে বিকাশ পাইয়াছিল।

প্রকাশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই Tom Payne-এর ‘Age of Reason’ নামক পুস্তক পাঠ করেন। তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার সন্দেহ জন্মে। যখন দর্শনশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন, তখন সেই সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। ওই ভাবের পরিবর্তন হইল বহরমপুর কলেজে অধ্যয়নকালে। স্থানীয় পাদরি রেভাঃ এ. জে. ছিল

সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি বাইবেল এবং খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ পড়িয়া এবং হিল সাহেবের সহিত ধর্মালোচনা করিয়া খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী হইলেন। একদিন রাত্রি এগারটার সময় পাঠ সমাপনান্তে প্রকাশচন্দ্র স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবেন। ছাত্রাবাসে যে বন্ধুটি তাঁহার সঙ্গে একই প্রকোষ্ঠে থাকিয়া পড়িতেন, তাঁহাকে জানাইলেন সে-কথা। তিনি ওই কার্য হইতে প্রকাশচন্দ্রকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। তাহাতে ফল হইল না। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাঁহার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অমূল্য উপদেশের কথাটি—"কোন গুরুতর কার্য করিবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা সময় লইও।" তিনি ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিলেন। পরদিন তাহার একটি খ্রীষ্টান সহাধ্যায়ী পরীক্ষা দিবার কালে অসৎ উপায় অবলম্বন করায় পরীক্ষা-গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। তখন প্রকাশচন্দ্রের মনে ভাবান্তর উদয় হইল এই কারণে যে, খ্রীষ্টান হইলেই তো অসৎ কার্য করার প্রবৃত্তি লোপ পায় না এবং নবজীবনও লাভ হয় না। ওই সমুদয় চিন্তা তাহাকে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিল। তৎকালে তিনি ব্রাহ্মধর্মেরও বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে স্বগ্রামের কয়েকটি সমবয়সী নব-দীক্ষিত ব্রাহ্ম বন্ধুর সংসর্গে আসার ফলে তাঁহার সেই বিরোধিতার ভাব দূর হইল এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মিল। ভাবীকালের সেই ধর্মবন্ধুদের মধ্যে ছিলেন—হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ভাবী শিক্ষক কেদারনাথ রায়, মিটিওরোলজিক্যাল্ অফিসের ভাবী প্রধান কেরানী (পরে রায়সাহেব) ফণীন্দ্রমোহন বসু ও পটলডাঙ্গার কবিরাজ পঞ্চানন ঘোষ কবিরত্ন। ওই বন্ধুদের সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :

'ধর্ম বিষয়ে আমার মনে যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের গ্রামের সেই বন্ধুদের সঙ্গে আমার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যতবার দেশে যাইতাম, ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। এই সময়ে কেদার প্রচারক হইবেন বলিয়া শ্রীপুর গমন করেন। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, ব্যাকুলতা, ফণীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পঞ্চাননের সরলতা আমার অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। পঞ্চানন আমার সঙ্গ প্রায় ছাড়িতেন না। দুইজনে প্রায়ই নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম। তিনি গান করিতেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিত। আমাকে ফিরাইবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কোথা হইতে দেবতা যেন ইহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।"

মানব-জীবনের উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে দেখা যায় যে, সঙ্গগুণে কিংবা সঙ্গদোষে মানুষের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সৎসঙ্গ লাভ করা মানুষের পরম সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে প্রকাশচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন, সহধর্মিণীর জীবন এবং পুত্রকন্যাগণের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ব্রাহ্ম সমাজে এবং অপর সমাজেও

পাইয়াছিলেন শ্রদ্ধার আসন। অঘোরকামিনীর অসামান্য প্রতিভা এই পরিবারকে আদর্শ পরিবারে পরিণত করিয়াছিল। তাই এই পরিবার 'অঘোর পরিবার' নামে খ্যাত ছিল।

পতি-পত্নী দুইজনের জীবনই গঠিত হইয়াছিল দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন এবং নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া। প্রকাশচন্দ্র ওকালতি পড়িয়া উকিল হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিবেন, এইরূপ আশা মনে মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু স্বগ্রামবাসী উকিল হরি দত্ত মহাশয় যখন বলিলেন 'আইন ব্যবসায়ে বিবেক ঠিক রাখা যায় না', তখন তিনি সে আশা ছাড়িয়া দিলেন। ডাকঘরে দুই মাস শিক্ষানবিশ থাকিয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং বর্ধমানের অস্থায়ী পোস্টমাস্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া সেই কার্যে যোগদান করিলেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল। কয়েক মাস পরে অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ ফুরায়। বর্ধমানে থাকাকালে অঘোরকামিনীও সেখানে তাঁহাদের প্রথম সন্তান সুশীলাবালাকে লইয়া স্বামীর সঙ্গে বাস করেন। ইহার পর জন্ম হইল দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনীর। তাহার [illegible] দুইটি কন্যা সহ অঘোরকামিনীকে বাস করিতে হইল শ্বশুরালয়ে [illegible] কাল। তখন দুইটি সন্তান পালন ব্যতীতও 'কুলবধূর সমুদয় কাজ, যেমন বাটনা বাটা, কুটনা কোটা, এ সমস্তই' তাঁহাকে করিতে হইত। 'সকালে উঠিয়া বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, গোবর দেওয়া, এ সকল নিত্যকর্ম ছিল।' প্রকাশচন্দ্র তখন তাঁহার এক বন্ধুর ছাপাখানা চালাইবার ভার নিলেন অংশীদার হিসাবে। কিন্তু প্রেসের টাকা মূলধনে রাখা হইত বলিয়া তিনি বাড়িতে টাকা পাঠাইতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীকে কন্যা দুইটি সহ থাকিতে হইয়াছিল সেজদাদার উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া। গ্রামাঞ্চলে ওইরূপ অবস্থায় কুলবধূকে পরিবারের সংকীর্ণমনা লোকজনদের মুখে যে সকল অপ্রিয় মন্তব্য দিবা-রাত্রি শুনিতে হয়, অঘোরকামিনীকেও তাহা শুনিতে হইত। কিন্তু তাঁহার সহজাত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। প্রকাশচন্দ্র সহধর্মিণীর এই দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। অবশেষে তিনি বন্ধুর সম্মতি লইয়া কলিকাতায় ছাপাখানার কাজ ছাড়িয়া দিলেন এবং অগোণে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। বগুড়ায় পোস্টমাস্টারের কাজ পাইলেন, কিন্তু ভাল না লাগায় তাহাও ছাড়িয়া দিলেন।

সেকালে উচ্চশ্রেণীর ভদ্রবংশীয় মেয়েদেরও লেখাপড়া শিখানো হইত না। হিন্দুসমাজ এতটা অনগ্রসর ছিল যে, স্ত্রী শিক্ষা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত। অঘোরকামিনীও নিরক্ষরা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর চেষ্টায় এবং নিজের আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ভবিষ্যতে কালোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল কালোপযোগী শিক্ষা-লাভই করেন নাই, তাঁহার বিদ্যোৎসাহ ও বিদ্যা-বিস্তারের অক্লান্ত আগ্রহ এবং সেজন্য কল্পনাতীত ত্যাগ-স্বীকার সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর

হইতে নিজে শয়নের পূর্বে প্রায় প্রতিদিনই সহধর্মিণীকে লেখাপড়া শিখাইতেন। উভয়েরই লেখাপড়ার কাজটি নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। অঘোরকামিনী আরও ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখিতে এবং বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পরিণত বয়সে (৩৬) মিস্ থোবর্ন নামক একজন মহীয়সী খ্রীষ্টান মহিলার পরিচালিত লক্ষ্ণৌ নগরের উইমেন্‌স্ কলেজে ভর্তি হইলেন। একই উদ্দেশ্যে সঙ্গে লইয়া গেলেন তাঁহার যুবতী কন্যা দুইটিকে। সেখানে কলেজের ছাত্রাবাসে নয় মাস (১৮৯১ খ্রীঃ) থাকিয়া তাঁহারা শিক্ষা লাভ করেন। বিহারে ফিরিয়া আসিয়া অঘোরকামিনী তাঁহার কন্যা দুইটির এবং স্বামীর সহযোগিতায় বাঁকিপুরে একটি ছাত্রীনিবাস-সমন্বিত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিয়া অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজে শিক্ষা লাভ করিয়া এবং অপরকে শিক্ষা দান করিতে হয়, তাহা আয়ত্ত করিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালন ও শিক্ষাদান অন্য কোন রমণী করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তিনি বাংলা শিখিয়াছিলেন ভালো করিয়া এবং হিন্দী ও ইংরেজি ভাষা মোটামুটি শিখিয়াছিলেন।

অঘোরকামিনী আপন চেষ্টায় কেবল উচ্চশিক্ষাই লাভ করেন নাই, তিনি আপন চেষ্টায় নিজেকে সকল প্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু পরিবারের মধ্যে নিতান্ত আশ্রিত অবস্থায় থাকিয়া ব্রাহ্মধর্মে অবিচল বিশ্বাস রাখা এবং হিন্দু সমাজের নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করা যে কী দুঃসাহসিক কাজ ছিল, তাহা সকলেই কল্পনা করিতে পারেন এ সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র নিজে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন:

'আমার ধর্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই তোমাকে (অঘোরকামিনীকে) বিপদে পড়িতে হইল। সে সময়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্তর বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। বিবাহাদির সময় আমাদের দেশে জলসওয়া বলিয়া একটা অনুষ্ঠান করা হয়। পাঁচবাড়ি হইতে জল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই জলে কন্যাকে বিবাহের পূর্বদিন স্নান করান হয়। আমাদের দেশে জল ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকর বাদ্য বাজায় এবং কুলনারীরা কুৎসিত সঙ্গীত করিতে থাকে। এ প্রথা আমার অত্যন্ত দোষাবহ মনে হইত। আমি বলিয়া দিলাম, তুমি এ কার্যে যোগ দিও না। আমার কথা রাখিতে গিয়া তুমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলে।" কেবল তিরস্কৃত নয়, তাঁহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে দুঃসহ তিরস্কার ও গঞ্জনার পর জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন: "তোমাকে তো এইরূপ বলপূর্বক লইয়া যাওয়া হইল, আমি আমার মনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিবার অন্য উপায় না পাইয়া আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলাম, রাত্রিতে যখন তোমাকে লইয়া সকলে ঘরে ফিরিলেন, আমি

আর তোমাকে ঘরে আসিতে দিই নাই। তোমার দোষ ছিল না; আমি আর সকলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে না পারিয়া তোমাকেই আরও একটু কষ্ট দিলাম। যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতে তোমাকে ও আমাকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকবার দাঁড়াইতে হইয়াছিল।"

প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহাদের পুত্র বিধানচন্দ্রের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে সংক্রামিত হইয়াছিল।

সেকালে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেন, হিন্দুসমাজ এবং আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে তাঁহারা লাঞ্ছনা পাইতেন যথেষ্ট। অঘোরকামিনী ধর্ম-সাধনার পথে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকৃত সহধর্মিণী হইয়াছিলেন। সেইজন্য স্বামীর অপেক্ষা তাঁহাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবারের সহিত একত্রে বাস করিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর কিছুকাল হরিনাভি (২৪ পরগনা) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বগুড়ার পোস্টমাস্টারের কাজ ছাড়িয়া দিবার কিছুকাল পরে (১৮৭৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর) প্রকাশচন্দ্র সেই বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি সপরিবারে তাঁহার ধর্মবন্ধু শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিবারের সহিত হরিনাভি গ্রামে একত্রে বাস করিতেন। উভয় পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতা ও প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল। এই সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"১৮৭৪ সালের মার্চ মাসে তোমাকে ও কন্যা দুইটিকে সেখানে লইয়া গেলাম। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তুমি মিশিতে লাগিলে। ব্রাহ্ম পরিবার যে কত উন্নত হয়, একত্র উপাসনার যে কত সুফল, তাহা অনুভব করিবার সুযোগ পাইলে। স্বামীর সঙ্গে ও স্বামীর ধর্মবন্ধুদের সঙ্গে একত্র বাস করিবে, স্বাধীনভাবে নিজের সংসার করিবে, ও সেই সংসারে নিজের প্রাণের ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিবে, এই সকল আশা অনেক দিন হইতে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলে। এতদিন আমি বিদেশে ছিলাম, আমার জন্যও কত ব্যাকুল হইয়াছিলে। এইবার তোমার এসকল বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল। তাই এখানে আসিয়া তুমি অতিশয় সুখী হইলে। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তোমার বন্ধুতা হইল। তাঁহার কন্যার আবদার রক্ষার জন্য স্বহস্তে একদিন আপন কন্যা সুসারের বড় চুল কাটিলে।...আমি মতিহারীতে দুর্ভিক্ষের রিলিফ্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাজ পাইলাম। এ কাজে বেতন অধিক, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও অধিক, তা ছাড়া গবর্নমেণ্টের কাজ, সকল কারণে তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। বন্ধু শিবনাথও বলিলেন, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আসিবার সময় তুমি ও তোমার কন্যাগুলি এবং শিবনাথের পত্নী ও কন্যা এত ক্রন্দন করিয়াছিলে যে সে কান্নার রোল আমি ভুলিতে পারিব না।"...

অঘোরকামিনী গ্রাম্য বালিকা ও গ্রাম্য বধূরূপে জীবন আরম্ভ করিলেও অত্যন্ত প্রগতিশীলা নারীর মতোই পুরুষের সহিত নারীর সমানাধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"বাহিরে আসিয়া তোমার মনে স্বাধীনভাব বাড়িতে লাগিল, সাহস বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির অধিকার বিষয়ে, নারীজীবনের আদর্শ বিষয়ে, চিন্তার স্রোত খুলিয়া যাইতে লাগিল। যতই তুমি বাহিরের জগৎ দেখিতে লাগিলে, ততই বুঝিতে পারিলে, এদেশে নারীর অবস্থা কত হীন, এবং তাঁহার উন্নতির পথে পদে পদে কত বাধা—ততই তোমার মনে ক্লেশও হইতে লাগিল।...উপাসনা, সংকীর্তন, আলোচনা প্রভৃতি যাহা কিছু পুরুষেরা করিতেন, তোমার মনে হইত যে নারীদের তাহা করা আবশ্যক, ও তাহা করিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। আর যথার্থ কথাও তো তাই। বিধাতা একই ধাতুতে নারীর ও পুরুষের আত্মাকে গড়িয়াছেন, ভিন্ন নিয়ম কিরূপে হইতে পাবে? অধিকারে ছোট বড় কিরূপে হইতে পারে? যখন সামাজিক উপাসনায় আচার্য বলিতেন, 'আমরা দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি' তখন কোন নারীই উঠিতেন না; কিন্তু তুমি আপনাকে সমাজের একজন লোক মনে করিতে, এবং প্রত্যেক সামাজিক উপাসনায় সাধারণ প্রার্থনাব সময় পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে। এজন্য তোমাকে অনেক নিন্দা ও ভৎ´সনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতে না।"

ওই উদ্ধৃতি দিয়াছি প্রকাশচন্দ্রের রচিত আত্মজীবনী 'অঘোর-প্রকাশ' নামক গ্রন্থ হইতে। বাংলা ভাষায় রচিত ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। সাধু পতি সাধ্বী পত্নীর দেহাবসানের পরে, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সেই পুণ্য জীবন-কাহিনী—যাহাতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে চরিতকারের পূত আত্মকথা। প্রকাশচন্দ্র গ্রন্থের 'উদ্বোধন'-এর আরম্ভেই লিখিয়াছেন :

"তোমার দেহত্যাগের পর ত্রিশ দিনের দিনে তোমার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তুমি বলিয়াছিলে, শুদ্ধাচার, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ ব্যবহার না হইলে তোমার সঙ্গে আর অধিক মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। আরও বলিয়াছিলে, তোমার মত না হইলে উন্নত মিলনের ভূমিতে উপনীত হইতে পারিব না।

"সেই দিন হইতে তোমার মত হইবার জন্য আরও ব্যাকুল হইলাম। আবার সেই দিন হইতে, কি জানি কেন, তোমার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই জীবনীর সূত্রপাত। কত সময়ে তোমার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি। দেশে থাকিতে তুমি মিলিত জীবনের এই কাহিনী শুনিতে কত ভালবাসিতে। কতবার পত্রে সে কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছি। আজ তুমি আমার কত নিকটে। এস দুজনে আবার চিরপরিচিত সেই পবিত্র কাহিনীর আলোচনা করি।"

প্রকাশচন্দ্র মতিহারীতে কাজ পাইবার কিছুকাল পরেই তাঁহার সেজদাদা পূর্ণচন্দ্র আসামে একটা বড় কাজ পাইয়া গেলেন। তিনি প্রকাশচন্দ্রকেও তথায় যাইয়া তাঁহার অধীনে কাজ করিতে লিখিলেন। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র যাইতে সম্মত হন নাই। তাঁহার অসম্মতির হেতু সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন :

"এই সময়ে সেজদাদা মহাশয় আসামের একজন বড় জমিদারের দেওয়ান হইয়া গৌহাটী গেলেন। আমাকেও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া কাজ লইতে বলিলেন। আমার ভাল লাগিল না। হাজার কেন টাকা হউক না, যেখানে ধর্ম রক্ষা করিয়া কাম্ব করিবাব সম্ভাবনা নাই সেখানে আমার প্রাণ থাকিতে চাহিল না। দাদাকে লিখিলাম, আমাব আসাম যাওয়া হইবে না। ইহাতে বাটীর সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ভগবানেব ইচ্ছায় এই সময় আমাব মতিহারীর কাজটি পাকা হইল।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মতিহাবী বিহারে অবস্থিত এবং তখনও বঙ্গভঙ্গ হয় নাই, বিহার বাংলাদেশেবই অংশ বলিয়া পাবগণিত হইত।

প্রকাশচন্দ্রের সমগ্র জীবনকে বিচাব-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি 'ধর্ম রক্ষা কবিয়া কাজ কবিবার' আদর্শ হইতে কোনাদন বিচ্যুত হন নাই। মঙ্গলময় পবমেশ্বরেব করুণাব সেই আদর্শ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া তিনি কর্মজীবনে উন্নতি-শিখবে উঠিতে পারিয়াছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্পকালেব মধ্যেই। দুর্ভিক্ষের রিলিফ সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজে তাঁহার মাসিক আয় ছিল মাত্র ৮০৲ টাকা। ইহা হইতে তিনি প্রতি মাসে মাকে ৩০৲ টাকা পাঠাইতেন, বাকী ৫০৲ টাকা দিয়া দূরদেশে অঘোরকামিনী বেশ গুছাইয়া একটা বড় সংসার চালাইতেন। অতঃপব প্রকাশচন্দ্রেব পদোন্নতি হইল, তিনি আবগারী ইন্‌স্পেক্টবেব পদ পাইলেন। সরকারী চাকবিতে প্রথমে পূর্বোক্ত দুইটি কাজে তাঁহার কাটিযা গেল প্রায় নয় বৎসব। ওই দুইটি পদেই তাঁহার অসৎ ও অবৈধ উপায়ে নিবাপদে প্রচুব অর্থোপার্জনেব সুযোগ-সুবিধা ছিল। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের মতো ধর্মপ্রাণ, সমাজহিতৈষী, লোকসেবক ও আদর্শবাদী যুবকেব মনে ওইরূপ লালসা ক্ষণেকের জন্যও স্থান পায় নাই। কর্মদক্ষতা ও সততাব জন্য কর্তৃপক্ষমহলে তাঁহার সুনাম ছিল যথেষ্ট। কার্যকালেব নয় বৎসর অতীত না হইতেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টাবেব পদে নিযুক্ত হইয়া (১৮৮৪ খ্রীঃ, জুলাই) পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। সেই উচ্চপদে বহাল থাকিয়া প্রায় ষোল বৎসর কৃতিত্ব ও সুখ্যাতির সহিত তিনি দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য পবিচালনা করিয়াছিলেন। পাঁচশ বৎসব রাজসেবা করিয়া তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টারের পদ পাইলেও অঘোর-পরিবারের ধন সঞ্চয় হয় নাই। কেননা স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই জন্মিয়াছিলেন প্রশস্ত হৃদয় লইয়া।

তাঁহাদের পরিবার দুইটি কন্যা এবং তিনটি পুত্রকে লইয়া সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিস্তৃত ও প্রসারিত ছিল অঘোর-পরিবারের পরিধি—যেখানে আত্মীয়-অনাত্মীয়ে স্বজনে-পরজনে কোন প্রভেদ কখনও দেখা যায় নাই, এবং যাহার মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছিল বহু রুগ্‌ণ, বিপন্ন, শোকার্ত, দীন-দুঃখী ও অনাথ নরনারী। 'অঘোর-প্রকাশ' গ্রন্থ হইতে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনীর বয়স যখন এগার বৎসর, তখন (১৮৮৩ খ্রীঃ, আগস্ট মাসে) তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশা একেবারেই কম ছিল। যাহা হউক, পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহার দিন কয়েক পরেই তাঁহাদের ধর্মবন্ধু পরেশবাবুর একটি সন্তানের কলেরা হইল। সন্তানটির সেবা-চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই বিষয়ে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"ইহার কয়েক দিন পরে ভাই পরেশের দ্বিতীয় সন্তান কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। যে গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন সেখানে থাকিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম, তাই তুমি তাঁকে নিজবাটীতে বাহিরের ঘরে আনিলে ও সেবা করিতে লাগিলে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বড় কন্যাটিরও কলেরা হইল। তখন তুমি বড় কন্যাটিকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলে, নিজের শিশু-সন্তানটিকে অন্য বাড়িতে পাঠাইয়া দিলে। সমুদয় সেবার ভার আপনার স্কন্ধে লইলে। অনেক পরিশ্রম ও যত্নের পরে দুটি সন্তানই ভাল হইয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, তুমি কিরূপ স্থিরভাবে এরূপ বিপদের সময় সমুদয় কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পার। এই সকল কার্য করিবার সময় আমাকে কিছু বলিয়া দিতে হইত না। তুমি নিজেই সমুদয় মীমাংসা করিতে, ও যাহা যাহা প্রয়োজন, করিয়া যাইতে। ভাই পরেশ এবং ভগিনী মঙ্গলক্ষ্মী এই সূত্রে চিরদিনের জন্য আমাদের আপনার হইয়া গেলেন।

"এইরূপে তুমি সকলকে আপনার করিয়া লইয়া চলিলে। তোমার দ্রুত গতি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। এই তো সবে তপস্যার আরম্ভ হইল। এই ব্রত পালন, এই পরসেবার কাজ, ক্রমশঃ জীবনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সংগ্রাম ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই আবার পরসেবার জন্য নিত্য নব নব আহ্বান আসিতে লাগিল, বিশ্বাসের পরীক্ষাও কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। পরে তোমার সকল সুখ ছাড়িতে হইল, বেশভূষা চলিয়া গেল, মস্তকের কেশ পর্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইল ; অর্থ, গৃহ, কিছুই আপনার রহিল না।"

ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাব্রত পালনের ঘটনা অঘোরকামিনীর জীবনে অনেক রহিয়াছে। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর যে নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা-পরায়ণতা ছিল তাহাও অভাবনীয়। এই নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা-পরায়ণতা ও সত্য পালনের জন্য অনেক সময় তাঁহাদিগকে কঠিন সমস্যা ও কঠোর দুঃখ-সহিষ্ণুতার সম্মুখীন হইতে হইত।

অঘোর-পরিবারে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইত, ওই সমুদয় নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্টভোগ সত্ত্বেও কখনও ভঙ্গ করা হইত না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জুন হইতে এই প্রবার একটি নিয়মের প্রবর্তন হইল যে, "স্বামীর বেতনের টাকা অগ্রে গৃহ-দেবালয়ে ঈশ্বর-চরণে নিবেদন করিয়া তাহার পরে ব্যয় করিতে হইবে।" বালক-বালিকা সকলেই বুঝিতে লাগিল যে, ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত একটি পয়সাও ব্যয় করিতে নাই। এই ব্রতরক্ষার জন্য পরে অঘোরকামিনীকে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। পুণ্যশীলা ধর্মনিষ্ঠ গৃহকর্ত্রী এই পরীক্ষায় কিভাবে উত্তীর্ণ হইলেন, তাহার বর্ণনা শুনুন প্রকাশচন্দ্রের নিকট হইতে :

"মতিহারীতে আসিয়াই এক পরীক্ষা দিতে হইল। বাঁকিপুরে ও দেশে টাকা পাঠাইতে হইল। মাসেব শেষে টাকা কম হইয়া আসিল। কিন্তু বাজারে ঋণ করা অনুচিত। সুতরাং আহারের বরাদ্দ কমাইয়া আনিতে হইল। এ হিসাবে চলিয়া আগস্ট মাস তো শেষ হইতই, সেপ্টেম্বরের ১লা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কাটিয়া যাইত। কিন্তু দৈবাৎ ১লা সেপ্টেম্বর ছুটিব দিন পড়িল, তাই সেদিন বেতন পাওয়া গেল না। ২রা সেপ্টেম্বর এক বেলার আহার কোনওরূপে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় টাকা আসিল, কিন্তু তাহা তো তখনো দেবালয়ে উৎসর্গ করা হয় নাই, তাই স্পর্শ করা যাইতে পারে না। ৪টি সন্তান, আপনারা দু'জন। আহারের সামগ্রীর মধ্যে /২ সের দুধ, ২টি ভুট্টা ও কয়েকটি পদ্মচাকা। ছোট ছেলে বিধান যখন ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পদ্মচাকা আহার কবিতে দিলে। দেবি, তুমি অনশনে কাটাইলে, স্বামীকে আধখানি ভুট্টা খাইতে দিলে, অন্য ছেলেমেয়েদের একটু একটু দুধ দিয়া কোনওরূপে রাত্রি অতিবাহিত করাইলে। তোমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সকালে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া পদ্মফুলে ঘর সাজাইয়া উপাসনা করা গেল। তারপর বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনা হইল। ঈশ্বরের জয়কীর্তি বর্ধিত হইল। তাঁহার উপরে যে প্রাণ-মন দিয়া নির্ভর করে তাহার সকল দুঃখ দুবে যায়, তিনি তাহাকে সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ করেন।"

পূর্বোল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, যখন প্রকাশচন্দ্র দ্বিতীয়বার মতিহারীতে গিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় কার্যে যোগদান করেন।

কখনও ঋণ গ্রহণ না করা বা কখনও ধারে কোন জিনিস ক্রয় না করা ছিল তাঁহাদের পরিবারের একটি বিশেষ ব্রত। বহু দুঃখেও এ ব্রত তাঁহারা কখনও ভঙ্গ করেন নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ, প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উড়িষ্যার মধুসূদন রাও প্রমুখ বিশিষ্ট নায়ক-গণের স্নেহাশিস লাভে ধন্য হইয়াছিলেন অঘোর-প্রকাশ। কেশবচন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য

সজ্জনেরা পাটনায় তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র যখন সাত মাসের শিশু, তখন তাঁহার মাতা ও পিতা ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। অঘোরকামিনীর উপাসনায় অনুরাগ কেশবচন্দ্রেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"স্বীয় শৃঙ্খলাগুণে তুমি সন্তানাদির আহার সমাপন করিয়া প্রতিদিন সকালে ৮টাব মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া আচার্য মহাশয়ের গৃহে দৈনিক উপাসনাস্থানে চলিয়া যাইতে। অনেক দিন তোমাকে চেষ্টা করিয়া প্রবেশদ্বার খোলাইয়া লইতে হইত; অনেক দিন ভাল স্থান পাইতে না, তবু তোমার উপাসনার অনুরাগ কমে নাই। তোমার অনুরাগ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইতেন। আচার্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'নূতন যে মেয়েটি আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমবা উপাসনার অনুরাগ শিক্ষা কর।' তুমি উপাসনার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত থাকিতে। কেহ কেহ উপাসনা প্রায় শেষ হইবার সময় (নাম পাঠের সময়) আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইহা দেখিয়া তুমি আশ্চর্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।...

"উৎসবান্তে বিদায়ের সময় আচার্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে। প্রণাম করিয়া তুমি বলিলে, 'ভুলিবেন না।' আচার্য বলিলেন, 'আর কি ভোলা যায়?' নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে ভোলেন নাই। কেন-না তাঁহার ভাবে, তাঁহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া তুমি তোমাব ভবিষ্যৎ জীবনের কাজ করিয়াছিলে। তাঁহার মত তোমারও কাজ কবিতে করিতেই মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল।"

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ওই সাধ্বী মহিলা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও 'অঘোর-প্রকাশ' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

"একদিকে যেমন সেবা চলিতে লাগিল, অপর দিকে সাধন ও উপাসনাও পূর্ণ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। তোমার বাড়ির উপাসনা ও উপাসনালয়ের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তোমার নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমাকে মৈত্রেয়ী নাম দিয়াছিলেন। যখন তোমার বিষয়ে কিছু বলিতে হইত, তোমাকে ঐ নামে উল্লেখ করিতেন। সংসারের কোন কার্যের জন্য কোন দিন তোমার উপাসনা বন্ধ হইত না। কেবলমাত্র আচার্যের প্রার্থনা শ্রবণ করা তোমার ধর্ম ছিল না। জীবনের শেষ দশ বৎসর প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে ভুল নাই।"

অতিথিপরায়ণতাও ছিল প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর জীবনের আর এক ব্রত। উড়িষ্যার মধুসূদন রাও একবার অঘোর-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:

"রাজগৃহ হইতে বাঁকিপুর ফিরিবার কিছুকাল পরেই উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তোমার গৃহখানি দেখিয়া বলিলেন, 'ওই তো তীর্থ। গয়া কাশী ঘুরিয়া আসিলাম, এমন তীর্থ তো আর কোথাও দেখি নাই।' রাওজী প্রাতঃকালে উপাসনায় বসিয়াছেন, উপাসনার পরেই গয়া যাত্রা করিবেন। যাত্রার সময় প্রাতঃকাল ৭টা। এই সময়ের মধ্যে উপাসনার পূর্বে তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া রান্না আরম্ভ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলে যে, আহার প্রস্তুত হইলে তৎপ্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যেমন উপাসনা হইল, অমনি আহারের স্থান প্রস্তুত হইল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়িতে দ্রব্যাদি উঠিতে লাগিল। বন্ধু রাওজী আশীর্বাদ করিতে করিতে আহার করিলেন। তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমরা কত কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার আতিথ্যে সরলতা ও আদব মিশান থাকিত বলিয়া সে আতিথ্য গ্রহণে কাহারও সঙ্কোচ হইত না।"

অঘোর-প্রকাশ একসঙ্গে ভারতবর্ষের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। একবার উভয়ে কার্সিয়াং পর্বতে যাইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। প্রকাশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "মহর্ষির উজ্জ্বল ভাব, তাঁহার উৎসাহ ও আমাদের প্রতিজনের প্রতি সম্ভাষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলে।"

অঘোরকামিনীর কর্মবহুল জীবনে একটা বৈশিষ্ট্য এই– তাঁহার দৈনন্দিন কার্যক্রমে এত অধিক কাজ থাকিত যে, একজনের পক্ষে সেই সমুদয় সুসম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কর্তব্যবোধের সঙ্গে তাঁহার শৃঙ্খলা-জ্ঞান ও নিয়মানুবর্তিতা সমতালে চলিত বলিয়া একটি কাজও অসম্পন্ন থাকিত না। কর্তব্য-পালনে তাঁহার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং বহুমুখী। প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"দেবি, এই সময়ে আমাদের দৈনিক জীবন কিরূপ তপস্যাময় ছিল, তাহা কি তুমি স্মরণ কর না? প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পূর্বে তুমি আমার সহিত সমস্বরে মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে। তারপর তুমি স্বহস্তে উপাসনার ঘর প্রস্তুত করিতে। এ কাজ অন্যের উপর ফেলিয়া রাখিতে না। নিষ্ঠার সহিত আসন পাতিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে। উপাসনার পর প্রতিদিন একটি ছোট প্রার্থনা করিতে। তারপরেই রন্ধনশালার কাজে যাইতে। ছেলেদের আহার করাইতে ও পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। নিজেকেই রন্ধন করিতে হইত; পাচক-ব্রাহ্মণের জন্য সকল সময় অর্থে কুলাইয়া উঠিতে পারিতে না। ইহারই মধ্যে কোনও সময়ে প্রতিবেশী দুই-তিনটি গৃহস্থের সংবাদ লইতে এবং সাধ্যমতে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে। বৈকালে কিছু পাঠ করিতে, ও কোথাও যাইবার হইলে যাইতে। সন্তানদের আহার পরিচ্ছদ সর্বদা তুমি নিজেই দেখিতে। সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির আহারের আয়োজন হইত এবং পূর্বেই ছোটদের আহার করাইয়া

পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। তারপর আমারা দুজনে নাম-গান করিতাম। নূতন যে সাধন করিবার থাকিত, করিতাম। আহারাদির পর আবার প্রসঙ্গ হইত।"...

প্রাত্যহিক কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইহা হইল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা—তখন সেই ধর্মশীলা নারীর পুণ্যপূত জীবনের ২৮ বৎসর চলিতেছিল। তাঁহার জীবনের শেষ দিকে কাজের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। ইহার আট বৎসর পরের (অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রীঃ) দৈনিক কার্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাঁহার সতীর্থ, সহকর্মী ও জীবনসঙ্গী প্রকাশচন্দ্র, উহার আংশিক উদ্ধৃতি দিতেছি :

"তোমার দৈনিক পড়িলে বুঝা যায়, এই সময়ে তোমার কাজ কত বাড়িয়া চলিল। একদিনেব কতগুলি কাজের তালিকা এই। (১) ছেলেদের আহার দেখা, (২) পাঠ, (৩) উপাসনা, (৪) রোগীর সেবা, (৫) স্কুলে যাওয়া, (৬) ধোপার বস্ত্র লওয়া ও দেওয়া, (৭) দেখা করা, (৮) লেপ প্রস্তুত করা, (৯) নূতন বন্ধুব বাটীর সংবাদ লওয়া, (১০) পূজার বন্দোবস্ত করা, (১১) এষ্টিমেট করা এবং বেতন দেওয়া। দেখিতে ও শুনিতে হয়তো সহজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের পক্ষে এ অনেক কাজ। ইহার মধ্যে দেখা করাটা একটা বিশেষ কাজ ছিল। নূতন কোন বন্ধু আসিলে একবার যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিত। কেননা নূতন স্থানে কেহ আসিলে তাঁহাকে কত অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহা তুমি বিলক্ষণ বুঝিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে ও সাহায্য করিতে।

"পাছে বাহিরের বড় বড় কাজে মন গেলে সংসারের কর্তব্য ভাল করিয়া করা না হয়, তাই সদাই তুমি চিন্তিত হইতে। ছেলেরা কি খাইল কি না খাইল, তার তত্ত্বাবধান করিতে তুমি সদাই সযত্ন হইতে। সেইজন্য ছেলেদের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে ভালবাসিতে।"

সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করাকে পতি-পত্নী উভয়েই ধর্মসাধনার সমতুল্য অবশ্য-করণীয় ও পবিত্র কর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেই কারণে তাঁহারা কোন দিনই কর্ম হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে চাহেন নাই। দেবারাধনায় ধ্যানমগ্ন থাকার ন্যায় লোকহিতার্থ কর্মমগ্ন থাকার মধ্যেও তাঁহারা অপূর্ব আনন্দ পাইতেন।

ওই মহীয়সী মহিলা তাঁহার স্বামীর মতোই নির্ভীক ছিলেন। অতি সাংঘাতিক বিপদ আসন্ন দেখিয়াও তাঁহারা কখনও হতবুদ্ধি হইতেন না কিংবা ভয় পাইতেন না। স্বামী-স্ত্রীকে জীবনে সেইরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল একাধিকবার। একটি ঘটনা 'অঘোর-প্রকাশ' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"নয়াটোলার বাটীতে থাকিতে একবার তোমার পার্শ্বের খোলার ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। তখন তোমার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত

হইয়াছিলাম। তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিবা মাত্র তুমি উপরের ঘরে আসিলে, একখানা বড় সতরঞ্চি ছিল, সেখানাকে স্নানের ঘরের জলে ভিজাইয়া, জানালা দিয়া সেই জ্বলন্ত চালে নিক্ষেপ করিলে; তার উপর বালতি কবিয়া জল দিতে দিতে অগ্নি নির্বাণ হইল। যখন সতরঞ্চি নিক্ষেপ কর, তখন মুখে কেবল 'মা' 'মা' বলিতেছিলে।"

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রকাশচন্দ্র ঘটনাটির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই:

"১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাই পরেশনাথের* সঙ্গে তুমি ও আমি সিমলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আগ্রার তাজমহল দর্শন করিলাম ও যমুনাতে স্নান কবিলাম। আম্বালা হইতে দুখানা এক্কা কবিয়া যাত্রা করিলাম। একখানিতে ভাই পরেশ ও আর একখানিতে আমরা দুজন। আমাদেব এক্কা-চালক গিয়া পরেশের এক্কাতে উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সারথির কার্য করিতেন ও অর্জুনের সঙ্গে সদালাপ করিতেন। যখন কালকার কাছে আসিলাম, তখন পরেশের ঘোড়া ক্লান্ত হইয়া কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের এক্কাখানি তখন উচ্চে উঠিতেছিল। এমন সময়ে একটি বৃহৎ চামড়া-বোঝাই গর্দভ এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যাইতেছিল। গর্দভের আকার দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা বৃহৎ বাঘ যাইতেছে। যেমন দেখা, অমনি আমাদের এক্কাব ঘোড়া ভয় পাইয়া দ্রুতবেগে পশ্চাৎ ফিরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। দুই দিকে গভীব খাদ, সম্মুখে নিম্নভূমি, অশ্বের অদম্য গতি সামলায় কে? আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাশ টানিয়া রাখিয়াও অশ্বের গতি রোধ করিতে পারিলাম না। রজ্জুহস্তে এক্কাব উপব শুইয়া পড়িলাম, তবু অশ্ব অদম্য বেগে চলিতে লাগিল। তুমি তখন ভয় না পাইয়া আমার সাহায্য করিতে লাগিলে, তুমিও রাশ টানিতে লাগিলে; অশ্বের গতি দমন হয় না। এইভাবে কয়েক মিনিট চলিল। আমরা মুখে 'মা! মা!' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল, মৃত্যু নিকটবর্তী। এমন সময় এক্কাওয়ালা আমাদের সাহায্য করিতে আসিল। অশ্বের গতি রোধ হইল, আবার আস্তে আস্তে ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম।"

সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিধানচন্দ্রের জন্মের পরেই পতি-পত্নী উভয়েই সংকল্প গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহাদের আর সন্তান হইবে না। সংকল্প গ্রহণের হেতু সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন:

* শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে জানিলাম, কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার কর্নেল করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় ইঁহার পুত্র।

"অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্মসাধনে ব্যাঘাত হয় তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর নিকট রাখিয়া যাইতে হয়; কিন্তু অতি শিশু-সন্তানকে তো রাখিয়া যাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে গর্ভস্থ সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, একথা সদাই বলিতে। এইবার তাই আমরা সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না।"...

প্রতিজ্ঞা-রক্ষা-কল্পে প্রথমে তাঁহারা 'দুজনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ' করিলেন। স্থির হইল যে, 'ছয় মাস শরীরের সম্পর্ক থাকিবে না।' পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রতচারী দম্পতি সেই দুঃসাধ্য ব্রত পালন করিলেন। নির্দিষ্ট কাল অতীত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ব্রত গ্রহণ করিলেন তাঁহারা চিরজীবনের জন্য। তখনও তাঁহারা যৌবন-সীমান্ত অতিক্রম করেন নাই। তৎকালে পতির বয়স ছিল ৩৪ বৎসর, আর পত্নীর বয়স ছিল ২৬ বৎসর। পরমেশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভরকে সম্বল করিয়া, পুণ্যাত্মা সাধক-সাধিকা যথার্থ সেই মহাব্রত পালন করিয়াছিলেন মৃত্যুকাল অবধি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত। তাঁহারা শারীরিক মিলনের পরিবর্তে আত্মিক মিলন সংঘটনে সতত সাধনা করেন। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী পরস্পর হইতে দূরে থাকিলে ঘন ঘন পত্রালাপ করিতেন। তাঁহারা পরে ইহাও ত্যাগ করেন এবং কেবল চিন্তার মাধ্যমেই পরস্পরের মধ্যে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার 'অঘোর-প্রকাশ' গ্রন্থে একস্থানে লিখিয়াছেন:

"পত্র লেখা বন্ধ হইল, তুমি আপনার মনের ভাব দৈনিক পুস্তকে লিখিতে লাগিলে, আমিও আমার খাতায় লিখিতাম, কিন্তু ডাকে দেওয়া হইত না। তুমি লিখিলে, 'কতদিন তুমি পত্র লিখিবে না, তাহা আমাকে বলিও না। আমিও যে কতদিন লিখিব না, তাহাও বলিব না; কিন্তু কোন বিষয় জিদরূপে করিতে তোমারও ইচ্ছা নয়, আমারও ইচ্ছা নয়, মারও ইচ্ছা নয়, যখন ইচ্ছা হইবে, মন সায় দিবে, বিবেক সায় দিবে, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি পত্র লিখিতে পার, আমিও পারি। সে কবে, কখন, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। দেখ, মা এ আবার কি লীলা আরম্ভ করিলেন। যাই করুন, চরণ তো কাড়িয়া লইতে পারিবেন না।'..."

তাঁহাদের ঈশ্বরনির্ভরতাও ছিল অসাধারণ। কঠিনতম বিপদেও তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া ধৈর্য ধারণ করিতেন। এই ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত 'অঘোর-প্রকাশ' গ্রন্থে বহু রহিয়াছে।

একালে দুইটি গৃহীর ওই সার্থক মহাব্রত পালন আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে—সেকালে প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষি ও ঋষি-পত্নীর ব্রতপূত সংযম-নিয়মিত জীবনের কথা। সাধিকা দেবলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন ৪০ বৎসর

বয়সে। ইহার প্রায় পনের বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর) ৬৪ বৎসর বয়সে সাধকের জীবনাবসান হইয়াছে পাটনায় নয়াটোলা অঞ্চলে নিজ বাস-ভবনে। গৃহের যে প্রকোষ্ঠ প্রকাশচন্দ্রের সাধ্বী পত্নীর পুণ্য-স্মৃতিতে পবিত্র, সেখানেই তাঁহার অন্তিম শয্যা রচিত হইয়াছিল। রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে যে এগার বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাহা বিশ্রাম-সুখের মধ্য দিয়া কাটান নাই। নিজের সাধনা ব্যতীত তিনি ধর্মবন্ধুদের আধ্যাত্মিক জীবনের তত্ত্ব লইতেন এবং কখনও কখনও তাঁহাদের বাড়িতে যাইয়া অন্নদানের জন্য থাকিতেন, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর লইতেন এবং অভাবগ্রস্ত ও দুর্গত প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। পাটনাতেই তিনি স্থায়িভাবে থাকিতেন এবং তথা হইতে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্যটন করিতেন। সেই এগার বৎসর কাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিধানমতে যে সকল প্রার্থনা করিতেন এবং প্রার্থনাত্মক ভাষণ দিতেন, তৎসমুদয় অনুলিখিত হইত। 'সাধনা' নামে সেইগুলি পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'সাধনায়' আছে ভক্ত সাধকের ভক্তি-উচ্ছ্বাস ও অন্তর্বাণীর প্রকাশ। পুণ্যবতী ভার্যার চিতাভস্মাধার তাঁহাদের নয়াটোলার বাড়িতে প্রোথিত আছে, পুণ্যবান স্বামীর অন্তিমকালীন বাসনা পূরণার্থ তাঁহার চিতাভস্মও ঐ আধারে রাখিয়াই প্রোথিত হইয়াছে। অঘোরকামিনীর স্থাপিত ও পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনার ভার লইয়াছেন বিহার সরকার। এই শিক্ষায়তনে এখন স্কুল ও কলেজ দুই-ই চলিতেছে।

অঘোর-প্রকাশের মতো দম্পতি বর্তমান যুগে দুর্লভ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না, তাঁহাদের হৃদয়, মত ও পথের এমনিই মিল ছিল যে, দুইজনকে অভিন্ন-হৃদয় অভিন্ন-মত এবং অভিন্ন-পন্থা বলিয়া নিঃসঙ্কোচে বিশেষিত করা যাইতে পারে। গৌরীশঙ্কর বা সীতারামের ন্যায় অঘোর-প্রকাশের পারস্পরিক অনুরাগ ছিল অনাবিল ও গভীর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটি প্রাণী একাত্ম হইয়া যেন জীবন-নাট্য-মঞ্চে বাজিতেন একতন্ত্রী-রূপে। সেই একতন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইত একই তান, গীত হইত একই গান।

৪

বিধানচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর

প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর পাঁচটি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বিধানচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই পাটনা বাঁকিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিধানচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র ১৪ বৎসর, তখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অঘোরকামিনীর মৃত্যু হয়। বিধানচন্দ্রের বয়স যখন ২৯ বৎসর তখন প্রকাশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। পিতামাতার অসামান্য চরিত্র এবং আদর্শ বিধানচন্দ্রের চরিত্র ও জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিধানচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই দিকটা তিনি পিতামাতার চরিত্র হইতে স্বাভাবিকভাবেই পাইয়াছিলেন মনে হয়।

বিধানচন্দ্রের, তাঁহার বড়দাদা সুবোধচন্দ্রের এবং মেজদাদা সাধনচন্দ্রের পাঠশালা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষালাভ হইয়াছিল পাটনাতেই; পাঠশালার শিক্ষা শেষ হওয়ার পরে তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন প্রথমে টি. কে. ঘোষ ইনষ্টিটিউসনে এবং তৎপর পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে ও কলেজে। নিজপরিবারে থাকিয়াই তাঁহারা লেখাপড়া করিয়াছেন। ছেলেদের শিক্ষার জন্য কোন গৃহশিক্ষক ছিল না, কারণ প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হওয়ার পরেও তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা এমন হয় নাই যে, গৃহশিক্ষক বা টিউটারের অতিরিক্ত ব্যয় তিনি বহন করিতে পারেন। বিশেষতঃ অঘোর-পরিবারের নিয়ম ও শিক্ষা এরূপ ছিল যে, আয় অনুসারে ব্যয়ের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কোন অবস্থায়ই ধার করিয়া খরচ করা হইবে না। বাল্যকাল হইতেই সন্তানেরা দেখিতেন—মাতাপিতার শুদ্ধ, সংযত, নিয়মিত, সরল, অনাড়ম্বর, মিতাচারী ও সুশৃঙ্খল জীবন। তাহা সন্তানদের নিজ নিজ জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

গুরু-দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজকার্য সম্পন্ন করিতে হইত বলিয়া প্রকাশচন্দ্রের উপর কাজের চাপ পড়িত বেশী। স্বামীর কর্মভার লাঘব করিবার জন্য অঘোরকামিনী নিজে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কাজটাও দেখাশুনা করিতেন। মাতাপিতার প্রভাব এবং পারিবারিক পরিবেশ এমনই ছিল যে, ছাত্র-জীবনের দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের জন্য ছেলেদের শাসাইবার কিংবা তিরস্কার করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। আপনা হইতেই তাঁহারা প্রতিদিন নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন। এইভাবে শিক্ষা পাইয়া বিধানচন্দ্র প্রবেশিকা বা এনট্রান্স (বর্তমান মাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; এবং পাটনা কলেজ হইতে এফ. এ. (বর্তমানের উচ্চ-মাধ্যমিক) ও বি. এ. পাস করিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি অনার্স পাইলেন অঙ্ক-শাস্ত্রে। বিধানচন্দ্র নিজের

বাল্যকাল সম্পর্কে বলিয়াছেন: "During my school days and early age, I did not show any promise of ever-achieving eminence in any field; nor did I have any such secret longing I was not born with any special gifts and was in every respect a very ordinary student I did not work hard at school, did not mind like so many other boys, playing truant occasionally, never expected to do well at examination, and was quite happy when I just passed in one. Nobody thought I was in any way a talented boy."

বিধানচন্দ্র বাল্যকালে কোনও মেধার পরিচয় না দিলেও ক্রমেই যে তাহার স্ফুরণ হইতেছিল, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। পাটনায় ছাত্রজীবনে বিধানচন্দ্র উচ্চাঙ্গের মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাত না হইলেও সাধারণ ছাত্রের অপেক্ষা তাঁহার মেধা যে উচ্চতর ছিল, তাহা তৎকালেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

অঘোর-পরিবারে প্রত্যূষে পরিবারের ছোট-বড় সকলকেই গৃহ-দেবালয়ে বসিয়া উপাসনা করিতে হইত। বাড়ির একটি কক্ষ উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিধানচন্দ্রের বড়দাদা সুবোধচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের পিতা ও মাতা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপর বসিয়াই গার্হস্থ্য বিষয় লইয়া কথাবার্তা বলিতেন, তখনই উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনায় সেই দিনের কাজকর্ম স্থির করা হইত। তারপরে ঘণ্টা বাজানো হইত সকলকে জাগাইবার জন্য। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এবং পরিবারে আশ্রিত বালক বালিকারা সকলে অনতিবিলম্বে উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিতেন। প্রথমে সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করিতেন একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃত শ্লোক। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে গীত হইত একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত এবং তারপর উপাসনা হইত। ইহা ছিল অঘোর-পরিবারের অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন কার্য। পূর্বোক্ত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

'শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্॥
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।
যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতম্॥"

বঙ্গানুবাদ এই: আগামী দিবসের কার্য অদ্যই সম্পন্ন করা উচিত এবং অপরাহ্ণের কার্য পূর্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা কর্তব্য। মানুষের কোন্ কার্যটি সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কোন্ কার্যটি সম্পন্ন করা হয় নাই, তাহা বিচার করিয়া মৃত্যু অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে। কাহার যে অদ্য মৃত্যু ঘটিবে, তাহা কে জানে। সুতরাং যৌবনেই মানুষের ধর্মশীল হওয়া বিধেয়, যেহেতু মানব-জীবন অনিত্য।

ওই শ্লোকগুলি আচার্য কেশবচন্দ্র সেন-সম্পাদিত এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্লোক-সংগ্রহ' নামক পুস্তক হইতে প্রাত্যহিক আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হইয়াছিল। 'শ্লোকসংগ্রহ' পুস্তকে বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যে শ্লোকাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয় আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সাধনে এবং নৈতিক চরিত্রগঠনে সহায়ক। সেইজন্য অধিকাংশ ব্রাহ্ম-পরিবারে ওই পুস্তকখানি ধর্মগ্রন্থের আসন পাইয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি গৃহীত হইয়াছে মহাভারতের শান্তি পর্ব হইতে। সকলেই শ্লোকের মম অবগত ছিলেন; যেহেতু অঘোর-পরিবারে বালক-বালিকাদের কোন শ্লোক বা স্তোত্র মুখস্থ করিতে উপদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে উহার মর্মও বুঝাইয়া দেওয়া হইত। ওই সারগর্ভ শ্লোক দুইটির মধ্যে নিহিত আছে বিধানচন্দ্রের জীবনদর্শনের মূল-তত্ত্ব। তিনি শ্লোক-ধৃত নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার জীবন গঠনে এবং কর্মধারা নিয়ন্ত্রণে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবোধচন্দ্র মনে করেন, বিধান যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাশি-রাশি কাজের মধ্যে পড়িয়া তৎসমুদয় সুসম্পন্ন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, উহার প্রধান কারণ উল্লিখিত নীতির অনুসরণ। এই বিষয়ে আমরাও তাঁহার সঙ্গে একমত। সুবোধচন্দ্র বলেন: "সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে খোঁজ নিন, দেখবেন বিধানের কোন কাজ মুলতবী রাখা হয় নি। ফাইলের পর ফাইল এসে জমেছে, কিন্তু একটিও পড়ে থাকবে না কালকের জন্যে। যে সময়ের ভেতর ওগুলো ডিস্‌পোজ্ অব্ করা দরকার, তার আগেই কাজ শেষ করে রেখেছে। কালকের জন্যে একটা ফাইলও সময় নেই অজুহাতে কখনও পড়ে থাকবে না। কলকাতার মতো একটা বড় সিটিতে বিধানের ডাক্তারিতে খুব বেশী পসার যখন, তখনও সেই একই নীতি ছিল তার কাজ করার। তিন জন ডাক্তার-অ্যাসিস্টেণ্ট্ বিধানের কাজে সাহায্য করতেন, ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তাঁরা। কিন্তু বিধানকে রোগীর পর রোগী দেখে ক্লান্ত হতে কেউ কোনদিন দেখেন নি। আজ বড় ক্লান্ত বা সময় নেই, এসব কথা বলে কোন রোগীকে কাল আসতে বলা হত না। যেসব রোগী এসে গেছেন, কিংবা যাঁদের আসবার জন্যে বলে দেওয়া হয়েছে, যত সময়ই লাগুক, তাঁদের সেদিনই দেখা চাই।"

সুবোধচন্দ্র এবং বিধানচন্দ্র—দুই ভাইয়েরই শেষ বয়স পর্যন্ত মুখস্থ ছিল পূর্বোক্ত শ্লোক দুইটি। সুবোধচন্দ্র আমাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বুঝাইয়া দিলেন। আমি লিখিয়া লইলাম। পরে তিনি সেল্‌ফ্ হইতে 'শ্লোক-সংগ্রহ' পুস্তকখানা টানিয়া লইয়া শ্লোকের পৃষ্ঠাটি খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন।

বাল্যকালে জ্ঞান সঞ্চার হওয়া অবধি বিধানচন্দ্র দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মাতা কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে, রুগ্‌ণ, আর্ত ও দুর্গত জনের সেবা করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতাও সেই কার্যে মাতাকে কত প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। জাতি, ধর্ম কিংবা শ্রেণী বিচার

না করিয়া মাতা-পিতা প্রতিবেশী গরীব-দুঃখীর কষ্ট ও দুর্গতি দূর করিবার জন্য কত রকমে সাহায্য করিয়াছেন দিনের পর দিন, তাহাও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। কৈশোরে জ্ঞানবৃদ্ধির এবং বিচার-বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার জনক-জননীর হৃদয় কত প্রশস্ত, করুণায় পরিপূর্ণ ও পরদুঃখে কাতর। ধর্মপ্রাণ, লোকহিতব্রত ও দানশীল মাতা-পিতা সন্তানদের জন্য ভোগ করিবার মতো কোন সঞ্চিত ধন রাখিয়া যান নাই; কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন ওই অমূল্য ধন—হৃদয়ের মহৎ গুণগ্রাম—যাহার কতক সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিধানও পাইয়াছেন যেন উত্তরাধিকারসূত্রে। পরিণত বার্ধক্যেও তিনি যে দেশবাসীর সেবায় নিমগ্ন হইয়া ছিলেন ধ্যান-সমাহিত যোগীর মতো, ইহার মূলে ছিল অঘোর-প্রকাশের চরিত্র-প্রভাব। অঘোর-পরিবারে বিধানচন্দ্রেরা পাঁচটি ভাই-ভগিনী ব্যতীত আরও কয়েকটি আত্মীয়-অনাত্মীয় বালক-বালিকা থাকিতেন। সকলের জন্য খাওয়া-পরার সমান ব্যবস্থা ছিল। পরিবারের কর্তা ও গৃহিণীর ব্যবহারও ছিল সকলের প্রতি সমান, কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। বিধানচন্দ্র উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সন্তান বটে, কিন্তু ওইভাবে সকলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করা এবং মাতা পিতার নিকট হইতে সমান ব্যবহার পাওয়ার ফলে তাঁহার মনে কোন প্রকার অহংকার ছিল না। এই অহংকারশূন্যতা ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাঁহার সমগ্র জীবনে। ইহা তাঁহার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কলিকাতার মতো মহানগরীর প্রতিযোগিতাপূর্ণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, পরাধীন ভারতে বিপদ-সঙ্কুল রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং স্বাধীন ভারতে সমস্যা-কণ্টকিত রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে—সর্বত্রই বিধানচন্দ্র অধিষ্ঠিত হইয়াছেন যশ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের মহোচ্চ আসনে। তথাপি তাঁহার আবাল্য-সঞ্জাত সেই নিরহংকার বা নিরভিমান ভাবের লোপ পায় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অঘোর-পরিবারে বিধান সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার জন্মের পরে সাধ্বী জননী স্তন্যপায়ী শিশুটিকে কোলে লইয়া শিশু-শিরে হাত রাখিয়া স্বামী-স্ত্রীর 'আত্মিক মিলন ব্রত' অর্থাৎ ভোগ-মুক্ত দেহে জীবনযাপনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধু জনকও একই ব্রতে ব্রতী হন। পরমেশ্বরের করুণায় সাধু-সাধ্বী সেই কঠোর দুঃসাধ্য ব্রত পরম নিষ্ঠার সহিত আজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিধানের জীবনের সঙ্গে ব্রতচারী মাতা-পিতার জীবনের পুণ্য-স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। মাতৃদেবীর মহাপ্রয়াণকালে বিধান ছিলেন চৌদ্দ বৎসরের কিশোর। প্রকাশচন্দ্র মাতৃহীন কিশোর পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে বিধানের বিদ্যার্থিজীবনে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি দেখিতে পাইয়া তিনি ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

৫

মেডিকেল কলেজে বিদ্যার্থী

বিধানচন্দ্র পরবর্তীকালে, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই, অমৃতবাজার পত্রিকার সংবেদকের কাছে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, তখনই তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি (পিতা) তাঁহার (পুত্রের) পথপ্রদর্শকরূপে কাজ করিবেন। বিধানচন্দ্র যখন পাটনা কলেজ হইতে গণিত-শাস্ত্রে অনার্স পাইয়া বিজ্ঞানে বি. এ. (এখনকার বি. এস্-সি) পাস করেন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১৮ বৎসর ১ মাস। তাই তাঁহার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিধানচন্দ্র এখন কি করিতে চান। তখন স্যার জন উডবার্ন ছিলেন বাংলার ছোটলাট। তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল। স্যার জন প্রতাপচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, প্রতাপচন্দ্র সুপারিশ করিলে তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত তিনজন নবশিক্ষিত তরুণকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করিবেন। প্রতাপচন্দ্র তরুণ বিধানচন্দ্রকে একটি পদ দিতে চাহিলেন। প্রকাশচন্দ্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে, তিনি ত্রিশ বৎসর সরকারী চাকরি করিয়াছেন, তিনি চান না যে তাঁহার পুত্র, এমন কি তাঁহার পরবর্তী তিন পুরুষের কেহ, সরকারী চাকরি করে। তারপর তিনি বিধানচন্দ্র কি করিতে চান জিজ্ঞাসা করিলেন। বিধানচন্দ্র জানাইলেন, কোন বিষয়ের প্রতি তাঁহার তেমন পক্ষপাত নেই। বিধানচন্দ্র বলিয়াছেন: "I had no ambition in life: My only motto has been this: whatever thy hands findeth to do, do it with thy might."—"আমার জীবনে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমার একমাত্র আদর্শ ছিল: যাহাই হাতের কাছে পাইবে, তাহাই সর্বশক্তি দিয়া করিবে।" বলাই বাহুল্য, পিতার অনীহা থাকায় বিধানচন্দ্র সরকারী পদ গ্রহণ করেন নাই।

তাই বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিধানচন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এবং শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হইবার জন্য দরখাস্ত পাঠাইলেন। একই দিনে বিভিন্ন সময়ে পূর্বোক্ত কলেজ দুইটিতে ভর্তি হইবার অনুমতি-পত্র আসিল। মেডিকেল কলেজ হইতে ভর্তি হইবার অনুমতি আসিল সকাল দশটায়। বিধানচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে মানি-অর্ডারযোগে ভর্তির ফী জমা দিলেন। বিকালে আসিয়া পৌঁছিল শিবপুর

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুমতি-পত্র। বিধানচন্দ্র তাই আর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইলেন না। যদিও তিনি বলিয়াছেন, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইলে তাঁহার আর্থিক সুবিধা হইত। কারণ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইলে পড়াশুনার জন্য ছাত্রবৃত্তি পাওয়া যাইত। হয়তো ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন, সেইজন্য ওইরূপ ঘটিয়াছিল। কেননা ভাবীকালে বিধানচন্দ্র ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান ও পারদর্শিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুবিদিত।

বস্তুতঃপক্ষে, তাঁহার জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হইল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন-কালে। এতকাল তিনি বাস করিয়াছেন পাটনা (বাঁকিপুর), মতিহারী, গয়া প্রভৃতি শহরে আপন পরিবারের ভিতরে। এখন আসিলেন পারিবারিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতার নাগরিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ নবাগতের মনে যে অসহায় ভাবের সৃষ্টি হয়, যুবক বিধানের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল। সেই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি ওয়াই. এম. সি. এ. পরিচালিত ছাত্রাবাসে (কলেজ স্ট্রীট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের মিলনস্থলের পার্শ্বে) থাকিয়া পড়িতেন। মেডিকেল কলেজে পড়া তখনও ব্যয়সাধ্য ছিল। তাহার পিতা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পিতাকে অন্য দুই পুত্রের (সুবোধ ও সাধনের) বিলাতে পড়ার খরচ চালাইতে হইত। সুতরাং বিধান পড়ার খরচ বাবদ যে টাকা প্রতি মাসে পিতার নিকট হইতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার চলিত কষ্টেসৃষ্টে। পিতার আর্থিক অনটনের অবস্থা জানা ছিল বলিয়া পিতৃভক্ত পুত্র ক্লেশ-ভোগ সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনও টাকা-পয়সার জন্য চাপ দিতেন না। বিশেষতঃ মিতাচার এবং নির্বিলাস, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল অঘোর-পরিবারের শিক্ষা। তিনি জীবনে কোনদিন সেই শিক্ষা ভুলেন নাই। উত্তরকালে স্বোপার্জিত অর্থের প্রাচুর্যও ওই শিক্ষার প্রভাবকে কিছুমাত্র ব্যাহত করিতে পারে নাই। ইহার ফলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিধানচন্দ্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলেন।

তখনকার দিনে মেডিকেল কলেজে এল. এম. এস. কিংবা এম. বি. ডিগ্রি পাইতে হইলে পাঁচ বৎসর পড়িতে হইত। বিধানচন্দ্র ওই পাঁচ বৎসরের ভিতর পাঁচ টাকা মূল্য দিয়া কেবল একখানা পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, কতটা আর্থিক অনটনের মধ্যে তাঁহাকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল পড়াশুনা করিতে হইয়াছিল। কখনও কখনও তিনি অবস্থাপন্ন সহাধ্যায়ী বন্ধুদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক চাহিয়া লইয়া তাহা হইতে টুকিয়া লইতেন বা কখনও কলেজ-লাইব্রেরির পুস্তক লইয়া পড়িতেন। জীবনযুদ্ধের আরম্ভেই প্রথম যৌবনে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইল

দারিদ্র্য এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে। যুবক বিধান আশা ও উৎসাহে বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন স্বীয় লক্ষ্যের দিকে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন-কালে বিধানচন্দ্রের শিক্ষানুরাগ, একাগ্রতা, মেধা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী দুইজন অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে একজন শস্ত্র-চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক কর্নেল চার্লস্ এবং অন্যজন বরিষ্ঠ শারীর-স্থান-প্রদর্শক দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল বসু। ওই সহৃদয় ও স্নেহশীল অধ্যাপকদ্বয় অবগত হইলেন তাঁহার আর্থিক অভাব-অনটনের বিষয়। শস্ত্র-চিকিৎসার্থ কোন রোগীর বাড়িতে গিয়া অস্ত্রোপচার করার কালে তাঁহারা বিধানকে পুরুষ-সেবক (male nurse) কিংবা ছাত্র-সহকারী (student assistant) রূপে কাজ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেই কাজ করিয়া তিনি যে ফী বা পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতে তাঁহার অর্থাভাব-জনিত কষ্ট ও অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইত। এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। সকাল আটটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত বারো ঘন্টা খাটিয়া তিনি আট টাকা উপার্জন করিতেন। শীতকালে এইরূপ উপার্জন হইত বেশী, কেননা শস্ত্র-চিকিৎসার উহা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়। যদিও বিধান দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতেই চার বৎসরের জন্য একটা বৃত্তি পাইতেছিলেন, তথাপি ওইভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন না করিলে তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের ব্যয় বহন করিতে পারিতেন না।

শিক্ষক এবং ছাত্র সকলেই বিধানকে ভালোবাসিতেন। কোন কোন শিক্ষক তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। তাঁহারা সেই সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন। তরুণ বিদ্যার্থীর মধ্যে যে প্রতিভা এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো প্রচ্ছন্ন ছিল, উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অনুকূল আবহাওয়া পাইয়া তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে একদিন বিধান ও তাঁহার কয়েকজন সহাধ্যায়ী শারীর-স্থান-গৃহে (Anatomy Hall-এ) শব-ব্যবচ্ছেদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তদানীন্তন অধ্যক্ষ বোমফোর্ড শারীরস্থান-প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া পরিদর্শনার্থ তথায় প্রবেশ করিলেন। সুদক্ষ চিকিৎসক এবং বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহাকে গৃহমধ্যে দেখিবা-মাত্র শব-ব্যবচ্ছেদরত বিদ্যার্থিগণ সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রত্যেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তন্মধ্যে কেবল বিধানই ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি পূর্ববৎ ধীর-স্থির থাকিয়া একাগ্রচিত্তে আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। অধ্যক্ষের দৃষ্টি পড়িল সেই দিকেই। তিনি লক্ষ্য করিলেন শিক্ষার্থী যুবকটির কর্তব্যানুরাগ ও একাগ্রতা। তৎক্ষণাৎ বোমফোর্ড বিধানের টেবিলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন মুখোমুখি হইয়া। বিধান মাথা তুলিয়া চাহিতেই তিনি সস্নেহ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি একজন

ভালো ছাত্র ?"—"Are you a good student ?" প্রশ্নটির কি উত্তর দিতে হইবে ঠিক করিতে না পারিয়া বিধান চুপ করিয়া রহিলেন। তখন শারীরস্থান-প্রদর্শক (Demonstrator of Anatomy) বিধান সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা অধ্যক্ষকে বলিলেন। শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিধানকে বলিলেন : "আমরা তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি, বাবু।"—"We expect many things from you, Babu." বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সেই স্বতঃব্যক্ত আশা বিধানকে অভীষ্ট লাভে উৎসাহ দিল এবং তাঁহার আত্মবিশ্বাস ও সংকল্প দৃঢ় করিল। শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী অধ্যক্ষের সেই আশা নিষ্ফল হয় নাই।

সেই বৎসরেই আর একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয়, প্রভাবশালী ও হৃদয়বান ইংরেজ অধ্যাপকের সস্নেহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ওই তরুণ বিদ্যার্থীর প্রতি। তিনি হইলেন মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ (Principal) কর্নেল লিউকিস্—যিনি বিধানের সমগ্র জীবনের উপর অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলেন, এবং যাঁহার স্নেহ, গুণগ্রাহিতা, উপদেশ, সাহায্য ও সহযোগিতা হইল বিধানের অগ্রগতির পথে অমূল্য পাথেয়। উদার-চরিত স্বাধীন ব্রিটিশ জাতির বহুগুণের সমাবেশ ছিল সেই অধ্যাপকের চরিত্রে। জাতি-বিদ্বেষে কখনও তাঁহার মন কলুষিত হয় নাই। তৎকালে পরাধীন ভারতে কিছুকাল বাস করার পরেই অনেক নবাগত ব্রিটেনবাসীর মানসিকতা বদলাইয়া যাইত। অধিকাংশ ভারত-প্রবাসী ইংরেজ আপনাদিগকে রাজার জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন এবং ভারতীয়গণকে দাস-জাতি বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহাদের কথাবার্তায়, চাল-চলনে এবং বিশেষ করিয়া ভারতবাসীর সহিত আচার-ব্যবহারে সেই প্রভুসুলভ মনোভাব প্রকাশ পাইত পূর্ণমাত্রায়। ওইরূপ মনোভাবাপন্ন ইংরেজদের ধারণা ছিল যে, ভারতের অধিবাসিগণকে ব্রিটিশ প্রভুত্বের নিকট মাথা নত করিয়া থাকিতে হইবে চিরকাল। কিন্তু কর্নেল লিউকিস্ ছিলেন অন্য শ্রেণীর মানুষ। ছাত্র-জীবনে এবং রাজকর্মচারীরূপে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গেই বিধানের পরিচয় ও সংযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি যদি কর্নেল লিউকিসের মতো ব্যক্তির সস্নেহ দৃষ্টিতে না পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হইত প্রতি পদক্ষেপে। তাঁহার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিও অন্যরূপ হইত।

বিধানচন্দ্রের জীবনে উন্নতির মূলে রহিয়াছেন তাঁহার ওই সদাশয়, গুণগ্রাহী, লোক-হিতৈষী ও উদারচরিত শিক্ষাগুরু মনীষী কর্নেল লিউকিস; এ-কথা তিনি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভক্ত ছাত্রশিষ্য শিক্ষাগুরু কর্নেল লিউকিসের প্রসঙ্গে বলেন : "তিনি ছিলেন আমার জীবনের চালক ও প্রেরণা-দাতা, আমার মধ্যে তিনি মনুষ্যত্বের বিকাশ করিয়াছিলেন, আমার আত্মসম্মান-জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহাকে দিয়া,

আমার ভিতরের সুপ্ত শক্তিগুলিকে তিনি সজাগ করিয়া দিয়াছেন, এবং স্বদেশের হিতার্থ সেবাব্রত গ্রহণে তিনি আমাকে দীক্ষিত করিয়াছেন; সেইজন্ত আমার পরামর্শ-গৃহে (consultation room-এ) বসিবার আসনের সম্মুখে আমি তাঁহার প্রতিকৃতি রাখি।" ইহা হইতে বিধানের শিক্ষাগুরুর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যে কত গভীর ছিল, তাহার কিছুটা পরিচয় মিলিবে। তাঁহার মধ্যে স্বাজাতিকতার (ন্যাশনালিজমের) ভাবও সঞ্চারিত করিয়া দিলেন ওই মহামতি ইংরেজ শিক্ষাব্রতী। স্বদেশী আন্দোলন উহার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করিল। বিধান যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তখন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আরম্ভ হয় ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদে ওই আন্দোলন। ইহাকে বাংলার নব-জাগৃতির (Renaissance) আন্দোলনও বলা হয়। বাঙ্গালীর রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে আসিল এক বিস্ময়কর দ্রুত পরিবর্তন। স্বদেশী আন্দোলন বাংলার ছাত্র ও যুবসমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। তাহা বিধানকেও আকৃষ্ট করিল সত্য, কিন্তু তিনি অন্য এক শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের মতো মাতিয়া যান নাই। কেননা তিনি ইহা ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তিনি দেশ, সমাজ ও জাতির যথেষ্ট সেবা করিতে পারিবেন। তাঁহার পরমহিতৈষী শিক্ষাগুরু কর্নেল লিউকিসের মতে,—ভারতের ন্যায় দারিদ্র্যপীড়িত বিরাট দেশে হৃদয়বান ও স্বজাতিবৎসল ভারতীয় সুচিকিৎসকের প্রচুর অভাব আছে। বিধানের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, দেশের সেই অভাব পূরণে তিনি তো কতকটা সাহায্য করিতে পারেন। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনের বন্যাপ্রবাহে তিনি নিজেকে ভাসিয়া যাইতে দিলেন না, অধ্যয়নকে অপরিহার্য কর্তব্য জানিয়া তাহাতেই পূর্বের ন্যায় নিরত রহিলেন।

কেবল পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রি পাইলেই যে আদর্শ চিকিৎসক হওয়া যায় না, ইহা বিধান তাঁহার শিক্ষাগুরুর মুখে বহুবার শুনিয়াছেন। সেই সত্যটি তাঁহার মনে ভালো করিয়া গাঁথা ছিল। কর্নেল লিউকিস্ বিধানকে আদর্শ চিকিৎসকের নীতি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে,—চিকিৎসকের চাই এমন অন্তঃকরণ, যাহা কখনও কঠিন হইবে না; চাই এমন প্রকৃতি, যাহা কখনও ক্লান্ত হইবে না; চাই এমন স্পর্শ, যাহা কখনও ব্যথা দিবে না।

"A heart that never hardens,
A temper that never tires,
A touch that never hurts."

আচার্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত নীতি-বাণী শিষ্যকে অনুপ্রাণিত করিল আদর্শ

চিকিৎসকরূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে। চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করা অবধি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সেই নীতি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা একটি মহৎ বৃত্তি—যাহাকে বিধানচন্দ্র সার্থক করিয়াছেন সেই নীতির রূপায়ণে। ডাক্তার রায়ের রোগনির্ণয়, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং হাতযশ সম্পর্কে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে,—তিনি অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে পরীক্ষা না করিয়া কিছুদুর হইতে দেখিয়াই সঠিক রোগনির্ণয় করিতে পারিতেন এবং তাহাকে দেখিবামাত্র রোগীব মনে রোগ সারিয়া যাইবে বলিয়া আশা জাগিত। কর্নেল লিউকিস্ বিধানের শিক্ষালাভে কিরূপ যত্ন লইতেন, সে সম্পর্কে তাঁহার বড়দাদা সুবোধচন্দ্র রায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেন যে,—কলেজ-হাসপাতালে পরিদর্শনকালে কর্নেল লিউকিস্ বিধানকে লইয়া যাইতেন সঙ্গে করিয়া। তিনি পনের-বিশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া কোন একটা রোগীকে দেখাইয়া দিয়া বিধানকে সেই স্থান হইতে দেখিয়া রোগ-নির্ণয় করিতে নির্দেশ দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধানচন্দ্রের নিদান (diagnosis) নির্ভুল হইত। কি কি লক্ষণ দেখিয়া ছাত্র রোগ সম্বন্ধে মত দিলেন, তাহাও অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিতেন। তারপর রোগীর শয্যার পার্শ্বে গিয়া উভয়ে রোগীর বেড্-টিকেট দেখিতেন এবং রোগীর প্রয়োজন মতো পরীক্ষা করিয়া আলোচনা করিতেন। সুবোধচন্দ্র বলেন যে,—কর্নেল লিউকিস্ পিতার মতো যত্ন লইতেন বিধানের শিক্ষা বিষয়ে। তিনি বিধানকে নিজহাতে সস্নেহে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দূরদর্শী শিক্ষাগুরু যেন চোখের সামনে দেখিতেছিলেন তাঁহার প্রিয় ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

এম. বি. শেষ (ফাইন্যাল) পরীক্ষার দিন পনের পূর্বে এমন একটি ঘটনা অকস্মাৎ ঘটিয়া গেল, যাহার দরুন বিধানকে অপ্রত্যাশিতভাবে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতে হইল। ঘটনাটি এই: একদিন সকালবেলা মেডিকেল কলেজের প্রসূতিতন্ত্রের অধ্যাপক (Professor of Midwifery) কর্নেল পেক্ তাঁহার ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া কলেজ হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। কলেজের সদরদরজার (gate-এর) সম্মুখে কলেজ স্ট্রীটের উপর একখানা চলন্ত ট্রামগাড়ির সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িখানার ধাক্কা লাগায় ঘোড়ার গাড়ির পেছনের দিকের চাকা ভাঙ্গিয়া যায়। আরোহী কর্নেল পেক্ কিংবা তাঁহার কোচম্যানের কোন আঘাত লাগে নাই। তখন অশ্ববাহিত ট্রামগাড়ির পরিবর্তে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রামগাড়ি কলেজ স্ট্রীট দিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলেজের প্রবেশ-দ্বারে দণ্ডায়মান বিধানচন্দ্র সেই দুর্ঘটনা দেখিয়াছিলেন। অব্যবহিত পরেই কর্নেল পেক্ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কি দুর্ঘটনাটা দেখিয়াছ? বিধান 'হাঁ' বলিতেই কর্নেল পেক্ পুনরায় প্রশ্ন করেন: ট্রামগাড়িখানা ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলিতেছিল না? জবাবে বিধান বলেন—'না।' সঙ্গে সঙ্গে

আরও বলেন যে, তাঁহার মতে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়াছে কোচম্যানের দোষেই। জবাব শুনিয়া কর্নেল পেক্ রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যান। পূর্বোক্ত ঘটনার ছয়দিন পরে এবং পরীক্ষার আটদিন আগে কর্নেল পেক্ বিধানকে ডাকাইয়া আনিয়া জানিতে চাহেন যে, ট্রাম-কোম্পানির বিরুদ্ধে তিনি যে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিয়াছেন, তাহাতে বিধান তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন কিনা। বিধান কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি সাক্ষ্য দিবেন, কিন্তু সত্য কথা বলিবেন। বিধানকে মামলায় সাক্ষী মানা হইল না।

ইহার এক সপ্তাহ পরেই ফাইন্যাল অর্থাৎ শেষ এম. বি. পরীক্ষায় তাঁহাকে মৌখিক (viva voce) পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইল কর্নেল পেকের নিকট। তিনি পরীক্ষার্থী বিধানকে দেখিবামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। পরীক্ষকের বিরাগ-ভাজন পরীক্ষার্থীটি প্রশ্নের উত্তর না দিতেই পরীক্ষক চেঁচাইয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন এবং তাঁহাকে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং তাঁহার নামের পাশে শূন্য বসাইয়া দিলেন। একজন উচ্চপদস্থ অধ্যাপকের ছাত্রের প্রতি ওই অন্যায় আচরণে বিধান মর্মাহত হইলেন। জীবনে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার দুর্ভাগ্য হইল তাঁহার এই প্রথম। তিনি দমিয়া গেলেন। বিধান কর্নেল লিউকিসের নিকট যাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত। তিনি বিধানের মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার কথাও ইতঃপূর্বে অবগত হইয়াছিলেন। নিরুৎসাহ বিধানকে উৎসাহিত করিয়া তিনি বলিলেন যে,—দুই সপ্তাহ পরে যে এল. এম এস. পরীক্ষা হইবে, তাহাতে ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিলেও সে পাস করিয়া গ্র্যাজুয়েট হইতে পারিবে ; এবং দুই বৎসর পরে এম. ডি. পরীক্ষা দিতেও কোন বাধা হইবে না। সুতরাং এম. বি. ডিগ্রি না পাইলেও তাহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। ইহাতে বিধান আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইতে পারিলেন না ; কেননা যে পরীক্ষক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার ও অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তিনিই তো আবার পরীক্ষা লইবেন। তিনি কর্নেল লিউকিস্‌কে তাহা খুলিয়া বলিলেন। কর্নেল লিউকিস্ বিধানকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছেন। যথাসময়ে পরীক্ষা দিবার জন্য বিধান উপস্থিত হইলেন কর্নেল পেকের নিকট। তিনি সানন্দে ও সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন তাঁহার পরীক্ষকের পরিবর্তন। পনের দিন পূর্বের সেই ক্রুদ্ধ, রুক্ষ ও কর্কশ কর্নেল পেক্ রূপান্তরিত হইয়া গেছেন শান্ত, কোমল ও মধুর-প্রকৃতির একটি মানুষে। কর্নেল পেক্ প্রথমেই বিধানকে সস্নেহ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—আগের এম. বি. পরীক্ষার বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য কেন তুমি আমার কাছে আসিলে না ? এইরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে,—কর্নেল লিউকিস্ তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সুযুক্তির দ্বারা সহকর্মী বন্ধু কর্নেল পেকের ওই প্রকার পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন। কর্নেল পেক

নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একটি নিরপরাধ, সত্যানুরাগী ও মেধাবী ছাত্রকে তিনি অবৈধ ও অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেন নাই।

বিধান ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এল এম এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে সহ-চিকিৎসক (Assistant Surgeon) নিযুক্ত হন। তিনি মেডিকেল কলেজে কর্নেল লিউকিসের সন্নিযুক্ত চিকিৎসক (House Physician) রূপে কাজ করিবার জন্যও আদেশ পাইলেন সম্ভবতঃ কর্নেল লিউকিসই তাঁহার প্রিয় ছাত্রটির জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নবোৎসাহে ও নবোদ্যমে বিধান তাহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে এম ডি পরীক্ষার প্রস্তুতি চলিল। মেডিকেল কলেজে তিনি যখন উপরের শ্রেণীর ছাত্র, তখন কর্নেল লিউকিস তাঁহাকে নিম্ন-শ্রেণীতে অধ্যাপনার সুযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্য শিক্ষার্থীগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। এল এম এস পরীক্ষা পাস করিবার পূর্বেই তিনি কলেজের ছাত্রমণ্ডলীতে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কাজের সঙ্গে তিনি যখন কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন তাহার গুণগ্রাহী ছাত্রদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতা পান। ইহাতে তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে লাগিল দ্রুতগতিতে। তৎকালে ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে নূতন ডাক্তারের দর্শনী (ফী) ছিল মাত্র দুই টাকা। সরকারী চাকরিতে বিধান মাসিক বেতন পাইতেন নিরানব্বই টাকা দশ আনা মাত্র। তাঁহাকে পৃথক বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিতে হইত। মেডিকেল কলেজের ডাক্তারের কর্তব্য সম্পাদন, এম ডি পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় চালানো—এই সমুদয় কার্যের জন্য তিনি প্রায় প্রতিদিনই সতের-আঠার ঘণ্টা খাটিতেন ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার ক্লান্তি আসিত না। এম ডি. পাস করিয়া বিলাতে গিয়া উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। সেইজন্য উপার্জিত অর্থ হই ত কিছু কিছু সঞ্চয়ও তিনি করিতেন। দুইটি বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া বিধানকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হইলে যাতায়াত-ব্যয় সহ যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁহাকে নিজেকেই বহন করিতে হইবে। সমস্ত টাকা তাঁহাকে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে স্বোপার্জিত অর্থ হইতে। সুতরাং শ্রমবিমুখ হইলে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন কি করিয়া? বিশেষতঃ শ্রমবিমুখতা ছিল বিধানের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। উচ্চাভিলাষী যুবকের উৎসাহ-উদ্যম লইয়া তিনি কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে পরিশ্রমের ফল ফলিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি ডিগ্রি লাভ করিলেন।

এই উচ্চাভিলাষী যুবক স্বীয় সংকল্প সিদ্ধিকল্পে শ্রমবিমুখ হন নাই। পরবর্তী জীবনেও

তাঁহার মধ্যে শ্রমবিমুখতা দেখা যায় নাই। সেজন্য তিনি স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র সম্মান ও সমাদর পাইয়াছিলেন।

ডাঃ রায়ের ৭৪তম জন্মদিনের প্রাক্কালে (১৯৫৫ খ্রীঃ পয়লা জুলাইয়ের অমৃতবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য) পত্রিকার রিপোর্টারকে বলিয়াছিলেন যে, বিলাতযাত্রা-কালে জাহাজের ভাড়া দিয়া তাঁহার ব্যাঙ্কের হিসাবে ছিল মাত্র বারো শত টাকা। এই সামান্য টাকা লইয়াই তিনি পাড়ি দিয়াছিলেন অকূল সাগরে। এই সামান্য অর্থেই তাঁহাকে বিলাতে অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসর কাটাইতে হইবে, যাহা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তবু বিধানচন্দ্র হতোদ্যম হন নাই, তাঁহার সঙ্কল্প ও আত্মবিশ্বাস ছিল সুগভীর ও সুদৃঢ়। বিলাতের বিদ্যার্থী-জীবনেও তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছিল অর্থকষ্টের মধ্য দিয়া। কোন অবস্থায়ই তিনি নিরাশ হন নাই। তাঁহার দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের সফলতার মূলে ছিল বলিষ্ঠ আশাবাদ, শ্রমশীলতা ও অবিলম্বে কর্মপন্থা স্থির করিয়া লওয়ার ক্ষমতা।

৬

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কর্মক্ষেত্রে

ডাঃ রায়ের মেডিকেল কলেজে চাকরি করার কালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের পদস্থ ইংরেজ ডাক্তারদের দুর্ব্যবহার ও অন্যায় আচরণের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। সেজন্য এম ডি পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও তাহার ব্যাঘাত কম ঘটে নাই। গবেষণা-কার্যে সাহায্য করা তো দূরের কথা, বরং বিঘ্নই সৃষ্টি করিয়াছিলেন ওই সমুদয় সংকীর্ণমনা অধ্যাপকেরা। আই এম. এস-ভুক্ত প্রায় প্রত্যেক ইংরেজ ডাক্তারই আপনাকে পি. এম এস-ভুক্ত ভারতীয় ডাক্তারের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে উচ্চস্তরের বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা যে প্রভু-জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয়গণ যে দাস-জাতির অন্তর্ভুক্ত—এই দাম্ভিকোচিত মনোভাব তাঁহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও আচরণে প্রকাশ পাইত। ফলে, ইংরেজ অধ্যাপক এবং ভারতীয় ছাত্রের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যথার্থ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারিত না। ওই অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলেন পূর্বোক্ত শ্রেণীর ইংরেজ অধ্যাপকরাই। ইহারা ছিলেন কর্নেল লিউকিসের বিপরীত প্রকৃতির মানুষ।

প্রভুমনোভাবাপন্ন দাম্ভিক ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অন্যায় আচরণ ও ব্যবহার ডাঃ রায়কে পীড়া দিত। তিনি কখনও তাহা বরদাস্ত করিতেন না। তাহার আত্মসম্মান-বোধ ছিল তীক্ষ্ণ। ডাক্তার রায় একবার ইউরোপীয়ান ফিমেল ওয়ার্ডে একটি রোগিণীর বেড-টিকেটে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে রেসিডেন্ট সার্জেন ক্যাপটেন আরউইন্ আসিয়া একজন নার্সের কথায় তাহা কাটিয়া অন্যরূপ নির্দেশ লিখিয়া নাম সই করিয়া দিয়া যান। পরদিন সকালে হাসপাতালের সেই ওয়ার্ডে আসিয়া বিধান তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে ওই প্রকার অন্যায় ও বিধিবিরুদ্ধ হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি টিকেটখানা হাতে লইয়া নিম্নতলে গিয়া কর্নেল লিউকিসকে দেখাইলেন এবং বিষয়টি বুঝাইয়া বলিলেন। অবিলম্বে কর্নেল ডাকিয়া পাঠাইলেন রেসিডেন্ট সার্জেনকে। তিনি আসিবামাত্র কর্নেল তাঁহাকে ডাক্তার রায়ের উপস্থিতিতেই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন: আরউইন, আমার হাউস ফিজিসিয়ানের নির্দেশ এভাবে কাটার মানে কি? তারপর কর্নেল তাঁহাকে বারান্দায় লইয়া গিয়া কি কি বলিলেন। ডাক্তার রায় তাহা শুনিতে না পাইলেও আরউইনের মুখের ভাব দেখিয়া

বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তিরস্কৃত হইয়াছেন। কর্নেল লিউকিস্ বারান্দা হইতে আসিয়া ডাঃ রায়কে বলিলেন : তোমার ওয়ার্ডগুলিতে ফিরিয়া যাও। তোমার কাজে আর কোন বাধা সৃষ্টি হইবে না। আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল কলেরা ওয়াডে রোগীর রক্ত পরীক্ষা সম্পর্কে। হাসপাতালে কাজ করার কালে ডাঃ রায় এম. ডি. পরীক্ষার গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ (thesis) লিখিবার জন্য গবেষণার কাজও করিতেন। একদিন তিনি কলেরা ওয়ার্ডে গবেষণার জন্য একটি রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিতেছিলেন। তখন বিকারতত্ত্ব-অধ্যাপক কর্নেল লিওনার্ড রোজার্স সেখানে আসিয়া ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি করিতেছেন। ডাঃ রায় জবাব দিলে কর্নেল তাঁহাকে বলিলেন যে, আর যেন সেই ওয়ার্ডে ওইসব করা না হয়। ডাঃ রায় সেই ওয়ার্ড হইতে সোজাসুজি গেলেন কর্নেল লিউকিসের নিকটে। বিষয়টি তাঁহাকে জানাইলে তিনি পরদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন কর্নেল রোজার্সকে। ডাঃ রায়ের উপস্থিতিতেই তিনি বলিলেন : রোজার্স! কলেরা ওয়ার্ডের ভার কোন চিকিৎসকের উপর দেওয়া হয় নাই। সুতরাং হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে সেই ওয়ার্ডের ভার অধ্যক্ষেরই উপর। ডাঃ রায় আমার হাউস ফিজিসিয়ান। আমার অনুপস্থিতিতে উঁহার ভার ডাঃ রায়ের হাতে। ভবিষ্যতে ওই ওয়ার্ডে যাইতে হইলে আমার অনুপস্থিতিতে ডাঃ রায়ের অনুমতি লইয়া যাইবেন।

মেডিকেল কলেজে কাজ করিবার কালে ডাঃ রায়ের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ইংরেজ ডাক্তারদের যে সকল বিরোধ বাধিয়াছিল, তন্মধ্যে আরও দুইটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি। একদিন কর্নেল লিউকিস্ ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করার সময়ে একটি রোগীর বেশী জ্বর উঠিয়াছে দেখিতে পাইলেন। ডাঃ রায়কে নির্দেশ দিলেন যে, রোগীর রক্ত পরীক্ষায় 'ম্যালেরিয়্যাল প্যারাসাইট' (পরজীবী) পাওয়া গেলে যেন কুইনিন দেওয়া হয়। ডাঃ রায় রক্ত পরীক্ষা করিয়া ম্যালেরিয়্যাল প্যারাসাইট পাইলেন। সে কালে উহা পাওয়া একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডাঃ রায় রোগীকে কুইনিন দিবার পূর্বেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান ক্যাপটেন মেগো। তিনি ডাঃ রায়কে কুইনিন দিতে নিষেধ করিলেন, কেননা বাংলা দেশের জ্বর রোগ সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিতেছেন, তজ্জন্য ওই রোগীকে তাঁহার পর্যবেক্ষণে রাখিতে হইবে। ক্যাপটেন মেগোর ওইভাবে ডাঃ রায়ের কর্তব্যকার্যে বাধা সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। তথাপি তিনি আই. এম. এস.-ভুক্ত বলিয়াই বিধিবিরুদ্ধ কাজ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কর্নেল লিউকিস্ কিছুক্ষণ পরে পুনরায় সেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন কুইনিন দেওয়া হইয়াছে কিনা। তদুত্তরে ডাঃ রায় তাঁহাকে ক্যাপটেন মেগোর নিষেধ করার কথা জানাইলেন। শুনিয়া কর্নেল খুব চটিয়া গেলেন এবং প্রশ্ন করিলেন—ক্যাপটেন মেগো কে? ডাঃ রায় বলিলেন : ক্যাপটেন মেগো কলেজের রেসিডেন্ট

ফিজিসিয়ান এবং আমি অ্যাসিস্টাণ্ট ফিজিসিয়ান বলিয়া আমাকে তাঁহার নির্দেশ মানিতে হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ কর্নেল লিউকিস্ ডাকিয়া পাঠাইলেন ক্যাপটেন মেগোকে। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে কর্নেল ডাঃ রায় এবং বহুসংখ্যক ছাত্রের সম্মুখেই তাঁহাকে বলিলেন: ওয়ার্ডগুলির ভার আমার উপর এবং আমার অনুপস্থিতিতে ডাঃ রায় হইলেন ওইগুলির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। ভবিষ্যতে ওয়ার্ডগুলির কার্যে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা না হয়। ক্যাপটেন মেগো পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল সিমলায়।

অপর ঘটনাটি হইল হাসপাতালের উর্ধ্বতন চিকিৎসক (Senior Physician) কর্নেল বার্ড সম্পর্কে। ডাঃ বিধান রায় ইউরোপীয়ান পোশাক পরিয়া হাসপাতালের কাজে যাইতেন। ওইরূপ পোশাক পরিলে কাহাকেও হাত তুলিয়া 'সেলাম' দিবার নিয়ম নাই, কেবল মুখে গুড্ মর্নিং, গুড্ আফ্‌টারনুন ইত্যাদি বলিলেই চলে। ডাঃ রায় তাহাই করিতেন। একদিন কর্নেল বার্ডের সঙ্গে হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার কালে ডাঃ রায়ের দেখা হয়। তিনি তাঁহাকে পূর্ববৎ গুড্ মর্নিং বলিয়া শুভেচ্ছা জানান; কিন্তু কর্নেল বার্ড তাহাতে সাড়া না দিয়া ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি আমাকে দেখিলে হাত তুলিয়া 'সেলাম' দেন না কেন? জবাবে ডাঃ রায় বলেন: সাহেবী পোশাক পরিলে হাত তুলিয়া 'সেলাম' দিবার নিয়ম নাই। কর্নেল বার্ড উত্তেজিত হইয়া কহিলেন: না, হাত তুলিয়া 'সেলাম' দিবার নিয়ম আছে। ডাঃ রায় প্রত্যুত্তর করিলেন: যদি ওই রকম নিয়ম থাকে, তবে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমি তাহা মানিয়া চলিব। আমার যে ওপরওয়ালা কর্নেল লিউকিস, তাঁহাকেও আমি হাত তুলিয়া 'সেলাম' করি না। ইহার অব্যবহিত পরেই কর্নেল বার্ডকে কর্নেল লিউকিসের সহিত কথা বলিতে দেখিলেন ডাঃ রায়। কর্নেল লিউকিসের মুখে তিনি চাপা-হাসি লক্ষ্য করিলেন। বার্ড চলিয়া গেলে ডাঃ রায় কর্নেল লিউকিসের নিকটে যান। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়া কর্নেল লিউকিস্ শান্তভাবে কহিলেন: বিধান, তুমি কর্নেল বার্ডের কাছে কখনও যাইও না। ভবিষ্যতে গুড্ মর্নিং বলিয়া শুভেচ্ছাও জানাইও না। এই জাতীয় কর্মচারীরাই তো ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সুনাম নষ্ট করিয়া দেন। ইংরেজদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সেই সম্পর্কে একদিন কর্নেল লিউকিস্ ডাঃ রায়কে কথাপ্রসঙ্গে বলেন: বিধান, আমি হয়তো চিকিৎসা-বিদ্যা তোমাকে বেশী শিখাইতে পারিব না; কিন্তু একটা বিষয় শিক্ষা দিয়া যাইতেছি। যখনই কোন ইংরেজের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহার কাছে তোমার মেরুদণ্ড এক ইঞ্চির সিকি ভাগও নত করিবে না; কারণ তাহা হইলে, তিনি তোমাকে নত করাইবেন দ্বিগুণ। ডাঃ রায় ওই অমূল্য উপদেশ সারা জীবন অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে কর্নেল বার্ডের মনোভাবের পরিবর্তন এবং ডাঃ রায়ের প্রতি উদার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ডাঃ রায় এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে যখন উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাতে যাইবেন বলিয়া স্থির করেন, তখন কর্নেল বার্ড তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার সৌভাগ্য কামনা করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিলাতে কয়েকজন বন্ধুর নামে পরিচয়পত্র দেন। ডাঃ রায়ও পূর্বের বিরোধিতার অপ্রীতিকর স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানান। ডাঃ রায় যুবাবয়সেই ছাত্রজীবনে এবং কর্মজীবনে ইংরেজ-চরিত্রের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দুইটি দিকই প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কর্নেল বার্ডের মধ্যেই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইংরেজের ন্যায়-বোধ প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতরে পড়িয়া সাময়িকভাবে অচেতন হইয়া পড়িলেও একেবারে লোপ পায় না। অনুকূল অবস্থায় সহজেই তাহা আবার সচেতন হইয়া উঠে। তখন তিনি নিজের অন্যায়কে নিজেই সংশোধন করিয়া লন। ইতঃপূর্বে বর্ণিত কর্নেল পেকের ঘটনাতেও তাহাই দেখা গিয়াছে।

৭

ইংলণ্ডে বিধানচন্দ্রের শিক্ষালাভ

ডাঃ রায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দুই বৎসর চাকরি করিয়া এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইয়া বিলাতে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার পিতার চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন হইয়াছিল তিনি মাসে ৪০০ টাকা মাহিনা পাইতেন এবং অবসর গ্রহণ করিলে মাসে পেনসন্ পাইবেন মাত্র অনধিক ১৮৯ টাকা। সুতরাং পিতার নিকট হইতে সামান্য অর্থসাহায্য পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তাঁহাকে স্বোপার্জিত অর্থের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইল।

যদিও তাঁহার সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট নহে এবং তাহাতে পড়ার খরচ চালাইতে হইবে কষ্টেসৃষ্টে, তবু তিনি বিলাত যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে (আই এম এস) ভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, না বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন করিবেন, তাহা স্থির করিতে তাঁহাকে সমস্যায় পড়িতে হইল। তৎকালে আই এম এস-ভুক্ত হওয়ার জন্যই চিকিৎসা-বিদ্যার্থীদের আগ্রহ ছিল বেশী। কেননা, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারিলে মোটা মাহিনায় চাকরি পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ সেকালে ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বড় বড় ডাক্তারদের অধিকাংশই ছিলেন আই. এম এস.-ভুক্ত। যাহা হউক, ডাঃ রায়ের সেই সমস্যা সমাধান করিয়া দিলেন তাঁহার পরম হিতৈষী শিক্ষাগুরু কর্নেল লিউকিস্। তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্র বিধানকে আই. এম. এস.-ভুক্ত হইতে নিষেধ করিলেন। কারণ আই এম এস-এ প্রবেশ করিয়া সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইলে তাহাকে কলিকাতার বাহিরেই থাকিতে হইবে কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময়। কর্নেল নিজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে,—তিনি আই এম এস-ভুক্ত হইয়া যে ভুল করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি বিধানকে আরও বলিলেন,—আমি যদি ভালো ভবিষ্যদবক্তা হই, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য করিবে ভারতীয়রাই। সুতরাং তোমার কলিকাতায় থাকিয়া তাহাতে অংশগ্রহণ করা উচিত। ডাঃ রায় তাঁহার শিক্ষাগুরুর উপদেশমতোই চলিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কর্নেল লিউকিস বিধানকে বলিলেন বিলাতে যাইয়া এম. আর. সি. পি.

(লণ্ডন) এবং এফ. আর. সি. এস. (ইংলণ্ড) ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন করিতে। এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কর্নেল লিউকিস্ উত্তরকালে ভারত সরকারের অধীনে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সর্বোচ্চ (ডিরেক্টার জেনারেল) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ডাঃ রায় তাঁহার মেডিকেল কলেজের চাকরিতে বিনা বেতনে দুই বৎসর তিন মাসের ছুটির জন্য আবেদন করিলেন। বঙ্গদেশের চিকিৎসা-বিভাগের বড় কর্তা সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেন এই অজুহাতে যে, ডাঃ রায় মাত্র দুই বৎসর চাকরি করিয়া প্রার্থিত ছুটি পাইবার দাবি করিতে পারেন না। ছুটির আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার কথা শুনিয়া কর্নেল লিউকিস্ বিধানকে পরামর্শ দিলেন ছোটলাটের নিকট আবেদন করিতে। তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন, এইরূপ কারণ যেন দেখান হয় যে,—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সদস্যগণকে যখন অনুরূপ অবস্থায় বেতন এবং অধ্যয়ন-ভাতাসহ বিদায় দেওয়া হয়, তখন প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসের একজন সদস্যকে বিনা বেতনে বিদায় দিতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তাঁহার উপদেশমতো পূর্বোক্ত কারণ দেখাইয়া বিধান ছোটলাটের নিকট আবেদনপত্র পাঠাইলেন। কর্নেল লিউকিস্ দুইটি মেডিকেল সার্ভিসের মধ্যে বিদায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারে ওইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি ডাঃ রায়ের আবেদনের সমর্থনে তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্নর (ছোটলাট) স্যার এড্‌ওয়ার্ড বেকারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে জোরালো যুক্তি দিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন। ছোটলাট ডাঃ রায়ের ছুটির আবেদন মঞ্জুর করিলেন। বঙ্গদেশের হাসপাতালসমূহের ইনস্পেক্টার-জেনারেলকে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যও নির্দেশ দেওয়া হইল।

ডাঃ রায় বিলাত যাইবার জন্য জাহাজে বার্থ রিজার্ভ করিলেন। জাহাজ রওনা হইবার দশদিন পূর্বে জাহাজ কোম্পানির জনৈক কর্মচারী তাঁহাকে জানাইলেন যে,—ডাঃ রায় যদি সেই কেবিনে যাইবার জন্য আর একজন ভারতীয় যাত্রী যোগাড় করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে দুইটি বার্থেরই ভাড়া দিতে হইবে; কেননা ভারতীয়ের কেবিনে কোন ইউরোপীয়ান যাত্রী যাইতে রাজী হইবেন না। এই নূতন বিঘ্নের কথা ডাঃ রায় কর্নেল লিউকিস্‌কে জানাইলে তিনি বলিলেন যে ইহা অত্যন্ত অন্যায়; ভারতীয়ের কেবিনে ইউরোপীয়ানের যাইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, সাধারণতঃ ভারতীয়রা ইউরোপীয়ান অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যদিও ভারতীয়ের চামড়া ইউরোপীয়ানের চেয়ে অধিক কালো; ওইরূপ অন্যায়কে বিনা প্রতিবাদে চালু হইতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি নিজেই কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং ওইরূপ অন্যায় ব্যবস্থা বাতিল করিতে বলিলেন। কর্নেল লিউকিসের কথায় সেই ব্যবস্থা বাতিল করা হইল।

ডাঃ রায় 'সিটি অব্ গ্লাসগো' জাহাজে করিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুআরি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

মার্চের শেষ ভাগে ডাঃ রায় লণ্ডনে পৌছিলেন। তিনি দেশে থাকাকালেই স্থির করিয়াছিলেন যে, সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে পড়াশুনা করিবেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল লিউকিস এবং অধ্যাপকগণের বেশির ভাগই ওই শিক্ষায়তনের ছাত্র। উহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে, তবে লণ্ডনের যাবতীয় চিকিৎসা-বিদ্যায়তনের মধ্যে উহাতে শিক্ষালাভের ব্যয় বেশী। কর্নেল লিউকিস এবং অন্যান্য অধ্যাপকেরা সেণ্ট বার্থোলোমিউর ডীনের (প্রধানের) নিকট ডাঃ রায়কে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। তিনি ভর্তি হইবার জন্য পরিচয়-পত্রাবলীসহ সাক্ষাৎ করিলেন হাসপাতালের ডীন (Dean) ডাঃ শোরের সঙ্গে। ডাঃ শোর তৎসমুদয় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেন এবং ডাঃ রায়ের গুণাবলী সম্বন্ধেও অবগত হইলেন। কিন্তু তিনি তথাপি ডাঃ রায়কে ভর্তি করিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি লণ্ডনের অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাঃ রায়কে প্রবেশের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। উচ্চাভিলাষী বিদ্যার্থী আরোগ্যশালা-প্রধানের (ডীনের) অসম্মতিতেও স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। দুইদিন পরে তিনি পুনরায় দেখা করিলেন ডাঃ শোরের সঙ্গে। তিনি ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ডাঃ রায় কতদিন থাকিবেন এবং কি পড়িবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উত্তরে ডাঃ রায় বলিলেন যে, তিনি দুই বৎসর তিন মাস থাকিয়া এম. আর. সি পি (লণ্ডন) এবং এফ. আর. সি এস (ইংলণ্ড) পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক। ডীন বলিলেন—দুইটি পরীক্ষার জন্য দুই বৎসর তিনমাস অত্যন্ত কম সময়। তারপর একসঙ্গে মেডিসিন এবং সার্জারির দুইটি পৃথক ডিগ্রির জন্য পড়িবার ছাত্র ইংলণ্ডে বেশী নাই। তুমি খুব বেশী উচ্চাভিলাষী। বিধান ওই মন্তব্যে ঘাবড়াইয়া না গিয়া জবাব দিলেন: সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত উচ্চাভিলাষ ব্যতীত জগতে কোন বড় কাজ সম্পন্ন হয় নাই। কিন্তু এবারেও বিধানের আবেদন মঞ্জুর হইল না। উচ্চাভিলাষী দৃঢ়সংকল্প যুবক বিধান ইহাতেও হাল ছাড়িয়া দিলেন না। দুইদিন পরে তিনি পুনরায় ডীনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডীন তাঁহাকে জানাইলেন যে, বিদেশী ছাত্রের নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডাঃ রায় বলিলেন—গতকল্য দক্ষিণ আফ্রিকার একজন নিগ্রো ছাত্রকে ভর্তি করা হইয়াছে। ডীন বলিলেন যে একজন লর্ডের সুপারিশ থাকায় তাহাকে ভর্তি করা হইয়াছে। ডাঃ রায় বলিলেন—"ঐরূপ কোন উচ্চস্তরের ব্যক্তির সুপারিশ যদিও আমার নাই, তথাপি আপনাদের শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের আগ্রহ আমার যে খুব বেশী, তাহা আপনাকে নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি।" এইবারের চেষ্টাও তাঁহার সফল হইল না। দেড় মাসের মধ্যে তিনি কমপক্ষে ত্রিশদিন হাসপাতালের ডীন ডাঃ শোরের

দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। ডাঃ রায়ের প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে,—যেখানে তিনি বাধা পান সেইখানে থাকিয়াই তাহা অপসারণে চেষ্টিত হন। তাঁহার অগ্রগতির পথের বিঘ্ন অপসারিত না করিয়া তিনি অন্য পথ ধরিয়া লক্ষ্যস্থলে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নহেন। সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের ডীন ডাঃ শোর ক্রমাগত বিধানচন্দ্রকে অন্য হাসপাতালে যোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন, বিধানচন্দ্র প্রত্যেকবারেই বলিলেন, তিনি দেশ হইতে যাত্রাকালে সেণ্ট বার্থোলোমিউতে শিক্ষালাভের সংকল্প করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং অন্যত্র যাইবেন না। অবশেষে ডীন একদিন তাঁহাকে ভর্তি হইবার অনুমতি দিলেন। বিধানচন্দ্র আনন্দে অধীর হইলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল যখন ডীন তাঁহাকে ৪০ গিনি (প্রায় ৮০০ টাকা) জমা দিতে বলিলেন। বিধানচন্দ্র সাহসে ভর করিয়া ডীনকে বলিলেন, তিনি ঐ ফী চার কিস্তিতে তিন মাস অন্তর দিতে চান। ডীন তাহাতে সম্মত হইলেন এবং পরদিন ১০ গিনি জমা দিতে বলিলেন।

অনুমতি পাইবার পরেই ডাঃ রায় বিখ্যাত শিক্ষায়তন সেণ্ট্ বার্থোলোমিউতে ভর্তি হইলেন। উচ্চাভিলাষী যুবক উৎসাহ, উদ্যম এবং মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। মেডিসিন এবং সার্জারি, দুইটি বিষয়ের উচ্চ ডিগ্রি-পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার সংকল্প। সেই সংকল্পকে সার্থক করিবার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই কয়েকজন অধ্যাপকের সস্নেহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তাঁহার প্রতি। বিধানচন্দ্র কিছুদিন পরে এখানে হাতে-কলমে শবব্যবচ্ছেদ করিবেন স্থির করিলেন। তখন ছিল গ্রীষ্মের ছুটি। শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষ একেবারে প্রায় শূন্য ছিল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট হইতে ব্যবচ্ছেদের জন্য একটি শব চাহিয়া লইলেন। প্রতিদিন তিনি সকাল সাড়ে নটা হইতে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত একনাগাড়ে শবব্যবচ্ছেদ করিতেন, পাছে সময় নষ্ট হয়, সেজন্য তিনি দুপুরের আহারও প্রায়ই করিতেন না। শব-ব্যবচ্ছেদের কাজ সম্পূর্ণ হইলে তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ শবটার জন্য তাঁহাকে কত মূল্য দিতে হইবে? কর্মচারী বলিল, বারো গিনি (অর্থাৎ প্রায় ২০০ টাকা)। বিধানচন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কলিকাতায় এইরূপ একটি শবের জন্য তাঁহাকে মাত্র ছ টাকা দিতে হইত। পরদিন বিধানচন্দ্র তাঁহার অধ্যাপক ডাঃ অ্যাডিসনের কাছে গেলেন এবং তাঁহার এই বিপদের কথা জানাইলেন। ডাঃ অ্যাডিসন বিধানচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না। বিধানচন্দ্র ভাবিলেন, তাঁহার এই দরিদ্রসুলভ বেশভূষা দেখিয়া সম্ভবত অধ্যাপক করুণা করিয়া এই কথা বলিতেছেন। তাই তিনি কিছু মূল্য দিতে চাহিলেন। ডাঃ অ্যাডিসন বলিলেন, "আমি তোমার ব্যবচ্ছেদ আগাগোড়া দেখিয়াছি। ঐ ব্যবচ্ছেদ এত সুন্দর হইয়াছে যে, উহা

ছাত্রদিগকে দেখাইবার উপযুক্ত। ছাত্রদিগকে দেখাইবার জন্য যে শব ব্যবচ্ছেদ করানো হয়, সেই শবের কোন দাম লাগে না। তোমার ঐ ব্যবচ্ছেদ করা শব ছাত্রদিগকে দেখানো যাইবে। তাই তোমাকে শবের মূল্য দিতে হইবে না। উহাতে আমাদেরও ঝামেলা কমিবে।"

কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ অ্যাডিসন বিধানচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি ভর্তির জন্য ডীনের কাছে বহুবার এসেছিলে। নির্বাচক-সমিতিতে আমিও ছিলাম। আমি এবং অন্য একজন সদস্য ছাড়া সকলেই ছিলেন ভারত-প্রত্যাগত আই. এম এস. বা আই সি. এস.। ঐ সময়ে বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলায় এবং ঢিংবা যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, সে ঘটনায় তারা ভারতীয়দের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের, প্রতি বিরূপ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার চেষ্টায় ডীন তোমাকে ভর্তি করতে সম্মত হয়েছিলেন।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ডাঃ অ্যাডিসন পরে লর্ড অ্যাডিসন হইয়াছিলেন। তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লিবারেল পার্টির প্রার্থীরূপে জয়ী হইয়া পার্লামেন্টের সদস্য ও মন্ত্রী হইয়াছিলেন। এই ঘটনার দশ-পনের দিন পরে বিধানচন্দ্র ডীনের কাছে তাঁহার পরবর্তী তিন মাসের ফী বা বেতন দিতে আসিলে ডীন তাহাকে বলেন, "রয়, আমরা স্থির করিয়াছি, তোমাকে বেতন দিতে হইবে না। তুমি এই হাসপাতালে যতদিন ইচ্ছা থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে পার। সেজন্য তোমাকে কোন ফী বা বেতন দিতে হইবে না।" ডীনের কথা শুনিয়া বিধানচন্দ্র হতবাক্ হইলেন। এই মানুষটিই একদিন তাঁহাকে এখানে ভর্তি করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, আর আজ তিনিই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বেতন লইতে চাহিতেছেন না। তাহার দরিদ্র বেশভূষার জন্যই কি তিনি তাহা করিতেছেন? বিধানচন্দ্র ডাঃ শোরকে বলিলেন, তিনি বেতন দিতে পারিবেন। ডাঃ শোর বলিলেন, তিনি বিধানচন্দ্রের কাজের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। "তুমি তো চর্মরোগের বিভাগে কাজ করিতেছ? ঐ বিভাগের অধ্যাপক আমাকে জানাইয়াছেন যে, তোমার কাজ অতিশয় সন্তোষজনক। আমাদিগকে বৎসরে ঐ চর্মরোগের বিভাগে সহকারীদের ষাট পাউণ্ড মাহিনা দিতে হয়। তোমার কাজের দ্বারা হাসপাতালের ঐ খরচটা বাঁচিয়া গিয়াছে। তাই তোমাকে বেতন দিতে হইবে না।" সেজন্য তাঁহার আর্থিক কষ্টের লাঘব হইল অনেক পরিমাণে। যে দুই বৎসর তিন মাস সময়কে ডীন ডাঃ শোর দুইটি ডিগ্রি-পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত কম সময় বলিয়া বিধানকে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই প্রতিভাবান উচ্চাভিলাষী বিদ্যার্থী যুবক দুইটি পরীক্ষায়ই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় তিনি অধিকার করিলেন সর্বোচ্চ স্থান। এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষায়ও ফল সন্তোষজনক হইল। ডাঃ রায় তাঁহার প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় লইবার কালে ডীন ডাঃ শোর তাঁহাকে বলেন :

ডাঃ রায়, তোমাকে আমাদের শিক্ষায়তনে প্রথমে ভর্তি হইতে অনুমতি দিই নাই বলিয়া আমি সত্যসত্যই লজ্জিত। তোমাকে অনুমতি দানের অসম্মতির কারণ এই যে, তোমার পূর্বে যে সকল ছাত্র বাংলা হইতে আসিয়া এখানে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের অমর্যাদা হইয়াছে। একজন বাঙ্গালী ছাত্র এল্. আর. সি. পি. পাস করিতেই ১১ বছর লাগাইয়াছিল। তোমাকেও সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থী মনে করিয়া লইতে রাজী হই নাই। তুমি যে দুই বৎসরের মধ্যে দুইটি ডিগ্রিই পাইয়াছ, তাহা কোন ইউরোপীয় ছাত্রের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার প্রতি আমার অতীতের ব্যবহারের জন্য আমি বড়ই দুঃখিত। বাংলাদেশ হইতে কোন ছাত্র যদি তোমার পরিচয়পত্র লইয়া ভর্তি হইবার জন্য আসে, তবে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া ভর্তি করিয়া লইব। বিধানচন্দ্র পরে চৌদ্দ-পনের জন বাঙ্গালী ডাক্তারকে পরিচয়পত্র দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের খ্যাতনামা সার্জন হইয়াছিলেন।

বিধানচন্দ্রকে বিলাতে অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যেই দিন কাটাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকায় এক সপ্তাহ চালাইতে হইত। প্রায়ই তাঁহার মধ্যাহ্নভোজন হইত না। তাঁহাকে ছয় মাইল দূর হইতে হাসপাতালে আসিতে হইত। ফিরিবার সময় গাড়িতে চড়িয়া ফিরিলে সন্ধ্যায় চা জুটিত না। হাসপাতালে কোনও ডাক্তার অনুপস্থিত থাকিলে তিনি তাঁহার স্থলে কাজ করিয়া দিয়াও মাঝে মাঝে টাকা উপার্জন করিতেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ রায় দুইটি উচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কলম্বো হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। যখন তিনি ভারতে পৌঁছেন, তখন তাঁহার কাছে মাত্র ১৫ টাকা ছিল। তাঁহার সহযাত্রী মাদ্রাজ হইতে রেঙ্গুন গেলেন। তাঁহার টাকা কম পড়ায় বিধানচন্দ্র তাঁহাকে ১০ টাকা ধার দেন। অবশ্য, ঐ ভদ্রলোক সে টাকা আর ফেরত দেন নাই। যাহাই হউক, বিধানচন্দ্র যখন কলিকাতায় পৌঁছেন, তাঁহার নিকট আর অবশিষ্ট পাঁচ টাকা ছিল। এই ঘটনা তাঁহার মিতব্যয়িতা ও পরহিতব্রত, উভয়েরই সাক্ষ্য দেয়।

৮

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে

ডাঃ রায় বিলাত হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমে সাক্ষাৎ করিলেন তদানীন্তন সার্জন-জেনারেল কর্নেল হ্যারিসের সঙ্গে। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে বিধান তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিলাতের দুইটি উচ্চ ডিগ্রি পাওয়ায় তিনি বিধানকে অভিনন্দন জানাইলেন এবং বিধান কি করিতে চাহেন জিজ্ঞাসা করিলেন। বিধান তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি চাহেন কলিকাতায় থাকিয়া সরকারী কার্য করার সঙ্গে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইতে। সার্জন-জেনারেল কর্নেল হ্যারিস বলিলেন যে, তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার মতো কোন পদ কলিকাতায় আপাততঃ শূন্য নাই। বিধানচন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকের পদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে,—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সহকর্মীদের মধ্যে যাহারা এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় তাহার অনেক নিম্নে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই তো পদোন্নতির দ্বারা অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাহার বেলায় অন্য প্রকার ব্যবস্থা হইতেছে কেন। তদুত্তরে সার্জন-জেনারেল বলিলেন যে,—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য যে ব্যবস্থা করা যায়, প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য তাহা করা যাইতে পারে না শেষোক্ত সদস্যদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে,—ব্রিটিশ শাসনকালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস ইত্যাদি যে সকল সার্ভিস প্রবর্তন করা হইয়াছিল, ওইগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অপেক্ষা ব্রিটিশদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা এবং নানাভাবে বেশী সুবিধা দেওয়া। ওই সমুদয় সার্ভিসে ভারতীয়গণের প্রবেশে কোন বাধা ছিল না সত্য, কিন্তু উচ্চপদগুলিতে অধিক গুণাবলী, কর্মদক্ষতা ও ন্যায্য দাবি থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত না। শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সার্ভিসের ব্রিটিশ সদস্যগণকে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার দ্বারা নানাভাবে অনুগৃহীত করা হইত।

ব্রিটিশ শাসকগণের অনুসৃত পূর্বোক্ত নীতির ফলেই ডাঃ রায় মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইলেন। আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলেও সরকারী কার্য তিনি তখন ছাড়িয়া দিতে পারেন না; কেননা তাহা ছাড়িয়া

দিলে কলিকাতার সরকারী হাসপাতালে থাকিয়া ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাঁহাকে হারাইতে হইবে। সার্জন-জেনারেল ডাঃ রায়কে বলিলেন যে, তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) শিক্ষকের (teacher-এর) পদ লইতে পারেন; তবে সেজন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ সেখানে কোন পদ খালি নাই। তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে কোন জেলায় সিভিল সার্জন করিয়া পাঠান যাইতে পারে, তাহাও জানান হইল। কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া বিধানচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি সার্জন-জেনারেলকে বলিলেন যে, যদি শুধু উচ্চপদের জন্য তাঁহার লোভ থাকিত, তবে তো তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে প্রবেশ করিতেন। বর্তমান অবস্থায় প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে থাকিয়া তাহাকে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইবার সুযোগ-সুবিধা দিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে সার্জন-জেনারেল মন্তব্য করিলেন যে, ডাঃ রায়ের মতো একটা শ্বেত হস্তীকে কলিকাতায় পোষণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ডাঃ রায় জবাবে বলেন—আপনি লিখিয়া দিন এখন কলিকাতায় আমাকে কোন কাজ দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা হইলে আমি সেই অজুহাতে চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারি। সার্জন-জেনারেল ডাঃ রায়ের জবাব শুনিয়া কতকটা বিব্রত হইলেন এবং সবলভাবে স্বীকার করিলেন যে, তিনি ওইরূপ লিখিয়া দিতে পারেন না, কেননা ভারতীয় সংবাদপত্রে এই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হইবে যে ডাঃ বি. সি. রায়কে তাঁহার একজন প্রাক্তন অধ্যাপক পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ রায়কে নির্দেশ দেওয়া হইল কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অতিরিক্ত চিকিৎসকরূপে কাজ করিতে। সেই কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে তাঁহাকে কলিকাতা পুলিসের কনস্টেবলদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় পরিচালনা (First aid and ambulance) সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইত। যে কার্য একজন সাধারণ ডাক্তারের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত, সেই কার্য করিতে হইল একজন ডাক্তারকে যিনি ভেষজ ও শস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যায় (Medicine and Surgeryতে) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ দুইটি ডিগ্রির অধিকারী। ডাঃ রায় দেখিতে পাইলেন যে, ওইরূপ অব্যবস্থার দুর্ভাগ্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয় ভারতীয় চিকিৎসকদের জন্যই। সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকিলে সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলা কর্তব্য, নতুবা শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। সুতরাং তিনি তাঁহার উপর অর্পিত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সেই কাজ করিতে হইল নয় মাসেরও অধিককাল। তৎকালে তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবসায় তেমন জমিয়া উঠে নাই। তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সার্জারি বা শল্য-চিকিৎসা শিক্ষা দানের জন্য একটা টিউটোরিয়েল ক্লাস খুলিলেন। সেই ছোটখাটো ক্লাসটিতে যে সকল

ছাত্র ডাঃ রায়ের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভাবীকালে দেশের চিকিৎসা-ব্যবসায়ে যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ইহার পরে ডাঃ রায় নিযুক্ত হইলেন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকের পদে। তখন তিনি মাসিক বেতন ভাতা ইত্যাদি বাবদ পাইতেন ৩৩০ টাকার কিছু বেশী। মাস কয়েক পরে তৎকালীন অধ্যক্ষ (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) কর্নেল অ্যাণ্ডার্সন ডাঃ রায়ের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই একজন প্রদর্শককে তাঁহার সহ-চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন বিধানচন্দ্র ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে অধ্যক্ষ তাঁহার ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা চাহিলেন। কিছুকাল পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া আসলেন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সদস্য মেজর রেইট। তিনি এডিনবার্গের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তবুও কেবল শ্বেতাঙ্গ বলিয়া আই এম এস-ভুক্ত হইয়া বেতন ভাতা ইত্যাদি সমেত মাসিক দেড় হাজার টাকা পাইতেছিলেন। তিনি যেদিন কাজে যোগ দেন, সেদিনই ডাঃ রায়কে তাঁহার বাড়িতে ডাকাইয়া লন ডাঃ রায়ের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য। মেজর রেইট প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন: আপনি এখানে কি কি কাজ করেন? ডাঃ রায় জবাবে বলেন: ছাত্রদের ক্লাসে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়, ইহা ব্যতীত ছাত্রদের শব-ব্যবচ্ছেদ এবং প্রদর্শকদের (ডেমনস্ট্রেটরদের) কার্য তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি। শুনিবামাত্র মেজর রেইট মন্তব্য করেন: কাজের তুলনায় আপনি এত বেশী বেতন পাইতেছেন দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে। চাকরি করিতেছেন বলিয়া ডাঃ বিধান রায় ওইরূপ অন্যায় ও অশোভন মন্তব্য শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিবার মতো যুবক নহেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দিলেন এই বলিয়া—একজন এম. আর. সি পি. (লণ্ডন), এফ. আর সি. এস্ (ইংলণ্ড) এবং এম. ডি (ক্যাল্) ডিগ্রি-পরীক্ষা পাস করিয়াও বেতনাদি বাবদ পাইতেছেন মাসে মাত্র ৩৩০ টাকা, কিন্তু অন্যজন এডিনবার্গের ডেপ্লোমাতে পর্যন্ত ফেল করিয়া একই সময়ে বেতনাদি বাবদ মাসে পাইতেছেন দেড় হাজার টাকা, এইরূপ অসমতার কারণ যে কি, তাহা আমি বুঝি না। হয়তো বর্ণ-বৈষম্যই ইহার একমাত্র কারণ। মেজর রেইট তাঁহার অধীনস্থ একজন ভারতীয় যুবক ডাক্তারের নিকট হইতে ওইরূপ জবাব শুনিবেন বলিয়া আদৌ আশা করেন নাই। যুবক বাক্যবাণ হানিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন উহার প্রতিক্রিয়া। সাহেবের চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে আঘাতের জ্বালা। ভিতরে ভিতরে তিনি খুবই চটিয়া গেলেন। তবে সেই ভাব গোপন রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তিনি আলোচনায় আর অগ্রসর হন নাই। শুধু বলিলেন যে ডাঃ রায়কে পরে সরকারী নোট পাঠানো হইবে।

যথাসময়ে অধ্যক্ষ মেজর রেইটের নিকট হইতে তিনি তাঁহার কার্যের সময়-নির্দেশক একখানা নোট পাইলেন। তাহাতে এইরূপ নির্দেশ ছিল যে, ডাঃ রায়কে শারীরস্থান

বিভাগে বেলা বারোটা হইতে তিনটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা উপস্থিত থাকিতে হইবে। অর্ধ শতক পূর্বে প্রদত্ত একটা বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তি (নোটিফিকেসন) অনুসারে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নোটখানা পাইয়া তিনি অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নির্দেশ কি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে, না উহার মূলনীতি (স্পিরিট অনুসরণ করিলে চলিবে। অধ্যক্ষ বলিলেন—সরকারী নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতে হইবে বই কি। তদুত্তরে ডাক্তার রায় কহিলেন—যখন আমরা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করি, তখন ঘণ্টা হিসাবে ভাড়ার টাকা দিয়া থাকি, কিন্তু ট্যাক্সির বেলায় হিসাব-নিকাশ হয় দূরত্ব ধরিয়া। তেমনি যখন কোন পিয়ন কিংবা ভৃত্য নিযুক্ত করি, তখন আমরা তাহাকে দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করিবে ঠিক করিয়া দিয়া থাকি, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে একটি বিভাগ পরিচালনায় নিযুক্ত করিলে আমাদের দেখিতে হয় তিনি দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতেছেন কিনা, তখন প্রতিদিন কত ঘণ্টা কাজ করেন তাহা দেখার প্রয়োজন হয় না। বিধানচন্দ্রের এই জবাব শোনার পরও মেজর রেইট পুনরায় বলিলেন যে, নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হউক, ইহাই তিনি চাহেন।

ওই নির্দেশের দিনকয়েক পরে মেজর রেইট ডাঃ রায়কে লিখিয়া পাঠান যে, তিনি বিকাল চারটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা শল্য-চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শ্রেণীর (tutorial class-এর) ভার লইতে পারেন কিনা। তিনি চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিয়া দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়ির (ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের) মধ্যে, কোন জবাবই দিলেন না। ইহার পরে কিছুদিন কাটিয়া গেল। মেজর রেইট্ একদিন শারীরস্থান বিভাগে আসিলেন। ডাঃ রায় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করিতেছেন কিনা, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যাওয়া সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তখন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা। ডাঃ রায়কে কমরত দেখিয়া অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার চিঠিখানার উত্তর ডাঃ রায় দেন নাই কেন। তিনি জবাবে বলিলেন—আপনার চিঠিখানাকে তো উহার উপযুক্ত স্থানেই অর্থাৎ বাজে কাগজের ঝুড়িতে (ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে) ফেলিয়া দিয়াছি। শুনিয়া মেজর রেইট্ হতভম্ব হইয়া যান এবং প্রশ্ন করেন—কেন? প্রত্যুত্তরে ডাঃ রায় কহিলেন—আপনিই যে আমাকে বলিয়াছেন সরকারী নিয়মকে মানা চাই অক্ষরে অক্ষরে, মূলনীতির কোন প্রশ্ন সেখানে উঠে না। আমি তো তাহাই করিতেছি, বারোটা হইতে তিনটা আমার কাজের নির্দিষ্ট সময়। ইহাতেই আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্যকার্যের দায়িত্ব শেষ হইয়া গেল। আপনি আমাকে সেই নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ করিতে বলিয়াছেন, আমি তাহা অস্বীকার করিয়াছি। মেজর রেইট্ মন্তব্য করিলেন যে, প্রকারান্তরে তাঁহার নির্দেশ অমান্য করা হইয়াছে। ডাঃ রায় বলিলেন—আপনি যদি তাহাই মনে করেন,

তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতে পারেন, আমার যাহা বলিবার সেইখানে বুঝাইয়া বলিতে প্রস্তুত আছি।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে কাজ করিবার কালে অধ্যক্ষ (সুপারিন্টেণ্ডেন্ট) মেজর রেইটের সঙ্গে ডাঃ রায়ের বিরোধ চলিয়াছিল অধ্যক্ষের ওই প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যাইবার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত। সেই সম্পর্কে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গ-বিভাগের (১৯০৫ খ্রী° ১৬ই অক্টোবর) ফলে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার, উড়িষ্যা ও চোটনাগপুরকে লইয়া যে প্রদেশটি গঠিত হইয়াছিল, উহার তৎকালীন ছোটলাট ছিলেন স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার। তিনি একদা প্রতিষ্ঠানটি দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার কিছুসময় পূর্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজের গাড়িতে করিয়া হাসপাতালে পৌঁছিলেন। সদরদরজায় ছোটলাটের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার সহকর্মী বন্ধুগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গাড়ি হইতে নামিয়াই তাঁহাদের সহিত মিশিয়া গেলেন। মেজর রেইট যে নিকটে ছিলেন, তাহা ডাঃ রায় দেখিতে পান নাই, তিনি বন্ধুদের সঙ্গে তখন কথা বলিতেছিলেন। ছোটলাট স্কুল ও হাসপাতাল দেখিয়া চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই অধ্যক্ষ ডাকাইয়া পাঠাইলেন ডাঃ রায়কে। তিনি জানিতে চাহিলেন—ডাঃ রায় তাহাকে দেখিতে পাইয়াও কেন মাথার টুপি (হ্যাট) উঠাইয়া সম্মান দেখান নাই। ডাঃ রায় বলিলেন— আমি প্রকৃতপক্ষে আপনাকে দেখিতে পাই নাই। আর দেখিতে পাইলেও টুপি উঠাইতাম না, মুখে 'গুড্ মর্নিং' বলিয়াই সম্মান দেখাইতাম। কেননা ইংলণ্ডে অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপককে দেখিয়া টুপি উঠাইতে হয় না, কেবল মুখে 'গুড্ মর্নিং', 'গুড আফ্‌টারনুন্' ইত্যাদি বলিলেই চলে। তিনি আরও বলিলেন—আমি মনে করিয়াছিলাম, ইংরেজরা যেখানেই যান, তাহাদের আচারও সেখানে চল থাকে। অধ্যক্ষ রেইট্ তাহাকে খোঁচা দিবার মতলবে বলিলেন--সে দেশ হইল ইংলণ্ড, আর এদেশ হইল ইণ্ডিয়া। তদুত্তরে ডাঃ রায় তাহাকে বলিলেন, তিনি যেন একটা নোটিশ দিয়া জানাইয়া দেন যে, প্রত্যেকেরই মাথার টুপি উঠাইয়া সম্মান দেখানো উচিত। মেজর রেইট এই বলিয়া তাহা করিতে অস্বীকার করেন যে, উহাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। সেই দিন হইতে ওই প্রতিষ্ঠানে মাথার টুপি উঠাইয়া সম্মান দেখাইবার রীতি একেবারে উঠিয়া গেল। এইজন্য প্রশংসা পাইবার অধিকারী একমাত্র ডাঃ রায়।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে আরও একটা রীতি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। কোন অধ্যাপক বা শিক্ষককে দেখিবামাত্র ছাত্রদের খোলা ছাতা বন্ধ করিতে হইত। ডাঃ রায় ইহা মোটেই পছন্দ করিতেন না। কোন ছাত্র ক্লাসে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ছাতা মাথায় দিয়া যাইবার কালে যদি তিনজন অধ্যাপককে কিংবা শিক্ষককে পর পর দেখিতে পাইতেন, তবে সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহাকে তিন বারই ছাতা বন্ধ

করিতে হইত এবং পুনরায় মাথায় দিবার জন্য তিন বারই ছাতা খুলিতে হইত। ডাঃ রায়ের বিবেচনায় এই রীতি যে কেবল ছাত্রদের পক্ষে বিরক্তিকর ছিল তাহা নহে, উহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় মর্যাদারও ক্ষতিকর ছিল। তিনি ছাত্রদের ওইভাবে সম্মান দেখাইতে নিষেধ করেন ; মুখে 'গুড্ মর্নিং', 'গুড্ আফটারনুন', 'গুড্ ইভিনিং' ইত্যাদি বলিয়া কিংবা নমস্কার জানাইয়া সম্মান দেখাইতে বলেন। ছাত্রসমাজে ডাঃ রায়ের জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে সেই উপদেশ দ্রুতগতিতে প্রচারিত হইয়া গেল। ছাত্রগণ তাহাই মানিয়া চলিতে লাগিলেন। একদিন মেজর রেইট্‌কে দেখিয়া কয়েকজন ছাত্র ছাতা বন্ধ না করিয়া কেবল মুখে 'গুড্ মর্নিং' বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি চটিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের ছাতা বন্ধ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তাহারা অধ্যক্ষকে জানাইলেন যে, ছাতা বন্ধ না করিয়া ওইভাবে সম্মান দেখাইতে উপদেশ দিয়াছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ঘটনাটা উল্লেখ করিয়া অধ্যক্ষ জানিতে চাহিলেন—ডাঃ রায় কেন ছাত্রদের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা শিক্ষা দিতেছেন। তদুত্তরে ডাঃ রায় বলিলেন যে, ওইরূপ শিক্ষা কখনও তিনি দিতে পারেন না ; বিরক্তিকর রীতি ছাড়িয়া একটা যুক্তিসঙ্গত রীতিতে সম্মান দেখাইতে বলিয়া দিয়াছেন মাত্র। ডাঃ রায় যে কি ধাতুতে গড়া, তাহার পরিচয় অধ্যক্ষ ইতঃপূর্বেই পাইয়াছিলেন। সুতরাং ওই ব্যাপার লইয়া বাড়াবাড়ি করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে বহু বৎসর যাবত অনুসৃত আর একটি অবাঞ্ছিত রীতি ডাঃ রায়ের সৎসাহসের দরুন চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

ওই সমুদয় ঘটনা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ডাঃ বিধান রায়ের আত্মসম্মান-জ্ঞান ও জাতীয় মর্যাদাবোধ কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল। ইংরেজ গবর্নমেন্টের অধীনে চাকরি করিতেন বলিয়া তিনি কোনদিন তাঁহার ঊর্ধ্বতন ইংরেজ রাজপুরুষকে মাথার টুপি খুলিয়া সম্মান দেখান নাই। ছাত্রদেরও তিনি ছাতা বন্ধ করিয়া সম্মান দেখাইতে নিবৃত্ত করিলেন। সেকালটা ছিল বাংলায় Renaissance বা নব-জাগৃতির যুগ—যাহা প্রবর্তন করিয়াছে স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে আরব্ধ বিরাট আন্দোলন তখন সফল সমাপ্তির দিকে চলিতেছিল। উহার সমাপ্তির পূর্বেই সমগ্র বাংলায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীর বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রের সাধনা। সেই যুগেরই অবিস্মরণীয় ঘটনা কলিকাতার মানিকতলায় অরবিন্দ ঘোষ ও ভ্রাতৃগণের বাগানবাড়িতে বোমা-নির্মাণের কারখানা এবং অস্ত্রাগার আবিষ্কার। তাহা হইতে উদ্ভব হইল আলিপুর বোমার মামলা—যাহাতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্লবধর্মী যুবকেরা। বিপ্লবী

যুবক প্রফুল্ল চাকী মৃত্যুবরণ করিলেন নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহনন করিয়া ; ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু প্রভৃতি ফাঁসির মঞ্চে গাহিয়া গেলেন জীবনের জয়গান। আরও কত কি ঘটিতেছিল সেকালের নব-জাগ্রত বাংলায়।

তেজস্বিতা, আত্মসম্মান-জ্ঞান ও সৎসাহস ছিল বিধানচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ; ইহা ব্যতীত তাঁহার উপর যুগের প্রভাবও যথেষ্ট পড়িয়াছিল। মননশীল, প্রতিভাবান ও ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী যুবক বিধানচন্দ্র সেই নবজাগৃতির যুগের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও স্বাজাত্যবোধ তীক্ষ্ণতর হইল। যুগের প্রভাব সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—'তা পড়েছিল বইকি।'

সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্বে একদিন মেজর রেইট্ ডাঃ রায়কে একাকী পাইয়া সরলভাবে একটি প্রশ্ন করেন—ডাঃ রায়, আপনি কি আমাকে মূর্খ মনে করেন? জবাবে ডাঃ রায় কহিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। যদি বলি 'হাঁ' তবে তাহা আপনি পছন্দ করিবেন না, আর যদি 'না' বলি, তাহা হইলেও আমার বিবেকে আঘাত লাগিবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না—কি উত্তর আপনাকে দিব। এইরূপ কথাবার্তার পরে মেজর রেইট্ বলিলেন—ডাঃ রায় আমার কার্যকাল এখনও শেষ হয় নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই আরও কয়েক বৎসর কাজ করিতে পারি। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি এখনই কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব। যে প্রতিষ্ঠানে আমার অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্যতর শিক্ষক রহিয়াছেন, সেখানে অধ্যক্ষের পদে থাকিয়া কাজ করা আমার পক্ষে যে অনুচিত, তাহা আমি অনুভব করিতেছি।

ইংরেজ চরিত্রের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, নিজের ক্রটি-বিচ্যুতি বুঝিতে পারিলে অকপটে তাহা স্বীকার করা। মেজর রেইটের চরিত্রেও সেই বিশেষত্ব ছিল। তবে ডাঃ রায়ের সৎসাহস এবং সতেজ আচরণই যে মেজর রেইটের ওইরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগাইতে সহায়ক হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না।

৭

চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে

বিধানচন্দ্র এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন মেডিকেল কলেজে সহ-চিকিৎসকের (অ্যাসিস্ট্যান্ট্ সার্জনের) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন হইতে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ফী লইতেন দুই টাকা। তৎকালে কলিকাতায় নূতন ডাক্তারদের দর্শনীর হার এই প্রকারই ছিল। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তাও ছিল যথেষ্ট। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অগ্রগতির পক্ষে তাহা কম সহায়ক ছিল না। ডাক্তার হিসাবে তাঁহার দক্ষতা ও হাতযশ এবং রোগীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ সদয় ব্যবহার ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি লাভের প্রধান কারণ। দুই বৎসরের উপার্জন হইতে ডাঃ রায় বিলাতে পড়ার খরচের টাকাও সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল লিউকিস্ বিধানচন্দ্রকে নূতন ছাত্রদের অধ্যাপনার সুযোগও দিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্য এবং সস্নেহ ব্যবহার বিদ্যার্থিগণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার গুণাবলীই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেই সমুদয় প্রকাশের সুবিধা দিয়াছিলেন গুণগ্রাহী ও হিতৈষী অধ্যক্ষ ডাঃ লিউকিসই। তাঁহার প্রিয় ছাত্র বিধান যে সুচিকিৎসক, ইহা তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন। তাহাতে ডাঃ রায়ের চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভে কম সহায়তা হয় নাই।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর ডাঃ রায় দর্শনীর হার বাড়াইয়া আট টাকা করিলেন। তাহাতেও রোগীর অভাব হইল না। দিনের পর দিন তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রথমে এল এম. এস. ডিগ্রী পাইয়া তিনি যখন সহ-চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন, তখন ৬৭।১নং হ্যারিসন রোডের বাড়িতে থাকিতেন। বিলাত হইতে আসিয়া তিনি ভাড়া লইলেন ৮৪নং হ্যারিসন রোডের বাড়ি, সেখানে বাস করিয়াছিলেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই বৎসরই তিনি তাঁহার নিজের বাড়িতে ৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে উঠিয়া আসেন। বাড়িটি তিনি খরিদ করিয়াছিলেন মিঃ খাস্তগীরের নিকট হইতে। ডাঃ রায়ের খরিদের পূর্বে সেই বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন একজন ন্যাভাল অফিসার অর্থাৎ নৌ-বিভাগের আধিকারিক। ১৯১৬ খ্রীঃ হইতে বিধানচন্দ্র সেই বাটীতেই বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওই বৎসর

হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নে তাঁহার কাটিয়া যায় দুই বৎসর তিন মাস। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় আট বৎসরের মধ্যেই ডাঃ রায় কলিকাতায় বাড়ি এবং গাড়ির মালিক হইয়াছিলেন। তৎকালে এই দুইটি ছিল কলিকাতায় আভিজাত্যের নিদর্শন। গবর্নমেণ্টের অধীনে সহ-চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি সেই সময়ে যে বেতন পাইতেন, উহাকে সামান্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার মত প্রতিযোগিতা-সংকুল মহানগরীতে তাঁহার ডাক্তারিতে যে কিরূপ দ্রুত ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ডাঃ রায়ের দর্শনীর হার আরও বাড়িয়া শীঘ্রই তদানীন্তন প্রবীণ শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের সমান হইয়াছিল।

রোগীর থুথু, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা তখন কলিকাতায় ছিল না। সেজন্য ডাঃ রায় নিজের বাড়িতে একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করিলেন। তাহাতে কয়েকজন ডাক্তার আসিয়া কাজ করিতেন। এই ব্যবস্থায় তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীদের সুবিধা হইল। কেননা প্রয়োজন হইলে থুথু, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার কাজ সত্বর সম্পন্ন হইত। চিকিৎসাবৃত্তিকে তিনি নিছক ব্যবসায় বলিয়া মনে করিতেন না, সেই বৃত্তির মধ্যে যে পরোপকার ও লোকসেবার সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, উহার সদ্ব্যবহার করিতেন। ডাঃ রায় রোগীর এরূপ যত্ন লইতেন যে, রোগীর ঘরে ঢুকিয়া যদি দেখিতেন রোগীর বিছানা নিয়মমত পাতা হয় নাই, তবে নিজ হাতে তাহা ঠিক করিয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে রোগীর পথ্য কিভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা রোগীর ঘরে নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়া দিয়া আসিতেন। বাড়িতে যে সকল রোগী চিকিৎসা করাইতে আসিতেন, তাহাদিগের প্রাথমিক পরীক্ষাদির জন্য তিনজন ডাক্তার বিধানচন্দ্রের সহকারী-রূপে কাজ করিতেন। সহকারী ডাক্তারের জন্য রোগীদের কোন অতিরিক্ত ফী দিতে হইত না। তাঁহাদের পারিশ্রমিক ডাঃ রায়ই দিতেন। নিয়ম ছিল সহকারী ডাক্তার প্রথমে রোগীর পরীক্ষাদি কাজ সারিয়া কেস্-বুকে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়া লইতেন। ডাঃ রায় প্রথমে কেস-বুকে লিখিত বিবরণ ও মন্তব্য পাঠ করিতেন এবং তারপর রোগীকে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিতেন। রোগীর রোগনির্ণয়ে তাঁহার দক্ষতা সমসাময়িক প্রবীণ চিকিৎসকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। ব্যাধির হেতুর দ্রুত নির্ভুল নির্ণয়ে তাহার ক্ষমতাকে অসাধারণ বলা যাইতে পারে।

দরিদ্রদের প্রতি বিধানচন্দ্র বরাবরই ছিলেন সহানুভূতিশীল। রোগীর বাড়িতে গিয়া যদি দেখিতেন রোগীর এমনই দুরবস্থা যে ডাক্তারের প্রাপ্য দর্শনী দিতে খুবই কষ্ট হইতেছে, তবে তিনি কখনও পীড়াপীড়ি করিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হইয়াছে যে, রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা আংশিক দর্শনী যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহা দিতে

সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন কিংবা সাহস করিতেছেন না, এরূপক্ষেত্রে ডাঃ রায় তাঁহার বাড়িতে চ্যারিটি বক্সে সেই টাকা দিতে বলিয়া আসিতেন। মর্যাদায় হানিকর অল্প ফী তিনি লইতেন না। বাড়িতে গিয়া যে সকল রোগী চিকিৎসা করাইতেন এবং দারিদ্র্যের জন্য অল্প ফী দিতে চাহিতেন, তাঁহাদের জন্যও পূর্বোক্ত নিয়ম ছিল। ডাঃ রায়ের বড়-দাদা সুবোধচন্দ্র রায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রতি মাসে সেই দান-ভাণ্ডারে বেশ টাকা জমিত এবং সমস্তটাই দান করা হইত নানাবিধ সৎকার্যে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ডাঃ রায় কেবল চ্যারিটি বক্সের টাকাই দান করিতেন, আর কোন টাকা দান করিতেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণের পর্বে তাঁহার আয়ের পরিমাণ ছিল কত গুণ বেশী! তখন দানের পরিমাণও ছিল যথেষ্ট, বিশেষতঃ কংগ্রেসের কার্যে তাঁহার দান কর্মিমণ্ডলীতে সুবিদিত।

ডাঃ রায় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। প্রায় তেরো বৎসর সরকারী কাজ করিয়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তিনি সেই বৎসরই কার্যে ইস্তফা দিলেন। নব-প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (পরে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বন্ধীকরণের (affiliation-এর) অনুমোদন পাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি উহার ভেষজ-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ওই মহাবিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী ইতঃপূর্বে যে ডাক্তারকে পূর্বোক্ত পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষদ (Syndicate) তাঁহাকে উপযুক্ত মনে করেন নাই। জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যদি ওই পদ গ্রহণে সম্মত হন, তবে সম্বন্ধীকরণের আবেদন মঞ্জুর করা হইবে। পরিচালক-গণের পক্ষ হইতে প্রসিদ্ধ ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র ডাঃ রায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার দেখা পাইলেন। দুইজনে নিজ নিজ গাড়ি থামাইয়া নামিলেন। উভয়ের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য কথাবার্তা হইল। ডাঃ মিত্র ডাঃ রায়কে ইহাও জানাইলেন যে, সেই দিনই কয়েক ঘণ্টা পরে নিষদের সভায় বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। এইরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার পরে মতামত জানাইবেন বলিয়া ডাঃ রায় সময় লইলেন না। তাঁহার মনের মধ্যে নিজের লাভ-লোকসানের প্রশ্ন জাগে নাই, জাগিয়াছিল একটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নটি হইল—তাঁহার অধ্যাপক-পদ গ্রহণের সম্মতিদানের উপর নির্ভর করিতেছে ওই বেসরকারী শিক্ষায়তনের ভবিষ্যৎ। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মতো একটা বিরাট প্রদেশে কলিকাতা মেডিকেল কলেজই ছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের একমাত্র কলেজ। বিদেশী-শাসনে শোষিত দেশে দরিদ্র জনগণের হিতার্থে কালোপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিকরণ যে অত্যাবশ্যক, তাহা তিনি অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে-

অধ্যয়নের সময় হইতেই। সে সময়ে অখণ্ড ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় ওই শ্রেণীর ডাক্তারের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বাংলা দেশে প্রতি চল্লিশ হাজার জনে একজন শিক্ষিত ডাক্তার, পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে প্রতি আঠার শত জনে একজন। সুতরাং শাসিত বা শোষিত দেশের সঙ্গে শাসকের বা শোষকের দেশের শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যার তারতম্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্গতির করুণ চিত্র চোখের উপর ভাসিয়া উঠে।

ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, এম. ডি., এফ. আর. সি. এস্ (এডিন্) ছিলেন কলিকাতার তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা শল্য-চিকিৎসকমণ্ডলীর অন্যতম। তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যু যথাক্রমে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ডাঃ রায়ের অপেক্ষা প্রায় পনের বৎসরের বড়। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ চিকিৎসকের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি জানাইলেন সঙ্গে সঙ্গেই। ডাঃ রায় প্রস্তাবককে বেতন, চাকরির শর্ত, পদের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাদি সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন নাই। কেননা তাঁহার মনে এইরূপ ভাবই জাগিয়াছিল যে, ওই সকল প্রবীণ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দেশের কল্যাণকল্পে একটি উচ্চাঙ্গের মহা-বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা গড়িয়া তুলিবার কার্যে অগ্রণী হইয়াছেন এবং ত্যাগ স্বীকারও করিতেছেন, তবে তিনি যুবক (৩৭) হইয়াও কেন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন? তাঁহার কাছে এ যেন দেশমাতারই ডাক; সেই ডাকে তিনি সাড়া দিবেন না কেন? ডাঃ রায় ড্রাইভারকে গাড়ি ফিরাইয়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে লইয়া যাইতে বলিলেন। সেখানে তদানীন্তন অধ্যক্ষ কর্নেল লেভেন্টনের করণে বসিয়াই পদত্যাগপত্র লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি তাহা পড়িয়া যেন অবাক হইয়া গেলেন। পত্রে পদত্যাগের হেতু লিখিত ছিল। অধ্যক্ষ পদত্যাগপত্র গ্রহণে ইতস্তত: করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন: ডাক্তার রায়! নয় মাসের ছুটি তো আপনার পাওনা আছে। এখন ছুটির দরখাস্ত দিলেও তো আপনার কাজ হয়।—বলিয়া তাঁহাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া নয় মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত দিতে বারংবার অনুরোধ করেন। কেননা অধ্যক্ষ জানিতেন যে, ডাঃ রায়ের মতো একজন লোকপ্রিয় শিক্ষক ও যশস্বী চিকিৎসককে হারানো ওই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এবং চিকিৎসা-কৃত্যকের (Medical Service-এর) অপূরণীয় ক্ষতি। ডাঃ রায় অধ্যক্ষকে সেই অনুরোধের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বিদেশী রাজের বংশবদ ভৃত্যরূপে রাজসেবার অনভিপ্রেত দায় হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন চিরদিনের জন্য। যে বাঞ্ছিত ক্ষণের জন্য এতদিন তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া গেল। উচ্চাভিলাষী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী যুবকের ঘটনাসংকুল জীবনের জয়যাত্রা চলিতে লাগিল নূতন পথ ধরিয়া।

১০

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে

বিধানচন্দ্র প্রবেশ করিলেন নূতন কর্মক্ষেত্রে--কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। পূর্বে কাজ করিতেছিলেন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে, বর্তমানে কাজ করিতেছেন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক রূপে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীকরণের (affiliation-এর) মঞ্জুরি দেওয়ায় ইহা পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে পরিণত হইল। মহানগরীর দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজের মর্যাদা পাইল ওই শিক্ষায়তনটি। ভারতবর্ষ পরাধীন থাকাকালে অখণ্ড বাংলাদেশে বহু শিক্ষায়তন বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখ করেতেছি: সিটি কলেজ (কলিকাতা ও ময়মনসিং), বঙ্গবাসী কলেজ (কলিকাতা), রিপন কলেজ (কলিকাতা, বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), মেট্রোপলিটান কলেজ (কলিকাতা, বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ), ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশান (কলিকাতা), ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশান (বরিশাল), ভিক্টোরিয়া কলেজ (কুমিল্লা), মহসীন কলেজ (হুগলী) এবং নরসিংহ দত্ত কলেজ (হাওড়া)। ডাঃ রায় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাইলেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র এবং স্বাধীনভাবে কাজ করিবার পূর্ণ সুযোগ। এই মহাবিদ্যালয়ে ভেষজ-অধ্যাপকের পদ গ্রহণের প্রায় তিন বৎসর পূর্বে (১৯১৬ খ্রীঃ) তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিসদের (Senate-এর) সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যেই তাঁহার প্রতিভা, কর্মশক্তি, স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদি গুণ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা কম হয় নাই। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহা অবগত ছিলেন বলিয়া ডাঃ রায়ের পক্ষে কাজ করার বেশ সুবিধা হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তিনিও পরিচালকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপনার প্রারম্ভেই ডাঃ রায় বিদ্যার্থিগণকে বুঝাইয়া দিলেন—কি কি গুণ থাকিলে আদর্শ চিকিৎসক হওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসা-বৃত্তি যে একটি মহৎ বৃত্তি, তাহা চিকিৎসককে মনে রাখিতে হইবে। সেই বৃত্তির সাফল্য নির্ভর করে চিকিৎসকের কোমলহৃদয়, ধৈর্যশীল প্রকৃতি এবং সমবেদনার উপর। তাঁহার শ্রদ্ধেয় আচার্য কর্নেল

লিউকিসের নিকট হইতে তিনি যে আদর্শ-বাণী (motto) পাইয়াছিলেন, তাহা ছাত্রদের শুনাইলেন :

"A heart that never hard'ns,
A temper that never tires,
A touch that never hurts."

এমন একটি হৃদয়—
কঠোর হয় না যে কভু,
এমন একটি প্রকৃতি—
বিরাম চায় না যে কভু,
এমন একটি পরশ—
বেদনা দেয় না যে কভু।

ওই বাণী যাহাতে শিক্ষার্থিগণের দৃষ্টিতে পড়ে, সেইজন্য ডাঃ রায় একখানি বড় বোর্ডে তাহা সুন্দর করিয়া লিখাইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখাইলেন। তাঁহার অধ্যাপনা এত চিত্তাকর্ষক হইত যে, শ্রেণীর ভালো-মন্দ সমস্ত ছাত্রই তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিত। অধ্যাপনার সময়ে শ্রেণীর মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত। সুচিকিৎসক হইলেই যে সুঅধ্যাপক হওয়া যায়, কিংবা সুঅধ্যাপক হইলেই যে সুচিকিৎসক হওয়া যায়, তাহা নহে। কিন্তু ডাঃ রায়ের মধ্যে উভয় গুণাবলীই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং কলেজের ছাত্রগণের তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান অধ্যাপকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

নূতন কর্মক্ষেত্রে বিধানচন্দ্র কাজ করিতে লাগিলেন নবোদ্যমে ও নবোৎসাহে। প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চাঙ্গের শিক্ষায়তন রূপে গড়িয়া তুলিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিল। তিনি পরিচালকমণ্ডলীকে তজ্জন্য নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শিক্ষায়তনটিকে স্কুল হইতে কলেজে উন্নীত করার তৃতীয় বৎসরে তিনি গ্রহণ করিলেন অধ্যাপকের পদ। কলেজে পরিণত হওয়ার পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে (১৯১৬ খ্রীঃ—১৯৪১ খ্রীঃ) ইহার কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল, সেই বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার দুইটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—'ক্যালকাটা স্কুল অব্ মেডিসিন' এবং 'কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জনস্'—একীভূত (amalgamated) হইয়া যায়। প্রথমটি স্থাপিত হইয়াছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং এক স্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পূর্বের নাম বদলাইয়া "দি ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল" নামকরণ হয়। ইহার বাড়ি নির্মাণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকায় খরিদ করা হয় কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে

বেলগাছিয়া রোডের পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড জমি। তারপর সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে একটি দোতলা বাড়ি নির্মিত হইল; সেই টাকার মধ্যে আঠার হাজার টাকার দান পাওয়া গিয়াছিল রাজপুত্র অ্যালবার্ট ভিক্টরের ভারত-আগমনের স্মারক ভাণ্ডার হইতে। সেই বৃহৎ দ্বিতল গৃহে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল' নামে একটি আরোগ্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত দুইটি শিক্ষায়তন একীভূত হওয়ার পর নাম দেওয়া হইল—'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জন্স্ অব্ বেঙ্গল'। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের জন্য একটা ব্লক তৈয়ারি করিতে পনের হাজার টাকা এককালীন সাহায্য (ক্যাপিটাল গ্র্যাণ্ট) রূপে দান করিলেন। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ তখন সংলগ্ন বারো বিঘা জমি খরিদ করিয়া আর একখানা বাড়ি নির্মাণ করাইলেন। তৎকালে গৃহ-নির্মাণের জন্য পোস্তা রাজ-পরিবারের রানী কস্তুরী মঞ্জুরি দান করেন সাঁইত্রিশ হাজার টাকা।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালকেরা ভারত সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন। শিক্ষায়তনটি যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বন্ধীকরণের (affiliation-এর) মঞ্জুরি পাইতে পারে, সেজন্য ভারত সরকার আর্থিক সাহায্য দানে সম্মত হইলেন। ওই সাহায্যপ্রাপ্তি যাঁহাদের চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল: স্যার শঙ্করন নায়ার, কর্নেল এড্ওয়ার্ডস, লর্ড সিংহ, স্যার আর. এন. মুখার্জি, ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ভারত সরকার কয়েকটি শর্তে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। এককালীন দানরূপে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ (capital grant) নির্ধারিত হইল পাঁচ লক্ষ টাকা। যদি শিক্ষায়তনের পরিচালকমণ্ডলী সেই প্রস্তাবিত দানের অর্ধেক অর্থাৎ আড়াই লক্ষ টাকার দান সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে সরকার পূর্বোক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা দিবেন। তদুপরি পৌনঃপুনিক বার্ষিক সরকারী সাহায্যের (recurring annual grant-এর) পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। ওইরূপ বার্ষিক সাহায্য পাইতে হইলে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (Corporation) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে ত্রিশ হাজার ও দশ হাজার টাকার বার্ষিক সাহায্যের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। পরিচালকমণ্ডলী শর্তগুলি পালন করিয়া পূর্বোল্লিখিত এককালীন ও বার্ষিক সাহায্য পাইলেন। পরিচালকবর্গের সংগৃহীত আড়াই লক্ষ টাকার মধ্যে স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার করিয়া দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দানের অল্পকাল পরেই রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের নিকট হইতে বহির্ভৈষজশালার (আউট্ডোর ডিস্পেন্সারির) জন্য পাওয়া গেল পঁচাত্তর হাজার টাকার দান। ইহা ব্যতীত তিনি হাসপাতালে আঠারখানা শয্যা বা 'বেড্'-এর ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও দান করেন।

পরিচালকমণ্ডলীর অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল কলেজের উপযোগী হইয়া। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই বাংলার তদানীন্তন গবর্নর লর্ড কারমাইকেল কলেজটির উদ্বোধন করেন; তদবধি ইহা 'বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম এবং শেষ এম. বি. পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়া যায় যথাক্রমে ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠানকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-মহাবিদ্যালয়রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় লর্ড কারমাইকেল বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নাম দিলেন 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তিত 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল' নামে যে বেসরকারী শিক্ষায়তনটি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিল, উহার পরিচালনার জন্য একটি সংস্থা গঠিত হয়। উহা আইনমতে রেজেস্টার্ড করা হইল। সেই পরিচালক সংস্থার সদস্যগণের নাম উল্লেখ করিতেছি: ডাঃ লালমাধব মুখার্জি (সভাপতি), ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর (কর্মসচিব), মিঃ আর. ডি. মেটা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ আর. কে. সেন, হরিপদ ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পূর্বোক্ত সংস্থার দ্বারাই শিক্ষায়তনটি পরিচালিত হইল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত। সেই বৎসরের ২০শে মার্চ ওই সংস্থার নাম বদলাইয়া 'মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' করা হয়। পরিচালনা-সংক্রান্ত বিধি-বিধানেরও কালোপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইল। আইনমতে উহার রেজিস্ট্রেশন হইল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জুলাই। তৎপূর্বে ২০শে মে হইতে নবগঠিত সোসাইটির বিধিবিধান চালু হইল। ইহার নিয়মানুসারে পরিচালক-পরিষদ গঠিত হইবে এইভাবে: (১) সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, (২) বাংলা সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য, (৩) কলিকাতা কর্পোরেশনের মনোনীত তিনজন সদস্য, (৪) কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারিগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত চারজন সদস্য, (৫) কলেজের অধ্যক্ষ (পদাধিকারে), (৬) মোট চৌদ্দজন সদস্যের মধ্যে অবশিষ্ট দুইজন নির্বাচিত হইবেন সোসাইটির সদস্যগণ কর্তৃক এবং তন্মধ্যে একজনকে লইতে হইবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর বহির্ভূত শ্রেণী হইতে। পরিচালক-পরিষদ নূতন নামে ('মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি') ও নূতনভাবে গঠিত হইলে পর উহার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন লেঃ কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হইলেন ডাঃ আর. জি. কর। তাঁহাদের কার্যকাল ছিল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন যথাক্রমে স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু (১৯২০—১৯২১ খ্রীঃ) এবং স্যার নীলরতন সরকার। শেষোক্ত

প্রেসিডেন্ট স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রায় দশ বৎসর। তারপর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ (Principal) নিযুক্ত হইয়াছিলেন ডাঃ এম. এন. ব্যানার্জি (১৯১৬—১৯২২ খ্রীঃ), দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্যার কেদারনাথ দাস (১৯২২—১৯৩৫ খ্রীঃ), তৃতীয় অধ্যক্ষ ডাঃ এম. এন. বসু, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যক্ষ যথাক্রমে ডাঃ এস. কে. সেন ও ডাঃ এ. কে. রায়চৌধুরী।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালে পূর্বোক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ইহার রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (Vice-chancellor) ডক্টর সি. আর. রেড্ডি। সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ উদ্বোধনী ভাষণে ডক্টর রেড্ডি আরম্ভেই ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাজাতিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলার অবদানের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ওই সমুদয় ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাতে বাংলা যে নেতৃত্ব করিয়াছে তাহা ভারতবর্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল স্মরণীয় বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি. আর. দাশ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তিনি সরকারী শিক্ষা-নীতির—বিশেষ করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানের—দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া সংশোধনের উপায়ও বলিয়া দেন। সরকারী মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যক্ষের পদ যোগ্যতা বিচার না করিয়া, কেবল আই. এম. এস.-ভুক্ত ডাক্তারদের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখার ব্যবস্থা যে কিরূপ অন্যায় ও অনিষ্টকর, তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন। ডক্টর রেড্ডি বলেন যে সরকারী চিকিৎসা-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতে হইলে তাঁহাকে সিভিল সার্জনের শ্রেণীর (grade-এর) রাজকর্মচারী হওয়া চাই, এইরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা ভারতের বাহিরে কোন দেশের কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিত আছে বলিয়া তিনি জানেন না।

তাঁহার ভাষণের একাধিক স্থলে তিনি ডাঃ বি. সি. রায়ের অবদানের উল্লেখ করেন। কলেজের অর্থ-ভাণ্ডারে যে সকল দানশীল ব্যক্তি দশ হাজার টাকা বা তদপেক্ষা অধিক টাকা দিয়াছেন তিনি তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন। সর্বোচ্চ দানের পরিমাণ তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা; সেই বিপুল দান পাওয়া গিয়াছিল মিসেস্ মেরি হেলেনা মগার নামক একজন মানবহিতৈষিণী উদারহৃদয়া মহিলার নিকট হইতে। এক লক্ষ টাকা বা তাহার বেশী টাকা যাঁহারা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উদ্বোধনী-ভাষণে প্রদত্ত

তালিকা হইতে দিতেছি : ডাঃ লালবিহারী গাঙ্গুলী ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, রায় বাহাদুর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, বলাইচাঁদ দে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, রায় বাহাদুর ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, কৃষ্ণদাস কুণ্ডু ১ লক্ষ টাকা। ডক্টর বেড্ডি বলেন যে, ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে দাতার যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে সংগঠক ও কর্মীর প্রয়োজনও তেমনি আছে। তাঁহাদের নাম প্রকাশকালে তিনি মন্তব্য করেন যে, ঐ নামগুলি জাতীয় প্রভায় দীপ্ত, সংগঠক ও কর্মীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় রহিয়াছেন—রায় বাহাদুর ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আর. জি কর, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ এম. এন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, স্যার কেদারনাথ দাস, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস যতীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ এম এন বসু। বক্তা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুরাতন শিক্ষা-দান পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইয়া বলেন—উহার উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্বের যোগ্য করিয়া তোলা নহে, পরন্তু পরবশ্যতায় দক্ষ করিয়া তোলা। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটি মন্তব্যে আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছি। 'কেহই শিক্ষাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন, যদি তাঁহার এইরূপ উচ্চাভিলাষ না থাকে যে, তাহার ছাত্রদের মধ্যেই একজন সেই (শিক্ষাদাতার) আসনে বসিবার অধিকারী হইবেন।' শিক্ষাগুরুর সবাপেক্ষা গর্ব এই হওয়া উচিত এবং আদর্শ শিক্ষাগুরুর বেলায় তাহা হইয়াছেও যে তাহার ছাত্র শিষ্যদের মধ্যে একজন সেই (শিক্ষাগুরুর) আসনে বসিবার যোগ্য হইবেন। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের বিদ্যার্থিগণের বেলায় কি হইতেছে, দেখুন। ওই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরাই শিক্ষা-সমাপনান্তে অধ্যাপকের আসনে বসেন। শিক্ষার্থিগণের মধ্য হইতে অধ্যাপক নির্বাচনে স্থানগত বা জাতিগত প্রশ্ন ওঠে না।

মনীষী বেড্ডি চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারের শিক্ষা দান ব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া বলেন—মেডিকেল কলেজগুলিকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে, যেন ওই সমুদয় হইতে শিক্ষার্থীরা সরকারের চিকিৎসা বিভাগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের উপযোগী হইয়া আসিতে পারে। আই. এম. এস.-ভুক্ত ডাক্তারদিগকেই কেবল উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কোন ভারতীয় তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের আসনে বসিবার উচ্চাভিলাস পোষণ করিতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষার পরিমাণ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ওই শ্রেণীর শিক্ষাদাতাদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা ও ক্ষমতা কতটা আছে। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানের সংস্কার সাধনের প্রসঙ্গে আসিয়া বলেন—ডাঃ বি. সি. রায় ভারতের চিকিৎসাক্ষেত্রের নেতা। তাঁহাদের

মতো শুভ-সূচক নক্ষত্র দীপ্যমান থাকিতেও আমরা যদি চিকিৎসা-বিদ্যায়তনগুলির অত্যাবশ্যক পুনর্গঠনের কাজ করাইয়া লইতে না পারি, তবে দেশের ও উহার ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা চরম দুর্ভাগ্য বলিয়া আমি মনে করিব। "Dr. B. C. Roy is the Medical Leader of India. If with all these propitious stars in the ascendant, we cannot get the much needed re-organisation effected, I should consider it greatest misfortune to the country and its future."

'মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' নামক যে সমিতি কলেজটি পরিচালনা করিতেছিলেন, উহার প্রেসিডেন্ট-স্বরূপ ডাঃ রায় রজতজয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রথম দিন (৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রীঃ) এক ভাষণ দিয়াছিলেন। তাহাতে কলেজের বিগত পঁচিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। সেই ইংরাজী ভাষণের কতকাংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম :

"সুদূর অতীতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্নমেন্ট কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিগত (উনবিংশ) শতাব্দীর অষ্টম দশকের কোন এক সময়ে ইহা অনুভূত হইয়াছিল যে, বাংলা দেশের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সরকারী শিক্ষায়তনগুলি যথেষ্ট নহে ; সেইজন্য অষ্টম দশক হইতে নবম দশকের মধ্যে কলিকাতায় চারিটি বেসরকারী শিক্ষায়তন স্থাপিত হইল। চিকিৎসাজীবীরাই ছিলেন ওই সমুদয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। ডাঃ আর. জি. কর এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন। ইহার পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া উহাকে রেজেস্টারি করা হইল। অপর তিনটির মধ্যে একটি স্থাপন করেন ডাঃ এস. কে. মল্লিক ও ডাঃ বি. বসু, দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ফার্নাণ্ডেজ্ এবং তৃতীয়টির স্থাপয়িতা ডাঃ বি. কে. বসু ও কর্নেল এন. পি. সিংহ। আমরা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করি। সরকার তদুত্তরে জানাইলেন যে, সমস্ত বেসরকারী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায়তনগুলিকে একীভূত করিয়া একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক এবং উহার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলির একীকরণ (amalgamation) সম্ভবপর হয় নাই। সে যাহা হউক, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে এই বিদ্যায়তনকে আর্থিক সাহায্য দান করিতে সম্মত হইলেন। পরিচালক-সংস্থা সেই সমুদয় শর্ত পালন করিতে সমর্থ হইল।

"বিগত পঁচিশ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির পথে কিরূপ অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে—ছাত্র, শয্যা ও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কার্যের পরিমাণ হইতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই

প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থীদের কার্যোপযোগী বিজ্ঞানের বিষয়গুলির শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিয়াছে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শয্যার সংখ্যা ছিল সত্তর, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের শয্যার সংখ্যা ৫ শত ৩১ হইয়াছে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ শত, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের ছাত্রসংখ্যা হইয়াছে ৮ শত ৮৩ জন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বহির্বিভাগগুলিতে ১৬ হাজার রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা এবং অন্তর্বিভাগগুলিতে হইয়াছে ৭ হাজারের বেশী রোগীর চিকিৎসা। বিগত পঁচিশ বৎসরে কলেজে ভর্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে মোট ২৩ হাজার ৯৩ জন ছাত্রের নিকট হইতে. এই সকল দরখাস্ত আসিয়াছে—মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতানা ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং এমনকি বহির্ভারতের ব্রহ্ম, সিংহল, স্টেট্‌স্ সেটলমেন্টস্ প্রভৃতি দেশগুলি হইতেও। দরখাস্তকারীদের মধ্যে ২ হাজার ৪ শত ৮৮ জন ছাত্রকে আমরা ভর্তি করিতে পারিয়াছি। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠান ভারতের সমস্ত অঞ্চলের জনগণের বিদ্যায়তন হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় বিদ্যার্থিগণ শিক্ষা-সমাপনান্তে নিজ নিজ অঞ্চলে গিয়া রুগ্‌ণ মানবকে নিরাময় করিতে আত্মনিয়োগ করেন। বিগত পঁচিশ বৎসরে যে ২ হাজার ৪ শত ৮৮ জন ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ১ হাজার ৩ শত ৬৬ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। এই সমুদয়ের কতক ছাত্র স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন পাইয়াছে ডক্টরেট এবং ১৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন রয়েল কলেজের ফেলোশিপ পরীক্ষায়, ২৭ জন পাইয়াছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ডিপ্লোমা; ১৫৬ জন এম বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন স্নাতকোত্তর বিষয় অধ্যয়নান্তে পাইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম ডি., এম. এস, এম. ও., এম. এস-সি এবং ডি. পি. এইচ. ও ডি. টি. এম. ডিপ্লোমা।

"ইহা আনন্দের বিষয় যে, এই শিক্ষায়তনের বহুসংখ্যক ছাত্র ডাক্তার হইয়া দেশের নানা অঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন।

"চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা কখনও সন্তোষজনক হইতে পারে না, যদি সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজও না চলে। সেইজন্য কলেজের পরিচালকবর্গ তদ্বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং 'স্যার নীলরতন সরকার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট' নামে একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে সম্পন্ন কার্যাবলীর মধ্যে অনেকগুলিই স্বদেশে এবং বিদেশে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয়ে যে পাঠাগার আছে, উহার গ্রন্থাদির সংখ্যা ২০ হাজারেরও অধিক। স্যার কেদারনাথ দাস তাঁহার সংগৃহীত স্ত্রীরোগ ও

প্রসূতিতন্ত্র বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ, মাসিক পত্রাদি এবং দর্শনীয় যন্ত্রপাতি পাঠাগারে দান করিয়া গিয়াছেন।

"১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তনের যাবতীয় সম্পত্তির মোট মূল্য ছিল ৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি ও গৃহাদির মোট মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে ২৫ লক্ষ টাকাব অধিক। গৃহমধ্যস্থ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং নানা জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত নহে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে যন্ত্রপাতির সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। ভেষজের বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা-পদ্ধতির যথেষ্ট পরিবর্তন হওয়ায় চিকিৎসার ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভেষজেব বিবিধ বিভাগে গণেষণার সঙ্গে যদি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার সম্বন্ধ না থাকে, তবে সেই শিক্ষা নিরর্থক। সুতবাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক চিকিৎসার জন্য প্রচুর ব্যয় আবশ্যক। আমাদেব বর্তমান আর্থিক অবস্থায় আমরা সেই ব্যয় বহন করিতে পারি না।"…

ডাঃ রায় কলেজের পরিচালক-পরিষদের (মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এর) সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত। কলেজের পুনর্গঠনে ও সম্প্রসারণে তাঁহার অবদান প্রশংসনীয়। জাতি ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধনার্থ তিনি যখন অধ্যাপকেব পদ গ্রহণ করিয়া ওই শিক্ষায়তনে গেলেন, তখন উহা মাত্র তিন বৎসবেব শিশু। যখন তিনি পরিচালক-পরিষদের সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত হইলেন, তখন উহা পঁচিশ বৎসরের যুবক—প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার এক বৎসরের মধ্যেই (১৯৪৮ খ্রীঃ ২রা মার্চ) কলেজের নাম পরিবর্তিত করিয়া 'আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ' নাম দেওয়া হইল। বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দুইমাসের মধ্যেই এই নাম-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাই এই নাম-পরিবর্তন যে তাঁহার প্রেরণা ও উদ্যোগেই হইয়াছিল, এমন অনুমান করা চলে। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য দেশবাসীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত এই মহাবিদ্যালয়টিকে বিধানচন্দ্র প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিদায়-ভোগী অধ্যাপকের পদে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির সহিত সাঁইত্রিশ বৎসরেব (১৯১৯—১৯৫৬ খ্রীঃ) সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

এই কলেজের সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে তাঁহার দান ছিল অতুলনীয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি নামে একটি সংস্থা এই কলেজের নীতি নির্ধারণ করিতেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রায় ঐ সংস্থার প্রেসিডেন্ট হন। ডাঃ রায়ের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় এই কলেজে ছাত্রদের বিশেষ-শিক্ষা (specialised study) এবং উন্নততর চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন বহির্বিভাগ খোলা হয়। ঐ সকল নূতন বিভাগের মধ্যে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর অধীনে জৈব-রসায়ন (*bio-*

chemistry) বিভাগ, ডঃ জিতেন দত্ত ও ডাঃ যোগেশ গুপ্তের অধীনে হৃদ্‌বিজ্ঞানের (cardiology) বিভাগ, বেঙ্গল ইমিউনিটি লিমিটেড গবেষণা ও তাহাদের কোম্পানিতে প্রস্তুত ঔষধসমূহের দ্বারা রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে টাকা কলেজকে দান করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালে বেঙ্গল ইমিউনিটি ব্লক গঠন, কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের গবেষণার কার্য চালাইবার জন্য স্যার নীলরতন রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন, ছাত্রাবাসের জন্য চারতলা সুবৃহৎ ভবন নির্মাণ, মিসেস্ মেরি হেলেনা মগার কর্তৃক প্রদত্ত চার লক্ষ টাকা, কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত পাঁচ লক্ষ টাকা এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ স্মারক কমিটি হইতে প্রদত্ত ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে কেদারনাথ ম্যাটারনিটি হাসপাতাল স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কলেজের জন্য অর্থসংগ্রহে তাহার প্রচেষ্টাই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাক-গৃহ (kitchen block) এবং নার্সদের বাসভবন নির্মাণ করান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ মেডিকেল কাউন্সিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এম. বি. বি. এস. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করিলে যে অসুবিধা দেখা দেয়, ডাঃ রায়ের চেষ্টায় তাহা দূরীভূত হয়। আবার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় শর্ত পালনে কলেজ অসমর্থ হইলে কলেজকে চিকিৎসা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রূপে কাউন্সিল অনুমোদন দিতে অস্বীকার করিলে, তখনও ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যরূপে ডাঃ রায় হস্তক্ষেপ করিয়া সেই অসুবিধা ও অন্তরায় দূর করেন। এই কলেজে তাঁহার উপস্থিতি ছাত্র, শিক্ষক ও রোগীর মনে যে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করিত, তাহাও তাহার মহান ব্যক্তিত্বের এক অপরিমেয় অবদান। ভারতবর্ষে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এজন্য ব্যক্তিগতভাবে বহু ত্যাগ স্বীকার করেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করেন। মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য ও উৎসাহদান করিবার জন্য তিনি তাঁহার মাতা অঘোরকামিনী দেবী ও পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে ছাত্রদের কতিপয় বার্ষিক বৃত্তিদানের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়া ডাঃ রায় কলেজকে তাহার বহু ঘাটতি ও ঋণের বোঝা হইতে সরকারী সাহায্য দান করিয়া উদ্ধার করেন। আজ আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-শিক্ষাদান-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে ডাঃ রায়ের প্রচেষ্টাই যে তাহার মূলে, তাহা অনস্বীকার্য।

স্বদেশের কল্যাণে দেশবাসীর প্রচেষ্টায় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (অধুনাতন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) স্থাপনায় ডাঃ রায়ের অবদান যেমন স্মরণীয়, তেমনি দেশবাসীর কল্যাণে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেই দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য আরও দুইটি

হাসপাতাল গড়িয়া তোলার কীর্তিও চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এ সম্পর্কে সর্বাগ্রে বলিতে হয় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের কথা।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র সেই সবে বিলাত হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় চিকিৎসা শুরু করিয়াছেন। তখন একটি যুবক একদিন তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিলেন। বিধানচন্দ্র তখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে চাকরি করিতেন। যুবকটির পিতাও ছিলেন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক। সেই সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে সামান্য আলাপ-পরিচয় ছিল। যুবকটি সেই সবে ইংল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তাঁহার প্লুরিসি হইয়াছিল। তিনি বিধানচন্দ্রের চিকিৎসাধীনে থাকিতে চাহিলে বিধানচন্দ্র তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া যুবকটি ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি কিছুটা অসাবধানতা এবং ঠাণ্ডা লাগাইবার ফলে পুনরায় তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন এবং রোগ ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিল। তিনি কয়েক মাস শয্যাশায়ী রহিলেন এবং অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত নিরাময়ের আশা আর রহিল না। তখনও যক্ষ্মারোগের আধুনিক উন্নত ধরনের ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল খাদ্য, জলবায়ু, সেবাযত্ন ও সতর্কতার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইত।

জীবনের যখন আর আশা রহিল না, তখন যুবকটি একদিন বিধানচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমতাবস্থায় তাঁহার যে সামান্য পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহা সদ্‌ভাবে ব্যবহারের জন্য তিনি কি করিতে পারেন। যুবকটি বলিলেন, তাঁহার এই পৈতৃক বাসভবনটি আছে। ইহার অর্ধাংশ তাঁহার এবং অপর অর্ধাংশ তাঁহার ভাইয়ের। মাঝখানে একটি উঁচু প্রাচীর রহিয়াছে। তাহাই দুই অংশকে পৃথক করিয়াছে। যুবকটি ছিলেন অবিবাহিত। তিনি বিধানচন্দ্রকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন; তাই আন্তরিকভাবেই তিনি বিধানচন্দ্রের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যে রোগে ভুগিতেছেন, সেই রোগের চিকিৎসার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার এই সম্পত্তি দান করিতে পারেন। ঐ সময়ে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক কোনও হাসপাতাল বা হাসপাতালে পৃথক শয্যার ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ ওয়ার্ডেই যক্ষ্মারোগীদেরও চিকিৎসা হইত।

বিধানচন্দ্রের পরামর্শ যুবকটির মনঃপূত হইল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া তাহার হস্তেই এই সম্পত্তি উইল করিয়া ন্যস্ত করিয়া গেলেন। আচার্য পি. সি. রায়, বি. কে. ঘোষ এবং বিধানচন্দ্রকে তিনি এই উইলের নির্বাহক নিযুক্ত করিলেন। উইলে এইরূপ নির্দেশ ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে

ঐ টাকা যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হইবে। তাই বিধানচন্দ্র সত্বর একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে কলিকাতার কতিপয় ডাক্তার মিলিত হইয়া গিরিডির কাছে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি ভবন স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্ত্বাবধানের অভাবে উহার কোনও উন্নতি হয় নাই। সিমলা পাহাড়েও যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল ছিল। কিন্তু উহা পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারত হইতে ছিল অনেক দূরে।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যুবকটির অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িল। অন্য একজন ডাক্তারের পত্নী মিসেস ঘোষ ঐ সময়ে যুবকটিকে মাতৃস্নেহে সেবাযত্ন করিতেন, এমনকি নিজহস্তে তাহার পথ্য পর্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিতেন। একদিন সকাল ছটায় বিধানচন্দ্র স্বয়ং রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকাকালেই যুবকটির মৃত্যু হইল। বিধানচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম এবং মিসেস ঘোষ ছিলেন খ্রীষ্টান। তাই তাঁহারা মৃতের সৎকারের জন্য তাঁহার ভাইকে সংবাদ দিলেন। কিন্তু ভাই পত্রপাঠ জানাইয়া দিলেন যে যাঁহারা মৃতের সম্পত্তি লইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সৎকার করিবেন। এই অবস্থায় বিধানচন্দ্র ও মিসেস ঘোষ খুবই সমস্যায় পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির করিলেন যে, তাঁহারাই শব-সৎকারের ব্যবস্থা করিবেন। বেলা প্রায় ১০টা হইয়া গিয়াছিল। তাই মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য ওই সময় কলেজের ছাত্রদের পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিধানচন্দ্রের একটা দুই-আসনযুক্ত মোটর গাড়ি ছিল। উহার পেছনে একটা খোলা গাড়ি জুড়িয়া দিয়া তাহাতেই মৃতদেহ তোলা হইল এবং বিধানচন্দ্র নিজেই তাঁহার মোটর চালাইয়া মৃতদেহটি শ্মশানে লইয়া চলিলেন। তাঁহার পাশের আসনে রহিলেন মিসেস ঘোষ। শ্মশানঘাটেও এক সমস্যা দেখা দিল। এইভাবে দুই অনাত্মীয়ের দ্বারা বাহিত শবকে শ্মশান কর্তৃপক্ষ দাহের অনুমতি দিতে চাহিল না। শেষে বিধানচন্দ্র নিজে একজন চিকিৎসক এবং কি পরিস্থিতিতে তাঁহাকে নিজেকে শব শ্মশানঘাটে আনিতে হইয়াছে, তাহা জানিয়া শ্মশান কর্তৃপক্ষ শবদাহের অনুমতি দিল।

এখন যুবক কর্তৃক দত্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ক্রেতার সন্ধান চলিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইল এবং প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। উইলে আর যে দুইজন নির্বাহক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বি. কে. ঘোষ—তাঁহারা কেহই চিকিৎসক ছিলেন না। সুতরাং হাসপাতাল স্থাপনের সকল দায়-দায়িত্ব বিধানচন্দ্রের উপরেই পড়িল। প্রথম সমস্যা দেখা দিল হাসপাতালের স্থান নির্বাচন লইয়া। বিধানচন্দ্রের বহু চিকিৎসক বন্ধু এইরূপ মত পোষণ করিতেন যে, হাসপাতালটি পশ্চিম হিমালয়ের শুষ্ক আবহাওয়ায় কোনও ঠাণ্ডা জায়গায় হওয়া উচিত। বিধানচন্দ্র তাঁহাদের মতে সায় দিতে পারিলেন না। তিনি যুক্তি দেখাইলেন যে, কলিকাতার

বাহিরে কোনও স্থানে হাসপাতাল হইলে তিনি তাহা ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করিতে পারিবেন না। দূরবর্তী কোনও স্থানে হাসপাতালটির তত্ত্বাবধান ও উন্নতিসাধনও সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, বিধানচন্দ্র চাহিতেছিলেন যে, হাসপাতালটি শহরের কাছেপিঠে হইলে হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করা না গেলেও রোগীর বাড়ির লোকেরা হাসপাতালে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারিবেন, কিভাবে রোগীর চিকিৎসা, দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করিতে হয়। বিধানচন্দ্র বলিয়াছেন : "In fact, I regarded the hospital as a laboratory for the training of persons who were unfortunate enough to have a tuberculosis patient in their house" এই সকল দিক্ চিন্তা করিয়া তিনি যাদবপুরকেই যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান মনে করিলেন। ঐ স্থান নির্বাচনের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে রোগীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিশ্রাম পাইবে, প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু এবং ভালো খাবার পাইবে, যেগুলি ঐই রোগের চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ। তখনকার দিনে এই রোগের চিকিৎসার জন্য কোনও বিশেষ ঔষধ (specific drugs) ছিল না। রোগীর অবস্থানুসারে অনুমানের ভিত্তিতে চিকিৎসা করা হইত।

যুবকের সম্পত্তি হইতে সংগৃহীত দুই লক্ষ টাকার অধিকাংশই যাদবপুরে জায়গা কেনা, নার্সদের থাকিবার কোয়ার্টার এবং চারিটি রোগী থাকিবার জন্য এককক্ষবিশিষ্ট পৃথক চারিটি গৃহাংশ নির্মাণেই ব্যয় হইয়া গেল। এখন হাসপাতাল চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সমস্যা দেখা দিল। হাসপাতালে চারিজন রোগীর পথ্য, ঔষধ, নার্স প্রভৃতির বেতন ইত্যাদিতে মাসে হাজার টাকা করিয়া লাগিতেছিল। ট্রাস্টের হাতে টাকা না থাকায় বিধানচন্দ্রকে রোগীদের মাসিক খরচ নিজ উপার্জন হইতে যোগাইতে হইল। তিনি প্রতিদিন একবার, প্রয়োজন হইলে দুইবার, হাসপাতালে নিয়মিত যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিধানচন্দ্র যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া তাঁহাদের মতামত লইতে লাগিলেন। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় জলবায়ু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে তিনি সকলকেই প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই লিখিলেন যে, বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু এবং সুচিকিৎসা জলবায়ুর অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিধানচন্দ্র এই হাসপাতালে একশত রোগীর চিকিৎসা করিয়া সুফল পাইলেন এবং এই ফলাফলের কথা ঘোষণা করিয়া তিনি সংবাদপত্রে জনসাধারণের কাছে একটি আবেদন প্রচার করিলেন। পরদিন সকালে একজন ভদ্রলোক বিধানচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি সংবাদপত্রে বিধানচন্দ্রের আবেদন পড়িয়াছেন এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব খরচ তিনি যোগাইবেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার আর্থিক অবস্থা

ভালো, তাঁহার কোনও নিকট-আত্মীয় নাই, একমাত্র যে ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল সে যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। তাই তাঁহার উপার্জিত অর্থ তিনি এই হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসায় ব্যয় করিতে চাহেন। এইভাবে বিধানচন্দ্র একটি দুর্বহ আর্থিক বোঝা হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু এই হাসপাতালের উন্নয়নে তিনি নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কুমুদশংকর রায় স্বেচ্ছায় এই হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসার দিক্ হইতেও বিধানচন্দ্র রেহাই পাইলেন। ডাঃ কুমুদশংকর এই হাসপাতালের উন্নয়নে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করায় বিধানচন্দ্রের একক চেষ্টায় মাত্র চারিটি শয্যা লইয়া একদিন যে ক্ষুদ্র হাসপাতালের সূচনা হইয়াছিল, তাহাই একদিন বিখ্যাত যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে পরিণত হইল। তাহার শয্যাসংখ্যা সাড়ে ছয় শত হইল। কার্শিয়াংয়ে তাহার একটি শাখাও খোলা হইল। এই হাসপাতালের জন্য কুমুদশংকরের প্রাণপাত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ ত্যাগের ফলে বর্তমানে এই হাসপাতাল তাঁহার নামেই নামাঙ্কিত হইয়াছে। যখন ভারতবর্ষে কোন যক্ষ্মা হাসপাতাল ছিল না বলা চলে, তখন বিধানচন্দ্রের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টাতেই যে এই অতিপ্রয়োজনীয় একটি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে মানবদরদী বিধানচন্দ্রের অন্যতম অমরকীর্তি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কথাও বলিতে হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নারী ও শিশুদের কল্যাণকল্পে একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া তাহার হস্তে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি দান করিয়া যান। কিন্তু এ বিষয়ে এই ট্রাস্ট কিছু করিবার পূর্বেই দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অকস্মাৎ দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণ ঘটে। নারী ও শিশুর কল্যাণসাধনকল্পে চিত্তরঞ্জন তাঁহার জীবদ্দশায় নিজে কিছু পরিকল্পনা করিয়া যান নাই। তাই তাঁহার মৃত্যুর পর চিত্তরঞ্জন-প্রদত্ত দান কিভাবে সদ্ব্যয়িত হইবে সে সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিল। ঐ দান হইতে প্রাপ্ত অর্থে নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপনই অধিকাংশের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বিধানচন্দ্র বলিলেন যে, এই দরিদ্র দেশে নারী ও শিশুদের জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল স্থাপনেই নারী ও শিশুদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। পরাধীন ভারতে এই জাতীয় হাসপাতালও আর ছিল না। মহাত্মা গান্ধীও এ বিষয়ে বিধানচন্দ্রের মত সমর্থন করিলেন। গান্ধীজীর প্রেরণায় এবং বিধানচন্দ্রের নেতৃত্বে স্ত্রীলোকদের জন্য একটি হাসপাতাল এবং স্ত্রীলোকদের নার্সিং শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই উদ্দেশ্যে দেশবাসীর কাছে একটি আবেদনও প্রচার করা হইল। আবেদনে চমৎকার সাড়া মিলিল। ভারতের সকল প্রান্ত হইতে মানুষ মুক্তহস্তে দান করিলেন। এইভাবে আট লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হইল। ঐ অর্থ হইতে কিছু দেনা শোধ করিবার জন্য দুই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইল এবং

১৩৩৩ সালের ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, ১৯২৬) উক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইল। উদ্বোধন করিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। হাসপাতালের নাম হইল চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। ইহার পরিচালনভার ন্যস্ত হইল বিধানচন্দ্রের উপর। তিনিই হইলেন ইহার সেক্রেটারি। ঐ পদে বিধানচন্দ্র ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সময় পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-সংস্থায় পরিণত করিয়াছিলেন।

২৩টি মাত্র শয্যা লইয়া এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার শয্যা-সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে উহার শয্যা-সংখ্যা ছিল স্ত্রীলোকদের জন্য ২৬১ এবং শিশুদের জন্য ৬০। পরে এই শয্যা-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই হাসপাতালের বহির্বিভাগ (Outdoor) খোলা হয়। ঐ বৎসরে ১৫,৯৯৪ জন রোগিণী বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে বহির্বিভাগে চিকিৎসিত রোগিণীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭,০৭৮।

গোড়া হইতে দুটি কেবিনও ছিল। তাহার জন্য রোজ পিছু মাত্র সাড়ে তিন টাকা লওয়া হইত। ১৯৬০ সালে কেবিনের সংখ্যা দাঁড়ায় তেরো। স্ত্রীলোকদের ২৬১-টি শয্যার মধ্যে ১৬৮টির জন্য কোনও টাকা-পয়সা দিতে হইত না। ১৩টি কেবিনসহ বাকী ৯৩টি শয্যার জন্য অল্পকিছু টাকা দিতে হইত। গোড়া হইতেই এখানে বিনা ফীতে পরামর্শ দেওয়ার এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

হাসপাতাল যতই সম্প্রসারিত হইতেছিল, ইহার ব্যয়ভারও ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য বিধানচন্দ্রকে সতত চিন্তিত থাকিতে হইত। ঐ সময়ে দেশ পরাধীন থাকায় সরকারী সাহায্য পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না, তাই বিধানচন্দ্রকে প্রধানতঃ দেশবাসীর দানের উপরই নির্ভর করিতে হইত। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে আবেদন প্রচার করেন, তাঁহাতে তিনি বলেন: "দেশের মানুষ যদি দেহে ও মনে সুস্থ ও সবল না হয়, তবে স্বরাজ স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। তাহাদের মাতারা যদি স্বাস্থ্যবতী না হন, শিশুর ঠিকমত প্রতিপালন সম্পর্কে যদি তাঁহাদের জ্ঞান না থাকে, তবে তাহারা কখনই সুস্থ ও সবল হইতে পারিবে না। আপনারা কি আপনাদের কানাকড়ি দিয়া জাতিকে পুনর্জীবন লাভে সাহায্য করিবেন না?" বছরের পর বছর বিধানচন্দ্র এই ধরনের আবেদন প্রচার করিতেন। দেশবাসী মুক্তহস্তে তাঁহার এইসব আবেদনে সাড়া দিলেও সেবাসদনের অর্থসমস্যা মিটিত না। মাঝে মাঝে বিধানচন্দ্র রেড ক্রশ সোসাইটির ন্যায় ১লা বৈশাখে সেবাসদনের প্রতিষ্ঠা দিবসে (Flag day) সেবাসদনের সাহায্য তহবিল পূর্ণ করিবার জন্য কুপন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন। কোন সমস্যাই কোনদিন বিধানচন্দ্রের অদম্য উত্তমকে স্তিমিত করিতে পারে নাই। সেবা-

সদনের চিরন্তন অর্থসমস্যাও না। মাঝে মাঝে অর্থ-সংগ্রহের জন্য বিধানচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হইতেন এবং তাঁহাকে দিয়া জনসভা করাইয়া সেবাসদনের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। শহরের বড় বড় হলে—যেমন ওভারটুন হল, ওয়াই. এম. সি. এ হল, অ্যালবার্ট হল, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল—সভার ব্যবস্থা করা হইত এবং সভায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তৃতা শোনার জন্য চারি আনা করিয়া ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ হইত। নলিনীরঞ্জন সরকার সেবাসদনের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি যখন বাংলার প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখনই কেবল বিধানচন্দ্র সর্বপ্রথম সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। নতুবা সর্বদাই তিনি দেশবাসীর অকৃপণ দানের উপরই নির্ভর করিতেন। তাঁহার সেই নির্ভরশীলতা কখনও ব্যর্থ হয় নাই। তিনি নিজেও ছিলেন যেমন মহৎ, ভারতবাসীর মহত্ত্বেও ছিল তাহার তেমনি অগাধ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস।

১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে পর্দাপ্রথা ও কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই তাহারা হাসপাতালে যাইতে চাহিত না। কুসংস্কার ও অজ্ঞতার জন্য তাহাদের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় বিশ্বাসও ছিল না। কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ায় এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকের ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় সেই কুসংস্কার এবং অজ্ঞানপ্রসূত অবিশ্বাসও ক্রমেই দূর হইল। সেবাসদন অল্পকালের মধ্যেই স্ত্রীলোকদের উপযুক্ত একটি হাসপাতাল বলিয়া গণ্য হইল—যেখানে স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ মানসম্ভ্রম লইয়া নিরাপদে চিকিৎসিত হইতে পারে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক ও শিশুরা চিকিৎসিত হইতে লাগল। এখানকার শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়া বহু স্ত্রীলোক উপযুক্ত নার্স হইয়া নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হইল। মেয়েদের মধ্যে নার্সের পেশা গ্রহণ সম্পর্কে যে দ্বিধা ও কুসংস্কার ছিল, তাহাও ধীরে ধীরে তিরোহিত হইল।

গোড়ার দিকে সেবাসদনে স্ত্রীলোকদের স্ত্রীরোগসমূহ সম্পর্কেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিধানচন্দ্রের চেষ্টায় অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও করা হইতে লাগিল। ক্যানসার রোগের চিকিৎসা তখনও শৈশবাবস্থায় ছিল। এই চিকিৎসার ব্যাপারে ডাঃ রায় এখানে 'রেডিয়াম থেরাপি' প্রবর্তন করিলেন। ঐ সময়ে রেডিয়ামের সাহায্যে চিকিৎসা বোম্বাই ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না। ডাঃ রায় সেবাসদনে রেডিয়াম চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেবাসদনের বিভিন্ন বিভাগে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা হইতেছিল। ঐ সময়ে ডাঃ রায়ের চেষ্টায় স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেরই এখানে ক্যানসার রোগের চিকিৎসার

ব্যবস্থা করা হইল। কারণ, ঐ সময়ে ক্যানসার রোগের বিস্তার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এজন্য ডাঃ রায় স্ত্রী ও পুরুষের কেবল ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন। ফলে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপিত হইল। তখন ডাঃ রায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই এই ক্যানসার হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষার জন্যও অনুমোদন দেন। ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত এই সংস্থার সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁহাব অসংখ্য কাজের মধ্যেও সেবাসদন তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই।

বিধানচন্দ্র কেবল পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসাদানের বেসরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহাতে শিক্ষাদান করিয়া, বেসরকারী হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়সমূহ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দেশে চিকিৎসাবিদ্যার মান যাহাতে উন্নত হয়, সেজন্য সর্বদাই চেষ্টা করেন। ইংরেজ-শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষাদানে এবং হাসপাতালসমূহের পরিচালনায় ইংরেজ প্রভুদেরই কর্তৃত্ব ছিল। এজন্য বৃটিশ সরকার আই. এম. এস. নামে এক উচ্চপদস্থ চিকিৎসক শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আই. এম. এস.-এ দুই-চারিজন ভারতীয় স্থান পাইলেও ইউরোপীয়রাই এই সকল উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন; উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় চিকিৎসকদেরও তাঁহাদের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতে হইত। ডাঃ রায়ের নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। ভারতীয়রা যাহাতে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতব শিক্ষার অধিকারী হইতে না পারে, সেজন্য এই আই. এম এস -শ্রেণীভুক্ত ইংরেজরা সতত নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিত। বিধানচন্দ্র সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে এফ আর. সি এস ও এম আর সি পি. উপাধি লাভের জন্য ভর্তি হইবার সময়ে ইহারাই প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংলণ্ডের জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল ইহাদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চিকিৎসাবিদ্যার মান অনুন্নত বলিয়া ঘোষণা করিয়া একদিকে যেমন ভারতীয়দের উচ্চতর শিক্ষালাভে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছিল, তেমনি ভারতের বাহিরে তাহাদের প্র্যাকটিস করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল। এই সকলের বিরুদ্ধে ডাঃ রায় তীব্রভাবে আন্দোলন চালাইতে থাকেন এবং আই এম. এস.-শ্রেণীভুক্ত ডাক্তারদের কার্যকলাপের নিন্দা করেন। সৈন্যবাহিনীতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, ইউরোপীয় ডাক্তাররাই তাহাদের চিকিৎসা করিবে। ডাঃ রায় বলেন: ইউরোপীয় সৈনিকরা না হয় ইউরোপীয় ডাক্তারদের হাতে চিকিৎসিত হইল, কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে যে ৫০,০০০ ভারতীয় সৈনিক আছে, তাহাদের ভারতীয় ডাক্তারদের হাতে চিকিৎসিত হইতে ক্ষতি কি? ভারতীয় ডাক্তারদের শিক্ষা ও নৈপুণ্যের মান নিম্ন বলিয়া বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী

যে প্রচার চালাইতেছিল এবং ভারতীয় ডাক্তারদের তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে যেভাবে বঞ্চিত করিতেছিল, ডাঃ রায় তাহা তাহার বিভিন্ন বক্তৃতায় তুলিয়া ধরেন। ভারতীয় ডাক্তাররা তাঁহাদের দাবি-দাওয়া তুলিয়া ধরিবার জন্য যে অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়াছিলেন, তিনি তাহারও সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ভারতে তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যা এবং চিকিৎসকদের দুরবস্থার জন্য তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদেরই দায়ী করেন। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী চিকিৎসকদিগকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানান। ডাক্তাররা প্রায়ই রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেন এবং রাজনীতিকে সংশয়ের চক্ষে দেখিতেন। তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের লাহোর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেন :

"It has been asked whether a member of the medical profession should interest himself in any matter outside his professional life, whether this Association should take up matters which, in common parlance, are dubbed political. Gentlemen, I have very definite views on this question. In India, we have never regarded the various aspects of life as being in separate water-tight comparts; politics technically so called, is intermixed with economic, social and medical problems. If politics means the science of organization for the purpose of securing the greatest good for the largest number, we, members of the medical profession dare not keep away from politics."

ডাঃ রায়ের কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দুই-ই ছিল জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। যে দেশের মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ঔষধ কিনিতে পারে না, চিকিৎসকের সাহায্য লইতে পারে না—সেই পরাধীন দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি কিভাবে হইতে পারে? পরাধীন দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসকের ভবিষ্যৎ কোথায়? সুতরাং পরাধীন ভারতে রাজনীতি, সমাজ ও চিকিৎসা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই মানবকল্যাণে নিয়োজিতপ্রাণ বিধানচন্দ্র যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবেন, তাহাই ছিল স্বাভাবিক।

স্মরণীয়, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই লাহোরে ভারত তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করিয়াছিল।

১১

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ

ডাঃ বিধান রায়ের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন কংগ্রেসে গান্ধী-যুগের পঞ্চম বৎসর। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদের পাথী হইয়াই তিনি প্রকাশ্যে প্রথম রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিলেন, কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার মনের গতি রাজনীতির দিকে যাইতেছিল। পরাধীন দেশের রাজনীতি যে স্বাধীন দেশের রাজনীতি অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহা তিনি জানিতেন। কেননা পরাধীন দেশের রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল—শক্তিশালী বিদেশী শাসকমণ্ডলী হইতে ন্যায্য অধিকার আদায় করা; সে অধিকার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের অধিকার। ইহা যে কঠিন কাজ তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ ছিল বলিয়াই তাঁহার মন সেই কষ্টসাধ্য কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। যে রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁহার মানসিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, উহার কতক বর্ণনা এস্থলে আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। সেই বর্ণনা হইল কংগ্রেসে গান্ধী নেতৃত্বের গোড়ার কথা। তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী-যুগ আরম্ভ হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) চলিতেছিল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের বিশ বৎসর কাটিয়া গেল দক্ষিণ আফ্রিকায়—লাঞ্ছিত অসহায় প্রবাসী ভারতীয়গণের সেবায়। তথায় তাঁহার পরিচালিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক অর্ডিন্যান্স বাতিল করার মধ্য দিয়া। সেই বৎসরই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, যেহেতু তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, স্বদেশে থাকিয়াই দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। তাঁহার মতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার কর্তব্যকার্য সম্পন্ন হইয়াছে; অবশিষ্ট কার্য তথাকার ভারতীয়গণ সম্পাদন করিতে পারিবেন। পরের বৎসর গান্ধীজী লোক-সেবার উদ্দেশ্যে আমেদাবাদের একটা গ্রামে আশ্রম স্থাপন করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১৯১৭ খ্রীঃ) সেই আশ্রম স্থানান্তরিত হয় শবরমতিতে।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অন্যতম স্মরণীয় অবদান। বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবরা চাষীদিগের উপর নানভাবে জোর-জুলুম ও

অত্যাচার-অবিচার করিতেন। গান্ধীজীর প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ অভিযান পরিচালিত হইল তাঁহাদের বিরুদ্ধে। বিদেশী সরকার এবং তদাশ্রিত ইংরেজ নীলকর উভয়ে মিলিয়া প্রবল ভাবে সে অভিযানের বিরোধিতা করেন। চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবদের অধ্যুষিত অঞ্চলে যাইয়া তিনি কৃষকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবেন এবং তাহাদের নিকট যথার্থ বিবরণ জানিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এপ্রিল মাসে গান্ধীজী প্রথমে মজঃফরপুর শহরে পৌছেন এবং অধ্যাপক জে. বি. কৃপালনীর গৃহে তাঁহার অতিথিরূপে বাস করেন। সেখানে বিহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মজঃফরপুর হইতে তিনি গেলেন চম্পারণ জেলার সদর মতিহারীতে। তথা হইতে দলবলসহ যাত্রা করিলেন গ্রামাঞ্চলে। অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করার পূর্বেই গান্ধীজীর উপর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইল। তিনি পরবর্তী ট্রেনে চম্পারণ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। সেই আদেশ মানিবেন না বলিয়া গান্ধীজী জানাইয়া দেন। সঙ্গের সহকর্মীদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে যাইয়া অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করিতে উপদেশ দিয়া তিনি মতিহারী শহরে ফিরিয়া আসিলেন। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে তিন দিন পরে মতিহারীর সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে তাঁহার বিচার হইবে বলিয়া সমন জারী করা হইল। বিচারের দিন এবং পরদিন সেখানে গেলেন—মিঃ পোলক, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, মৌলানা মজহরল্ হক (ব্যারিস্টার), ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ (বিহার সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) এবং বিহারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাহারা সকলে মিলিয়া একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, গান্ধীজীর কারাদণ্ড হইলে তাঁহার আরব্ধ কর্ম তাঁহারা সম্পন্ন করিবেন। তজ্জন্য একটি কার্যক্রম রচিত হইল। শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

সমন জারীর তৃতীয় দিবসে গান্ধীজীর বিচার হইল। তিনি অভিযোগ স্বীকার করিলেন এবং এক লিখিত বিবৃতি বিচারালয়ে দাখিল করিয়া জানাইয়া দিলেন—কি কারণে তিনি নিষেধাজ্ঞা মানেন নাই। বিচারের দিন আদালতের প্রাঙ্গণে এবং নিকটবর্তী স্থানে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বিরাট জনতার বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চল হইতে আগত কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি সাধারণ জন। অভিযোগ স্বীকার করা সত্ত্বেও রায়দান স্থগিত রহিল। তৃতীয় দিবসে সংবাদ আসিল যে, বিহার সরকার গান্ধীজীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করিয়াছেন। অধিকন্তু জেলা-কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে সরকারী নির্দেশ আসিয়াছে—যেন গান্ধীজীর তদন্তকার্যে সর্বপ্রকার সম্ভবপর সাহায্য করা হয়। সরকারের তরফ হইতেও একটি তদন্ত-কমিটি নিয়োগ করা

হইল। মধ্য প্রদেশের গভর্নর মিঃ স্লাই চেয়ারম্যান এবং গান্ধীজী সদস্য মনোনীত হইলেন। মাত্র একপক্ষ কালের মধ্যে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম যেন দ্রুত সংঘটিত নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জয়যুক্ত হইল। নিপীড়িত প্রজাগণের মন হইতে ভয় দূর হইয়া গেল। তাহারা নীলকর সাহেবদের জোর-জুলুম এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার মতো মনোবল পাইল। বেগতিক দেখিয়া নীলকর সাহেবরা তল্পিতল্পা গুটাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

চম্পারণ সত্যাগ্রহে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী-যুগের প্রবর্তন হয়। গান্ধীজীর পরবর্তী দুইটি অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল খয়রায় কৃষকগণের পক্ষে এবং আমেদাবাদে কাপড়ের কলে শ্রমিকদিগের অনুকূলে। এই তিনটি সফল সত্যাগ্রহের অভিযানে তাঁহার সুখ্যাতি ভারত ও বহির্ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এতদিন কংগ্রেস কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের শরিক করিতে পারে নাই। এই সকল সত্যাগ্রহের দ্বারা গান্ধীজী তাহার সূচনা করিলেন। ভারতের গণচিত্তে তিনি যে আসন পাইলেন, তাহা ইতঃপূর্বে আর কোন নেতা পান নাই। এদেশে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ যে মহাত্মা গান্ধী, সেই ঐতিহাসিক সত্য গান্ধী-বিরোধীরাও অস্বীকার করিতে পারেন না।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘোষিত হইল। পরের বৎসর জুলাই মাসে বোম্বাইয়ে সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হইল, তাহাতে প্রস্তাবিত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান হয়। সেই অধিবেশনের পরে ওই বৎসরই দিল্লীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। তাহাতে নরমপন্থী (মডারেট) দল যোগদান করে নাই। এতকাল ভারতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ছিল নরমপন্থী নেতাদেরই হাতে। তাঁহারাই ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু জাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহারা আর চলিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের কংগ্রেস ছাড়িয়া যাইতে হইল। ইতোমধ্যে রাউলাট কমিটির (সিডিশান কমিটির) সুপারিশ অনুসারে জনগণের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে (কেন্দ্রীয় আইনসভায়) নূতন দমনমূলক আইন পাস হইয়া গেল। সেই আইনের বলে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের অজুহাতে ভারতবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায্য অধিকার হরণ করা হইল। প্রতিবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল প্রভৃতি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যগণ পদত্যাগ করিলেন। পূর্বোক্ত দিল্লী অধিবেশনে সেই আইন প্রত্যাহার করার দাবি জানান হইল। আর একটি প্রস্তাবে যুদ্ধান্তে ইউরোপে যে শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে ভারতের

নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের দাবি জানান হইল এবং লোকমান্য তিলক, গান্ধীজী ও মিঃ সৈয়দ হাসান ইমামকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হইল। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইল—যুদ্ধের ব্যয়-ভার হইতে ভারতকে অব্যাহতি দিবার দাবি জানাইয়া।

কংগ্রেসে গান্ধী-যুগ প্রবর্তিত হওয়া অবধি কংগ্রেসপন্থীরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন সংগ্রামের পথে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। ৩০শে মার্চ রাওলাট আইনের প্রতিবাদে হরতাল পালনের জন্য গান্ধীজী সমস্ত জাতিকে আহ্বান করেন। বিশাল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় জনগণ সাড়া দিল সেই আহ্বানে। দিল্লীতে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিস গুলি চালায়, ফলে অনেকে হতাহত হইল। প্রতিবাদে পুনরায় হরতাল পালন করা হইল ৬ই এপ্রিল। ওই দিন অমৃতসরে পুলিস জনতার উপর গুলি চালাইলে বহু লোক হতাহত হইল। পাঁচদিন পরে জেনারেল ডায়ারের উপর ন্যস্ত হইল তথাকথিত শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত অন্যূন দশ সহস্র নিরস্ত্র হিন্দু মুসলমান ও শিখ নরনারী ও শিশুর উপর ডায়ারের আদেশে সৈন্যগণ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করিল। পুরুষের সঙ্গে নারী শিশু ও বৃদ্ধ শত শত ভারতবাসী নিহত হইল, যাহারা আহত হইয়াও প্রাণ হারায় নাই তাহাদের সংখ্যাও শত শত, ওই নৃশংস বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ভারত ঘৃণায় ও বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। সেই বৎসরই অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। পাঞ্জাবে হত্যাকাণ্ড এবং নিগ্রহ-নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হইল এবং সেই সংস্রবে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ডকে অভিযুক্ত করার এবং বিলাতে তলব করার দাবি জানান হইল। অন্য এক প্রস্তাবে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার অগ্রাহ্য করা হইল। অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীজীর অপূর্ব লোকপ্রিয়তার পরিচয় মিলিল বিরাট জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন হইতে।

পর বৎসর (১৯২০ খ্রীঃ) পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ির সন্নিকটে পূর্বাদকস্থ বৃহৎ উদ্যানে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। তাহাতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই আন্দোলনকে সফল করার জন্য যে কার্যক্রম গৃহীত হইল, তাহাতে ছিল— আইনসভা বর্জন, সরকার-প্রদত্ত খেতাব, সরকারী দরবার এবং সরকারী ও আধা-সরকারী অনুষ্ঠানাদি বর্জন, স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদান, আদালত বর্জন ও সালিসী আদালত গঠন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধী যে ভারতের অবিসংবাদী নেতা, উহার প্রকাশ্য স্বীকৃতি হইল সেই অধিবেশনে। ডাঃ রায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান

করেন। বিরাট সভামণ্ডপে সমবেত বিশ-পঁচিশ হাজার নরনারী—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি ও দর্শক—যেভাবে ওই মহান নেতাকে অভিনন্দিত করিলেন, তাহা দেখিয়া ডাঃ রায় বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে ইতঃপূর্বে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি ওই পর্যন্ত বিগত ৩৪ বৎসরের মধ্যে কোন দেশনায়ক জনগণের নিকট হইতে এমন আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পান নাই। অল্পকালমধ্যেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের সবশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটিল। এতকাল কংগেস ছিল ধনী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংস্থা। তিনি ইহাকে রূপান্তরিত করিলেন সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রতিষ্ঠানে। জেলা, মহকুমা এবং থানা বা গ্রাম ও গ্রামাঞ্চলে কংগেস কমিটি স্থাপিত হইল। এইভাবে কংগেস সুসংহত ও সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। সেই বৎসরই কংগ্রেসের ৩৫তম অধিবেশন হইল নাগপুরে বিজয়রাঘব আচারিয়ার সভাপতিত্বে। চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে 'দেশবন্ধু') ও লালা লাজপত রায় গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সমর্থন করায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি আলোচ্য অধিবেশনে পুনরায় অনুমোদিত হইল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রেরও আমূল পরিবর্তন ঘটিল। গান্ধীজী সমগ্র জাতিকে আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল দেশের অগণিত মুক্তিকামী নরনারীর নিকট হইতে।

পরের বৎসর (১৯২১ খ্রীঃ) আমেদাবাদে হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসিল, তাহাতে গান্ধীজীকে আন্দোলন পরিচালনার্থ সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মাত্র চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি জাতির কিরূপ বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। ভারতে অহিংস পন্থায় রাজনৈতিক সংগ্রাম এই প্রথম। সেই অভিনব পন্থার প্রদর্শকও গান্ধীজী। তিনিই সবপ্রথম পাইলেন একনায়কত্বের ক্ষমতা—যাহা কংগ্রেসের জন্মাবধি আর কোন নেতা ইতঃপূর্বে পান নাই। আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল সমগ্র ভারতবর্ষে। লক্ষাধিক নরনারী কারাবরণ করিলেন। বিদেশীরাজের নিগ্রহ-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগেও আন্দোলন মন্দীভূত হইল না। কিন্তু অকস্মাৎ সর্বাধিনায়কের নিকট হইতে আদেশ আসিল যুদ্ধ-বিরতির। সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল। গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে পুলিসবাহিনীর আক্রমণে বিপুল জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং পালটা আক্রমণ চালাইয়া একজন দারোগা ও একুশ জন কনস্টেবলকে পুড়াইয়া মারে। ইহাতে গান্ধীজীর উপর যে প্রতিক্রিয়া হইল, তাহারই ফলে তিনি দেশ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উপযুক্ত হয় নাই যুক্তি দিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎকালে এই বিশাল দেশে এই নূতন আন্দোলন চলিতেছিল বর্ষা-সমাগমে বন্যা-প্লাবনের দুর্নিবার স্রোতের মতো। কিন্তু এইভাবে

আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য সত্যাগ্রহী সৈন্যের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইল। নেতৃবর্গের অনেকেই গান্ধীজীর এই আদেশকে অসমীচীন বলিয়া প্রতিকূল সমালোচনা করিলেন। তাঁহাদের মতে, ভারতবর্ষের ন্যায় একটা বিরাট দেশে কোন অঞ্চলে সাময়িক উত্তেজনার মুখে অল্পসংখ্যক লোক যদি হিংসার পথ অবলম্বন করে এবং সেই হেতুতে যদি আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তবে কোনকালেই তাহা চালানো সম্ভবপর হইবে না। পরে গান্ধীজীও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি ভুল করিয়াছেন। সেই ভুলকে তিনি 'Himalayan blunder' অর্থাৎ হিমাদ্রি-প্রমাণ ভুল বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। সাধারণ নেতারা কখনও এইরূপ ক্ষেত্রে নিজের ভুল স্বীকার করেন নাই, পাছে যদি বা নেতৃত্বের পদ হইতে অপসারিত হইয়া যান। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ নেতা। তাঁহার পন্থা এবং নীতি ছিল অসাধারণ। তাঁহার ওই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া যে সৎসাহস প্রকটিত হইল, তাহাতে গান্ধী নেতৃত্বে জনগণের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন হইল গয়াধামে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কলিকাতায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দণ্ড ভোগ করার কালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। দণ্ডকাল শেষ হইবার পরেই কংগ্রেসের অধিবেশন। তিনি গয়া গিয়া সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। অপর এক প্রস্তাবে দেশের শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা স্থির হইল এবং তজ্জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। দেশবন্ধু মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারকে সংশোধন কিংবা সংহার করার উদ্দেশ্যে (to mend or end) আইনসভায় প্রবেশের প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন এবং চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী উহার বিরোধিতা করিলে দেশবন্ধুর প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, এন. সি. কেলকার প্রমুখ নেতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী দল গঠন করিলেন। সেই বৎসরই মার্চ মাসে গান্ধীজীকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গেপ্তার করা হইল। তিনি সত্যাগ্রহের নীতি অনুসরণ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন না। বিচারে তাঁহার প্রতি ছয় বৎসরের কারাদণ্ড ভোগের আদেশ হইল। পরে গান্ধীজী কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় দণ্ড-ভোগের দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে মুক্তি পাইলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল মৌলানা আবুল কালাম

আজাদের সভাপতিত্বে। তাহাতে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, এন. সি. কেলকার্-প্রস্তাবিত আইনসভায় প্রবেশের নীতি পুনরায় আলোচিত হইল। সেই নীতির সমর্থক নেতৃবর্গ বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আইনসভায় প্রবেশ করিবেন না; তাঁহারা আইনসভায় প্রবেশ করিয়া নব-প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনব্যবস্থার (Diarchy) সংস্কার করিবেন, আর যদি তাহা সম্ভবপর না হয় তবে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া উহাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিবেন। ইহাও একপ্রকার অসহযোগ। তাই স্বরাজ্য দলকে আইনসভায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। যদিও গান্ধীজী আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। স্মরণীয়, ঐ সময় তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। সেই বৎসরের শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে নির্বাচন হইল, তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্বরাজ্য দল জয়ী হইল।

বৎসর তিনেক পূর্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিল বয়কটের বা আইনসভা বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর নরমপন্থী দলের এবং বিদেশী সরকারের কায়েমী সমর্থক 'জো-হুকুম' দলের আইনসভায় প্রবেশের সুবর্ণসুযোগ জুটিয়াছিল। সেই সুযোগের পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন উভয় দলই। তৎকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ এতটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল যে, অধিকাংশ দেশবাসী দুইটি দলের মধ্যে কোন পার্থক্য জানিতেন না। বস্তুতঃপক্ষে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাবের এমন অধোগতি হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে সরকার-ঘেঁষা বলিয়া গণ্য করা হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি ছিলেন বয়কট আন্দোলনের পুরোভাগে। সে-কালে তিনি এতটা জনপ্রিয় ছিলেন যে, দেশবাসী তাঁহাকে বাংলার অনভিষিক্ত রাজা ('Uncrowned King of Bengal') বলিতেন। একদা দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনে তাঁহার অবদান এত বেশী ছিল যে, তিনি 'রাষ্ট্রগুরু' বলিয়া অদ্যাবধি অভিহিত হইতেছেন। কংগ্রেসের স্রষ্টাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে তাঁহার সেই সংগ্রামী চেতনা হারাইয়াছিলেন, তিনি তখন ইংরাজঘেঁষা নরমপন্থীদের নেতা হইয়াছিলেন। তাই মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীতে সুরেন্দ্রনাথকে আসন দেওয়া হইল। বেতন ধার্য হইল বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা। এইজন্য দেশের লোক সে-কালের মন্ত্রীদের বলিত 'চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী'। অপর এক মন্ত্রী মনোনীত হইলেন প্রভাসচন্দ্র মিত্র—যিনি রাউলাট কমিটির সদস্যরূপে কুখ্যাত হইয়াছিলেন। তৃতীয় মন্ত্রীর পদ পাইলেন নবাব নবাবালি চৌধুরী। যে শাসনসংস্কার কংগ্রেস গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে, উহাকে চালু করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী

সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করায় সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য নরমপন্থী নেতার বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে জোরালো প্রচার চলিতে লাগিল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে 'চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী' সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার সদস্যপদের প্রার্থী হইলেন। ভোটযুদ্ধের রণাঙ্গন হইল উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী প্রবীণ জননায়কের প্রতিপক্ষ হইলেন রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। 'শতযুদ্ধের বীর যোদ্ধা'র বিরুদ্ধে বিধানচন্দ্র স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে দাঁড়াইলেন। স্বরাজ্য দল আইনসভায় প্রবেশের জন্য কংগ্রেসের অনুমতি পাইবার পূর্বেই ডাঃ রায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশে স্থির করিয়াছিলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে তিনি প্রতিযোগিতা করিবেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত গবর্নমেন্টের বিরোধ চলিতেছিল। আশুতোষের ইচ্ছা ছিল বিধানচন্দ্রের মত একজন তেজস্বী, স্পষ্টবাদী, কর্মদক্ষ, বিতর্কবিদ যোদ্ধা আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হউন। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট উপকার হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদের (Senate-এর) নির্বাচিত সদস্যরূপে বিধানচন্দ্র কয়েক বৎসর যাবৎ যেভাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে আশুতোষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নির্বাচকমণ্ডলী বাছিয়া লইবার ব্যাপারে বিধানচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন বিশিষ্ট সদস্যের উপদেশ পাইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া ডাঃ রায়ের পক্ষে দুঃসাহসিকতার কাজ হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কেননা স্বরাজ্য দলের প্রচারের ফলে সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পাইলেও তখনও তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। কিন্তু বিধানচন্দ্রের ঘটনাবহুল জীবনের কার্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কার্য দুঃসাহসিক বলিয়া তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। দেশবন্ধুর সঙ্গে স্বরাজ্য দলে যোগ দিয়া মনোনয়ন লওয়া সম্পর্কেও তাঁহার আলোচনা হইল। তিনি দেশবন্ধুকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, স্বরাজ্য দল নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় নামিবার পর হইতেই তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে ভোটদাতাদের কাছে যাতায়াত করিতেছেন এবং সেইভাবে প্রচারকার্যও চালানো হইতেছে। সুতরাং সেই অবস্থায় যদি তিনি স্বরাজ্য দলে প্রকাশ্যে যোগদান করেন, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের দল প্রচার করিবার সুযোগ পাইবে। এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার কোন কারণ দেশবন্ধু দেখিতে পান নাই। উভয়েই বিশিষ্ট ব্রাহ্মপরিবারের সন্তান বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে জানাশুনা আগে হইতেই ছিল। বিধানের প্রতিভা, তেজস্বিতা, স্বদেশসেবার আগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যরূপে কার্যাদি সম্বন্ধে দেশবন্ধু সবিশেষ অবগত ছিলেন। আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যে স্বরাজ্য দলের বিপক্ষে যাইবেন না কিংবা

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন না, তাহাও দেশবন্ধুর অজানা ছিল না। অতএব দেশবন্ধু স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে প্রকাশ্যভাবেই বিধানচন্দ্রকে সমর্থন করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর (১৩৩০ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ) ভোট গণনার ফলাফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে, একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেন্দ্রনাথকে বহু ভোটে পরাজিত করিয়া বিধানচন্দ্র জয়লাভ করিয়াছেন। পরের দিনের (১লা ডিসেম্বর) অমৃতবাজার পত্রিকায় সেই সংবাদ প্রকাশিত হইল এই শিরোনামায়

"Sir Surendra Nath Banerjee Defeated

"An object lesson to supporters of Bureaucracy

"Dr Bidhan Chandra Roy Elected

"People's Victory at Barrackpur"

এই শিরোনামা ছিল গোটা পৃষ্ঠা জুড়িয়া। সেই সংবাদে ছিল—মোট ১১,৬৬০ জন ভোটারের মধ্যে ৮০২৯ জন ভোট দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫৮টি ভোট অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিধান রায় পাইয়াছেন ৫৬৮৮ ভোট এবং সুরেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন ২২৮৩ ভোট। ভোট-গণনার ফলাফল জানিবার জন্য আলিপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের প্রাঙ্গণে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে বিরাট জনতা অপেক্ষা করিতেছিল। বিধানচন্দ্রের জয় এবং সুরেন্দ্রনাথের পরাজয় ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'মহাত্মা গান্ধীকী জয়', 'সি. আর. দাশকী জয়', 'ডাঃ বি সি. রায়কী জয়'। ডাঃ রায়—যিনি সাদা ধুতি-জামা পরিয়া ভোট-গণনাকালে উপস্থিত ছিলেন—শ্রবণবিদারী জয়ধ্বনির মধ্যে মাল্যভূষিত হইলেন। পূর্বোক্ত নির্বাচনে ভোট গৃহীত হইয়াছিল ২৬শে নভেম্বর। পরবর্তী দিবসের (২৭শে নভেম্বরের) অমৃতবাজার পত্রিকায় 'বারাকপুরের সংগ্রাম—ডাঃ রায়ের নিশ্চিত জয়' শিরোনামায় বিশেষ সংবাদদাতার প্রদত্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার স্বরাজ্য দল কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার মতামত হইতে জানা যায় যে, স্বরাজ্য দলের কার্যক্রম তিনি সাধারণতঃ সমর্থন করেন। সংবাদের পূর্বোল্লিখিত অংশটি এই:

"The Battle of Barrackpur

"Dr. Roy's sure success

"Dr. Bidhan Chandra Roy was backed by the Swarajya Party of Bengal inasmuch as his views show that he generally supports the programme of the Swarajya Party. ···· "

সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ের সংবাদের সঙ্গে একই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল অন্যান্য নরমপন্থী নেতাদের পরাজয়ের সংবাদ। স্যার নীলরতন সরকার এবং মিঃ এস. আর দাশ

ব্যারিস্টার (দেশবন্ধুর আপন জেঠতুত ভাই) পরাজিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে স্বরাজ্য দলের বিজয়কৃষ্ণ বসু এবং সাতকড়িপতি রায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। কংগ্রেস ঐ সময় দুইটি দলে বিভক্ত ছিল—প্রো-চেঞ্জার (Pro-changer) বা পরিবর্তনপন্থী এবং নো-চেঞ্জার (No-changer) বা পরিবর্তনবিরোধী। স্বরাজ্য দল ছিল প্রো-চেঞ্জার। আনন্দবাজার পত্রিকার তখন শৈশব। তৎকালে সেই পত্রিকা ছিল গান্ধীজীর গোঁড়া ভক্ত—'নো-চেঞ্জার' দলভুক্ত। ইহারা গান্ধীজীর কার্যক্রমের কোন প্রকার পরিবর্তন সমর্থন করিতেন না। ওই দলের কর্মীরা স্বরাজ্য দলের আইনসভায় প্রবেশের নীতির বিরোধী ছিলেন। সুতরাং আনন্দবাজার পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়-বার্তা স্বরাজ্য দলের সমর্থক অমৃতবাজার পত্রিকার মতো জমকালো ও আকর্ষণীয় করিয়া প্রকাশ করেন নাই। আনন্দবাজার পত্রিকা পয়লা ডিসেম্বর তারিখে মাত্র ডবল কলম শিরোনামায় সেই সংবাদ প্রকাশ করেন। চারটি ছত্রে শিরোনামা ছিল এই :

"নির্বাচনের ফলাফল
"মন্ত্রীদের কেল্লা ফতে
"সুরেন্দ্রনাথ কুপোকাত
"নীলরতনের পতন"

পূর্বোক্ত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামের ডান দিকে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইয়াছিল 'আধা স্বরাজ্য দল'। ওই সংখ্যায় 'রঙ-বেরঙ' শিরোনামায় যে সম্পাদকীয় টিপ্পনী কাটা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"বাঙ্গালীর স্বদেশী যুগের মুকুটহীন রাজা, নন-কোঅপারেশন যুগের চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ, আপ্রাণ চেষ্টা করেও নির্বাচন-যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। আপসোস কি কম! সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বুড়া বয়সের তিন বৎসরের চাকরির রোজগারের একটা মোটা অংশ নাকি এই নির্বাচন-ব্যাপারে দু'হাতে লুটিয়েছেন, তথাপি অকৃতজ্ঞ ভোটারগণ এমন মুক্তহস্ত দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেছেন!"

"আ হা হা। সে যুগ আর নেই, সে দিন-কাল কি আর আছে? নেতাগিরি ছেড়ে কোন রকমে রাজবাড়িতে আমলাতন্ত্রের আওতায় থেকে যে কায়মনপ্রাণে দেশসেবা,—পোড়া দেশের লোকের চোখে তাও সহিল না। হে মন্ত্রী, হে স্যার, আপনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন এ হতভাগা দেশ হিত চায় না, কাজেই আপনার মতন হিতৈষীর কাজ শেষ হয়েছে, এখন রাজনীতি ছেড়ে, গঙ্গাতীরে আশ্রম রচনা করে,—শেষের সেদিন স্মরণ করুন—আর কেন?"

* * *

"তবে বাজারে ইতিমধ্যেই গুজব সুরেন্দ্রনাথ এই পরাজয়ের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন, কাজেই তাঁর পরাজয়-সংবাদে 'হৃদয় ছাড়া' হবার কোন সম্ভাবনা নেই। লাটসভার তাঁর জন্য নাকি আর একটা পোস্ট অপেক্ষা করছে, আশ্রিত-বৎসল আমলাতন্ত্র তাকে সরকারী দপ্তরখানায় কায়েম করে রাখবেন বোধ হয়।"

অমৃতবাজার পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের নির্বাচনে পরাজয়-বার্তা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই সংখ্যায় "Defeat of Sir Surendranath" অর্থাৎ স্যার সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। সেই প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির আরম্ভেই লিখিত হইয়াছিল যে, সুরেন্দ্রনাথ যে নির্বাচনে পরাজিত হইবেন, তাহা একটি পূর্বোপনীত সিদ্ধান্ত ছিল। বর্তমানে জনগণের যে মনোভাব, তাহাতে এ দেশে বিদেশী আমলাতন্ত্রের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নবগঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর অনুগ্রহ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই কম। প্রবন্ধে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী থাকা কালেই বাংলা দেশে অসহযোগ আন্দোলনকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে। বাংলা দেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিও একই সময়ের ঘটনা। প্রবন্ধটি আরম্ভ এই: "Sir Surendranath's defeat at the polls was a foregone conclusion. In the present temper of the people no one who is suspected to be on the side of the present foreign Bureaucracy in the country had the least chance of winning the favour of the new electorates. "

বিধানচন্দ্র রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন একটা ঐতিহাসিক জয়লাভের গৌরব লইয়া। সুরেন্দ্র-বিজয়ী বিধান, বিদেশী আমলাতন্ত্রের সুরলোক মহাকরণ (সেক্রেটারিয়েট) হইতে ভারতবিশ্রুত নেতা, কংগ্রেসের অন্যতম স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথকে অপসারিত করিয়া দিলেন। জীবনের সায়াহ্ন-বেলায়ও তিনি সে পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারেন নাই। সেই কারণেই আত্মচরিত ("A Nation in Making") লিখিতে বসিয়া তিনি স্বরাজ্য দল ও উহার অন্যতম নেতা মিঃ সি. আর. দাশের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে, যুক্তি কিংবা সাধারণ বুদ্ধি অথবা স্বদেশ-হিতকর সমীচীনতার সাধারণ বিচার-বিবেচনার দ্বারা স্বরাজ্যবাদের নীতি নির্ধারিত হয় না। "But neither logic nor common sense, not even the ordinary considerations of patriotic expediency, dominate the counsels of Swarajism."…সুরেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের বিধি-বিধান অনুসারে চিত্তরঞ্জন দাশ যে কলিকাতা পৌরসভার (কর্পোরেশনের) মহানাগরিক (মেয়র) নির্বাচিত হইয়াছিলেন,

তাহাও তিনি সহিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) পরিচালনা সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের কোন অভিজ্ঞতা নাই। ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি! সুরেন্দ্রনাথ যৌবনে যখন প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তখনও তো যে-কেহ তাঁহার প্রতিকূলে অনুরূপ যুক্তি উত্থাপন করিতে পারিতেন। পরাধীন অবস্থায় আমাদের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীও স্বরাজের দাবি অগ্রাহ্য করিবার কালে এইরূপ অভিজ্ঞতার অভাবের মামুলী যুক্তি দেখাইতেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীতই স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁহার অনুগামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ পরবর্তী নেতারা দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা পৌরসভার মহানাগরিকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর (নেতাজী) নাম সংযুক্ত করি নাই এইজন্য যে, তিনি মহানাগরিকের পদে নির্বাচিত হইবার পূর্বে কলিকাতা পৌরসভার মুখ্য নির্বাহক (চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার) রূপে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ অভিযোগও আনিয়াছিলেন যে, স্বরাজীদের প্রাধান্য বাংলার জন-জীবনকে নীতিভ্রষ্ট করিয়াছে, অতীতের পবিত্রতা বিলোপ পাইয়াছে, জনসাধারণ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির সিদ্ধান্তে বল এবং প্রতারণা হইয়াছে নির্ধারক যন্ত্র। "The dominance of the Swarajists has demoralised the public life of Bengal. The purity of the past is gone. Force and fraud have become determining factors in deciding public issues." প্রবীণ নেতা সুরেন্দ্রনাথ পরাজয়ের জ্বালায় যে কতটা জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছিলেন, তাহা এইরূপ বিষোদ্গার হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার অভিযোগের সমর্থনে তিনি একটি ঘটনারও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বহু বৎসরের রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি দেশ ও জাতির দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুগামী নরমপন্থী দল (যাহা পরবর্তীকালে উদার-নীতিক দল নামে অভিহিত হইয়াছিল) জাতীয় জাগরণের প্রভাতকালের সেই নিয়মতান্ত্রিকতাবাদকেই (constitutionalismকেই) জাতির মুক্তির একমাত্র পথ জ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন। সেই নীতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও আত্যন্তিক আসক্তি-বশতঃ তাঁহাদের দৃষ্টি এমনই আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই—ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন নেতার আবির্ভাবে কী বৈপ্লবিক বিবর্তনই না সংঘটিত হইতেছিল! স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিযানে মহানায়ক গান্ধীজীর অনুগমন করিয়া চলিতেছিল—অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী নূতন পথ ধরিয়া। বাংলার রাজনৈতিক রাজ্যের এককালের অনভিষিক্ত রাজা—'Uncrowned King of

Bengal'—সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতি-ক্ষেত্রে নবাগত বিধানচন্দ্রের নিকট নির্বাচন-যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও বুঝিতে পারেন নাই—দেশের হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে। যিনি 'রাষ্ট্রগুরু' বলিয়া জীবিতকালে অভিনন্দিত হইয়াছেন এবং মৃত্যুর পরেও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইতেছেন, তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব দেখিয়া দুঃখ হয়। যে স্বরাজ্য দল তাঁহার উষ্মা ও অস্বাস্থ্যর কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দলের অর্থাৎ কংগ্রেসীদের হাতে কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব থাকাকালে কর্পোরেশন স্ট্রীট হইয়াছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিজে এবং তাঁহার অনুগামী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি নেতারা রাষ্ট্রগুরুকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

১২

ব্যবস্থাপক সভায়

তখন ভারতবাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ দাবি করিতেছিলেন। তখনও তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন নাই। কিন্তু ভারতবাসীর এই সামান্য ন্যায্য দাবিতেও ইংরেজ সরকার কর্ণপাত করে নাই। ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের যোগ্য করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হইবে, এই বুলি আওড়াইয়া তাহাদের ঘাড়ে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার নামে এক শাসনব্যবস্থা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই শাসনব্যবস্থা অনুসারে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে এদেশের প্রধান শাসক ছিলেন গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়। তাঁহার একটি শাসন পরিষদ ছিল। ঐ শাসন-পরিষদের সাহায্যে তিনি বৃটিশ ভারত শাসন করিতেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অলংকাররূপে একটি আইনসভাও ছিল। ঐ আইনসভা দুইটি কক্ষে বা পরিষদে বিভক্ত ছিল। তবে ঐ আইনসভার নিকট গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় বা তাঁহার শাসন পরিষদ, কেহই দায়ী ছিল না। শাসন পরিষদের সদস্য করিয়া দুই-একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়কে মনোনীতও করা হইতেছিল। তবে তাঁহাদের হাতে প্রতিরক্ষা বা অর্থের মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থাকিত না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, রেলপথ, ডাক তার প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুদ্রা ও মুদ্রা প্রচলন, বাণিজ্য, আইন, শিক্ষা প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিষয়গুলি ছিল। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা ও জেল, সেচ, কৃষি, বন, দুর্ভিক্ষত্রাণ, রাজস্বব্যবস্থা, শ্রমশিল্পের উন্নয়ন, কলকারখানা পরিদর্শন, শ্রমিক সমস্যার সমাধান, স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, আবগারী শুল্ক, সমবায় প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষকে ১০টি প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছিল এবং প্রতি প্রদেশে একটি করিয়া এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বা ব্যবস্থাপক সভা ছিল। বাংলা প্রদেশের আইনসভায় ১৩৯ (পরে ১৪০) জন সদস্য ছিলেন। ইহাদের অন্ততঃ শতকরা ৭০ জনকে নির্বাচিত হইতে হইত। তবে তখনও সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ছিল না। নানাপ্রকার যোগ্যতার ভিত্তিতে লোকে ভোটাধিকার পাইত। অবশিষ্টরা ছিলেন মনোনীত সদস্য। মনোনীত সদস্যদের শতকরা বিশ ভাগের বেশী সরকারী কর্মচারী হইতে পারিতেন না। প্রাদেশিক

শাসনভার ছিল গভর্নরের উপর। তিনি গভর্নর-জেনারেল ও বৃটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকিতেন। প্রাদেশিক বিষয়সমূহকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল—সংরক্ষিত এবং হস্তান্তরিত। স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা (ইউরোপীয়দের শিক্ষা ছাড়া), জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, কৃষি, বাস্তাঘাট, আবগারী, সমবায়, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল হস্তান্তরিত বিষয়। গভর্নর ও তাঁহার শাসন পরিষদের হাতে ছিল সংরক্ষিত বিষয়গুলির নিরঙ্কুশ দায়িত্ব ও ক্ষমতা। আইনসভার নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে গভর্নর তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠন করিতেন। ঐ মন্ত্রিসভার হস্তে থাকিত হস্তান্তরিত বিষয়গুলি। মন্ত্রিসভার কোন ব্যবস্থা মনঃপূত না হইলে গভর্নর নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা লইতে পারিতেন। সুতরাং মন্ত্রিসভা নামে ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী হইলেও কার্যত গভর্নরের নিকটই দায়ী ছিলেন। আইনসভা অনাস্থা প্রকাশ করিলে মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইত। হস্তান্তরিত বিষয়ে কোন বিল পাস করিতে হইলে আইনসভার সম্মতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সংরক্ষিত বিষয়ের কোন বিল ইহার অসম্মতি সত্ত্বেও গভর্নর পাস করিতে পারিতেন। ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলেও হস্তান্তরিত বিষয়ে ছাড়া ইহার করণীয় কিছুই ছিল না। হস্তান্তরিত বিষয়েও আইনসভা অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিত না, কেবল হ্রাস বা নামঞ্জুর করিতে পারিত। কার্যতঃ সমস্ত ক্ষমতাই প্রকৃতপক্ষে গভর্নরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এই শাসন-ব্যবস্থাকে সকল দলই "inadequate. unsatisfactory and disappointing" আখ্যা দিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হইয়া ডাঃ রায় প্রবেশ করিলেন নূতন কর্মক্ষেত্রে। তখন তাঁহার বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বৎসর। তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, যখন কোন কার্যের ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িত, তখন তাহা তিনি দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিতে চেষ্টিত হইতেন। মন্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইন, ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাবলী এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিধি-বিধান ডাঃ রায় ভালো করিয়া পড়িয়া লইলেন। আইনসভায় প্রবেশ করিয়া নিয়মকানুন শিখিবার জন্য তাঁহাকে কোন প্রবীণ সদস্যের শিক্ষানবিশ হইতে হয় নাই। জীবনে দুইটি কঠিন বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন,—একটি হইল চিকিৎসা-বৃত্তি এবং অপরটি অধ্যাপনা। একটি পরাধীন জাতির জীবনের সর্বক্ষেত্রের সহিত যে রাজনীতি জড়িত, তাহা তিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন। তাই উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিবিদ্ হইয়া নির্ভীক ও নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবা করাই হইয়াছিল তাঁহার তৎকালীন উদ্দেশ্য। তাহাতে সফল হইতে তাঁহার দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। অর্থনীতি তিনি বেশ বুঝিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যরূপে এবং

সেই প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব অ্যাকাউন্টস্-এর প্রেসিডেন্টরূপে কাজ করিয়া ডাঃ রায় অর্থনৈতিক বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় আয়ব্যয়-সংক্রান্ত (budget) আলোচনায় স্বাধীনভাবে স্বকীয় মতামত গঠনে ও প্রকাশে সুবিধা হইয়াছিল। স্বরাজ্য দলের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হইলেও তিনি সেই দলের সহিত সহযোগিতা রাখিয়া প্রথমে কাজ করিয়াছিলেন, এবং পরে সেই দলে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার আয়ব্যয় সংক্রান্ত অধিবেশনে তিনি প্রথম (১৯২৪ খৃঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারি) যে সারগর্ভ, তথ্যপূর্ণ ও সমালোচনাত্মক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতেই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান কিরূপ গভীর এবং তাঁহার দৃষ্টি কতটা তীক্ষ্ণ ও সন্ধিৎসু। এই বক্তৃতার কতকাংশের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"রাজস্ব আয়ব্যয়ের উপস্থাপিত করার বার্ষিক অনুষ্ঠান কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। বাজেট সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিও আমরা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? যে নিয়মাবলী অনুসারে আমরা আজ কাজ করিতেছি, তাহাতে আমাদের এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই যাহার দ্বারা আমরা অর্থ মঞ্জুর করিতে পারি, কিংবা মঞ্জুর-অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে পারি অথবা মঞ্জুরিকৃত অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাপারে ব্যয় না করিয়া অন্য ব্যাপারে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারি। এইরূপ ক্ষমতা আছে বৃটিশ পার্লামেন্টের (Imperial Parliament)—যেখানে মন্ত্রীরা হইলেন নির্বাহী (executive) এবং রাজস্বের জন্য দায়ী, তাঁহাদের দাবি অনুযায়ী রাজার পক্ষ হইতে কমন্সসভা অর্থ মঞ্জুর করিয়া থাকে। সাধারণ নিয়ম সেখানে এই যে, ঐ সমুদয় দাবি কোন প্রকার হ্রাস না করাইয়াই মঞ্জুর করা হইয়া থাকে, কারণ নির্বাহী (executive) নানাভাবে আইনসভা এবং দেশের নিকট দায়ী। কিন্তু আমাদের বেলায় কি প্রতিকার আছে? এই সভা কি করিয়া নির্বাহীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে? আমি এই ভাবিয়া আশ্চর্য হই যে, তাহা হইলে শাসন-সংস্কার আইনের উদ্দেশ্য বুঝি এই ছিল যে, আইন-সভা নির্বাহীর উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিলে, একমাত্র সম্ভবপর ও ব্যবহারিক উপায় হইল দাবিমতে অর্থ মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করা কিংবা দাবি-করা অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া। ইহা একটা অবিসংবাদিত সত্য—কোন মানুষকে ক্ষমতা দিয়া দেখুন যে তিনি উহার অপব্যবহার করিবেনই, যদি দৃঢ় জনমত উহার প্রতিকূলে না থাকে, ক্ষমতা পাইয়া কোন মানুষ উহার অপব্যবহার না করিলে বুঝিতে হইবে তিনি মানব নহেন—অতিমানব। উপস্থাপিত বাজেটের বেলায়ও আমি দেখিতেছি ক্ষমতার অপব্যবহারের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

পূর্বোক্তভাবে শাসন-সংস্কার আইনের নীতিগত ত্রুটি প্রারম্ভে দেখাইয়া দিয়া ডাঃ রায়

বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহার অভিমতের সমর্থনে তিনি বাজেট হইতে যুক্তির সহিত তথ্যাদি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন: ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাজেটের আলোচনাকালে তদানীন্তন অর্থ-সদস্য এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য কোন কার্যে ব্যয় করা হইবে না, কেবল ব্যয় করা হইবে এই দুইটি খাতে—মূলধন হিসাবের (Capital-account-এর) জন্য ঋণদানের ব্যবস্থায় এবং দ্বিতীয়তঃ হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিকল্পনা রূপায়ণে। বর্তমান সময়ে এই আইনসভা কিভাবে কি সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কিভাবে বাধ্য করিতে পারে? ইহা একটি সুবিদিত সত্য যে, সরকারের নির্বাহী সদস্যগণ জনগণের ইচ্ছা জানেন না এবং জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে জনগণের ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করিবার একমাত্র উপায় হইল অর্থ মঞ্জুরির দাবি অগ্রাহ্য করা কিংবা উহার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া।

বাজেটের ব্যয়-সংকোচন প্রসঙ্গে আসিয়া ডাঃ রায় বলেন: মাননীয় অর্থ সদস্য দুঃখ করিয়াছেন যে, পুলিস বাজেট হইতে ১২ লক্ষ টাকা কমাইতে হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কার্যকর তত্ত্বাবধানের অভাবে পুলিসবাহিনীর দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কাহার উপর তত্ত্বাবধান? ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই দেশে শতকরা মাত্র ১৩ জনের অক্ষর-পরিচয় আছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, যদি জনগণ উহার গুরুত্ব না বুঝে কিংবা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহাদের না থাকে। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় একটা বৃহৎ শিক্ষা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। গতকল্য মিঃ মিত্র (শিক্ষা-মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র) এই প্রদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার জন্য অর্থ মঞ্জুরির দাবি জানাইয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং তিনি অর্থ-সদস্যের রাজনীতিজ্ঞতার অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাপক সভার সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাটা কি প্রকার? আমি ধরিয়া লইতেছি যে, গবর্নমেন্টের পক্ষে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়কে ওই কর্তব্য সম্পাদনের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের দায়িত্ব হইতে সরকার মুক্তি পাইতে পারেন না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত সরকারের পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন:

যখন এম. এ. পড়িবার জন্য ছাত্রেরা স্থানাভাবের দরুন কলেজে ভর্তি হইতে পারিতেছে না, তখন উচ্চতর শিক্ষাদানের, উচ্চতর অধ্যয়নের এবং গবেষণার বর্তমান ব্যবস্থাকে আমি মোটেই পর্যাপ্ত বিবেচনা করিতে পারি না।···আমাদের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদের

মধ্যে অনেকে উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যে নিযুক্ত আছেন এবং বহুসংখ্যক ছাত্রের উচ্চশ্রেণীর এম. এ. ডিগ্রি পাইয়া বাহির হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক; নতুবা স্কুল ও কলেজগুলির জন্য যোগ্য শিক্ষাদাতা পাওয়া কঠিন হইবে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্জুর-করা পূর্বোক্ত দান ভারত সরকার এবং বাংলা সরকার অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বিভিন্ন দাতার নিকট হইতে ৪৫ লক্ষ টাকা দান বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছে। গবর্নমেণ্ট তদুত্তরে কি করিয়াছেন? কালিম্পং হোমস্ এবং লরেটো কনভেণ্টে সরকারী আর্থিক সাহায্য মঞ্জুরির সুপারিশ করিয়া তৎকালীন অর্থ-সদস্য স্যার হেনরি হুইলার বলিয়াছিলেন যে, ওই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দাতার নিকট হইতে প্রচুর আর্থিক দান পাইয়াছে, সুতরাং উহারা সরকারের নিকট হইতেও মুক্তহস্তে দান পাইবার অধিকারী। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, বে-সরকারী দানে উৎসাহ দেওয়া একটা ভালো কারবার। আমি জানিতে চাহি—বিশ্ববিদ্যালয়ে বে-সরকারী দানের বেলায় উৎসাহ দিবার জন্য এই সরকার কিংবা ভারত সরকার কি করিয়াছেন? এই তো সেদিন স্যার পি. সি. রায়—যাঁহার নাম ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়, এবং যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব দেখিয়া নিজের প্রাপ্য মাসিক বেতন হইতে এক হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন—বিজ্ঞান কলেজের কাজে রাসায়নিক দ্রব্য কিনিবার জন্য মাত্র ৪ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব অ্যাকাউণ্টসের সভাপতিরূপে আমাকে তাঁহার ওই সামান্য অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। মিঃ মিত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে উপেক্ষার জন্য এই সভার সদস্যগণের এবং নির্বাহী সরকারের রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্যদানের ব্যাপারে সরকারের রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাবের জন্য আমি সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহি।

অতঃপর ডাঃ রায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করার প্রসঙ্গে আসিয়া বলেন: জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগ সম্পর্কে আমার আগ্রহ সর্বাধিক। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুইনাইন বিলির জন্য দেওয়া হইয়াছে। মিঃ জি. এস. দত্ত (তৎকালীন বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী) একটি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, ম্যালেরিয়ার জন্য বিশ লক্ষ লোকের চিকিৎসা গত বৎসর করা হইয়াছে। একটু অঙ্কশাস্ত্র ব্যবহার করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ঐ টাকায় বিশ লক্ষ লোকের তিনদিনের মাত্র চিকিৎসা হইতে পারে। সকলেই জানেন, তিন মাসের ক্রমাগত চিকিৎসাতেও মানবদেহ হইতে ম্যালেরিয়াকে বিতাড়িত করা যায় না। সুতরাং এই বরাদ্দ অর্থ সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান করিতে পারে না। ইহাতে কাহারও কোন সাহায্য হয় না।

প্রদেশে পানীয় জল সরবরাহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাকে বলা হইয়াছে যে, সরকারের হৃদয় পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু মিঃ ডোনাল্ডের (তৎকালীন অর্থ-সদস্য) পাষাণ হৃদয় পরিবর্তিত হয় নাই। যাহাই হউক, ঐ পাষাণ হইতেও জল বাহির হইয়াছে, গ্রামে জল সরবরাহের জন্য সরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। আমি পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী, সেই গ্রামে আমাদিগকে গত বৎসর একটি পুষ্করিণী খনন করিতে হইয়াছিল, এবং তাহাতে এক হাজার টাকা লাগিয়াছিল। সুতরাং যদি ৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়, তাহা হইলে তাহা দিয়া ৫০টি পুষ্করিণী খনন করা যাইবে, এবং প্রতি পুষ্করিণী যদি ৫০০ জনের জন্য জল সরবরাহ করে, তবে ৫০,০০০ টাকা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে যে ছয় কোটি বিশ লক্ষ লোক বাস করে, তাহার মধ্যে মাত্র ২৫০০০ লোকের জলকষ্ট দূর করিতে পারিবে। কিন্তু জলকষ্টই সব নহে ভারতবর্ষে একটি ভয়ানক অস্বস্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের প্রদেশেও প্রচুর পরিমাণে অস্বস্তির ভাব রহিয়াছে। উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতেছে, উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে কিছু কিছু প্রলাপও যে প্রকাশ পাইবে, তাহাই স্বাভাবিক। চিকিৎসকরা মানুষের ক্ষেত্রে যাহা করিয়া থাকেন, তাহাই যদি রাজনীতির ক্ষেত্রেও করা হয়, তাহা হইলে এই ব্যাধিই নির্ণীত হইবে যে, ভারতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু এবং রোগের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক যুদ্ধে নিযুক্ত আছে। দারিদ্র্যই হইল সেই রোগ এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষের অধিক মানুষ মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতেছে নিরোধযোগ্য ব্যাধিগুলির আক্রমণে। একই কারণে প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষ বৎসরে অনেক দিনের কাজ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে এবং বহুসংখ্যক শ্রমজীবী চিরজীবনের জন্য কর্মশক্তি হারাইয়া বিকলাঙ্গের মতো দিন কাটায়। এই সকলই হইল সত্য বিবরণ—যাহা স্বাস্থ্যবিভাগের পরিসংখ্যানের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। অবস্থা এতটা শোচনীয় যে, জনগণ এই দুঃখ-কষ্টকে অদৃষ্টের বিধান বলিয়া নির্বিবাদে ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে পারিতেছে। আমাদের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, রোগের চিকিৎসার জন্য প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় হইতেছে। যখনই চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য জনগণ অধিকতর আর্থিক সাহায্যের দাবি জানায়, তখনই প্রদেশের দারিদ্র্যের অজুহাত দেখানো হয়; কিন্তু এই দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে বহুল পরিমাণে প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধিগুলি হইতেই। ভারতবর্ষ যদি স্বাস্থ্য ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহা অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া ধরিতে হইবে।···প্রতিরোধযোগ্য রোগগুলি দমন করুন, উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করুন, তবে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা উত্তম ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে। মহাশয়। ইহাই হইল উদ্বুদ্ধ ভারতের বাণী। ভারত সরকার, ভারত সচিব এবং তাঁহাদের স্থানীয় উপদেষ্টাদের দায়িত্ব যথেষ্ট। রাত্রির পরে দিনের

আগমন যেমন নিশ্চিত, তেমনিই দেশের জনগণের নিকট একদিন তাঁহাদের কর্ণধারত্ব সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে। তাহারা জানিতে চাহিবে—কেন এভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে এমন নিষ্ফল প্রচেষ্টার জন্য—যাহা পীড়িত জনগণের কষ্ট লাঘবে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু শত্রুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিনাশ করিতে নিয়োগ করা হয় নাই। তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, যুদ্ধের প্রথম নীতি হইল শত্রুকে—প্রতিরোধ-যোগ্য ব্যাধিগুলির হেতুগুলিকে—খুঁজিয়া বাহির করা। উহাদের বিরুদ্ধে সংহত পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযানের ব্যবস্থা করুন, তবে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর শত্রু নিপাত হইবে। উহাকে উপেক্ষা করুন, তাহা হইলে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশ সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইবে, দেশবাসী যদি সংগ্রাম করে, তবে তাহারা ঠিক কাজই করিবে।

ডাঃ রায় তাঁহার বক্তৃতা বাড়ি হইতে লিখিয়া আনিয়া পাঠ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় এবং অন্যত্র তিনি বরাবরই উপস্থিত-বক্তা। পূর্বোল্লিখিত প্রথম বক্তৃতার মধ্যেই ব্যবস্থাপক-রূপে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিল। তিনি ক্রমান্বয়ে প্রায় সাত বৎসর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি একই নির্বাচনক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনবার। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভাগুলির কংগ্রেসী সদস্যগণকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। তখন ডাঃ রায় সেই নির্দেশ মতো পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের নির্দেশ সম্পর্কে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তৎকালে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদেও ইস্তফা দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডাঃ রায় উচ্চশ্রেণীর ব্যবস্থাপক বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসক ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের ন্যায্য স্বার্থ-রক্ষা ও দাবি আদায়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। হুগলী নদীর জল দূষিত হইয়া যাইতেছে বলিয়া তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি আটজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বিভিন্ন দলের পক্ষ হইতে সমর্থন করা হয়। সরকারের তরফ হইতে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করা হয় প্রস্তাব তুলিয়া লইতে, এবং ইহাও জানান হয় যে, তিনি প্রস্তাব তুলিয়া লইতে সম্মত না হইলে সরকার কর্তৃক উহা গৃহীত হইবে। ডাঃ রায় তদুত্তরে বলিলেন—অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, উত্থাপিত প্রস্তাব তুলিয়া লইবার ফল ভালো হয় না। অতঃপর ডাঃ রায়ের প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইল। সংশোধনের ফলে তাঁহার প্রস্তাবিত আটজন সদস্যের সঙ্গে আরও চারজন বৃদ্ধি পাইল। কমিটির বারোজন সদস্যের নাম নিম্নে দিতেছি:

বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়, ডক্টর প্রমথনাথ ব্যানার্জি, বাবু খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, বাবু বরদাপ্রসাদ দে, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মিঃ এ. সি. ব্যানার্জি, মিঃ আর. এন. ব্যাগু, মৌলবী আবদুর রসিদ খান, মৌলবী বছর আহ্‌মেদ, মৌলবী নাজিমদ্দিন আহ্‌মেদ এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি এক তথ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিরূপ যত্নের সহিত ও শ্রম স্বীকার করিয়া তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সেই বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যবস্থাপক-রূপে তাঁহার কার্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ডাঃ রায় যখন যে কার্যে হাত দিতেন তাহা ঐকান্তিকতার সহিত করিতেন, বাজেট সমালোচনা কালে, কিংবা কোন প্রস্তাব উত্থাপন উপলক্ষে, অথবা প্রস্তাবের সমর্থনে বা বিরোধিতায় তিনি যে সকল বক্তৃতা দিতেন, তাহাতে তাঁহার পরিশ্রম ও চিন্তাশীলতার সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলিত। ব্যবস্থাপক সভার কার্যের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করিতেন এই ভাবিয়া যে, তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, বিদেশী সরকার কর্তৃক শাসিত ও শোষিত দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের চেষ্টা করা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাঁহার মতে, নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তিনি জনগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। সুতরাং ব্যবস্থাপক-রূপে কর্তব্যকার্য সুসম্পন্ন না করিলে কিংবা করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা না করিলে বিশ্বাসভঙ্গ হয়।

তখন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন না। ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য-দলের নেতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং উপনেতা ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ রায়ের ভাষণগুলি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও শ্লেষাত্মক হইত। তিনি সরকারের কার্য-কলাপের যে বিশ্লেষণ সভায় ও জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিতেন, তাহাতে সহজেই বৃটিশ শাসনের নগ্নরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত। ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী বাজেটের অসঙ্গতি এবং জনকল্যাণের দাবির হাস্যকরতাকে তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের সাহায্যে ব্যবস্থাপক সভা ও জনসাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরেন। এই বাজেট আলোচনা-কালেও সরকারের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ঔদাসীন্য সম্পর্কে তিনি সরকারকে কশাঘাত করিয়া বলেন: আমি দেখিতেছি যে, গত বৎসর কলেরা-প্রতিরোধক ব্যবস্থাসমূহের জন্য ১৬০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই বৎসর ওই খাতে কোন টাকাই বরাদ্দ করা হয় নাই। ইহা করা হইয়াছে এই কারণ দেখাইয়া যে, কলেরা-প্রতিরোধের জন্য কোনও পরিকল্পনা (scheme) নাই। প্রতি বৎসর বাংলাদেশে প্রায় ৮০,০০০ লোক কলেরায় মারা যায় এবং কলেরা রোগীরা যাহাতে মরিবার পূর্বে একটি কলেরা-প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠায়, এইরূপ একটি দাবি মিঃ ডোনাল্ড রাখিবেন

কিনা তাহা আমি জানি না। আমি গত বৎসর সরকারকে যে সতর্কবাণী জানাইয়াছিলাম, এ বৎসরও পুনরায় তাহাই জানাইতেছি। যদি সরকার জনপ্রিয় হইতে চান, তবে তাঁহারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দিন এবং জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ সংগঠিত বিরোধিতাব পথ ত্যাগ করন। নতুবা কোনও অর্ডিন্যান্স, কোনও গোয়েন্দা পুলিস আপনাদিগকে ও আমাদিগকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুআরি খড়্গপুরে বি. এন. আর.-এর ধর্মঘটী রেলওয়ে কর্মিগণের উপর গুলিবর্ষণের ব্যাপার সম্পর্কে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে একটি মুলতবী প্রস্তাব (Adjournment motion) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইয়াছিল। দলের উপনেতারূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ২৭শে ফেব্রুআরির অধিবেশনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। ওই বক্তৃতার সারমর্ম অনুবাদ করিয়া দিতেছি :

ওই ঘটনা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে (Assembly তে) উত্থাপিত হইয়াছিল। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সদস্য স্যার আলেকজেণ্ডার মাডিম্যান এবং বাণিজ্য-সদস্য স্যার চার্লস্ ইন্নেচ নাকি বলিয়াছেন, ব্যাপারটা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার (Council-এর) আলোচ্য বিষয় বলিয়া এই পরিষদের পক্ষে উহার আলোচনা ঠিক কাজ হইবে না; প্রকৃত বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের কার্য ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছিল। সরকার পক্ষের সদস্যের প্রদত্ত ওই প্রকার বিবৃতিতে আমাদের আশ্চয হইবার মতো কিছুই নাই, আমি মুলতবী প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে স্যার চার্লস ইন্নেচের বক্তৃতার কতকাংশ শুনাইতেছি—"আমাদের সরকারী কর্মচারী যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা রেলওয়ে শ্রমিকদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে একেবারে অন্য রকমের; এবং সমস্ত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মিল নাই। বস্তুতঃপক্ষে এই পরিষদের নিকট এখনও প্রকৃত বৃত্তান্ত আসে নাই।" যদি আমি সেখানে থাকিতাম, তাহা হইলে স্বরাষ্ট্র সদস্যকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, ওইরূপ অবস্থায় তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তা-ব্যক্তিদের আচরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন কি করিয়া? স্যার চার্লস্ ইন্নেচ নিজেও বলিয়াছেন যে, জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে আদেশ দেন নাই, সঙ্গীন ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কাজটা কঠিন ছিল এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা হয় নাই। যখন পরিষদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নাই, তখন কি করিয়া যে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। সুতরাং আলোচনার জন্য কংগ্রেস পক্ষে প্রস্তাবটি আনিয়াছি। সরকার পক্ষের কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রশ্ন করিলেই তো হইত। পূর্বে কতকগুলি ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর তিন সপ্তাহের পূর্বে পাই নাই। সুতরাং প্রস্তাব আলোচনায় সরকার এবং জনসাধারণের সুবিধা হইবে।

অতঃপর ডাঃ রায় ঘটনা সম্পর্কে বি. এন. আর. ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ রামচন্দ্র রাও-এর বিবরণের (রিপোর্টের) উল্লেখ করিয়া একাংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন—"A further attack was made by Auxiliary Force and they began to pursue and charge the strikers with bayonets." অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি বাহিনী আরও একটা আক্রমণ চালাইয়াছিল ; তাহারা ধর্মঘটীদের পিছনে ধাওয়া করিয়া সঙ্গীন দিয়া আক্রমণ করে। ব্যবস্থাপক সভার 'প্রেসিডেন্ট' রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি ওই বিবরণের দায়িত্ব নিতে পারেন কিনা। তদুত্তরে ডাঃ রায় বলেন—অক্সিলিয়ারী বাহিনীর যে সকল সৈন্য গুলিবর্ষণে লিপ্ত ছিল বলিয়া বিবরণে উল্লেখ করা হয়, তাহাদের নামও দেওয়া হইয়াছে এবং ওই বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে এ পর্যন্ত সেই বিবরণের প্রতিবাদ করা হয় নাই। তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে গুলিবর্ষণ এব সঙ্গীনের আক্রমণের কথা। সঙ্গে-সঙ্গেই স্বরাষ্ট্র-সদস্য মাননীয় মিঃ মোবার্লি এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, মুলতবী প্রস্তাবে সঙ্গীনের আক্রমণের উল্লেখ নাই। জবাবে ডাঃ রায় বলিলেন—আমি তো ঘটনার বর্ণনা দিতেছি ; মাননীয় সদস্যের অধৈর্য হইবার আবশ্যকতা নাই। অতঃপর ডাঃ রায় বলেন : অক্সিলিয়ারি বাহিনীর দুইজন সদস্য মেসার্স এডওয়ার্ড ও গেইট্ ধর্মঘটীদের উপর গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রের বিবরণে দেখা যায়, তাহাদের তো খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে। তাঁহারা লোকদের পিছনে ধাওয়া করিয়া বাজারের মধ্যে গিয়াছিলেন এবং সেখানে করিম বক্সের দোকানের নিকট একজনকে গুলি করিয়াছিলেন। লোকটি গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়া যায়, তারপর তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। গুলি করার ঘটনা সরকার পক্ষ হইতেও অস্বীকার করা হয় নাই। ডাঃ রায় এইভাবে ঘটনা বর্ণনা করার কালে সরকার পক্ষীয় কতিপয় সদস্য মুচকি হাসিতেছিলেন দেখিয়া তিনি বলিলেন—আমাদের বিপক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করিতেছি, বিষয়টিকে তাঁহারা যেন হালকাভাবে না নেন। আমাদের সমাজের লোকদের গুলি করা হইয়াছে ; সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পর্কে আমি যখন এই সভায় বক্তৃতা দিতেছি, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ হাসিতেছেন এবং কেহ কেহ মুচকি হাসিতেছেন। আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না, এইভাবে তাঁহারা হাসিতে পারেন কি করিয়া। আমাদের বিপরীত দিকের সদস্যগণের এই প্রকার আচরণ হইতেই মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে।......

ডাঃ রায়ের প্রস্তাবটি যিনি সমর্থন করিলেন, তিনি কংগ্রেস দলের সদস্য নহেন। তিনি ছিলেন সরকারের মনোনীত বেসরকারী সদস্য মিঃ কে. সি. রায়চৌধুরী। মুলতবী প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাও যুক্তি এবং তথ্যে পূর্ণ ছিল।

মিঃ চৌধুরী তৎকালে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া গবর্নমেণ্ট শ্রমিকদের স্বার্থে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া মিঃ চৌধুরী প্রথমেই ডাঃ রায়কে অভিনন্দন জানাইলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মাধ্যমে তাঁহার বৃহৎ দলকেও অভিনন্দিত করিলেন; তিনি বলিলেন যে, কৃষক ও শ্রমজীবীর অভাবাদি সম্বন্ধে ওই দল সচেতন হইয়া উঠিতেছে; এবং উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সভ্য জগতের কোথাও প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ বাদ দিয়া পরিচালিত হয় নাই। বক্তা আরও বলিলেন– বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে যে ব্যাপক শ্রমিক ধমঘট হইয়াছিল, তাহা কেবল অর্থনৈতিক কারণে ঘটে নাই, অন্যান্য কারণও ছিল; যেমন—বেত মারা, সঙ্গীনের আঘাতে আহত করা এবং খড়্গপুরে ১১ই ফেব্রুআরি তারিখে গুলি ছোঁড়া। খড়্গপুরে মেকানিকেল ওয়ার্কশপের রেলওয়ে শ্রমিকগণের মধ্যে যে অশান্তি (unrest) ঘনীভূত হইতেছিল, তাহা গত ছয়মাসকাল জনসাধারণের বিশেষ মনোযোগের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর মিঃ রায়চৌধুরী কয়েকটি অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করেন, যথা—বাসের অযোগ্য ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা, প্রায় ৭০ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা, অল্প বেতন, মারধর এবং জাতি-বিশেষে বিচার-বিবেচনা। ঘটনার বিশদ বিবরণও তাঁহার বক্তৃতায় ছিল।

তারপর বক্তা বলিলেন যে, বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল এবং তিনিও কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। ২৯-শে জানুআরি তিনি বি. এন. রেলওয়ের এজেণ্টকে তদন্ত-কমিটির পক্ষ হইতে সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ জানান; তদুত্তরে পয়লা ফেব্রুআরি এজেণ্ট লিখেন যে, ওই রকম তদন্তে কোন সুফল হইবে না এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ওই ধরনের কমিটির সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারেন না। বক্তা ইহাও বলেন যে, ধর্মঘটের দুইদিন পূর্বেও শ্রমিকদের অভিযোগ শোনার কথা ছিল, কিন্তু তাহা শোনা হয় নাই।

প্রস্তাবটি সমর্থিত হইবার পরে ব্যবস্থাপক সভার আরও কয়েকজন সদস্য বক্তৃতা দেন এবং পুলিস এবং অক্সিলিয়ারি বাহিনীর দুষ্কর্মের তীব্র নিন্দা করেন। সরকারের তরফ হইতে জবাব দিতে উঠিয়া মোবার্লি সাহেব বলেন যে, ধর্মঘটীরা এবং অন্যান্য বহুসংখক শ্রমিক পুলিস ও অক্সিলিয়ারি বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছিল। সহকারী পুলিস সাহেব মিঃ কুক আক্রমণকারী জনতাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও জনতা পাথর ছুঁড়িয়া মারা বন্ধ করে নাই। তখন বাধ্য হইয়াই গুলি চালাইতে হইয়াছিল। কেহ হত হয় নাই। হাসপাতালে যে সকল লোক আহত হইয়া চিকিৎসার জন্য ভর্তি হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা হইবে প্রায় ১২ জন এবং তন্মধ্যে ৩।৪ জনের

অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি সঙ্গীনের আক্রমণ (Bayonet charge) সম্পর্কে এইরূপ জবাব দেন যে, সেই রকমের কিছু করা হয় নাই, তবে আক্রমণকারী জনতাকে হটাইবার জন্য সঙ্গীন দিয়া খোঁচা মারিতে হইয়াছিল। জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মোবার্লি বলেন যে, সহকারী পুলিসসাহেব মিঃ কুকের মাথায় জখম হইয়াছে, পুলিসসাহেব মিঃ ওয়াটারওয়ার্থ এবং কিছুসংখ্যক কনেস্টবলের শরীরেও আঘাত লাগিয়াছে।

মুলতবী প্রস্তাবের আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্বে জনৈক নির্বাচিত ইউরোপীয় সদস্য ডাঃ রায়ের হাসি ও মৃদু হাসি সম্পর্কিত মন্তব্যের জবাবে বলেন যে, তাঁহাদের হাসি ও মৃদু হাসি আলোচ্য ঘটনা লইয়া নহে, উহা একটা দুঃখজনক ব্যাপার। তাঁহারা হাসিয়াছিলেন ডাঃ রায়ের যুক্তি শুনিয়া। স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে সদস্যের বিবৃতি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়।

মুলতবী প্রস্তাবটির আলোচনায় একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উহার সমর্থক সরকার-মনোনীত বেসরকারী সদস্য মিঃ কে. সি. রায়চৌধুরী তাঁহার বক্তৃতায় যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। ওই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে তাঁহার কর্তব্য-বোধের নিদর্শনও মিলিবে। মিঃ চৌধুরী তৎকালে শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। মনোনীত সদস্য হইলে প্রত্যেক বিষয়েই যে সরকারকে সমর্থন করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৎসত্ত্বেও প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকার ওই শ্রেণীর সদস্যদের সমর্থন পাইতেন। কিন্তু মিঃ রায় চৌধুরী তাঁহার কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদের ব্যতিক্রম। অধিকন্তু, প্রবীণ, বহুদর্শী ও প্রভাবশালী জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বয়ঃকনিষ্ঠ নবীন নেতা হইলেও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, দেশের হাওয়া কোন্‌দিকে বহিতেছিল। সেইজন্যই তিনি বক্তৃতার আরম্ভেই প্রস্তাবক ডাঃ রায়ের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাইলেন কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত স্বরাজ্য দলকে বৃহৎ দল বা 'great party' বলিয়া। শ্রমিক নেতার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রশংসনীয়।

ডাঃ রায় স্বরাজ্য দলের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হইয়া যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি ন্যাশন্যালিস্ট দলের নেতা সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেন। পরে মিঃ চক্রবর্তী নিজের প্রচারিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। ডাঃ রায় তখন স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইল। ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের উপনেতা (ডেপুটী লীডার) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (জে. এম. সেনগুপ্ত) নেতা (লীডার) নির্বাচিত হইলেন সর্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুর স্থলে, এবং ডাঃ রায়ও উপনেতা নির্বাচিত হইলেন যতীন্দ্রমোহনের স্থলে বিনা বিরোধিতায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব উত্থাপনের ভার পড়িল স্বরাজ্য দলের পক্ষ

হইতে ডাঃ রায়ের উপর। তখন কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী ছিলেন হাজী এ. কে. আবু আহ্‌মদ খান গজনবী এবং শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। তিনি দুইজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুইটি পৃথক অনাস্থা-প্রস্তাব (motions of no-confidence) ব্যবস্থাপক সভায় আনিলেন। সেই উপলক্ষে ডাঃ রায় যে দীর্ঘ, জোরালো যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উহার আংশিক সারমর্ম নিম্নে দিতেছি :

"আমাদের নিকট দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা (Diarchy) অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যপূর্ণ ছিল, হইয়াছে ও রহিয়াছে, এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে যে কেহ বর্তমান অবস্থায় সেই শাসন-ব্যবস্থা কার্যকর করিতে সাহায্য করেন, তিনি আমাদের আস্থাভাজন নহেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল এই মর্মে—এই কংগ্রেস শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বিগত দিল্লী-অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সমর্থন করিতেছে এবং এই কংগ্রেসের মতে শাসন-সংস্কার আইন অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যপূর্ণ। কংগ্রেসের প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন পরলোকগত মিঃ সি. আর. দাশ। তিনি প্রস্তাব উপস্থিত করার কালে বলেন—'যদি দায়িত্বপূর্ণ সরকার দ্রুত স্থাপনে সহায়তা হইত, তাহা হইলে আমরা শাসন-সংস্কার গ্রহণ করিতাম; আমরা সহযোগিতার বিরোধী নহি, যদি তাহাতে স্বরাজ লাভের সাহায্য হইত, আমরা বিরোধিতার—সোজাসুজি বিরোধিতার বিরোধী নহি, যদি তাহাতে স্বরাজ লাভের সাহায্য হইত।' এই হইল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ছয় বৎসর পরে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিঃ দাশ তাঁহার ফরিদপুরের বক্তৃতায় বলেন—আমি যদি সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম যে, বর্তমান শাসন-সংস্কার আইন জনগণের অনুকূলে প্রকৃত দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছে এবং ইহাতে আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিকাশের সুবিধা রহিয়াছে, তবে বিনা দ্বিধায় সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতাম এবং ব্যবস্থাপক সভার কক্ষেই গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করিয়া দিতাম।"

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, ইহার পরেও দলের মত বদলায় নাই। তিনি শাসন-সংস্কার আইনের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়া বলিলেন—আইনে পরিষ্কার বিধান রহিয়াছে যে, মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা কেবল গবর্নরের হাতে এবং হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ('transferred subjects'-এর) দায়িত্ব ও মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত বলিয়া বলা হইলেও মনঃপূত না হইলে গভর্নর মন্ত্রীর পরামর্শ নাও শুনিতে পারেন। এই আইনের দ্বারা প্রকৃত দায়িত্ব কি জনগণকে প্রদত্ত হইয়াছে? গত ২২শে ফেব্রুআরি এই সভার অধিবেশনে বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবন্দী এবং সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য যখন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন মন্ত্রীরা কোথায় ছিলেন? কোন্ পক্ষে তাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা নীরব থাকিয়া বন্দীদের অনির্দিষ্ট

কালের জন্য আটক রাখিতে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ চক্রবর্তী এই সভায় অধুনালুপ্ত ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির নেতৃরূপে তাঁহার দলকে বর্তমান সরকারের বিপক্ষে পরিচালিত করিয়াছিলেন, এবং তিনবার মন্ত্রক (ministry) গঠনে অস্বীকার করিয়াছিলেন কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় শর্ত সরকার পক্ষ হইতে পালন করা হয় নাই বলিয়া ; কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি ওই সমুদয় শর্ত পালিত না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন আমলাতন্ত্রের অঙ্গ, স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন না এইবারের পূর্বেও, মন্ত্রিত্ব নেওয়ার দরুন তিনি জনমতের বিপক্ষে একাধিকবার ভোট দিয়াছেন।

ডাঃ রায়ের আনীত মিঃ গজনবী সম্পর্কিত অনাস্থা-প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল ৬৬ ভোটে, প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল ৬২ ভোট, মিঃ চক্রবর্তী সম্পর্কিত অনাস্থা-প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল ৬৮ ভোটে, প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল ৫৫ ভোট। দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায় সৃষ্ট গজ-চক্র মন্ত্রক (Ministry) ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল স্বরাজ্য দল।

ইহার পূর্বেও স্বরাজ্য দল তদানীন্তন মন্ত্রিযুগলকে (নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী এবং রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরীকে) পদচ্যুত করিয়া দিয়াছিল। তখন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকার মন্ত্রী দুইজনের এক বৎসরের বেতন বাবদ ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার দাবি নামঞ্জুর করার প্রস্তাব আনয়ন করেন। দেশবন্ধু তখন গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি সেই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন। ২৩শে মার্চের স্মরণীয় অধিবেশনে ডাঃ রায়ের তত্ত্বাবধানে দেশবন্ধুকে ইন্‌ভেলিড্ চেয়ারে করিয়া সভায় আনা হইল। তিনি অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়াই নলিনীবাবুর উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন। সরকারপক্ষের দাবি অগ্রাহ্য হইল ৬৯—৬৩ ভোটে। চৌধুরী-যুগলের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল মন্ত্রিত্ব-যুগ।

১৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে

বিধানচন্দ্র যখন চিকিৎসকের পেশা ও চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষকের পেশা গ্রহণ করেন, তখন হইতেই তিনি শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হইয়া উঠেন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন। স্যার আশুতোষ বিধানচন্দ্রকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইবার জন্য পরামর্শ দেন। ডাঃ রায় যখন বাংলা গভর্নমেন্টের চিকিৎসাবিভাগের অধীনে সহ-চিকিৎসকের (অ্যাসিস্টান্ট্ সার্জন-এর) পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের নির্বাচনকেন্দ্র হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডাঃ কেদারনাথ দাস, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও মন্মথনাথ রায়। ঐ সময়ে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, ফেলো পদপ্রার্থীকে নিজের পয়সা খরচ করিয়া শ'খানেক নূতন গ্র্যাজুয়েটকে রেজিস্টার্ড করিতে হইত। কিন্তু ডাঃ রায় তাহা না করিয়া পূর্ব হইতে যাহারা রেজিস্টার্ড আছেন, সেইরূপ গ্র্যাজুয়েটদের ভোটের উপরই নির্ভর করিলেন। কারণ, নূতন গ্র্যাজুয়েটকে নিজের পয়সা খরচ করিয়া রেজিস্টার্ড করা তাঁহার নিকট ভোট কেনার নামান্তর মাত্র ছিল। তিনি তাঁহার জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করিয়াই জয়ী হইতে চাহিলেন এবং বিপুল ভোটে জয়যুক্তও হইলেন। ঐ সময়ে স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী সাহায্যের জন্যও সর্বদাই লড়িতেছিল। এই উভয় সংগ্রামে বিধানচন্দ্রের মতো একজন বিদ্যোৎসাহী, নিষ্ঠাবান্ ও প্রতিভাশালী সৈনিকের প্রয়োজন ছিল। ঐ সময়ে স্যার তারকনাথ পালিত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। তবে ঐ দানের সহিত এই শর্ত আরোপিত হইয়াছিল যে, ঐ অর্থ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগকে ভারতীয় হইতে হইবে। ঐরূপ শর্ত গ্রহণ করায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রুষ্টই হইয়াছিল এবং সরকারী সাহায্য সম্পর্কে কার্পণ্য করিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার যাহাতে অধিকতর সাহায্য মঞ্জুর করে, বিধানচন্দ্র সেজন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যই তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে সংকল্প করিয়াছিলেন। ঐ সময়ও তিনি রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের সহিত তিনি যে সংগ্রাম শুরু

করিয়াছিলেন, তাহাই পরে তাঁহাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে একদা অবতীর্ণ করাইয়াছিল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যুবক বিধানচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছিলেন। বিধানচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় ৩৪ বৎসর। সেনেটের সদস্য হওয়া অবধি আশুতোষের সহিত বিধানচন্দ্রের মিশিবার সুযোগ ঘটিল। আশুতোষ যুবক বিধানের গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেনেটের সদস্য-রূপে ডাঃ রায়ের অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর মধ্য দিয়া অন্যান্য সদস্যরাও তাঁহার গুণের পরিচয় পাইলেন। তিনি যে অনেক বৎসর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে বাংলার মতো একটা প্রগতিশীল প্রদেশে সে-কালেও শিক্ষিত সমাজে তাহার বিপুল জনপ্রিয়তার পরিমাপ করা যাইতে পারে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে তাঁহার কার্যকাল আরম্ভ হয় ১১ই মার্চ হইতে। তিনি ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিন্-এর সহিত সংযুক্ত হইলেন। পরবর্তী নির্বাচনে (১৯২১ খ্রীঃ) ডাঃ রায় রেজিস্টার্ড্ গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক অর্ডিনারী ফেলো নির্বাচিত হইয়া ১১ই মার্চ হইতে ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিন্-এর সহিত সংযুক্ত হন। তৃতীয় বার (১৯২৬ খ্রীঃ) তিনি একইভাবে নির্বাচিত হইলেন, ১১ই মার্চ হইতে তাহাকে ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিন্, ফ্যাকাল্‌টি অব্ সায়েন্স এবং ভেষজ, শারীরবৃত্ত ও প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়নের পর্ষৎগুলির সহিত সংযুক্ত করা হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রায় অর্ডিনারী ফেলোর পদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি পরের বৎসরেই (১৯৩১ খ্রীঃ) পুনর্নির্বাচিত হইয়া ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে পূর্বোল্লিখিত ফ্যাকাল্‌টি দুইটির সহিত পুনরায় সংযুক্ত হইলেন। পরের বারও (১৯৩৬ খ্রীঃ) তাঁহার পুনর্নির্বাচন হইল, এবং ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে তিনি সংযুক্ত হইলেন পূর্বোক্ত ফ্যাকাল্‌টি দুইটির সহিত। পাঁচ বৎসর পরে (১৯৪১ খ্রীঃ) ডাঃ রায় আবার নির্বাচিত হইলেন এবং ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে ওই দুইটি ফ্যাকাল্‌টির সহিতই তাঁহাকে সংযুক্ত থাকিতে হইল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নির্বাচন হইল সপ্তম বারের জন্য, এবং ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে পূর্বের মতো তিনি সংযুক্ত হইলেন সেই ফ্যাকাল্‌টি দুইটির সহিত। ইহার পরেও ডাঃ রায় রেজিস্টার্ড্ গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক অর্ডিনারী ফেলোরূপে পুনর্নির্বাচিত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-পর্ষদের (Board of Accounts-এর) কার্য জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ। ডাঃ রায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই অর্থনৈতিক জ্ঞান ও দক্ষতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ফেলো নির্বাচিত হইবার আট বৎসর পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিসাব-পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হন; এবং সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এগার বৎসর কাল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ পর্যন্ত ডাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস্-চ্যান্সেলার) ছিলেন। তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে অর্থ-সমিতিরও সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ওই সময়ের জন্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যেই স্যার আশুতোষের উৎসাহে ও পরামর্শে বিধানচন্দ্র প্রথমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপেও বিধানচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জন-স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসক-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন,—যদিও দেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি কখনও উদাসীন থাকিতেন না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে ডাঃ রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে—স্নাতকোত্তর বিভাগের পুনর্গঠন, গবেষণা ইত্যাদি কার্য সুপরিচালনার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক পৌনঃপুনিক অনুদান (annual recurring grant) মঞ্জুর করা হউক। একটি অনুরূপ প্রস্তাব স্বরাজ্য দলের খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক পূর্বেই উত্থাপিত হইয়াছিল। ডক্টর প্রমথনাথ ব্যানার্জি, মন্মথনাথ রায় প্রভৃতিও প্রায় একই রকমের প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের উপনেতা বিধানচন্দ্র দলের পক্ষে ভার পাইলেন ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে। সেই উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন, তাহা সমাপ্ত করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। তাহার বক্তৃতা ছিল যেমন তথ্য ও যুক্তিতে পূর্ণ, তেমনই ছিল বলিষ্ঠ। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম অনুবাদ করিয়া দিতেছি :

সদস্যগণের ধৈর্যকে নিঃশেষে পীড়ন করিতে আমি প্রয়াসী হইব, কেননা, প্রস্তাব-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সদস্যগণের নিকট উপস্থাপিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ কর্মীরূপে আমি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য মনে করি। যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে হয়, তবে উহার শিক্ষাদাতাদিগের এবং অন্যান্য কর্মচারিগণের চাকরির স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিলে নৈপুণ্যের সহিত কার্য পরিচালিত হইতে পারে না। ইহার ফলে কেবল যে শিক্ষাদাতা-দিগেরই ক্ষতি হইবে তাহা নহে, ছাত্রগণেরও ক্ষতি হইবে। আমাদের প্রস্তাবিত মঞ্জুরি ব্যতীত ভবিষ্যতে কোন পরিকল্পনাই রচিত হইতে পারে না। সরকারের মতো কর ধার্য করিয়া টাকা আদায়ের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই; একমাত্র ক্ষমতা আছে পরীক্ষার ফী বাড়াইবার, তাহাও সরকারের সম্মতি ব্যতীত করা যায় না। ইতঃপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের অপ্রিয়তার সম্মুখীন হইয়াও অর্থ সংগ্রহের জন্য পরীক্ষার ফী বাড়াইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরকারের সম্মতি পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর ডাঃ রায় স্নাতকোত্তর বিভাগের উন্নয়নের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর এইচ. ডব্লিউ. বি. মরিনো একটি ছোট বক্তৃতা দিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

স্যার আবদুর রহিমের বক্তৃতার পরে স্বরাজ্য দলের সদস্য খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রথমে আনীত প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হইলে গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে সম্মতি দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় ডাঃ পি. সি. রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি আনীত অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণার্থ উপস্থিত করার প্রয়োজন হয় নাই।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের কার্পণ্য সম্পর্কে বাজেট বিতর্কের সময়ে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধিকতর অর্থসাহায্য দাবি করেন। ঐ সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন নবাব মুশারফ হোসেন। তাঁহার বাজেট প্রস্তাবের সমালোচনায় ডাঃ রায় যাহা বলেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই :

আমার বন্ধু মাননীয় মন্ত্রী তাঁহার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সযত্নে মনোযোগ সহকারে শুনিতে চেষ্টা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আপনারা যদি আমাকে এই পদে রাখেন এবং এই বিভাগে কাজ করিতে দেন, তবে আমি আপনাদিগকে স্বর্গরাজ্য আনিয়া দিব। তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সামরিক এবং ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলিয়াছেন। তিনি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন, তবে আমি তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মঞ্জুরি দান সম্পর্কে কবে হইতে ভারত সরকার তথা বাংলা সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা তিনি কি চেষ্টা করিয়া অনুসন্ধান করিবেন? তিনি যদি ধৈর্য ধরিয়া আমার কথা শোনেন, তবে আমি তাঁহাকে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকার বিমুখ হইয়াছেন। কারণ, ঐ দানের শর্ত ছিল এইরূপ যে, ঐ দানের অর্থ হইতে কেবলমাত্র ভারতীয় অধ্যাপকই নিয়োগ করা যাইবে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিং-ই প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক ৬৫,০০০ টাকা সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লিখিত দানগুলি গ্রহণ করায় সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ কোনও প্রতিষ্ঠান বাহিরের নিকট

হইতে কোনও সাহায্য পাইলে তাহার কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য সরকার সমপরিমাণ অর্থসাহায্য দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাহিরের ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পঞ্চাশ-ষাট লাখ টাকা সাহায্য পাইয়াছে, কিন্তু সরকারকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সরকার সম্প্রতি বহুদিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন অর্থমঞ্জুরি (capital grant) দেন নাই। কেবলমাত্র দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতে ঘাটতি মিটাইবার জন্য সামান্য টাকা দিয়াছিলেন। যে সকল শর্তে পূর্বোক্ত দানগুলি লওয়া হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে একটি এই ছিল যে, ঐ ন্যস্ত অর্থের সাহায্যে যেসব অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত গবেষণাগারসমূহ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দিতে হইবে। কিন্তু যথেষ্ট অর্থ না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ঐ শর্ত পালন করিতে পারেন নাই। আমি অন্যদিন বলিয়াছি, ঐ উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের ভার বিশ্ববিদ্যালয় আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন (স্মরণীয়, বিধানচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব অ্যাকাউণ্টসের সভাপতি ছিলেন). কিন্তু আমি জানি না, কিভাবে আমি এই অর্থ সংগ্রহ করিব। আমি সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিভাগগুলিকে অনাহারে রাখিয়াছেন। আমার যদি ভুল না হয়, তবে বলিতে পারি, চারিবার বিজ্ঞান কলেজের জন্য সরকারের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞান কলেজকে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। সরকার ঐ সকল প্রার্থনায় সাড়া দেন নাই। মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট আমার বিনীত পরামর্শ এই যে, তিনি যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উপকার সত্যই করিতে চান, তবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কত অর্থ দিয়াছেন, কেন দিয়াছেন, সে সব প্রশ্ন না তুলিয়া—কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কি দেওয়া হইয়াছে, সে সম্পর্কে কাহারও কোন অভিযোগ নাই, তাহাকে যত ইচ্ছা দেওয়া হউক না—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহা পাওয়া উচিত এবং যাহা তাহার প্রয়োজন, তাহা তাহাকে দেওয়া হউক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগগুলিকে ভারতীয়করণের নীতি গ্রহণ করাতেই সরকারের মনোভাবের এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যায্য সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এজন্য আমি বর্তমান মন্ত্রীমহোদয়কে বা তাঁহার পূর্ববর্তী মন্ত্রীমহোদয়গণকে বিন্দুমাত্র দায়ী করিতেছি না। কারণ, শিক্ষা বিভাগের নীতির উপর তাঁহাদের কোনও কর্তৃত্ব নাই।

ডাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপের সকল চেষ্টার সতত প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ যে ভাষণ দেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদের জন্য মাহিনার ব্যবস্থা করিয়া বিল আনিলে ডাঃ রায় তাহার তীব্র

প্রতিবাদ করেন। ইহা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের আর একটি পদক্ষেপ, তাহা তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ একটি ভাষণে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মাহিনা সরকার হইতে অনেক বেশি করিয়া বাঁধিয়া দিলে, ডাঃ রায় তাহারও প্রতিবাদ করেন। কারণ তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যোগ্য অধ্যাপক পাওয়া কঠিন হইবে, তিনি এই যুক্তি দেখান। তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ঐ সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার নীলরতন সরকার, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর মতো সর্বজনবরেণ্য ব্যক্তিরা। বিধানচন্দ্র ঐ সময় বয়সে তরুণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, বুদ্ধি ও তেজস্বিতা তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করিয়াছিল। তিনি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব অ্যাকাউণ্টসের সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐ পদে তিনি এগারো বৎসর ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ডাঃ রায়ের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান মুখপাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। রেঙ্গুনের পতনের পর কলিকাতায় যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছিল এবং কলিকাতা হইতে পলায়নের যে হিড়িক পড়িয়াছিল, তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগকে কলিকাতার বাহিরেও স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের নিরাপত্তা বিধান, পরীক্ষাগুলির পরিচালনা, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ রায় যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্র ব্যবস্থাগ্রহণের শক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহার উৎসাহে ঐ সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানচালনা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ঐ সময় তিনি কলকারখানাগুলির মালিক ও শ্রমিকগণের মধ্যে উদ্ভাবিত সমস্যাদির সমাধান ও যোগাযোগ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েলফেয়ার অফিসারদের শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এখন ডাঃ রায় প্রবর্তিত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইন্‌স্টিটিউসন একটি অতিশয় জনপ্রিয় সংস্থায় পরিণত হইয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থী অসংখ্য উৎসাহী যুবক এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে।

ডাঃ রায় সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ও ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে যে অসামান্য কর্মদক্ষতা

দেখাইয়াছিলেন, তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত করেন। চিকিৎসাবিদ্যাই ছিল ডাঃ রায়ের সর্বাধিক প্রিয়বস্তু, যাহাকে ইংরেজিতে বলে first love। তাহার পরেই ছিল দেশবাসীর শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পেই সরকারের সহিত সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন এবং কালক্রমে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নহে, যাদবপুর, ঢাকা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি ও স্বাধিকার রক্ষায় তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষার ব্যাপারে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিলের আলোচনাকালে ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা আজও স্মরণীয় হইয়া আছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলিয়াছিলেন: "For myself, I shall be glad to see not one university in Dacca, not one university in Eastern Bengal, but one university in every division of Bengal, and then I, and the public opinion will be satisfied" তিনি তাঁহার এই স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে সফল করিয়াছিলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রমাণ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নও দেখিতেন। রবীন্দ্র-ভারতী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ডাঃ বিধান রায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে তিনি উপাচার্য-রূপে ইংরেজীতে ভাষণ দিয়াছিলেন।

তাহাতে একস্থলে তিনি বলেন—অধুনা গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই শুনিয়া থাকি; ইহা শুধু এক প্রকার গবর্নমেন্ট নির্বাচন-পদ্ধতি নয় যে, স্বায়ত্তশাসন অধিকার আমাদের কাম্য। তাহার অর্থ কেবল আমরা যে দেশের লোক সেই দেশবাসীকে শাসন ব্যাপারে সাহায্যের অধিকার লাভ করাই নহে। আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করাই ইহার উদ্দেশ্য। ক্ষমতা যেখানে কম প্রয়োগ করা যায় তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা। নিয়মানুবর্তিতাই কৃষ্টির প্রাথমিক লক্ষণ। সর্বজনের সর্বাধিক হিতসাধনই নৈতিক শিক্ষার আদর্শ। কেবলমাত্র সত্যের পরিবেশের মধ্যেই নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে।

বিধানচন্দ্র উপাচার্য থাকাকালে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ (১৩৫০ সালের ২০শে

ফাল্গুন) শনিবার সার্কুলার রোডস্থিত (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি) দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এক উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণ দেন।

"ডাঃ বিধান রায় তাঁহার অভিভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলার স্যার জন হার্বার্ট এবং ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার নীলরতন সরকারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার পর বলেন—১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে সিনেটের এক বিশেষ সভায় স্যার নীলরতনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ তাঁহার নামানুসারে অভিহিত করা হইবে। ডাঃ রায় তাঁহার বক্তৃতায় আরও জানান যে, সাইক্লোস্টোন সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিড়লার নিকট হইতে ৬০ হাজার টাকা অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছেন। তিনি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এই টাকা অর্পণ করিবেন। জনৈক অধ্যাপক (তিনি আপাততঃ তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে চাহেন না) বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন; তিনি ইতিপূর্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আর. এম. ঠাকুর তাঁহার পরলোকগত কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের ১৫০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ অর্পণ করিয়াছে। এই টাকা হইতে একটি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতি বৎসর একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক দানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্তও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ রায় বলেন, "যাহারা এইবার উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ নলিনীমোহন সান্যালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বিহারী ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ৮০ বৎসর বয়সে তিনি পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন দে ১৯ বারের চেষ্টায় বি. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছেন। তিনি বাংলা দেশের আধুনিক রবার্ট ব্রুস। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর এবং বি. এ ডিগ্রি লাভের জন্য তিনি তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম অংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ দৃঢ় সংকল্পের দৃষ্টান্তের কথা আর একটিমাত্র জানি। তিনি ছিলেন আমার সমব্যবসায়ী পরলোকগত ডাঃ নন্দন। ১৮৯৬ সাল হইতে তিনি

চিকিৎসা বিভাগের শেষ পরীক্ষা দিতে সুরু করেন এবং ১৯২২ সালে পরীক্ষায় পাস করেন।

পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াও ডাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন। তাহার অসংখ্য কাজের মধ্যেও এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিতেন।

ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালাচারীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সম্মানসূচক ডক্টর অব্ ল (ডি. এল.) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। উপাধিদান উপলক্ষে যে বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অস্থায়ী ভাইস্-চ্যান্সেলাররূপে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়াছিলেন। উহার সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"রাজাজী যেখানে যে আসনেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কখনও বিস্মৃত হন নাই যে, সাধারণ লোকেরাই দেশকে গড়িয়া তোলে ; এবং যাঁহারা সৌভাগ্যের আসনে আসীন, তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ বিবেচনা তাহাদের প্রাপ্য। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রাচ্যের সন্তান হইলেও বিস্ময়ের বিষয় ইহাই যে, পাশ্চাত্য কূটনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। তাঁহার সূক্ষ্ম ও বিচারক্ষম বুদ্ধিবৃত্তি, অপরকে স্বমতে আনয়ন করিবার শক্তি এবং তাঁহার লৌহ-কঠিন সঙ্কল্প প্রায়ই শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে জয়লাভ করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ধৈর্য রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৪৮ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর]

ডাঃ রায় ও রাজাজী বহু বৎসর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদে রাজাজী অধিষ্ঠিত থাকাকালে বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁহাকে আরও ভালো করিয়া চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ডাঃ রায় মানুষের রোগ নির্ণয়েই কেবল দক্ষ ছিলেন না, দোষ-গুণে গঠিত মানুষের মধ্যে গুণগুলি বাছিয়া লইবার দক্ষতাও তাঁহার ছিল। পূর্বোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত ভাষণেই সেই দক্ষতার পরিচয় মিলিবে। যে কয়েকটি গুণ রাজাজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তৎসমুদয়ই পরিস্ফুট হইয়াছে ডাঃ রায়ের সমাবর্তন ভাষণে।

ডাঃ রায় কখনও সিনেটের সদস্যরূপে, কখনও সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে এবং কখনও বা ভাইসচ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রের এবং প্রতিভাধর উৎসাহী ও উদ্যমশীল সেবকের নিঃস্বার্থ নিরলস সেবায় সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।

১৪

দেশবন্ধুর সহযোগিরূপে বিধানচন্দ্র

বিধানচন্দ্রকে যাঁহাদের চরিত্র বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাঁহারা হইলেন তাঁহার পিতামাতা, শিক্ষাগুরু ডাঃ লিউকিস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মহাত্মা গান্ধী।

ডাঃ রায় চিকিৎসা-উপলক্ষেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরিবারের সহিত প্রথম জীবনে পরিচিত হইয়াছিলেন। ডাঃ রায় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরিবার উভয়ই ছিল ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত, এদিক হইতেও তাঁহাদের সামাজিক পরিচিতি থাকা অসম্ভব ছিল না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রামে তাঁহার যে বিখ্যাত ভাষণটি দিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। ঐ সময়ে অবশ্য বিধানচন্দ্র রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। সংবাদপত্রে রাজনৈতিক সংবাদপাঠের মধ্যেই তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের কর্মসূচীর বিরোধিতা করিলেও পরে তিনি গান্ধীজীর কর্মসূচীকে মানিয়া লন এবং গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন চিন্তাশীল ব্যারিস্টার, তিনি বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি মদ্যপান করিতেন, চুরুট খাইতেন ও বহুমূল্য অতীব শৌখিন বেশভূষা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া তিনি রাতারাতি তাঁহার জীবনযাত্রা-প্রণালী পরিবর্তন করিলেন। চিত্তরঞ্জন মদ্যপান ও ধূমপান এবং বিলাসিতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন। রাতারাতি মদ্যপান, ধূমপান ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া তিনি যে মানসিক ও চারিত্রিক শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন, তাহা বিধানচন্দ্রকে বিস্মিত করিল। তিনি তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকার আইন-ব্যবসায়ও ত্যাগ করিলেন। এ বিষয়ে বিধানচন্দ্র তাঁহার অন্যতম জীবনীকার কে. পি. টমাসকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য: "It may be comparatively easy for some people to give up their source of income, but to my mind to abjure a habit which had grown for years—habit of smoking and drinking—in one day indicated a strength of mind and character which was unique." বিধানচন্দ্র

চিকিৎসকরূপে প্রায়ই চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে যাইতেন। চিত্তরঞ্জনের এই অসামান্য মানসিক ও চারিত্রিক শক্তি বিধানচন্দ্রকে বিস্মিত করিয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ হওয়ায় বিধানচন্দ্রের সহিত অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে চিত্তরঞ্জন কারাগার হইতে মুক্তি পান এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতির সহযোগিতায় কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য পার্টি গড়িয়া গেলেন। স্বরাজ্য পার্টি নির্বাচনের মাধ্যমে আইন-সভাগুলিতে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে সরকারের বিরোধিতা ও সরকারের সহিত অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময় বিধানচন্দ্র প্রধানতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের সহিত সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমে উত্তর কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনকেন্দ্র হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী নির্বাচনে ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে প্রাচীন রাজনৈতিক নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হইয়াছিলেন এবং এবারও তিনি ঐ নির্বাচনকেন্দ্র হইতেই নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র দলনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা যে নবাগত বিধানচন্দ্রের পক্ষে দুঃসাহসিকতার পরিচয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সময় একদিন চিত্তরঞ্জন বিধানচন্দ্রকে স্বগৃহে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার নিকট তাঁহার নির্বাচনপ্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর লইলেন। বিধানচন্দ্র বলিলেন, তিনি আশাবাদী এবং বিগত পাঁচমাস ধরিয়া তিনি নির্বাচকদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং বহু সভা-সমিতিও করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি স্বরাজ্য পার্টির পক্ষ হইতে দাঁড়াইতে চাহেন কিনা। বিধানচন্দ্র বলিলেন, না। চিত্তরঞ্জন প্রশ্ন করিলেন, না কেন? বিধানচন্দ্র বলিলেন, তিনি দলনিরপেক্ষ প্রার্থীরূপেই বিগত পাঁচ-মাস ভোটারদের কাছে আনাগোনা করিয়াছেন এবং নির্বাচনী প্রচার চালাইয়াছেন, এখন হঠাৎ তাঁহার এই রঙ বদলানো নিতান্ত অশোভন হইবে। চিত্তরঞ্জন বলিলেন, তাহা হইলে স্বরাজ্য পার্টিকে ঐ নির্বাচনক্ষেত্রে অন্য প্রার্থী দিতে হইবে। বিধানচন্দ্র বলিলেন, ধন্যবাদ, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথেরই সুবিধা হইবে, তিনি সহজেই জয়ী হইবেন, কারণ, স্বরাজ্য পার্টি ও আমার প্রচার প্রায় এক হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথবিরোধী ভোট ভাগ হইবে।

চিত্তরঞ্জন বিধানচন্দ্রকে বলিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার পার্টির সিদ্ধান্ত পক্ষকালের মধ্যে জানাইবেন। পক্ষকাল পরে বিধানচন্দ্রকে জানাইলেন যে, স্বরাজ্য পার্টি বিধানচন্দ্রকেই সমর্থন করিবে এবং অন্য কোন প্রার্থী দিবে না।

নির্বাচনী প্রচারের সময় চিত্তরঞ্জনের সহিত বিধানচন্দ্রের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইল।

সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়া বিধানচন্দ্রের বিপুল ভোটে জয়লাভ চিত্তরঞ্জনকে অত্যন্ত আনন্দদান করিলেও চিত্তরঞ্জন বিধানচন্দ্রকে স্বরাজ্য পার্টিতে বা কংগ্রেসে যোগদানের জন্য কখনও বলেন নাই। ঐ সময় ব্যবস্থাপক সভায় ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে যে স্বতন্ত্র দল ছিল, বিধানচন্দ্র তাহারই সভ্য ছিলেন। চিত্তরঞ্জন জানিতেন, বিধানচন্দ্র স্বতন্ত্র দলে থাকিলে সহজেই ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য পার্টি স্বতন্ত্র দলের সমর্থন পাইবে। বিধানচন্দ্র ঐ সময়ে কংগ্রেস যোগ না দিলেও স্বরাজ্য পার্টি তথা কংগ্রেস তাঁহাকে তাঁহাদেরই একজন মনে করিত।

যে দেড় বছর বিধানচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের সহিত কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ যতই দিন যাইতেছিল, চিত্তরঞ্জন ক্রমেই বিধানচন্দ্রের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছিলেন। কোনও সমস্যা দেখা দিলেই তিনি বিধানচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতেন। চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রোগী হিসাবেও চিত্তরঞ্জন বিধানচন্দ্রের উপর ছিলেন একান্ত নির্ভরশীল।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁহার সম্পত্তি দেশের স্ত্রীলোকদের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে দান করিয়া একটি ট্রাস্ট বা ন্যাস গঠন করেন। তিনি বিধানচন্দ্রের কোনরূপ সম্মতি না লইয়াই তাঁহাকেও ঐ ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টী বা ন্যাসরক্ষক করিয়া যান। বিধানচন্দ্রের উপর তাঁহার ছিল এমনই গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা। বিধানচন্দ্রের চেষ্টাতেই এখন এই সম্পত্তি হইতে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, শিশুসদন, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনা করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে বিধানচন্দ্র স্বতন্ত্র দলের পক্ষ হইতে রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ছোট ছোট ট্রাস্ট বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব রাখেন। তিনি বলেন, ঐ ট্রাস্ট বোর্ডগুলি গ্রামাঞ্চলের কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে নজর রাখিবে। সরকার ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিলেও উহা চিত্তরঞ্জনের মনে সাড়া জাগায়। তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন। যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হয়। চিত্তরঞ্জন এবারও বিধানচন্দ্রের সম্মতি না লইয়াই তাঁহাকে 'গ্রাম পুনর্গঠন পরিষদের' (Village Reorganisation Board) ট্রাস্টী ও সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন।

মন্ত্রীদের মাহিনা সংক্রান্ত বিল স্বরাজ্য পার্টি প্রভৃতি বিরোধী দলগুলির বিরোধিতায় পাস হইতে পারে নাই। তাই মন্ত্রীদের পদগুলি শূন্য থাকে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার মন্ত্রীদের মাহিনা সংক্রান্ত বিল পুনরায় আনেন এবং মন্ত্রীদের

পদগুলি পুনরায় চালু রাখিতে চেষ্টা করেন। তাই এই বাজেট অধিবেশন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ঐ সময় অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন এবং তিনি ব্যবস্থাপক সভায় আসিতে পারিবেন কিনা, তাহা লইয়া দেশবাসীর আশঙ্কার সীমা ছিল না। চিত্তরঞ্জন বিধানচন্দ্রকে ব্যবস্থাপক সভায় লইয়া যাইবার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করিতে থাকেন। বিধানচন্দ্র তাহাকে একটি ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় আনেন। চিত্তরঞ্জন কেবল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিতই হন না, তিনি যে অতুলনীয় ভাষণ দেন, তাহা সরকারকে অনিবার্য পরাজয়ের মুখে ঠেলিয়া দেয়। বিধানচন্দ্র চিত্তরঞ্জনকে সভাশেষে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেন।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুকালে বিধানচন্দ্র ছিলেন গৌহাটিতে। তিনি চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দ্রুত কলিকাতায় ফেরেন এবং চিত্তরঞ্জনের গৃহে গিয়া শোকবিধুরা চিত্তরঞ্জনপত্নী বাসন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধী বাসন্তী দেবীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, বিধানচন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেই বাসন্তী দেবী গান্ধীজীর সাক্ষাতেই বলিয়া উঠেন: "বিধান, তুমি দার্জিলিংয়ে থাকলে এমন বিপদ ঘটত না।" বিধানচন্দ্রের উপর বাসন্তী দেবীর এই প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা গান্ধীজীকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করিল। তিনি বিধানচন্দ্রকে চিনিতেন না। এই শোকবিহ্বল পরিবেশের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিধানচন্দ্রের পরিচয় হইল। সম্ভবত বিধানচন্দ্রের উপর গান্ধীজীর নিজেরও প্রগাঢ় বিশ্বাস এই সূত্রেই সূচিত হইয়াছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারেই বিধানচন্দ্রও এই মহামানবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার জন্য সংগৃহীত বিপুল অর্থ এবং চিত্তরঞ্জনের নারীজাতির কল্যাণসাধনের জন্য স্বপ্নকে সার্থক করিবার সকল দায়িত্ব বিধানচন্দ্রের উপর নির্দ্বিধায় ন্যস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবার আগ্রহেই বুঝি বিধানচন্দ্র স্বরাজ্য পার্টি তথা কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের ডেপুটি লীডারের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অন্যতম প্রিয় সংস্থা কলিকাতা পৌরসভাতেও তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া চিত্তরঞ্জনের কলিকাতার নগরবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের স্বপ্নকে সফল করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন।

১৫

কলিকাতা পৌরসঙ্ঘে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীর গদিতে বসিলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুআরি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। সংশোধিত 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট' তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের একমাত্র প্রশংসনীয় কায বলা যাইতে পাবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখের অধিবেশনে ওই আইন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইল। সেই আইনের বিধানমতে কলিকাতা নগরীর শহরতলীর কয়েকটি অঞ্চল কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর লণ্ডনের মতো কলিকাতাকেও পৌর মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া উন্নত করিবার ব্যবস্থা পূর্বোক্ত নূতন আইনে রহিয়াছে। পৌর জনগণের ভোটদানের অধিকারও প্রসারিত করা হইল। লণ্ডন নগরের পৌরসঙ্ঘের মতো কলিকাতার পৌরসঙ্ঘে (কর্পোরেশনে) মেয়র এবং অল্‌ডারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থাও করা হইল নয়া আইনে। অল্‌ডারম্যানের সংখ্যা হইল পাঁচজন, ইঁহাদের নির্বাচন করিবেন কাউন্সিলারগণ। ওই পাঁচজনের দ্বারাই নির্বাচিত হইবেন মেয়র বা মহানাগরিক। তৎকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় ছিল অখণ্ড বঙ্গের সরকারী রাজস্বের প্রায় পাঁচভাগের একভাগ। পদমর্যাদায় অল্‌ডারম্যানদের স্থান হইল মেয়রের পরেই। মেয়রের পদমর্যাদা ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার বা সভাপালের অনুরূপ।

নবরচিত আইনের বিধান অনুসারে কর্পোরেশনের যে নির্বাচন হইল, তাহাতে কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্ত স্বরাজ্য দল জয়লাভ করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে মেয়র নির্বাচিত হইলেন। পরবৎসর (১৯২৫ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল) সেই পদে দ্বিতীয় বার তাঁহারই পুনর্নির্বাচন হইল। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে দুঃখিত হইয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে না। তাঁহার আত্মচরিত 'A Nation in Making' গ্রন্থে (৩৪তম অধ্যায়ে) তিনি লিখিয়াছেন যে, মিঃ সি. আর. দাশের (চিত্তরঞ্জনের) মেয়রের পদে নিয়োগ স্বরাজ্য দলের প্রথম গুরুতর ভুল। মিঃ দাশের কর্মকৌশল ও বিচারবুদ্ধির উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। এই সম্পর্কে স্বরাজ্য দলের কর্মনীতির সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, ওই

পদে সাধারণতঃ অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন সেই সকল সম্মানিত নাগরিকেরাই, যাঁহারা পৌরসঙ্ঘের কাজ করিতে করিতে পক্ককেশ হইয়া গিয়াছেন। গ্লাডস্টোনকে, পামার্স্টনকে কিংবা ডিস্রেইলিকে ওই পদ কখনও দেওয়া হয় নাই, কেননা ইহা পৌরসেবার খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাপ্য সম্মান। মিঃ দাশের সমগ্র জনজীবনের মধ্যে তিনি কোনদিন মিউনিসিপ্যাল অফিসের কয়েক মাইলের মধ্যেও যান নাই। কিন্তু তাঁহার দলের হাতে ক্ষমতা থাকায় এবং তিনি নেতা হওয়ায় পৌরকার্যের এতটুকু অভিজ্ঞতা ব্যতীতই রাতারাতি তাঁহাকে মহানাগরিকের (মেয়রের) পদে অধিষ্ঠিত করা হইল। সুরেন্দ্রনাথের সমালোচনা হইতে বুঝা যায় যে, স্বরাজ্য দলের পক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে মিউনিসিপ্যালকার্যে অনভিজ্ঞতা সত্বেও মেয়রের পদের ন্যায্য দায়িত্বপূর্ণ পদে স্বরাজ্য দলের বসানো উচিত কাজ হয় নাই। তাঁহার এই আপত্তি খণ্ডন করিবার যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত আত্মচরিতের পরবর্তী অধ্যায়েই আছে। সংশোধিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট প্রবর্তনের পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্যপরিচালনার জন্য গবর্নমেণ্ট একজন সিনিয়র আই. সি. এস. রাজপুরুষকে 'চেয়ারম্যান অব্ দি কর্পোরেশন' পদে নিয়োগ করিতেন। ওই লোভনীয় পদটি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্যই সংরক্ষিত থাকিত। সুরেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে (৩৫তম অধ্যায়ে) তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের উল্লেখযোগ্য কার্যের বিবরণ দান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম সেই পদে বাঙ্গালী সিভিলিয়ান মিঃ জে. এন. গুপ্তকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পরবর্তী চেয়ারম্যান নিয়োগ করার বেলায় সুরেন্দ্রনাথ পূর্বপ্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমে মনোনীত করিলেন একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে। ইনি হইলেন আলিপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকিল, কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলার এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক: শাসন-কর্তৃমণ্ডলীর কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকার্যে মিঃ মল্লিকের অভিজ্ঞতা নাই, এবং উহার অভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্র কিভাবে পরিচালিত হয়, তাহাও তিনি জানেন না। সেই আপত্তির উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন: মিঃ লয়েড জর্জ যখন 'চ্যান্সেলার অব্ দি এক্স্‌চেকার' (অর্থমন্ত্রী) হইলেন, তখন তিনি ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কি জানিতেন? মিঃ মল্লিককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগাইয়া সাহায্য করার জন্য কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারীরাই রহিয়াছেন। কর্পোরেশনের মতো একটা বৃহৎ বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন হইল প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এবং তথ্যাদি সম্পর্কে এরূপ জ্ঞান যদ্দ্বারা স্থায়ী কর্মচারিগণকে পরিচালিত করা ও উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার এই যুক্তি মানিয়া লইয়া বাংলার গবর্নর মিঃ মল্লিকের নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছিলেন। অনুরূপ যুক্তি কি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

মেয়র-পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নহে ? সুতরাং দেখিতেছি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রবীণ বহুদর্শী জননায়কও দলাদলির সংকীর্ণ মনোভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই।

কর্পোরেশন পরিচালনার ভার কংগ্রেস দলের হস্তগত হইবার পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রায় আট বৎসর অলডারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং দুইবার কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস দলের হাতে কেবল কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালনার ভারই আসে নাই, তেইশ বৎসর পরে (১৯৪৭ খ্রীঃ) খণ্ডিত ভারতের শাসন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্বও আসিয়াছে। এই মহানগরীর পৌর-শাসনক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে থাকায়, স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই বাইশ বৎসরের (১৯২৪ খ্রীঃ—১৯৪৬ খ্রীঃ) মধ্যে ইহার নব রূপায়ণ হইয়াছিল। কত দিক দিয়া যে কলিকাতার উন্নয়ন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নগরবাসীগণ অবগত আছেন বলিয়া বিস্তারিতভাবে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটা কিংবদন্তী আছে যে, জনস্মৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী—'Public memory is short.' সুতরাং কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি: অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা, কর্পোরেশনের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মী ও শ্রমিকগণের বেতনাদি বৃদ্ধি ও কতকগুলি বিষয়ে ন্যায্য সুবিধা দান, পৌরস্বাস্থ্যের বিবিধ উন্নতিসাধন এবং নির্যাতিত দেশসেবকগণের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। এই সমুদয় ব্যতীতও কলিকাতা পৌরসঙ্ঘের অনুরূপ প্রশংসনীয় অবদান আরও রহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের সমালোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ সতর্কবাণীও শুনাইয়াছিলেন যে,—ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সেই ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তগত থাকে ততদিন পর্যন্তই, যতদিন তাহারা ন্যায়নিষ্ঠার সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া না পড়েন। সমস্ত ইতিহাসের তাহাই শিক্ষা। "Power is given to the righteous; and is held by the righteous so long as they do not deviate from the golden track of right dealing. That is the lesson of all history." ওই সতর্কবাণী সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে কাহারও দ্বিমত হইবার সঙ্গত কারণ নাই। কংগ্রেসপন্থীগণ যে একাদিক্রমে এত দীর্ঘকাল যাবত কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালনার ক্ষমতা অধিকার করিয়া ছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাদের লোকপ্রিয়তার পরিচয়ই মিলিতেছে; অধিকন্তু তদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা পৌর-শাসন ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কলিকাতার মেয়র হইলেন ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তিনি ১৯২৫ হইতে (কেবল ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ ছাড়া) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর পর মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯২৯

খ্রীষ্টাব্দের শেষে কংগ্রেস পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করিলে ঐ সংগ্রামের কর্মসূচী অনুসারে স্বরাজ্য দল আইনসভা বর্জন করে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে লবণ আইন অমান্যের জন্য সারা দেশ প্রস্তুত হয় এবং মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা করিয়া ডাণ্ডি অভিযান করেন। লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার অল্পকাল পরেই কলিকাতা পৌরসভার তৎকালীন মেয়র জে. এম. সেনগুপ্ত কারারুদ্ধ হন। লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হইবার পূর্বেই রাজদ্রোহের অপরাধে স্বর্গত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হইলে তিনি ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের অবশিষ্ট কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার মেয়রের পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার যে-কোনও মুহূর্তে পুনরায় কারারুদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকায় কলিকাতা পৌরসংস্থার পরিচালনার জন্য একজন উপযুক্ত নেতার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন সুভাষচন্দ্রই এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিরূপে বিধানচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেন। ঐ সময় কংগ্রেসের কর্মসূচী অনুসারে স্বরাজ্য দল আইনসভা বর্জন করায় বিধানচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে মেয়র নির্বাচিত হন।

বিধানচন্দ্র ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময় হইতে ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একাদিক্রমে অল্ডারম্যান ছিলেন। পরে তিনি ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় অল্ডারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং একাদিক্রমে ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অল্ডারম্যান ছিলেন। তিনি কলিকাতা মহানগরীর উন্নতিকল্পে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদর্শ ও পন্থাকেই সর্বান্তঃকরণে অনুসরণ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদর্শ ও স্বপ্নকে রূপায়িত করিবার পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পর পর দুই বৎসর মেয়র পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে। ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেয়র নির্বাচনে তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ঐ বৎসর মেয়র পদের জন্য তাঁহার নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন পরবর্তীকালের মেয়র ও মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসু। বিধানচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিঃ জে. এন. মৈত্র এবং পরবর্তীকালের অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক। বিধানচন্দ্র ৪২ ভোট পাইয়া বিজয়ী হন। মিঃ মৈত্র পান ২৬ এবং মৌলবী এ. কে ফজলুল হক পান ৮ ভোট।

বিধানচন্দ্র কলিকাতা মহানগরীকে সত্যই ভালোবাসিতেন। তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় হইতে বিলাতে দুই বৎসর শিক্ষালাভের সময় ছাড়া কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছিলেন। পাছে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে

হয়, এই ভয়ে তিনি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে (I. M. S.) যোগ দেন নাই। তিনি কলিকাতা নগরীকে ভালো করিয়া চিনিতেন। চিকিৎসকরূপে তিনি কলিকাতার রাজপথ হইতে গলি, প্রাসাদ হইতে বস্তি, সর্বত্রই বিচরণ করিতেন। চিকিৎসকরূপে এই মহানগরীর অধিবাসীদের সমস্যাগুলি তাঁহার নখদর্পণে ছিল। সুতরাং কলিকাতা মহানগরীর উন্নতিকল্পে সর্বাগ্রে কি কি করণীয়, তাহা তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন। তথাপি দেশবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি মেয়র নির্বাচিত হইয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধু কলিকাতার উন্নয়নের যে রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে পরিপূর্ণ রূপ দিলেই আমরা সাফল্যমণ্ডিত হইব।

"The outlines of the canvas are there, we have to fill in the details : the broad features of the scheme are there, we have got to frame and work out a programme ; the power, prestige, the men and the money are there, let us utilise them with a set purpose and let us work in unison to bring about the uplift of the poor and the relief of the sufferer.. Let our service to the rate-payers be guided by a pure heart and an honest effort."

বিধানচন্দ্র জীবনে কখনও কোন পদ বা সম্মান লাভের জন্য চেষ্টা করেন নাই। যখনই কাজের দায়িত্ব আসিয়া পড়িত, তখনই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেন এবং অকৃপণভাবে নিজ কর্মশক্তিকে সেই কর্মসাধনে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেন। কলিকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান ও মেয়র থাকাকালেও তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। কাউন্সিলর শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "কর্পোরেশনের ইতিহাসে এই প্রথম দেখিলাম কোনও মেয়র প্রতিদিন দুপুর হইতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করিতেছেন।" বিধানচন্দ্র কাউন্সিলরদের নিজ নিজ কাজে অমনোযোগ ও অবহেলারও তীব্র নিন্দা করিতেন, একবার তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—ইহারা "behaving not like city-fathers but like children." বিধানচন্দ্রের বিরোধীরা বিধানচন্দ্রের বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও সৌজন্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। বিধানচন্দ্রের সহিত অতি সাধারণ নাগরিকও সাক্ষাতের সুযোগ পাইতেন।

তিনি কর্পোরেশনের একুশটি কমিটিতে থাকিয়া—কোন কোন কমিটির সভাপতিরূপে এবং কোন কোন কমিটির সদস্যরূপে—মহানগরীর অধিবাসীগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে চারিটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির উল্লেখ করিতেছি :

বাজেট স্পেশাল কমিটি—চেয়ারম্যান : ১৯৩১-৩২, ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৯-৪০, ১৯৪২ ৪৩, ১৯৪৩-৪৪ ,

ফিনান্স স্ট্যাণ্ডিং কমিটি—চেয়ারম্যান : ১৯৩০-৩১, ১৯৪২-৪৩, ১৯৪৩ ৪৪ ;

সার্ভিসেস স্ট্যাণ্ডিং কমিটি—চেয়ারম্যান : ১৯৩১-৩২, ১৯৩৯-৪০ ,

পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্ স্ট্যাণ্ডিং কমিটি—সদস্য : ১৯৩৯-৪০ ।

অপরাপর কমিটিগুলির নামও নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ডেভেলপমেণ্ট স্কিম্ স্পেশ্যাল কমিটি, বেগার প্রব্লেম্ স্পেশ্যাল কমিটি ; বিল্‌ডিং রুল্‌স্ রিভিসান স্পেশ্যাল কমিটি ; ড্রেইনেজ ডিপার্টমেণ্ট এন্‌কোয়্যারি স্পেশ্যাল কমিটি, হরিজন স্পেশ্যাল কমিটি ; লাইভস্টক্ অ্যাণ্ড মিল্ক সাপ্লাই স্পেশ্যাল কমিটি, ড্রাফট্ ভ্যাগেন্সী বিল স্পেশ্যাল কমিটি, স্ট্রে বুল্‌স অ্যাণ্ড ক্যাটল্ এন্‌কোয়্যারি স্পেশ্যাল কমিটি, আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট প্রব্লেম্ স্পেশ্যাল কমিটি, এ. আর. পি স্পেশ্যাল কমিটি ; কর্পোরেশনের আর্থিক বিষয়ে মিঃ সি. ডব্‌লিউ. গার্নারের রিপোর্ট বিবেচনার জন্য স্পেশ্যাল কমিটি, পল্‌তা পাম্পিং স্টেশন এন্‌কোয়্যারি স্পেশ্যাল কমিটি, ট্রেইনিং অব্ ইণ্ডিয়ান নার্সেস্ সাব্ কমিটি, মিউনিসিপ্যাল (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল স্পেশ্যাল কমিটি, মোহামেডান অ্যাণ্ড্ ব্যাক্‌ওয়ার্ড অ্যাণ্ড্ মাইনরিটি কমিউনিটিজ্ এম্‌প্লয়মেণ্ট্ স্পেশ্যাল কমিটি, রুল্‌স্ অব বিজ্‌নেস্ স্পেশ্যাল কমিটি, প্লে গ্রাউণ্ড্ ফেসিলিটিজ্ স্পেশ্যাল কমিটি।

বিধানচন্দ্র কেবল কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়নেই মন দেন নাই, কলিকাতা পৌরসভাকে সকল প্রকার কলঙ্ক হইতে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। স্যার চার্লস্ টেগার্ট বাংলা সরকারের পুলিস বিভাগের স্পেশ্যাল ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বড়কর্তা ছিলেন। বাংলার স্বাধীনতাকামী বিপ্লবপন্থী যুবকদের উপর লাঞ্ছনা-নির্যাতনের জন্য তিনি, তাঁহার সহকর্মী মিঃ লোম্যান প্রভৃতি কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। টেগার্ট সাহেবকে তাঁহার কর্মদক্ষতার জন্য পুরস্কৃত করা হইল কলিকাতার পুলিস কমিশনারের পদে নিযুক্ত করিয়া। অবসর গ্রহণান্তে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাংলা দেশের বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বিষোদ্গীরণ করিতে থাকেন। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতে বিপ্লববাদ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সভার বিবরণ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়। সভা আহ্বান করিয়াছিল রয়েল এম্পায়ার সোসাইটি এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলার ভূতপূর্ব গবর্নর স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন। টেগার্ট সাহেব বলেন যে,—একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে এমন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাই, যেখানে প্রধান প্রধান নেতাদের অধীন কোন একজন বিপ্লবী নাই। ইহার ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ওই সকল নেতার আদেশে বিপ্লবী যুবকেরা রাজনৈতিক

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিতেছে, কিন্তু পুলিস উহাদের ধরিতে পারিতেছে না। ওই সমুদয় নেতা পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া চলে এবং বিপ্লবী দল পরিচালনা করে। যুবকদের প্রতারণা করিয়া দলে আনে এবং উহাদের মনকে গবর্নমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। বিপ্লবী নেতারা এমন ধরনের লোক যে, জনসাধারণ তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিসকে সামান্য সাহায্য করিতেও সাহস করে না।

ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্যার চার্লস্ টেগার্ট বলেন যে, অনেক রক্তপাত হইয়া গিয়াছে এবং উহার পরিণাম বাস্তবিকই ভয়াবহ হইত যদি সাহসী পুলিস কর্মচারীর দল বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করাটা জীবনের একটা দুঃসাহসিক কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ না করিতেন। বক্তা বলেন যে, তিনি তিনটি বিভাগের তিনজন বড়কর্তাকে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওই সকল নিহত পুলিস কর্মচারীর বিপজ্জনক কর্তব্যভার অন্য কর্মচারী বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার কংগ্রেসে বর্তমানে বিপ্লবী দলের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া টেগার্ট সাহেব বলেন যে, সম্প্রতি একজন ইউরোপীয়ানকে হত্যার অপরাধে যে বিপ্লবী যুবকের ফাঁসি হইয়াছে, তাহাকে প্রশংসা করিতে বাংলার কংগ্রেসকে বিপ্লবী দল বাধ্য করিয়াছে। তিনি কংগ্রেসকে এবং বিশেষ করিয়া কংগ্রেস-নেতা মিঃ সি. আর. দাশকে দোষারোপ করিয়া বলেন যে, মিঃ দাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইবার পরে এমন সব লোককে চাকরির জন্য আহ্বান করিলেন, যাহারা দেশের স্বার্থের জন্য দুঃখকষ্ট স্বীকার করিয়াছে। ইহার ফলে অনেক বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের আত্মীয় কর্পোরেশনে চাকরি পাইয়াছে। বেশির ভাগ বিপ্লবীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে শিক্ষকতার কার্যে। প্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলন-কালের অপেক্ষা বর্তমান কালে সমগ্র প্রদেশে স্কুল ও কলেজে বিপ্লবীরা অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং গবর্নমেণ্ট আবার ভারত রক্ষা আইনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং ইতঃপূর্বে ওইরূপ ব্যবস্থার দ্বারাই বিভীষিকামূলক কার্যাবলী দমন করা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইল; বিপ্লব দমনের উপযুক্ত আইন রহিত করার কিছুকাল পরেই চট্টগ্রামে চমকপ্রদ ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হইল। ইহা বিপ্লবীদলের তৃতীয় অভিযান বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কীর্তিমান টেগার্ট সাহেবের পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতায় সমস্ত বাংলাদেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। তাহা লইয়া কর্পোরেশনের ৭ই নভেম্বরের সভায় আলোচনা হয়। সেই সভার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"পূজার ছুটির পর গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার ভূতপূর্ব পুলিস-কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট বিলাতে বসিয়া

এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন বিভীষিকা উৎপাদনকারীদিগকে অনেক চাকরি দিয়াছেন, বিশেষতঃ কর্পোরেশন ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকপদে ঐরূপ অনেক লোককে নিয়োগ করা হইয়াছে।

"মিঃ আবদুল রজ্জাক উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য মেয়রকে নোটিশ দেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বলেন যে উক্ত বিবৃতিতে যে সকল অভিযোগ আছে তাহা ভিত্তিহীন, অন্যায় ও অযাচিত। তিনি বলেন যে, হয় মেয়র মহাশয় স্বয়ং কিছু উক্তি করুন অথবা সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি দিন স্থির করা হউক।

'মিঃ ক্যাম্বেল ফরেস্টার বলেন যে, দিন ধার্য করায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই বটে, তবে এই কথা সত্য কিনা তাহা অবধারণ করা ভাল।

"মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, তাহারা বহুবার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, স্যার চার্লস্ টেগার্টকে পত্র লিখিয়া তাঁহার বক্তৃতাটি পুরাপুরি আনয়ন করা ভাল, তারপর এই বিষয়ে সভায় আলোচনা করিলেই চলিবে। ঐ বিবৃতিতে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য নহে। মিঃ ফরেস্টার বলিয়াছেন যে, ঐ বিবৃতি পুরাপুরি পাঠ করিলে অন্যরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

"পরিশেষে মেয়র মহাশয় বলেন যে, এই প্রকার প্রচারকার্যের দ্বারা কর্পোরেশনের কর্তব্য সম্পাদনের কোন বিঘ্ন হইবে না। তিনি সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি স্যার চার্লস টেগার্ট যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার অনুলিপি পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিবেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ই নভেম্বর ১৯৩২]

স্যার চার্লস টেগার্টের বক্তৃতা এবং কর্পোরেশনকে আক্রমণ সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের ৫ই ডিসেম্বরের (১৯৩২ খ্রীঃ) সভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতি দান করেন। সেই সভার বিবরণ এবং মেয়রের বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

'ইংলণ্ডে কিছুদিন পূর্বে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার চার্লস টেগার্ট বলিয়াছেন যে, কর্পোরেশন বিপ্লবীদিগকে, এবং বিপ্লবীদের আত্মীয়দিগকে মাস্টারের চাকুরি দিয়া পুষিতেছেন। ঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্পর্কে কাউন্সিলারদের অভিলাষ সমর্থন করিয়া মেয়র গত সোমবারের সভায় ঐ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দান করেন। তিনি বলেন: কর্পোরেশন স্থির করিয়াছিলেন যে, স্যার চার্লস টেগার্টের বক্তৃতার একখণ্ড সঠিক অনুলিপি না পাওয়া পর্যন্ত ঐ বিষয়ে কর্পোরেশন বিবেচনা স্থগিত রাখিবেন: কিন্তু এখানকার ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েসন ঐ বক্তৃতা

প্রধানে মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি অদ্যকার কাগজে আবার রয়টারের খবর আসিয়াছে যে, স্যার চার্লস্ টেগার্ট সংবাদপত্র-প্রতিনিধির নিকট তাঁহার পূর্ব উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। রয়টারের তারের ভাষা উল্লেখ করিয়া মেয়র বলেন— অভিযোগের বিষয়ীভূত বিষয় সম্পর্কে আমি পূর্বে বলিয়াছি, এখনও তাহার পুনরুক্তি করিতেছি। ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নির্লজ্জ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। দেশের এই সঙ্কটসময়ে যাঁহারা সত্য তথ্যের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদিগের মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে লোকের মনকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়েই উহা প্রচার করা হইয়াছিল। স্যার চার্লস্‌কে আমরা একজন কৃতী কর্মচারী বলিয়াই জানি, কিন্তু তিনি যে একজন কুটিল তার্কিক তাহা আমরা জানিতাম না। স্যার চার্লস্ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পরলোকগত দেশবন্ধু মেয়র হইয়াই যাঁহারা দেশের জন্য কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চাকুরি লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে দেশবন্ধু সত্যই এরূপ করিয়াছিলেন কিনা, কর্পোরেশনের কাগজপত্রে তাহার প্রমাণ নাই। ধরিয়া লওয়া গেল তিনি তাঁহাদিগকে চাকুরি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দোষের কি আছে? দেশবন্ধু মেয়ররূপেও জেল খাটিয়াছেন। দেশের কাজে জেল খাটিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেশের কাজে জেল খাটিয়াছেন। দেশের কাজে জেল খাটিয়াছেন এক কথা, আর কর্পোরেশন অনেক বিপ্লবী ও তাঁহাদের আত্মীয়গণকে শিক্ষকতার চাকুরি দিয়া পুষিয়া আসিতেছেন, এ কথা বলার অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশের কাজ করা আর বিপ্লবী হওয়া এক কথা নয়। এই পার্থক্য রাস্তার লোকও বুঝিতে পারে, স্যার চার্লস কি বুঝিতে পারেন না?

"সময় বুঝিয়া স্যার চার্লস্ এখন সেই পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন কেন, এ বিষয়ে মেয়র বলেন: ইহা যে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক প্রচারকার্য, তাহা বুঝিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ বহুবার আনীত হইয়াছে, প্রতিবারই কর্পোরেশন অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। স্যার চার্লস যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যদি সত্য থাকিত, তাহা হইলে ঐ সময়ে কেন তিনি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? ঐ সময় তাঁহার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং সরকারেরও তাঁহার উপর যথেষ্ট আস্থা ছিল। আমি শিক্ষা-বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, চাকুরি পাওয়ার পর বিপ্লববাদ সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছে এরূপ কোন লোককে চাকুরি দেওয়া হয় নাই; তবে সেই বৎসর পূর্বে একটি ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত এক ব্যক্তিকে চাকুরি দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি কোন কালে যদি বিপ্লববাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে চাকুরি দেওয়ার

পক্ষে বাধা কি? বাংলার ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড লিটন ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারে মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি স্বীকারোক্তি করায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সরকারী চাকুরিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষে কি ইহা অসঙ্গত হইয়াছে, না হইয়া থাকিলে এই ধরনের অভিযোগের মূল্য কি?

"মেয়র বলেন—আমি পূর্বেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি যে, কর্পোরেশন এই সকল অভিযোগ খণ্ডন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিবে, নাগরিকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারিবে। এই বিষয়ে কর্পোরেশনের সাফল্যই সম্ভবতঃ কোন কোন লোকের মনে হিংসার জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। আমরা যতদিন পর্যন্ত যথাযথভাবে আমাদের কর্তব্য সমাধান করিয়া যাইতে পারিব, ততদিন পর্যন্ত আমরা সগর্বে সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রবচনের উল্লেখ করিবার অধিকারী থাকিব—"উহারা অনেক বলিয়াছে, অনেক বলিবে, যত পারে বলুক।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩২) এমন আরও অনেক কাজ বিধানচন্দ্র করেন, যাহা কলিকাতা পৌরসভার ইতিহাসে অভিনব।

গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তাঁহার আশ্রমবাসী উনআশি জন সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে লইয়া লবণ-সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ করেন। ডাণ্ডি অভিমুখে মহানায়কের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গুর্জর হইতে পূর্বে বঙ্গদেশের মেঘনা-সৈকত অবধি সমগ্র দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মহাত্মাজীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিদ্যুদ্‌বেগে পরিব্যাপ্ত হইল দেশময়। জনগণের নিকট অপরাধী স্বৈরাচারী বিদেশী রাজার দুর্বলচিত্তে শঙ্কা জাগিল। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার তৃতীয় মাসেই গান্ধীজী বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৪ই মে তারিখের অলডারম্যান ও কাউন্সিলারদিগের সভায় মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, অহিংসার দেবদূত মহাত্মা গান্ধীকে এই পৌরপ্রতিষ্ঠান পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রণতি নিবেদন করিতেছে এবং তাঁহার অভিযানের অভূতপূর্ব সাফল্যে ও তাঁহার কারাবরণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ডালহাউসি স্কোয়ারে মহাকরণে (রাইটার্স বিল্ডিংএ) বেলা দ্বিপ্রহরের পরে বাংলা সরকারের তদানীন্তন ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অব্ প্রিজন্ লেফটেনেণ্ট-কর্নেল সিম্‌সন তিনজন সশস্ত্র বিপ্লবী যুবকের রিভলভারের গুলিতে নিহত হন। ঘটনার অল্পক্ষণের মধ্যেই অস্ত্রধারী পুলিসবাহিনী আসিয়া রাইটার্স বিল্ডিং

বেষ্টন করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত থাকে এবং একদল উপরে উঠিয়া বিপ্লবীদের ধরিবার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিবর্ষণ চলে; তাহাতে কোন পক্ষেই হতাহত হয় নাই। বিপ্লবীদের সমস্ত গুলি ফুরাইয়া গেল। অধিনায়কের আদেশ, কোন অবস্থাতেই শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ নহে, বরং আত্মবিলোপ। দুর্ধর্ষ বিপ্লবীত্রয়—বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দিনেশ গুপ্ত মারাত্মক বিষ পটাসিয়াম সাইনাইড্ পান করিলেন এবং বিনয় ও দিনেশ বিষপানের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলিও ছুঁড়িলেন। সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ পঞ্চদশ-বর্ষীয় বাদলের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। পাঁচ দিন পরে বিনয়ের প্রাণ-বিয়োগ হইল হাসপাতালে। দিনেশের তখন মৃত্যু হইল না। সুস্থ হইবার পরে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলের বিচারে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুআরি তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। হাইকোর্টে আপীলে বিচারপতি বাকল্যাণ্ড সেই দণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখেন।

৭ই জুলাই প্রাতঃকালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দিনেশের ফাঁসি হইল। মৃত্যুঞ্জয় বিপ্লবী বীর প্রফুল্লচিত্তে "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল···জীবনের জয়গান।" সেই দিন কলিকাতায় হরতাল পালন করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক মহতী জনসভায় বিপ্লবী দধীচির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইল। কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের এক সভায় দিনেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, আত্মোৎসর্গ ও আদর্শনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক হইতে এবং কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে দিনেশ তাঁহার জীবনাদর্শকে সার্থক করিবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহা সমর্থন করিতে পারা যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার ব্রতপালনে অন্তিমকাল পর্যন্ত যে সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তৎপ্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারি না। এই পর্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দিনেশ প্রফুল্লচিত্তে ফাঁসুড়ের ফাঁস গলায় পরিয়াছেন; এবং তাঁহার কণ্ঠ হইতে যে শেষ বাণী ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা 'বন্দে মাতরম্'। হাইকোর্টের বিচারপতি বাকল্যাণ্ড তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, ওই যুবক আত্মস্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় নাই। বস্তুতঃপক্ষে বিচারপতি বাকল্যাণ্ড কেবল ইতিহাসের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। আমরা এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত বহুবার পাঠ করিয়াছি—যেখানে অনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়া যাঁহারা একপুরুষে দণ্ডিত হইয়াছেন, পরবর্তী পুরুষে তাঁহারা সেই কার্যের জন্যই শহীদ বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। অতএব এই যুবক তাঁহার জীবনাদর্শকে সার্থক করিবার

জন্য যে সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

যে সকল দেশভক্ত জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি ডাঃ রায়ের শ্রদ্ধা যে কত গভীর, তাহা পূর্বোক্ত ভাষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ভাষণে তাঁহার সৎসাহসের পরিচয়ও মিলিবে।

গান্ধীজী কলিকাতা পৌরসভা কর্তৃক এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণের সংবাদ পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কারণ তিনি হিংসাত্মক কোন কার্যকে প্রশংসনীয় মনে করিতেন না, তাহা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য হইলেও। মহাত্মা গান্ধী ঐ প্রস্তাবটিকে প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলেন। কংগ্রেসের অনুগত সৈনিক এবং মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বস্ত শিষ্যরূপে বিধানচন্দ্র ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইতে চাহিলেও উহা প্রত্যাহার করিয়া লইবার আর কোনও উপায় তখন ছিল না। বিধানচন্দ্র তখন প্রস্তাব দেন যে, ইহা লিপিবদ্ধ করা হউক যে, মহাত্মা গান্ধী তথা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উহা এখন প্রত্যাহারের উপায় না থাকায় করা হইল না।

কবিগুরুর সপ্ততি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কর্পোরেশন কর্তৃক তাঁহার সংবর্ধনা ডাঃ রায়ের মেয়র-পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর (১১ পৌষ, ১৩·৮ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার নাগরিকগণের এক সভায় মহানাগরিক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন :

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবিপ্রতিভা সমগ্র সভ্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জন সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জন-সমাজে সম্মান লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ

উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনা-প্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে এবং তোমার লেখনী-নিঃসৃত অমৃতধারা বাঙালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞানগুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

বন্দে মাতরম্।

কলিকাতা,
১১ই পৌষ, ১৩৩৮

তোমার গুণগর্বিত
কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়,
মেয়র

পাঠান্তে বিধানচন্দ্র কবিগুরুকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলে উত্তরে তিনি বলিলেন—

"একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজ-মহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবি সংবর্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে, আরোগ্যে, আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক—পুরবাসীর দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃ-বিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি, সকল ধর্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক, এই আমি কামনা করি।"

ওইদিন বাংলার জনসাধারণের পক্ষেও কবিগুরুকে জনসভায় অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। সেইজন্য "রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদ" নাম দিয়া বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া পূর্বেই একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাহাতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কবি কামিনী রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। সেই পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দ্বিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র বঙ্গদেশে জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনও তাঁহাকে সংবর্ধিত করিয়াছিল। ১০ই ডিসেম্বর কর্পোরেশনের উদ্যোগে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আচার্যদেবকে মানপত্র দানে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় রচিত মানপত্র মেয়র পাঠ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাহাতে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য কর্পোরেশনকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন - হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, ৬৪ হাজার টাকার বেতনভোগী শাসন-পরিষদের সদস্যগণ ছাড়াও আমাদের চলে, কিন্তু শিক্ষকদিগকে ছাড়া আমাদের চলে না। কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ৪০ হইতে ৫০ হাজার বালক-বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। কর্পোরেশন উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর বালক-বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কিরূপ চেষ্টা করিতেছে, সেই বিষয়টির প্রতি একজন শিক্ষক হিসাবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি। অনুন্নত সম্প্রদায়ের অনেকে শিক্ষকতা-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা যে কর্পোরেশনের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষাদান কার্যে প্রতি বৎসর সাড়ে এগার লক্ষ টাকা ব্যয়ও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। কিন্তু একজন শিক্ষক হিসাবে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাগণের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য মেয়রের মারফত কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানাইতেছি।

আচার্যদেব তাঁহার ভাষণে আরও বলেন : রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জন্যই কর্পোরেশনকে নিজেদের বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো চটি পায়ে দিয়া ঢুকিতে পারি। কর্পোরেশন শহরের হাসপাতালগুলিতে এককালীন ৪ লক্ষ টাকা এবং নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিয়া থাকেন, ইহাও উল্লেখযোগ্য বিষয়। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আজকাল এ দেশের চিকিৎসকগণ বহুল পরিমাণে জনহিতকর কার্যে যোগদান করিতেছেন ; ইতিপূর্বে এরূপ বড় একটা দেখা যাইত না। কিন্তু এখন বড় বড় চিকিৎসকদের আমরা জনসেবকরূপে দেখিতে পাইতেছি। এই সম্পর্কে স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ আন্‌সারী, ডাঃ দেশমুখ এবং আমাদের মেয়র মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরদিন আচার্যদেবের সম্মানার্থ কর্পোরেশনের অফিস এবং তদধীন সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকে।

পুরসভায় ডাক্তার রায়ের মহানাগরিকত্বের (Mayoralty-র) কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। পূর্ব হইতেই বিষয়টি কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবর্ধনা-সভায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করায় কংগ্রেসী দলের নেতা বিধানচন্দ্রের পক্ষে বেতনবৃদ্ধির বিবেচনাধীন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সুবিধা হইল। এগার দিন পরেই ২০শে ডিসেম্বরের অলডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের সভায় বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রথম বার কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইবার কালে তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারের জন্য তাঁহার মেয়র নির্বাচন কালে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিঃ জে. এন. মৈত্র এবং মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক। এইবার সন্তোষকুমার বসু ডাঃ রায়ের নাম প্রস্তাব করেন। ডাঃ রায় নির্বাচিত হইলেন ৪২ ভোটে, মিঃ মৈত্র এবং মৌলবী হক পাইলেন যথাক্রমে ২৬ ভোট ও ৮ ভোট। প্রথমবারের কার্যকাল শেষ হইয়া গেলে কাউন্সিলার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাঃ রায়ের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনের ইতিহাসে তাঁহারা এই প্রথম দেখিতে পাইলেন যে, মেয়র দ্বিপ্রহরে অফিসে আসিয়া অপরাহ্ণ তিনটা পর্যন্ত কাজ করিতেছেন। জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাঃ রায়ের কাজ করার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থাকিলেও পুরসভার ব্যাপক ও সমস্যা-সংকুল কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নবাগত। তৎসত্ত্বেও তিনি সাফল্যের সহিত তাঁহার কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করিয়া সমস্ত দলের প্রশংসা লাভ করেন। দ্বিতীয়বার মেয়রের কার্য সমাপনান্তে বিদায় লইবার কালে অলডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের সভায় বিপক্ষদলের পক্ষে মিঃ পি. এন. গুহ, মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ ক্যাম্বেল ফরেস্টার প্রভৃতি ডাঃ রায়ের প্রশংসা করিলেন। মিঃ গুহ বলেন যে, এমন কোন উপলক্ষ কখনও হয় নাই, যাহাতে মেয়রের কোন সিদ্ধান্তে বা সভার কার্য পরিচালনায় আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারিত। মিঃ বিশ্বাস বলেন যে, কৃতজ্ঞতা ও গুণগ্রাহিতার সহিত তিনি স্বীকার করিতেছেন ডাঃ রায় তাঁহার ভুল বুঝিতে পারা মাত্রই তাহা সংশোধন করিতেন। মিঃ ফরেস্টার বলেন যে, মেয়র অতি উত্তমরূপে (extremely well) তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং কেহই তাঁহার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পান নাই।

পৌরসভায় চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা বিধানচন্দ্রই করেন। উহার ফলে কেবল সুপারিশ ও স্বজনপোষণের দ্বারাই নহে, যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ সম্ভব হয়। ইহাতে পৌরসভার কাজকর্মে দক্ষতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

১৬

শিল্পপতি বিধানচন্দ্র

বিধানচন্দ্রের ছিল বহুমুখী প্রতিভা। তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িলে উহাতেও যে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করিতেন, তাঁহার পরিকল্পিত ও নিজ তত্ত্বাবধানে নির্মিত বিশাল হর্ম্যগুলি দেখিলে তাহা সহজেই বোঝা যায় এবং একথা বহু শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারও বিস্ময়ের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয়। শিক্ষাক্ষেত্র হইতে তিনি যখন রাজনীতিক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, তখনও তিনি যে দক্ষতা ও প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর। অনেকে মনে করেন, তিনি যদি ব্যবসায় ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা নিয়োগ করিতেন, তাহাতেও তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করিতেন। তাহার সামান্য দৃষ্টান্ত আসামে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা স্থাপন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই তাঁহার প্রথম যৌবন কাটিয়াছিল। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন যে একান্তভাবে প্রয়োজন, তাহা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিতেন। এ বিষয়ে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার নীলরতন সরকার প্রভৃতির মতো মহামনীষীরা তাঁহাকে আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র তাঁহার কর্মময় জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া প্রবেশ করেন নাই। আসামে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা স্থাপনও তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ঐ সংস্থা স্থাপন সম্পর্কে বিধানচন্দ্র নিজে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া মোটরে করিয়া শিলং যাইতেছিলেন। তিনি নিজেই গাড়ি চালাইতেছিলেন। গৌহাটির নিকটস্থ রেল স্টেশন আমিনগাও হইতে শিলংয়ের দূরত্ব ৬৮ মাইল। কিন্তু ৫২ মাইল যাইবার পর দেখা গেল যে গাড়ির তেল ফুরাইয়া গিয়াছে। গাড়িতে বিধানচন্দ্র ছাড়া আরও সাতজন ছিলেন। ঐ সময় ব্যক্তিগত গাড়ি ছাড়া ভাড়াটে ট্যাক্সির চল ছিল না। যাত্রীদের মোটর কোম্পানির গাড়িতে আসন সংরক্ষিত করিয়া যাতায়াত করিতে হইত। দেরিতে আমিনগাও হইতে তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাই পথিমধ্যে যখন গাড়ির তেল ফুরাইয়া গিয়া গাড়ি অচল হইল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছে, যাত্রী-গাড়িগুলিও চলিয়া গিয়াছে। একমাত্র ডাকবাহী গাড়িটিই আসিতে বাকি আছে। তাহাতে তাহাদের লোকজন ও ডাক আসিতেছে। এই অবস্থায় বিধানচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীরা খুবই বিপদে

পড়িলেন। রাত্রি হইয়া গেল। অবশেষে ডাকবাহী গাড়িটি আসিয়া পৌঁছিল। বিধানচন্দ্র ডাক-গাড়িটিকে থামাইয়া তাহার চালককে বলিলেন, তাঁহাকে শিলং যাইবার মতো পেট্রোল না দিলে তিনি ডাক-গাড়িটিকে যাইতে দিবেন না। কিছু তর্ক করার পর ডাক-গাড়ির চালক তাঁহাকে প্রয়োজনীয় তেল দিল এবং তাঁহারা শিলং যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন শিলংয়ে পৌঁছিলেন, তখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। শিলং শহরের পৌরসভা জ্যোৎস্নার উপর নির্ভর করিয়া মাসের অর্ধেকটা সময় পথে গ্যাসের বাতি জ্বালাইত না। বিধানচন্দ্ররা যখন শিলং গিয়াছিলেন, তখন ছিল শিলং পৌরসভার সেই অন্ধকার পক্ষ। অন্ধকারে পথ ঠিক করা কঠিন হইল। বিধানচন্দ্র তাঁহাদের ভাড়া-করা বাড়ির পথের নিশানা জানিবার জন্য এক দোকানদারের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে দোকানদারটি ছিল বাঙ্গালী। সে পথের নিশানা দিলেও অন্ধকারে পথ ঠিক করা কঠিন ছিল। অবশেষে বিধানচন্দ্র বাড়ির পথ দেখাইবার জন্য তিনজন খাসিয়াকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে বিধানচন্দ্র শেষ পযন্ত ভাড়া-বাড়ির সন্ধান পাইলেন। পথে আসিবার সময়ে শহরটিকে খুবই মনোরম মনে হইল। কিন্তু কোথাও আলোকের চিহ্নমাত্র ছিল না।

পরদিন সকালে বিধানচন্দ্র শিলং শহরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং এমন একটি স্থানে বৈদ্যুতিক আলোক নাই জানিয়া দুঃখ বোধ করিলেনা। তিনি তাঁহার এক ডাক্তার বন্ধুকে শিলংয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার বন্ধুটি বিধানচন্দ্রকে এ বিষয়ে জানিবার জন্য তাঁহার বন্ধু আর. দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। বিধানচন্দ্র আলাপ করিয়া জানিলেন যে, দত্ত আর-এক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া একটি জল-প্রপাত—বীডন জলপ্রপাত—ইজারা লইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। বিধানচন্দ্রের মাথায় একটি মতলব খেলিয়া গেল। তাঁহার মেজদাদা সাধনচন্দ্র ইংল্যাণ্ড হইতে ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে শিলং শহরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য একটি কোম্পানি খোলা যায় কিনা বিধানচন্দ্র এ বিষয়ে দত্তের সহিত আলোচনা করিলেন এবং শিলং শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য একটি কোম্পানি খুলিবার জন্য সরকারের কাছে লাইসেন্স চাহিয়া আবেদন করিলেন।

লাইসেন্স পাইবার ব্যাপারে বিঘ্ন দেখা দেওয়ায় বিধানচন্দ্রের উৎসাহ-উদ্যম আরও বাড়িয়া গেল। ঐ সময়ে শিলংয়ের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন একজন ইংরেজ। তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য লাইসেন্স ক্যাপ্‌টেন ময়ো নামে জনৈক ইংরেজকে দিতে চাহিলেন। কোনও জলপ্রপাতের উপর ক্যাপ্‌টেন ময়োর দখল না থাকায় তিনি

কয়লা বা ডিজেল হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে অনেক বেশি ব্যয়বহুল, এই কারণ দেখাইয়া বিধানচন্দ্র লাইসেন্স পাইবার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে লাগিলেন। প্রায় নয় মাস ধরিয়া এই দ্বন্দ্ব চলিল। ডেপুটি কমিশনার স্বভাবতই একজন ইংরেজকে লাইসেন্সটি দিতে চাহিয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র এ বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লাইসেন্স আদায় করিলেন। ব্যাপারটা এখন বিধানচন্দ্রের কাছে শিল্পস্থাপন বা অর্থোপার্জনের চেয়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের লড়াইয়ে পর্যবসিত হইয়াছিল। লাইসেন্স পাইবার পর বিধানচন্দ্রের কাজ হইল আধুনিক শিল্পে ভারতীয়রাও যে বৃটিশের অপেক্ষা অনগ্রসর নয় তাহা প্রমাণ করিয়া দেখানো। এজন্য বিধানচন্দ্রকে প্রায়ই শিলং যাইতে হইত। এ ব্যাপারে যে সকল সমস্যা দেখা দিল, সেগুলির সমাধানও তিনিই করিলেন। এইভাবে তাহাদের স্থাপিত বিদ্যুৎসংস্থা লাইসেন্স পাইবার পর মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে শিলংয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইল। এত অল্পসময়ে এইভাবে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার কাজ সম্পূর্ণ করা সত্যই অভাবনীয় ছিল। এইভাবে স্থাপিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন সংস্থা সুদীর্ঘকাল শিলং শহরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়াছে এবং নৈসর্গিক দৃশ্যে মনোরম শিলংকে আরও মনোরম করিয়াছে।

১৭

কংগ্রেসী নেতৃমণ্ডলে আসন লাভ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিলেন গান্ধীজী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের নেতার ('লীডার'-এর) পদে তিনি গান্ধীজীর নির্দেশে অধিষ্ঠিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর যোগ্য শিষ্যের শিরে 'ট্রিপ্‌ল্‌ ক্রাউন' বা ত্রিমুকুট পরাইয়া দিলেন। সেই মহান্ নেতার জীবনাবসানের কিছুকাল পর হইতে বাংলাদেশের পাঁচজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতাকে একসঙ্গে মিলিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে কাজ করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত; চারজন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার এবং একজন কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রভাবশালী সদস্য। তাঁহারা 'বিগ্‌ ফাইভ্‌' অর্থাৎ বৃহৎ পঞ্চক বলিয়া অভিহিত হইতেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং তুলসীচরণ গোস্বামীকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল দেশবিশ্রুত বৃহৎ পঞ্চক। প্রথমজন যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী, চতুর্থজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং পঞ্চম-জন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বড় জমিদার। হয়তো বা অনেকের মনে এরূপ ধারণা থাকিতে পারে যে, উল্লিখিত পঞ্চনেতা পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে এবং তাহা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র অথচ বলিষ্ঠ সঙ্ঘ গড়িয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা ঠিক নহে। বস্তুতঃপক্ষে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একমত হইয়া কাজ করিতে করিতে আপনা হইতেই এই দলটা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনের কিছুকাল পরে বাংলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল,—একটি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সমর্থক এবং অন্যটি সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক। সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) 'বিগ্‌ ফাইভ্‌'-এরও সমর্থন পাইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলার দুইটি প্রধান বিপ্লবীদলের মধ্যে 'অনুশীলন' দল ছিল যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে এবং 'যুগান্তর' দল ছিল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। তবে এইভাবে পক্ষাবলম্বনের ব্যাপারে দুইটি দলের বিপ্লবীদের মধ্যে কতক ব্যতিক্রমও ছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের দুইটি দলের (যতীন্দ্রমোহনের এবং সুভাষচন্দ্রের) মধ্যে ব্যতিক্রম-শ্রেণীর অর্থাৎ স্বাধীন মতের অনুগামী বিপ্লবীর সংখ্যা ছিল সামান্য। গান্ধীপন্থী দলের পূর্ণ

সমর্থন পাইয়াছিলেন যতীন্দ্রমোহন। এই স্থলে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে আদর্শ, মত বা পথের পরিবর্তনের জন্য কিংবা অন্যান্য কারণে দলের ঐক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ থাকে না। কয়েক বৎসর পরে বৃহৎ পঞ্চকের মতৈক্য নষ্ট হওয়ায় নেতৃবর্গের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। এদিকে যতীন্দ্রমোহনের বন্দী থাকা অবস্থায় মৃত্যু হইবার কিছুকাল পরে বিপ্লবী দল দুইটির সদস্যগণের সংহতিও ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে দুইটি দল থাকিলেও দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় দল সম্মিলিতভাবে কাজ করিত। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে ৪৩তম অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে দুই দলই মিলিত হইয়া কাজ করিয়াছিল। কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র; এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (জি. ও. সি.) নির্বাচিত হইয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন নলিনী-রঞ্জন সরকার। উভয় দলের সম্মিলিত কার্য, ঐকান্তিকতা ও কর্মনিষ্ঠার ফলে কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সফলতার প্রশংসা যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাপ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রায়ের, তাহা যতীন্দ্রমোহনও স্বাভাবিক উদারতাবশতঃ নিজেই প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন। কংগ্রেসের ন্যায় একটা শক্তিশালী সর্বভারতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনকে সুসম্পন্ন করিতে হইলে যে শ্রমশীলতা, কর্মনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি সংগঠনী ক্ষমতার প্রয়োজন, ওই সমুদয়ের কোনটিরই অভাব ছিল না ডাঃ রায়ের মধ্যে। দলাদলির সংকীর্ণ মনোভাব হইতে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া স্বাভাবিক ঔদার্যের সহিত তাঁহার উপর ন্যস্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উভয় দলের আন্তরিক সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হন নাই। কর্তব্য-কার্য বণ্টনের জন্য যে সকল কমিটি সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশমতো গঠিত হইয়াছিল, সেইগুলির সম্পাদক তিনি বাছাই করিলেন এমনভাবে যে, দুই দলই তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। বাছাই করার কালে তিনি যোগ্যতা এবং সততার মাপকাঠি দিয়া সম্পাদকগণের গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের এবং বিশেষ করিয়া শিল্প-প্রদর্শনীর জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়া গান্ধীজী অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিকূল মন্তব্য আমাদের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসের নেতা এবং কর্মিগণের মধ্যে বিধানচন্দ্রের খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই বৎসরই বিধানচন্দ্র সর্বপ্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসন পাইলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে। তদবধি ডাঃ রায় মৃত্যু পর্যন্ত বহু বৎসর যাবত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রূপে ভারতের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্'-এর পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করার জন্য একটি প্রভাবান্বিত দল দাবি জানাইল। সেই দলের পুরোভাগে ছিলেন—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি জননায়কগণ। জওহরলালজী ছিলেন সেই বৎসর কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। এই দাবিকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের মধ্যে বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠিলে গান্ধীজী মধ্যস্থ হইয়া তাহা মিটাইয়া দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল; কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যদি 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' প্রদান করে, তাহা হইলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবে। পূর্বোক্ত প্রস্তাবটির সারমর্ম এবং উত্থাপন ও গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"গতকল্য বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে মহাত্মা গান্ধী পূর্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন—'সর্বদল সম্মেলনের কমিটির রিপোর্টে যে শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া কংগ্রেস উহাকে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে করিতেছে; এবং ব্যবস্থাগুলিতে কার্যতঃ কমিটির সদস্যগণ সকলেই একমত হইয়াছেন দেখিয়া কমিটিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছে; এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব অব্যাহত রাখিয়া রাজনৈতিক অগ্রগতি হিসাবে, বিশেষতঃ দেশের শক্তিশালী দলগুলি ইহাতে যথাসম্ভব একমত হইয়াছেন, এইজন্য কমিটির রচিত শাসনতন্ত্রখানি অনুমোদন করিতেছে। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেন, তবে তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষে কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিবে; কিন্তু যদি ঐ তারিখের মধ্যে উহা গৃহীত না হয়, অথবা ঐ তারিখের পূর্বেই যদি ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট উহা প্রত্যাখ্যান করে, তবে দেশকে করপ্রদান বন্ধ করিতে বলিয়া এবং অন্যান্য কাযের দ্বারা অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করিবে। এই প্রস্তাবানুসারে কংগ্রেসের নামে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতে কাহারও বাধা থাকিবে না।' মহাত্মাজীর প্রস্তাব ১১৮-৪৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই বাংলার প্রতিনিধি।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯২৮ খ্রীঃ ২৯শে ডিসেম্বর)

পূর্বোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং শরৎচন্দ্র বসু বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া গান্ধীজী যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রারম্ভেই

জওহরলাল নেহরুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল। তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি হইয়াও কেন তৎকালে সভায় আসেন নাই, গান্ধীজী তাহার কারণও বর্ণনা করেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেও প্রস্তাবটি অপরিবর্তিতভাবেই গৃহীত হইল।

কংগ্রেসের সেই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ভারতের জনমতের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরুইন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক ঘোষণায় প্রচার করিলেন যে, 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' ভারতীয় শাসন-সংস্কারের লক্ষ্য। সেই ঘোষণায় ইহাও প্রচারিত হইল যে,—সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে ভারত-শাসন সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা হইবে, এবং সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য লণ্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হইবে। কিন্তু ইতোমধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের মতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। বড়লাটের ঘোষণার সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ঘোষণার সম্পূর্ণ সঙ্গতি ছিল না। কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রচারিত সদিচ্ছায় সন্দিহান হইল। কংগ্রেসের উপর সেই অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর) গৃহীত প্রস্তাবে। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের কোন প্রয়োজন নাই।

লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই বাংলার কংগ্রেসীদের মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির) সদস্য নির্বাচন লইয়া সুভাষচন্দ্রের দল এবং সেনগুপ্তের দলের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। উভয় দলের পক্ষভুক্ত এবং সমর্থক সদস্যগণের অধিকাংশই লাহোরে গিয়াছিলেন। কিন্তু আপসে মিটমাট না হইলে সমস্ত সদস্য উল্লিখিত কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নাই। ডাঃ রায় 'বিগ্ ফাইভ্'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সুভাষ বসুর দলের সমর্থক হইলেও দলাদলি পছন্দ করিতেন না। দলাদলি চলিতে থাকিলে যে রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হয়, তাহা অন্যান্য নেতার মতো তিনিও অবগত ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কাজে নামিলে একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে; তবে দলভুক্ত হইলেই যে দলাদলিতে জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে, ইহা কাজের কথা নয়। ডাঃ রায় লাহোরে গিয়া বাংলার কংগ্রেসীদের দলাদলি রক্ষা করিতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাংলা কংগ্রেসের দলাদলি অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিগণেরও সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উভয় দলই বুঝিলেন যে দলাদলি না মিটিলে বাংলার মর্যাদা তো নষ্ট হইবেই, পরন্তু আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। দুইটি বলিষ্ঠ

রাজনৈতিক দলের বিবদমান সহকর্মীর মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া মিলন ঘটাইতে হইলে কতটা ধৈর্য, বুদ্ধি-বিবেচনা, কৌশল, আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন তাহা রাজনীতি-ক্ষেত্রের কর্মীমাত্রই জানেন। ডাঃ রায়ের ওই সমুদয় গুণের অভাব ছিল না। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে কিভাবে যে গৃহবিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকার ২৯শে ডিসেম্বর (১৪ই পৌষ ১৩৩৬ সাল, রবিবার) তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় দুই স্তম্ভব্যাপী শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে শিরোনামা-সমেত সেই বিবরণ উদ্ধৃত হইল :

"নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বাঙ্গলার কংগ্রেসী কলহ"
"ডাঃ বিধান রায়ের আপস প্রস্তাব"
"লাহোর অধিবেশনের জন্য সাময়িকভাবে গৃহীত"
"নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে দুই দলের যোগদান"

লাহোর, ২৮শে ডিসেম্বর। "বেলা ২৷৹ টার সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পুনরায় বিষয় নির্বাচনী-সমিতির অধিবেশন হয়। সভার কার্য আরম্ভ করার পূর্বে সভাপতি অনিবার্য কারণে বিলম্ব হইবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন; এবং অতঃপর তিনি বাংলার কংগ্রেসীদের কলহ সম্পর্কীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন, এই সম্পর্কে যে ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে, উহা কতকটা বিধি-বহির্ভূত, কিন্তু সংশোধনের অসুবিধা অনেক বেশী। সভা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারেন। তিনি অতঃপর সভাকে সুপারিশ করেন যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে আপস প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন, উহা সভায় গ্রহণ করা কর্তব্য।

"ডাঃ রায় নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন :

"ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি-সংখ্যা অতিক্রম না করিলেও বাংলার পুরাতন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণকে এবং নবনির্বাচিত সদস্যগণকে একযোগে বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে কাজ করিতে দেওয়া হউক। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি-সংখ্যা ৪৮, কিন্তু বর্তমানে লাহোরে নূতন এবং পুরাতন লইয়া মোট ৩৮ জন উপস্থিত আছেন। কাজেই এ বিষয়ে কোন বাধাবিপত্তি নাই। ডাঃ রায় বলেন যে, দুঃখের বিষয়, বাংলার কংগ্রেসী নির্বাচন লইয়া কিছু মতানৈক্য ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে দুইটি বিধিসম্মত বিবেচনা করিতে হইবে; একটি বিষয় হইল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুরাতন সদস্যগণকে কাজ করিবার অধিকার দান, অপর বিষয় হইল বাংলার নব-নির্বাচিত সদস্যগণ। এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে সভাকে বিবেচনা করিতে হইবে। এই বাংলার কংগ্রেসী কলহ সম্বন্ধে

আপীল দায়ের করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, আমি আমার বাংলার সদস্যগণের এই সমস্যার একটা মীমাংসার জন্য অনুরোধ করি। আমরা ইহাও জানি যে, আমি যে সমাধানের উপায় নির্দেশ করিব, উহা কতকটা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, বিধি-বহির্ভূত যদি কিছু করিতেই হয় তাহা হইলে মূল প্রতিষ্ঠান দ্বারাই তাহা করা কতব্য। পণ্ডিত মতিলালের নির্দেশ অনুসারে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতিকে বাংলার পুরাতন প্রতিনিধিগণকে এবং নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে যোগদান করিবার অধিকার দিতে অনুরোধ করিতেছি। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে বাংলার নির্দিষ্ট প্রতিনিধির সংখ্যা ৪৮, কিন্তু বর্তমানে লাহোরে বাংলার মাত্র ৩৮ জন নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির সভ্য আছেন, কাজেই এ বিষয়ে কোনই অসুবিধা হইবে না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কর্তৃক বাংলার এই কংগ্রেসী কলহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ডাঃ রায়ের প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত সত্য, কিন্তু ইচ্ছা করিলে বিধিসম্মত করিয়া লইতে পারি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সকল ব্যাপারকে বিধিসম্মত করিয়া মানিয়া লওয়া কতব্য।"

প্রস্তাবটি যথারীতি গৃহীত হইল। কিন্তু পরদিন আর এক সমস্যা দেখা দিল।

পরবর্তী দিবস (২৯শে ডিসেম্বর) লাহোরের জাতীয়তাবাদী পভার্তী সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার দলভুক্ত ২৭ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যের এক বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ায় পূর্বদিনের গৃহীত আপস-প্রস্তাবটি নিষ্ফল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। ওই বিবৃতি প্রকাশ করায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অপমান হইয়াছে এবং তাহা শিষ্টাচারসম্মত হয় নাই ইত্যাদি অভিযোগ আনা হইল সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহার দলের স্বাক্ষরকারী ২৭ জন সদস্যের বিরুদ্ধে। সেই দিনের বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভাপতি জওহরলাল নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন উল্লিখিত বিবৃতির প্রতি। ইহা লইয়া তুমুল তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁহার নিজের পক্ষে এবং দলের স্বাক্ষরকারী সদস্যগণের পক্ষে কৈফিয়ত দিতে উঠিয়া বলিলেন :

"গতপরশ্ব সভা ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর আমরা ঐ বিবৃতি দিয়াছি, উহা গতকল্য প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজ প্রকাশিত হইয়াছে। বিলম্বে প্রকাশের জন্য আমরা দায়ী নহি। সংবাদপত্রের উহা না প্রকাশ করা উচিত ছিল।"

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার উহা প্রকাশের জন্য সুভাষচন্দ্রকে দুঃখ প্রকাশ করিতে বলিলে তিনি তাহা করিলেন। ইহা লইয়া কিছুক্ষণ বিতর্ক চলে। ডাঃ রায় ব্যাপারটি বুঝাইতে উঠিয়া বলেন—গতকল্য এই কলহ সম্পর্কে সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপন

করা হয় এবং সভা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, ঐ অপরাধের জন্য তিনিই দায়ী। ডাঃ রায় আরও বলেন—আমি জানিতাম যে ২৮ জন সদস্য স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয়াছে ; পরে তদন্ত করিয়া উহা জানিতে পারি যে, উহা গতকল্য প্রকাশিত হয় নাই। সেইজন্যই আমি সভায় উক্ত আপস-প্রস্তাব তুলিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় আজ উক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার অপরাপর বন্ধুগণের তরফে নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, এই কংগ্রেসী কলহ নিষ্পত্তির ভার পণ্ডিত মতিলালের হস্ত হইতে অপর কাহারও হাতে তুলিয়া দিবার অনুমাত্র ইচ্ছাও সুভাষবাবুর বা তাঁহার বন্ধুদের নাই। তাঁহারা এখনও চাহেন যে, পণ্ডিত মতিলাল কর্তৃক এই কলহের মীমাংসা হউক ; যদি কোন পক্ষ পণ্ডিত মতিলালের বিচার মানিয়া না লয়, তখন সেই দল নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে আপীল করিতে পারে।

তৎপরবর্তী দিবসও (৩০শে ডিসেম্বর) নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে ট্রিবিউন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি সম্পর্কে চার ঘণ্টার ঊর্ধ্বকাল আলোচনা চলে। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাহাতে যোগ দিয়া সভাপতির নিকট আবেদন জানান যে, বিষয়টি যেন আর অগ্রসর না হয়, ওইখানেই উহার নিষ্পত্তি হউক। পরিশেষে ডাঃ রায়ের পরিশ্রম, চেষ্টা এবং আন্তরিকতার সুফল ফলিল। বিবৃতি প্রকাশের দরুন সুভাষচন্দ্র যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়াছিলেন, ডাঃ রায় তাঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিলেন।

২৯শে তারিখের বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের যে বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকার পরের দিনের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, দুইটি স্তম্ভ জুড়িয়া উহার শিরোনামা ছিল এই :

"সুভাষচন্দ্র বসুর অশিষ্ট আচরণ
"পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহরের অপমান
"বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে উত্তেজনা"

৩০শে তারিখের নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের বিবরণ পরবর্তী দিবসের সংখ্যায় বাহির হইল এই শিরোপা পরিয়া :

"পণ্ডিত মতিলালের অপমানের জের
"ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সুভাষচন্দ্রের রেহাই
"নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তুমুল আলোচনা"

আনন্দবাজার পত্রিকা যে তৎকালে গান্ধীপন্থী ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে সমর্থন করিয়া আসিয়াছে

সুভাষচন্দ্রকে। এমন কি যখন তাঁহার দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার পরে, অবিলম্বে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করার প্রস্তাবে কংগ্রেস সম্মত হয় নাই এবং সেইজন্য তাঁহার সহিত কংগ্রেসের বিরোধ ঘটে, তখনও তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছেন। ওই পত্রিকার মতো প্রভাবশালী ও লোকপ্রিয় সংবাদপত্রের সমর্থন থাকায় সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক্'-দলের বিরোধিতা যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছিল। এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সুভাষচন্দ্র কর্তৃক কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ ডাঃ রায় সমর্থন করেন নাই।

লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ২৬শে জানুআরি সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হইল। সেই অনুষ্ঠানের জন্য রচিত স্বাধীনতার সংকল্প-বাণী ওই দিন জনসভায় পঠিত ও গৃহীত হইয়াছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনও ছিল অনুষ্ঠানের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে ২৬শে জানুআরি স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানের উপসভাপতি ললিতমোহন দাশগুপ্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতার সংকল্প-বাণী পাঠ করেন ; কেননা সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু তিনদিন পূর্বে (২৩শে জানুআরি) রাজদ্রোহের মামলায় দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। স্বাধীনতা-দিবস পালন উপলক্ষে ভারতবর্ষের গ্রামে ও নগরে সর্বত্র অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। কংগ্রেসপন্থী লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার সংকল্প লইয়া প্রস্তাবিত আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

লবণ আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আশ্রমবাসী ৭৯জন সত্যাগ্রহী সহ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আশ্রম হইতে আরব সাগরের তীরে ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ করেন ১১ই মার্চ। সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভারত নব উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। গান্ধীজী পদব্রজে দুইশত মাইল দূরবর্তী ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়া ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহী বাহিনী সহযোগে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভঙ্গ করেন। যাঁহারা কারাবরণ করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে তিনি আহ্বান করিলেন লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে। সে আহ্বানে সাড়া দিতে লাগিলেন প্রতিদিন বহুসংখ্যক নরনারী। দেখিতে দেখিতে সেই আন্দোলন ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ঝটিকার বেগে। ৫ই মে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করিয়া বন্দী করা হইল। প্রত্যেক প্রদেশে আন্দোলনের গতি রোধ করিবার জন্য ভারত-সরকারের নির্দেশমতে প্রাদেশিক সরকারগুলি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। দমন-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগেও দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের দুর্নিবার বেগ সরকার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২৩শে জানুয়ারি বাংলাদেশের বারোজন নেতা

ও কর্মী রাজদ্রোহের অভিযোগে আলিপুরের (চব্বিশ পরগণা জেলা) 'অবর জেলাশাসক' মিঃ কে. এল. মুখার্জি কর্তৃক এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এবং কর্মসচিব কিরণশঙ্কর রায়, বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত এবং কর্মসচিব পুরুষোত্তম রায় প্রভৃতি। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি দিবস পালন করা হইয়াছিল। তজ্জন্য রাজদ্রোহের মামলার সৃষ্টি হয়। বিচারে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি নেতাদের গ্রেফতার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। ফলে বাংলার আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপর। তিনি বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মিগণের সহযোগিতায় সেই দুঃসাধ্য কর্তব্য দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-অমান্য আন্দোলন চলিতে থাকাকালে। ডাঃ রায় ওই সকল অধিবেশনে যোগদান করেন। আন্দোলন দমনের অভিসন্ধিতে ভারত সরকার তৎকালে যে প্রেস অর্ডিনান্স্ জারি করিয়াছিল, তাহা সভ্যতার উপর জুলুম বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাবে নিন্দা করে এবং যে সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সেই অর্ডিনান্সের বিধান মানিয়া চলিতে সম্মত হয় নাই, তাহাদের মর্যাদা-বোধ ও সৎসাহসের প্রশংসা করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে কমিটি ট্যাক্স বন্ধের অভিযান আরম্ভ করার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিল। ওয়ার্কিং কমিটির পূর্বোক্ত অধিবেশন হইয়াছিল এলাহাবাদে মে মাসে। পরের মাসে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সামরিক বিভাগে এবং পুলিস বিভাগে যে সকল ভারতীয় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হয় যে, উভয় বিভাগের ভারতীয়গণের স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য অন্যান্য ভারতীয়গণের মতো চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য, এবং নিরস্ত্র ও নিরুপদ্রব জনগণের উপর নির্মম আক্রমণ তাঁহাদের কর্তব্যকার্যের অঙ্গীভূত নহে। আইন-অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে এপ্রিল মাসে পেশোয়ারে অহিংসা-পন্থী লাল-কোর্তা ('রেড্-শার্ট') পাঠান সত্যাগ্রহীদের উপর সাঁজোয়া গাড়ী ('আর্মারড্ কারস্') হইতে গুলি চালাইয়া ব্যাপকভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। পাঠান সত্যাগ্রহী দলের একজনও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পশ্চাতে সরিয়া যান নাই। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বীরের ন্যায় আত্মবলিদান করিলেন। সেই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক একটা স্পেশ্যাল কমিটি নিযুক্ত হয়।

ওই হত্যাকাণ্ড নিতান্ত অন্যায়রূপে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কমিটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, ওয়ার্কিং কমিটি আগস্ট মাসে দিল্লী অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিল।

তৎকালে বিদেশী সরকারের নিগ্রহ-নীতি এমনভাবেই অনুসৃত হইতেছিল যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কারাবরণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিয়াই কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা করিতে হইত। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে গ্রেফতার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল; তাঁহার পরে কারাদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের উপর। কংগ্রেসের বিধি অনুসারে সংগ্রাম চলিতে থাকাকালে পদাসীন সভাপতি কারাগমনের পূর্বে তৎপদে পরবর্তী সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের শূন্যপদে নূতন সদস্য মনোনীত করিয়া যাইতেন।

পণ্ডিত মতিলাল আগস্ট (১৯৩০ খ্রীঃ) মাসে নাইনী জেলে কারাদণ্ড ভোগকালে গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার কাশির সঙ্গে রক্ত পড়িতেছিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারে যুক্তপ্রদেশের গবর্নমেন্ট ডাঃ এম এ. আন্সারি এবং ডাঃ বিধান রায়কে ওই জেলে যাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে অনুরোধ করেন। উভয়ে এলাহাবাদ হইতে নাইনী জেলে যাইয়া পণ্ডিতজীকে পরীক্ষা করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিলেন। ডাঃ আন্সারি দিল্লী চলিয়া গেলেন। ডাঃ রায় লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ পাইলেন যে, সরকারী ডাক্তাররা পণ্ডিতজীকে পরদিন পরীক্ষা করিবেন। সেইজন্য তিনি এলাহাবাদে থাকিয়া গেলেন এই ভাবিয়া যে আলোচনার্থ তাঁহার ডাক পড়িতে পারে।

ইহার পর ২৭শে আগস্ট নয়া দিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আন্সারির ভবনে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য ডাঃ রায় তথায় গেলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল। সেইদিন অপরাহ্নে কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকাকালে মিসেস্ কমলা নেহরু এবং মিসেস্ হংস মেটা ব্যতীত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে—ডাঃ এম এ. আন্সারি (সভাপতি), মথুরাদাস ত্রিকমজী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ভিঠলভাই প্যাটেল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, দীপনারায়ণ সিংহ, দুনীচাঁদ, সর্দার মঙ্গল সিং, চৌধুরী আবজল হক এবং রাজা রাওকে (সম্পাদক) পুলিস গ্রেপ্তার করিল। ওই দশজন সদস্যকে স্থানীয় জেলে লইয়া যাওয়া হইল। কারাগারের সীমানার মধ্যে প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটাইয়া তাহাদের রাখা হইল। পরদিন (২৮শে আগস্ট) জেলের ভিতরেই জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাদের বিচার করিলেন। নেতারা সত্যাগ্রহ-নীতির অনুসরণ করিয়া মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন না। বেআইনী জনতায় মিলিত হওয়ার অভিযোগে প্রত্যেকে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বিধানচন্দ্রও কারারুদ্ধ হইলেন। এইভাবে বিধানচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে প্রথম অগ্নি-অভিষেক ঘটিল। অবশ্য, বিধানচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছিলেন।

১৮

কারাগারে বিধানচন্দ্র

বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির পূর্বোল্লিখিত দশজন সদস্যের কারাদণ্ডের পরে যে সকল কংগ্রেস-নেতা ডাঃ আনসারি কর্তৃক সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ২৯শে আগস্টের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়। নিম্নে ওয়ার্কিং কমিটির নূতন সদস্যবর্গের নাম প্রদত্ত হইল : (১) চৌধুরী খালেকুজ্জমান, লক্ষ্ণৌ (সভাপতি), (২) পণ্ডিত হরকরণ নাথ মিশ্র, লক্ষ্ণৌ, (৩) কে. ভি. আর. স্বামী, রাজমহেন্দ্রী, (৪) এস. ভি. কৌজলগী, বিজাপুর, (৫) এ. এম. খাওজা, এলাহাবাদ, (৬) ইসমাইল গজনবী, অমৃতসর, (৭) শরৎচন্দ্র বসু, কলিকাতা, (৮) এস. এ. ব্রেলভি, বোম্বে, (৯) অধ্যাপক আবদুল বারি, পাটনা, (১০) আসফ আলি, দিল্লী, (১১) আবদুল্লাহিল বাকী, দিনাজপুর, (১২) ভেলজী. এল. নাপু, বোম্বে (কোষাধ্যক্ষ), (১৩) গোবিন্দকান্ত মালব্য, 'এলাহাবাদ।

দিনদশেক পরে ডাঃ বিধান রায় এবং দীপনারায়ণ সিংহকে দিল্লী কারাগার হইতে স্থানান্তরিত করা হইল। পুলিসসাহেব দুইজনকে একখানি মোটরগাড়ীতে করিয়া জেল হইতে আনিয়া রেলস্টেশনে প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। দীপনারায়ণ সিংহকে হাজারীবাগ রোড্ স্টেশনে যথাসময়ে নামিতে হইল। তথা হইতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে। ডাঃ রায় বর্ধমানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহার বড়দাদা সুবোধচন্দ্র রায়কে। তিনি কোন সূত্রে পূর্বেই গোপনে খবর পাইয়াছিলেন যে, সেই দিন বিধানকে কলিকাতা আনা হইবে। উভয় ভ্রাতার মধ্যে কথাবার্তা হইল, সঙ্গের পুলিস কর্মচারী তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। হাওড়া স্টেশনে বিধানচন্দ্র গাড়ি হইতে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই মাল্যভূষিত হইয়া এবং পুষ্পস্তবক উপহার পাইয়া অভিনন্দিত হইলেন। বিধানচন্দ্র বলিয়াছেন, এইরূপ বিপুল অভিনন্দন জীবনে তাঁহার এই প্রথম। তাঁহাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। তৎকালে সেই জেলে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী, রতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। ডাঃ রায় জেলে আসিয়া কারাধ্যক্ষ মেজর পাটনীকে বলিলেন

যে, তিনি বিনাশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদী হইলেও তাঁহার পক্ষে উপযোগী কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন, কোন কাজ না করিয়া তিনি বৃথা সময় কাটাইতে পারিবেন না। অধ্যক্ষ মেজর পাট্‌নী ছিলেন ডাক্তার, তিনি বিধানচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কারাধ্যক্ষ সানন্দে ১২০-টি শয্যা-সমন্বিত জেল হাসপাতালের ভার লইবার জন্য ডাঃ রায়কে বলিলেন। যে কার্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল, তাহা সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীর উপযোগী। বিনাশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীকে সাধারণতঃ ওই কার্যের ভার দেওয়া হয় না। ডাঃ রায় সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি জানাইলেন। মেজর পাট্‌নী তাঁহার নাম সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীর কর্মতালিকায় ভুক্ত করিয়া লইলেন। তবে অবস্থা বিবেচনায় আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি যে, উল্লিখিত ব্যবস্থা করার পূর্বে মেজর পাট্‌নী কারা-বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া সম্মতি লইয়াছিলেন। ডাঃ রায়ের কারাবাসকালে সুবোধচন্দ্র প্রতি রবিবারেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে জেলখানায় যাইতেন, কোন কোন দিন পরিবারের অন্যান্যেরাও সঙ্গে যাইতেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কয়েদীর মোট সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার, এবং তন্মধ্যে অর্ধেক ছিল রাজনৈতিক বন্দী।

ডাঃ রায়ের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিয়া যাইতেন। কয়েক মাস কারাবাসকালে তিনি পরাধীন ভারতের কারা-শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। হাসপাতালের কার্য পরিচালনা উপলক্ষে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েদীর সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে ভালো করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসক-মণ্ডলীর প্রবর্তিত কারা-শাসনব্যবস্থায় দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের কিংবা মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধনের কোন চেষ্টা ডাঃ রায় দেখিতে পান নাই। সেই ব্যবস্থায় মানবতাবোধের যে অভাব ছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। স্বাধীনতা-লাভের পর বিধান-মন্ত্রিপরিষদের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে কারা-শাসনব্যবস্থায় যে সকল কালোপযোগী সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে ডাঃ রায়ের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ দানও যে রহিয়াছে, তাহা বলিলে ভুল হইবে না। কারাগারে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য আরম্ভ হইত ভোর পাঁচটার সময়। তখন তিনি জনকয়েক কারাবাসী সহকর্মী সহ তাঁহার কারাকক্ষের সম্মুখস্থ সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া প্রাতর্ভ্রমণ করিতেন। প্রতিদিন এইভাবে তিনি এক মাইল হাঁটিতেন। হাসপাতালের কার্য তিনি এরূপ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, রোগীদিগের মৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় কমিয়া গেল। ডাঃ রায় টাইফয়েড নিউমোনিয়া ইত্যাদি কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনমতো নিজের চেষ্টায় বাহির হইতে ঔষধাদি আনাইয়া লইতেন। কেননা

জেলখানায় প্রয়োজনীয় ঔষধাদি পাওয়া যাইত না। ডাঃ রায় ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাঁহার বড় দাদা সুবোধচন্দ্র রায়কে দিতেন; তিনি নিজে টাকা দিয়া বাহির হইতে ঔষধাদি খরিদ করিয়া কারাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতেন। কারা-কর্তৃপক্ষ ডাঃ রায়ের কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কারাধ্যক্ষের সুপারিশ মতে গবর্নমেন্ট তাঁহার প্রশংসনীয় কার্যের জন্য কারাদণ্ডকালের ছয় সপ্তাহ মকুব করিয়া দেন।

কারাবাসী সহকর্মীগণের মধ্যে ডক্টর কানাই লাল গাঙ্গুলী জার্মান ভাষা ভালো জানিতেন। তিনি বহু বৎসর জার্মানিতে ছিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় তিনি ডক্টরেট প্রাপ্ত হন। ডক্টর গাঙ্গুলী বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রেও সুপরিচিত। প্রথম যৌবনে রাজনৈতিক কর্মজীবনে তাঁহার যাত্রা আরম্ভ হয় বৈপ্লবিক সাধনার দুর্গম সংকটসংকুল পথ ধরিয়া। তিনি বরিশাল শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বিপ্লবীদলে ছিলেন। কারাবাস-কালে ডাঃ রায় নিয়মিতভাবে জার্মানভাষা শিখিতে লাগিলেন ডক্টর গাঙ্গুলীর নিকট। বর্তমান লেখকের অনুরোধে তাঁহার বৈপ্লবিক জীবনের সহযাত্রী ডক্টর গাঙ্গুলী বিধানচন্দ্রের কারাবাস সম্পর্কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :

"১৯৩০ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী-চালিত লবণ-সত্যাগ্রহ আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে বিপুল আলোড়ন এনেছিল, তখন বাঙ্গলার প্রায় সকল খ্যাতনামা নেতাই,আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ঐ জেলের স্পেশাল ইয়ার্ডে এক-একটি কুঠরিতে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি সকলেই থাকতেন। আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল এইরকম একটা কুঠরিতে স্থান পাবার। ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত থাকতেন হাসপাতালে, আর খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত থাকতেন ভিন্ন স্থানে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ থাকতেন দমদম জেলে। স্পেশাল ইয়ার্ডে নেতাজী ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের কুঠরি দুটি ছিল পাশাপাশি। আমরা সকলে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এই দুটি কামরার সামনের বারান্দায় সমবেত হতাম, আর কত আলোচনাই না হত।

"হঠাৎ একদিন স্পেশাল ইয়ার্ডে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই আকস্মিক ঘটনা আমাদের সকলকেই বিস্মিত করলে, কারণ আমরা ভাবতেই পারি নি যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও সত্যাগ্রহ করবেন। কেউ তাঁর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশাও করেনি। কিন্তু পরে শুনলুম, তিনি ঠিক সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন নি। সেই সময়ে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হয়েছিলেন। এই কমিটির এক অধিবেশন দিল্লীতে আহূত হয়, তিনি সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ইংরাজ সরকার অধিবেশনে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করে। বিচারে ডাঃ রায়ের

ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। তারপরই তাঁকে দিল্লী থেকে কলিকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়।

"ডাঃ রায় জেলে এসে প্রথমেই তাঁর কুঠরিটিকে নানা আসবাবপত্রে ভরে ফেললেন। ভাল খাট, ধপধপে বিছানা, মশারি, চেয়ার, টেবিল, সুন্দর সুন্দর পরদা ইত্যাদির দ্বারা ঘরটা নিমেষে সুসজ্জিত হয়ে গেল। চিকিৎসা-জগতে তাঁর তখন শ্রেষ্ঠ খ্যাতি। তখন ডাক্তার নীলরতন সরকার জীবিত ছিলেন, তবু ডাঃ রায় তখন ভারতবর্ষের চিকিৎসকমহলে প্রথম স্থান না হ'ক, দ্বিতীয় স্থান তো নিশ্চয়ই অধিকার করতেন। আর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অজ্ঞাত, অখ্যাত ইংরাজ সরকারের চাকুরে, একজন নামমাত্র ডাক্তার। তিনি তো তাঁর বন্দী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একরকম অধীনতা স্বীকার করে কৃতার্থ হলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

"অল্পকালের মধ্যেই প্রায় দেখা যেত, স্টেথিস্কোপ কাঁধে ছয় ফুটেরও উচ্চ দীর্ঘ-বপু ডাঃ রায় জেল-কম্পাউণ্ডে এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন, আর তাঁর পেছনে পেছনে চলেছেন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর পাট্‌নী। মনে হ'ত, জেলের সকল ব্যবস্থা ডাঃ রায় করতে আরম্ভ করে দিলেন। এমন কি দেখেছি, ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রায়ই জেলে আসতেন—ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে বা অন্য কোন কাজে। শুধু একটি বিশেষত্ব দেখলুম, কোন রাজনৈতিক আলোচনায় ডাঃ রায় কখনো যোগ দিতেন না।

"নিত্য ভোরে দেখতাম, ডাঃ রায় ও তাঁর পেছনে পেছনে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী স্পেশাল ইয়ার্ডের সামনে প্রাচীর-ঘেরা মাঠটুকুর মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অর্থাৎ জেলের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে যতটুকু সম্ভব প্রাতভ্রমণ ক'রে স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা করছেন। আমিও কখনো কখনো এই প্রাতভ্রমণে যোগ দিতুম। সমস্ত ক্ষণই নানা রকমের আলোচনা হ'ত, কিন্তু একটা বিশেষত্ব এইটুকু দেখতুম, যে তিনি রাজনৈতিক আলোচনা করতেন তো নাই, এমন কি কোন রাজনৈতিক নেতারও আলোচনা করতেন না। তাঁর আর একটা বিশেষত্ব এইটুকু দেখেছিলুম, তিনি আলস্যে কখনো সময় নষ্ট করতেন না।

"যেদিন জেলে এলেন, সেইদিনই আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার কাছে আমি কিন্তু রোজ দুপুরে খাওয়ার পর এক ঘণ্টা জার্মান শিখব।' বলাই বাহুল্য, আমি আনন্দের সঙ্গে রাজী হলুম। ডাঃ রায় প্রায় ছয়মাস জেলে ছিলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, এই ছয়মাসের মধ্যে একদিনও তাঁর জার্মান শেখা বন্ধ থাকে নি। এই ছয়মাসে তিনি জার্মান ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এটা নিশ্চয় কৃতিত্বের কথা।

"ডাঃ রায়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্যে আমাদের সকলেরই তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। জেলের আবহাওয়ায় আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু অসুস্থতা

হ'ত, ডাঃ রায়ের উপস্থিতি ও সহৃদয় চিকিৎসা আমাদের নিরাময় করতো ও পরম সান্ত্বনা দিত। সর্বশেষে বলতে বাধ্য হলুম, ডাঃ রায়ের রাজনৈতিকক্ষেত্রে আসা চিকিৎসা-শাস্ত্রের পক্ষে ক্ষতি হয়েছে। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত।"

এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পাবে যে, ডাঃ রায়কে কারা-কর্তৃপক্ষ আপনা হইতেই কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দিয়াছিলেন। তিনি নিজের শয্যা-দ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিতেন। দুই বেলায়ই তাঁহার আহার্য বাড়ি হইতে পাঠানো হইত। সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঘরের দরজা তালা-চাবি দিয়া বন্ধ করা হইত না। দেখা-সাক্ষাতের জন্য রবিবার নির্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনার্থীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয় নাই।

ডাঃ রায়ের সহকারাবাসিগণের মধ্যে বর্ধমানের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও গান্ধীপন্থী নির্যাতিত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যের নাম ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমান জীবনী-লেখকের অনুরোধে তিনি ডাঃ রায়ের কারাবাস-কালের যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"১৯৩০ সালের নভেম্বর মাস। দমদম জেল থেকে আলিপুর জেলে এলাম।

"কয়েক মাসের অত্যধিক পরিশ্রমে বড্ড ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। জেলখানায় এসেই শরীরটা ভেঙ্গে পড়ল। বাইরে কাজের মধ্যে থাকলে হয়তো ঠিকই থাকতাম। ভিতরে এসেই বিপদ হল, শরীর আর চলতে চাইল না। এমনই হয়। পথ যতই শেষ হয়ে আসে ক্লান্তি ততই বাড়তে থাকে। বাড়ির দুয়ারে এসে আর পা উঠতে চায় না।

"বর্ধমানে কটা দিন এক রকম কাটল। এক গাদা ছেলে এসে জেল ভর্তি করে ফেলেছে। দমদমে স্পেশাল জেল হয়েছে। বড়রা যাঁরা ছিলেন তাঁদের সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছোটগুলি রয়ে গেছে। তাদের নিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশ একটু মুশকিলে পড়েছেন। একসঙ্গে এত লোকের ব্যবস্থা করবার মত তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। নানারকম অসুবিধা হচ্ছে। ছেলেরা নিজেরা সে অসুবিধা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। জেলখানায় সবাই নূতন। পদেপদে গোলমাল বাধছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বটে, নিজেদের মধ্যেও বটে। এই গোলমাল মিটিয়ে শৃঙ্খলা বিধান করতে বেশ কয়েক দিন লাগল। এইসব চুকিয়ে একটু হাঁফ ছাড়বার মত অবস্থা হতেই বদলির আদেশ এল। দমদমে আর একটা জেল খোলা হয়েছে—দমদম এডিশনাল স্পেশাল জেল। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য।

"সরকার বাহাদুর দয়া করেছিলেন। বর্ধমান সদরে এস. ডি. ও. ছিলেন শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ; রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের ছেলে। তাঁর শ্রেণীবিচার ছিল না। তিনি ছোট বড় সকলের জন্য এক ব্যবস্থাই করতেন। নির্বিচারে তৃতীয় শ্রেণী।

এতে একটা সুবিধা হয়েছিল। বড়রা ছোটদের সঙ্গে থাকতে পেরেছিলেন। ছোটদের আরও শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। বাইরে কয়েক দিনের শিবির-জীবনে কতটুকুই বা শেখাতে পারা গেছে? জেলের ভিতরে একসঙ্গে থাকবার জন্য বড়রা তাদের ভাল করে শেখাবার সুযোগ পেলেন। এই শিক্ষা আমাদের কর্মীদের ভবিষ্যৎ জীবনে খুব কাজে লেগেছে।

"কাজের সুবিধা ছাড়াও এর ফলে আর একটা সুবিধা হয়। রাজনৈতিক কয়েদীদের সাধারণ কয়েদীদের মত করে রাখবার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছিল। সরকার নিয়ম করলেন, শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে কয়েদীদের শ্রেণী-বিভাগ করা হবে। এ নিয়ম শুধু রাজনৈতিক কয়েদীর জন্য নয়, সকল কয়েদীর জন্যই। রাজনৈতিক কয়েদীদের আলাদা করে দেখতে তাঁরা রাজী ছিলেন না। সরকারের এই নিয়মের ফলে যাঁরা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন, তাঁরা কেউ প্রথম, কেউ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলে গণ্য হলেন। আর সব তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীর দলে রয়ে গেল।

"আমাদের অনেকেরই এটা ভাল লাগেনি। এক সঙ্গে কাজ করলাম, একই অপরাধ, একই শাস্তি। কিছু বেশী লেখাপড়া শিখেছে বা বাবার কিছু টাকা আছে বলেই একজন বেশী সুখসুবিধা পাবে, আর একজন তা নয় বলে বঞ্চিত হবে, এটা বড়ই বিসদৃশ বলে মনে হত। কেবলই মনে হত, বেরিয়ে এসে আবার মুখোমুখি দাঁড়াব কেমন করে? বর্ধমানের সরকার আমাদের এই লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ছোট বড় সকলে মিলে একসঙ্গে সমানে কষ্ট ভোগ করব, এর মধ্যে একটা আনন্দও ছিল।

'জরগায়েই বর্ধমান থেকে দমদমে এলাম। এসে তো চক্ষুস্থির! বর্ধমান জেলে যদি বা কোন ব্যবস্থা ছিল, এখানে কিছুই নাই। একটা ফাঁকা মাঠে তারের বেড়ার মধ্যে খানদুই পুরানো পাকা বাড়ি আর কয়েকখানা চালা ঘর, দর্মার বেড়া, খড়ের চাল। তারই মধ্যে বাংলা দেশের চারদিক থেকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের এনে গাদাবন্দী করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, এমন কি অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলেও যে ব্যবস্থার জেলখানায় কোন দিন অভাব হয় না, সেই পাহারার ব্যবস্থাও নাই। অল্প কয়েকদিন হল জেল খোলা হয়েছে, কোন ব্যবস্থাই তখনও হয়ে ওঠে নি। এই অবস্থায় যা হয় তাই হল। শরীরটা ক্রমেই বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ল। জ্বর এবং তার সঙ্গে কঠিন রক্তামাশয়। অতুল্যর (কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ) সঙ্গে হুগলীর একটা দল তার কয়েক দিন আগে এসেছে। এই অবস্থার মধ্যে যতটুকু ব্যবস্থা করা সম্ভব তারা করতে চেষ্টা করল। তা সত্ত্বেও অসুখ ক্রমেই বাড়তে লাগল। আমাশয় একটু কমতে না কমতেই সাইনোভাইটিস দেখা

দিল। আর বিছানা থেকে উঠবার সামর্থ্য রইল না। ওজন ১১৬ পাউণ্ড থেকে ৭২ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুবান্ধবেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"প্রেসিডেন্সি জেল-হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার কথা বললেন জেল-কর্তৃপক্ষ। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা তখন ঐখানেই করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে পাঠানো বন্ধুদের ইচ্ছা নয়। তাঁরা চান আলিপুরে পাঠাতে। সেখানে হাসপাতালের ব্যবস্থাও ভাল। তা ছাড়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখন সেখানে আছেন। জেল-হাসপাতালের চিকিৎসার ভার তাঁরই উপর। আলিপুরের হাসপাতাল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য। জেল-কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছুতেই সেখানে পাঠাতে রাজী নন।

"পাশেই দমদম স্পেশাল জেল। অসুখের খবর সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে। যতীন্দ্র-মোহন রায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বড়দের অনেকেই তখন সেখানে। অসুখের খবর পেয়ে তাঁরা সবাই খুব চিন্তিত হয়েছেন। তাঁরাও চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে আমাকে আলিপুরে পাঠানো হয়। অনেক চেষ্টার পর কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন।

"বৈকাল বেলায় আলিপুরে এসে পৌঁছলাম। আসবার কথা বন্ধুরা আগেই শুনেছিলেন। আমার খবর পেয়ে সকলেই এসে পড়লেন। প্রথমেই এলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি তখন হাসপাতালেই আছেন। এপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য কারমাইকেল হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সদ্য সেখান থেকে ফিরেছেন। একটু পরেই সম্ভবতঃ খবর পেয়েই, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এসে পৌঁছলেন।

"বিধানবাবুকে তার আগে কোন দিন দেখি নি। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর অসামান্য খ্যাতির কথা বাংলা দেশের আর সকলের মত আমিও শুনেছি। আলিপুর জেলে যেতে পারলে তাঁর কাছে থাকতে পারব এবং তাঁর চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি সেরে উঠব, এই মনে করেই আলিপুরে এসেছি। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে দেখতে পেয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল। প্রথমেই চোখে পড়ল তাঁর চেহারা। মূর্তিমান স্বাস্থ্য। এমন না হলে চিকিৎসক! দেখলেই রোগী উৎসাহিত হয়ে ওঠে, তার অর্ধেক রোগ সেরে যায়। ছেলেবেলায় রাজসাহী কলেজে পড়তাম। আমাদের হোস্টেলে চিকিৎসা করতেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তাঁরও চেহারা এমনই ছিল। তিনি যখন আসতেন তাঁর পায়ের শব্দ পেয়েই মনে হত সেরে গেছি। বিধানবাবুকে দেখে আমার উপেনবাবুকে মনে পড়ে গেল।

"বিধানবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসলেন। মিনিট কয়েক চেয়ে দেখলেন এবং তারপর অসুখের বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। পরীক্ষাও করলেন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। একটু যেন চিন্তিত হয়েছেন মনে হল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে

মুখখানা আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল। হেসে বললেন, "কিছু না; সেরে যাবে।" মনে হল এর মধ্যেই অসুখের সব কিছু দেখে বুঝে ফেলেছেন, এখন নির্দিষ্ট পথে পর পর চিকিৎসা করে গেলেই চলবে। এর পরেও তাঁর মধ্যে এই জিনিসটি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। তখন বিভিন্ন জেল থেকে আলিপুর হাসপাতালে অনেক দুরারোগ্য রোগী আসত। বোধ হয় ডাঃ রায় আছেন বলেই তাদের আলিপুরে পাঠানো হত। রোগী এলেই ডাঃ রায়ের কাছে খবর যেত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হতেন। কয়েক মিনিট স্থির হয়ে রোগীর দিকে চেয়ে থাকতেন এবং তার পর ধীরে ধীরে রোগীকে পরীক্ষা করতেন। দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে হাসিমুখে কর্তব্য নির্দেশ করতেন। এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই কেমন করে জানি না, তিনি যেন রোগের গতি-প্রকৃতি সব ধরে ফেলতেন। তারপর এ সম্বন্ধে আর কোন দিন তাঁকে চিন্তা করতে হত না। বর্ধমান কলেজে আমাদের একজন অধ্যাপক ছিলেন। কোন ছেলের দিকে চাইলে একদৃষ্টিতে তার ভিতর পর্যন্ত যেন দেখতে পেতেন। কেউ কোন প্রশ্ন করতে উঠলে তার একটা কথা শুনেই তিনি সব বুঝে নিতেন। ছেলেদের অসুবিধা বুঝবার তাঁর একটা সহজাত শক্তি ছিল। চিকিৎসার বিষয়ে বিধানবাবুর সম্বন্ধে আমার এই কথাই মনে হয়েছে।

"আমার বেড্‌টা ছিল ঘরের একেবারে শেষে। প্রতিদিন রোগী দেখবার সময় সকলের শেষে আমার কাছে আসতেন। হাসপাতালে তখন নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ছিল না। ওয়ার্ড থেকে সকলেই সকল সময় হাসপাতালে আসতে পারত। তাই সকাল হলেই বন্ধুবান্ধবেরা হাজির হতেন। প্রফুল্ল সেনের তো কথাই ছিল না। তিনি হাসপাতালে ছিলেন, দিবারাত্রিই কাছে থাকতেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও সবকিছু নিজের হাতে করতেন। অন্যান্য বন্ধুদেরও বিরাম ছিল না। সারা দিন একজন না একজন আছেনই। বেশী ভিড়টা হত সকালে বিকালে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তী, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল গাঙ্গুলী এবং আরও অনেকে আসতেন। রোগী দেখা শেষ করে বিধানবাবু যখন আসতেন, এক-একদিন তিনিও তারই মধ্যে বসে যেতেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকমের গল্পগুজব হত।

"একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। তখন আমি অনেকটা ভাল হয়েছি, আমার জন্য বন্ধুদের চিন্তাও অনেকটা কমেছে। সুতরাং আড্ডাটার জোরও বেড়েছে। আলোচনার শেষ ছিল না। তার বিষয়ও বিচিত্র। স্বর্গ মর্ত্য রসাতলের এমন জিনিস ছিল না, যা নিয়ে আমরা আলোচনা না করতাম। যেদিন যা নিয়েই আলোচনা হক না কেন, বিধানবাবু তাতে যোগ দিতেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত। দেখে শুনে মনে হয়েছে তিনি শুধু চিকিৎসা-শাস্ত্রেই পণ্ডিত নন, আরও অনেক শাস্ত্রেই তাঁর চিকিৎসা-শাস্ত্রের মতই গভীর পাণ্ডিত্য আছে।

"আর একটা জিনিস যা চোখে পড়েছে তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। একদিনকার কথা মনে আছে। আলিপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন মেজর পাট্‌নী আই. এম. এস., তিনি হাসপাতালের কিছু দেখতেন না। সব ভারই ছিল ডাঃ রায়ের উপর। স্বদেশী অ-স্বদেশী সব রোগীকেই তিনি দেখতেন। তখন সব নিয়ে ১১০ জন রোগী ছিল হাসপাতালে। সকালবেলায় রোগী দেখার সময়ে হাসপাতালের ডাক্তার ডাঃ রায়ের সঙ্গে থাকতেন। সেদিন রোগী দেখা শেষ করে ডাঃ রায় আমার বেড্-এর কাছে বসেছেন। এমন সময় হাসপাতালের ডাক্তার বঙ্কিমবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। কী ব্যাপার! না, সেদিন তাঁর হাসপাতালে আসতে দেরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ডাঃ রায় এসে গেছেন। বঙ্কিমবাবুকে না দেখে ডাঃ রায় একাই রোগী দেখতে আরম্ভ করলেন এবং এক এক করে সব রোগীকেই দেখে শেষ করেছেন। বঙ্কিমবাবু অপরাধীর মত মুখ নীচু করে বললেন, তাঁর আসতে দেবি হয়েছে। ডাঃ বায় বলসেন তাঁর জন্য কিছু অসুবিধা হয় নি। তিনি রোগীদের টিকিটগুলি আনতে বললেন। টিকিট আনা হলে ডাঃ রায় একে একে ১ থেকে ১১০ পর্যন্ত সমস্ত রোগীর কার কি ওষুধ এবং পথ্য হবে সব বলে গেলেন।

"মানুষটিকে আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আর এত বড় মানুষ! তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অনেকবার মনে হয়েছে, তিনি থাকতে থাকতে যদি হাসপাতাল থেকে বেরতে পারতাম, তাহলে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারতাম। তাঁকে আরও ভাল করে দেখারও সুযোগ হত। কিন্তু তা আর হল না। আমি হাসপাতাল থেকে বেরোবার আগেই তিনি জেল থেকে বেবিয়ে গেলেন। ঠিক মনে নাই। বোধ হয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অসুস্থ হয়ে কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ডাঃ রায়কে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন। সেইজন্য সরকার তাঁর জেলের মেয়াদ শেষ হবার আগেই তাঁকে ছেড়ে দেন।

"হাসপাতালের বাইরে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কাছে ডাঃ রায়ের কথা শুনতাম। খুব সকালে উঠতেন এবং দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসতেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে নিজের হাতে পায়খানা ধুতেন। নিমের কাঠি দিয়ে দাঁতন করতেন, টুথব্রাশ টুথপেস্ট ব্যবহার করতেন না। খানিকক্ষণ খুব জোরে জোরে হাঁটতেন এবং তারপর পড়তে বসতেন। পড়তেনও খুব জোরে জোরে। কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতাই এই সময়টায় তিনি সাধারণতঃ পড়তেন। ইতিমধ্যে হাসপাতালে যাবার সময় হত। হাসপাতালে রোগী দেখা ছাড়াও আরও কাজ ছিল। আন্দোলনের টানে অনেক ছোট ছোট ছেলে জেলে এসে গিয়েছিল। তাদের অসুখ করলেই বিপদ! না খাওয়ানো যায় ওষুধ ও না দেওয়া যায় পছন্দমত পথ্য। ডাঃ রায়ের অনেকখানি সময় যেত তাদের পিছনে।

ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওষুধ খাওয়াতে হত। হাসপাতালের রান্না খাবার তারা খেতে পারে না। ডাঃ রায়ের বাড়ি থেকে যে খাবার আসে তা থেকে তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে তেল মেখে স্নান করতেন। সাবান তিনি কমই মাখতেন। জেলখানার খাবার তিনি খেতেন না। তিনি প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের বাইরে থেকে খাবার আনার অধিকার ছিল। তাঁরও বাড়ি থেকে খাবার আসত। সাহেবী খানা নয়, খাঁটি বাঙ্গালী খাবার—ভাত, ডাল, সুক্ত, মাছের ঝোল। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে আবার পড়তে বসতেন। এই সময়টায় তিনি ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলীর কাছে জার্মান পড়তেন। কানাইবাবুর কাছে শুনেছি তার পড়ার উৎসাহে ইস্কুলের ছেলেরাও হার মেনে যেত। বৈকালবেলায় আবার একবার হাসপাতালে আসতেন। জেলখানায় সব দলের লোকই আছে। জেলের ভিতরে আর কোন কাজ নাই। তাই স্বাভাবিকভাবেই দলাদলিটা বেশি হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে নবাগতদের মধ্যে থেকে সকলেই লোক সংগ্রহের চেষ্টা করে। এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে খানিকটা রেষারেষিও হয়। আলিপুরেও হোত। ডাঃ রায় এ-সকলের মধ্যে যেতেন না। পড়াশোনা এবং চিকিৎসা, এই নিয়েই তাঁর সময় কাটত।"

আলিপুব সেন্ট্রাল জেলের তৎকালীন সিনিয়র ডেপুটী জেলর সিউড়ি (বীরভূম)-নিবাসী রায়সাহেব অনিলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথিত বিবরণ তথাকাব যশস্বী চিকিৎসক ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. বি. লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং গ্রন্থকারকে গত ১১।১।৫৭ ইং তারিখে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখানে তাহা প্রকাশিত হইল :

" · ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্পেশাল ইয়ার্ডে রাখা হয়। এইটি একটি দোতলা ইউরোপীয়ান ব্লক। এই স্থানে নেতাজী সুভাষ, স্বর্গীয় জে. এম. সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতবিখ্যাত নেতারা অবস্থান করিতেন। ডাক্তার রায়কে জেল-হাসপাতালে কয়েদী রোগীদের দেখিবার ভার দেওয়া হয়, কেননা তিনি ভাবতবিখ্যাত ডাক্তার। তদানীন্তন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। আমি সেই সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সিনিয়র ডেপুটি জেলর ছিলাম এবং জেলের ভিতবের চার্জে ছিলাম। সমস্ত পলিটিক্যাল প্রিজনারদিগকে আমাকে দেখিতে হইত। ডাক্তার রায়ের খাবার তাঁহার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ি হইতে আসিত। এই খাবারের নমুনা ডেপুটী জেলর টেস্ট করিতেন। একদিন রাত্রে তাঁহার খাবার জেল আফিসে আসার পর উক্ত ডেপুটী জেলর খাবার টেস্ট করিতে করিতে সমস্ত খাবার খাইয়া ফেলেন এবং আমাকে খবর দেন। আমি আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া ডাক্তার রায়ের নিকট স্পেশাল ইয়ার্ডে গিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলি। তিনি বলিলেন—আমাকে বললে ডেপুটী জেলরের জন্য আলাদা খাবার আনিয়ে দিতাম।

আমি তাঁহার বাড়িতে তাঁহার খাবারের জন্য ফোন করি, এবং জানাই যে যত রাত্রিই হউক, আমি খাবার লইবার জন্য জেল-আফিসে উপস্থিত থাকিব। কারণ রাত্রি সাড়ে ৯টার পর কোন খাবার লইবার আদেশ ছিল না। যাহা হউক, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় খাবার আসে, এবং আমি উহা লইয়া ডাক্তার রায়ের নিকট পৌছাইয়া দিই। তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অবস্থানকালীন বহু মূল্যবান ঔষধ জেল-হাসপাতালে দান করেন। জেলের প্রত্যেক অফিসার তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি সকলের সহিত মধুর ব্যবহার কারতেন। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইয়া আমার স্ত্রীর চিকিৎসা তাঁহাকে দিয়া করাইয়াছিলাম। একটি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র খুব দামী ছিল বলিয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি সেইটি আমি যাহাতে বিনামূল্যে পাই, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

"যদিও ডাক্তার রায়ের বিনা পরিশ্রমে ছয় মাসের কারাদণ্ড হইয়াছিল, তথাপি তিনি জেলে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া জেলেব আইন অনুযায়ী রেমিশন পাইতেন। জেল-আইনে একটি বিধান আছে যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন কয়েদীকে এক বৎসর কালের মধ্যে ত্রিশ দিন স্পেশাল রেমিশন দিতে পারেন। সেই বিধানটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকল জেল-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন। একমাত্র আমি বলিয়াছিলাম যে, ছয় মাসে ডাক্তার রায় ত্রিশ দিন স্পেশাল রেমিশন পাইতে পারেন। পরে এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের সহিত পত্রালাপ হইলে আমার মতটি সমর্থিত হয়। ডাক্তার রায় ত্রিশ দিন স্পেশাল রেমিশন পাইয়া যথাকালে জেলখানা হইতে মুক্তি পান।

"খালাস হওয়ার পর তিনি একটি বহুমূল্য ঘড়ি জেলে দান করিবার জন্য একদিন জেল-গেটে আসিয়া আমাকে খবর দেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলে আমাকে ঘড়িটি দানের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিতে বলেন; কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘড়িটি লইতে অরাজী হওয়ায় তিনি ঘড়িটি ফিরাইয়া লইয়া যান; আমি জানি না এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা এখন তাঁহার মনে আছে কিনা।"

জেলের মেয়াদ কম হইবার কারণ সম্বন্ধে কিন্তু ডাঃ রায়ের অন্যতম জীবনীকার মিঃ টমাস অন্যরূপ বিবরণ দিয়াছেন। তাহা এইরূপ: "It was found out in January 1931 that death rate within the period of about six months when Dr. Roy was in charge of the hospital was six or seven less than in the previous records. According to the Jail Code a convict who saves another convict's life get full remission for such an act. Therefore the Superintendent argued that since Dr. Roy had saved the lives of so many jail inhabitants he should

get the maximum that may be permitted to any person, who is convicted for six months. The Government readily accepted the suggestion and allowed Dr. Roy six weeks remission of his sentence in course of the six months period."

বিধানচন্দ্র যখন বন্দী অবস্থায় দিল্লি হইতে হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হইয়াছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেন: "I was over-run with and amazed at the welcome my friends gave me as if I had done something wonderful. This was the first time when I received presents of bouquets and garlands from the public. I wondered why. I had no realisation of having done anything extraordinary, anything more than another person in the same situation would have done."

তিনি তাঁহার কারাজীবন সম্পর্কে বলেন: "I had an enforced rest for five months. I was given many priviliges denied to an ordinary convict. I was respected by one and all. I had my hours in jail fully employed and yet can I truthfully say that I liked incarceration ? In my mind I had no such feeling that I was making some sacrifice for the motherland or that I was fulfilling the directions of the leaders of the Congress. I went to prison merely owing to a chain of circumstances and not because I had planned for it. I do not hesitate to declare that life in prison, however comfortable it may have been made for me, implies all the restrictions on the prisoner's freedom which everyone of us highly cherishes."

ছয়মাস কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হইবার ছয় সপ্তাহ পূর্বেই বিধানচন্দ্র কারামুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিধানচন্দ্র সাড়ে চার মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। বিধানচন্দ্র যখন কারামুক্ত হন, তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এলাহাবাদে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। বিধানচন্দ্র কারামুক্ত হইবার পরদিনই এই মহান নেতার চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলেন। ডাঃ আনসারিও মতিলালকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র মতিলালের জীবনের শেষ কয়েকদিন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি মতিলালকে এক্স্-রে-চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদ হইতে লখ্নৌ লইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত হয়। বিধানচন্দ্র মতিলালের সহিত

লখ্‌নৌ যান। লখ্‌নৌয়ে পৌঁছিবার পরদিনই, ২৯শে জানুয়ারি, সকালে লখ্‌নৌয়ে মতিলালের মৃত্যু ঘটে। বিধানচন্দ্রই মতিলালের মরদেহ এলাহাবাদে আনার সকল ব্যবস্থা কবেন। মতিলালের মরদেহ এলাহাবাদে যমুনার তীরে দাহ করা হয়। সমস্ত এলাহাবাদ এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ তাহাদের প্রিয়নেতার শেষকৃত্য দেখিবার জন্য সমবেত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযোগী এবং স্বরাজ্য দলের নেতারূপে মতিলালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বিধানচন্দ্র আসিয়াছিলেন। মতিলালের প্রতি তাঁহার ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। মতিলালের মৃত্যুতে সেদিন বিধানচন্দ্র জীবনের:একটি গভীরতম বেদনা বোধ করিয়াছিলেন।

১৭

বিধানের জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব

নানা দিক দিয়াই গান্ধীজীর জীবন ও কার্যাবলীর মধ্যে অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার আদর্শ ও নীতি, মত ও পথ, আচার ও ব্যবহার এবং রচনা ও বাণী অভিনব এবং বিচিত্র। বর্তমান জগতে—স্বদেশে, বিদেশে, স্বজাতি ও পরজাতির নিকট তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। যুগের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ভাব এবং পন্থার গ্রহণ, বর্জন ও সংস্কার অর্থাৎ সমন্বয়-সাধন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে তাঁহার জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব জীবন-বেদ রচিত হইয়াছে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের উৎকৃষ্ট বস্তুর মিলনে। সত্য এবং অহিংসা হইল সেই জীবন-দর্শন ও জীবন-বেদের মূলমন্ত্র। গান্ধীবাদের ইহাই মর্মবাণী।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানবের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য গান্ধীজীই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অহিংসাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই অমোঘ অস্ত্রের শক্তি ও সাফল্য আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে। ওই মহাস্ত্রের আবিষ্কারক ও প্রয়োগকর্তা মহানায়ক গান্ধীজী ভারতে মুক্তিযুদ্ধের অগণিত যোদ্ধাকে প্রেরণা দিয়াছেন ত্যাগস্বীকার, দুঃখবরণ ও আত্মবলিদানে। বহু উচ্চশ্রেণীর নেতার জীবনেও তিনি বিস্ময়কর বিবর্তন ঘটাইয়াছেন। সেই নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথমেই আমাদের স্মরণে আসিবে—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও তদীয় পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁহার সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তাঁহার সহধর্মিণী নেলী সেনগুপ্তা, শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), ভিঠলভাই প্যাটেল ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ খান সাহেব ও খান আবদুল গফ্ফর খান (সীমান্ত গান্ধী), ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, মওলানা মজহরুল্ হক প্রভৃতির নাম। পূর্বোক্ত শ্রেণীর নেতৃবর্গের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জীবনের উপরও গান্ধীজী যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর গুণগ্রাহী, অনুগামী ও ভক্ত জনের তিনি অন্যতম। সেই মহনীয় অধিনায়কের অহিংসা-মহাস্ত্রের অমোঘতায় বিধানচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল অবিচলিত। তাঁহার

মনে এই ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অহিংসার পথেই ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। সেইজন্য স্বাধীনতার অভিযানে তিনি গান্ধীজীর পদানুবর্তন করিয়াই চলিয়াছেন, যদিও সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল গভীর। গান্ধীজীর প্রতি বিধানের যে কিরূপ ভক্তি, অনুরাগ ও বিশ্বাস ছিল, তাহা তিনি নিজেই বার বার অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন। গান্ধীজীর জীবনের কতিপয় ঘটনা চিকিৎসা-শাস্ত্রকেও হার মানাইয়াছিল, ইহা বিধানচন্দ্র সবিস্ময়ে বার বার স্বীকার করিয়াছেন। কঠোর অনশন-ব্রত পালন উপলক্ষে সেইজন্য বিধানকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে হইত। বিধানের প্রতিভা, স্বদেশানুরাগ, সমাজ-হিতৈষণা ইত্যাদি গুণের জন্য গান্ধীজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাজের সেবাকার্যের মধ্য দিয়া উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বর্তমান বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে ডাঃ রায় একদিন ঘটনাক্রমে কলিকাতায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাসভবনে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীকে (মিঃ গান্ধীকে) প্রথম দেখিতে পাইলেন। তখন ডাঃ রায় বাংলা সরকারের অধীনে সহ-চিকিৎসক (অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন) পদে নিযুক্ত থাকিয়া কলিকাতায় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল এবং হাসপাতালে কাজ করিতেন। গান্ধীজীর মাহাত্ম্য তখনও আপামর জনসাধারণের নিকট পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় নাই বলিয়া তিনি 'মহাত্মা' নামে ব্যাপক ভাবে অভিহিত হইতেন না। ডাঃ রায় গান্ধীজীকে প্রথম দেখিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয় নাই। ইহার বৎসর পাঁচেক পরে (১৯২০ খ্রীঃ) তিনি কলিকাতায় তাঁহার বর্তমান বাসভবনের (৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের) পূর্বদিকস্থ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীকে দেখিয়াছিলেন। ওই অধিবেশনের পরে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনাবসান হইল দার্জিলিংয়ের শৈলাবাসে। মৃত্যুর পূর্বে তথায় রোগশয্যাশায়ী দেশবন্ধুকে দেখিতে যান এবং ছয়দিন (৪ঠা জুন হইতে ৯ই জুন) তাঁহার সহিত বাস করেন। তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় অবস্থানকালে দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। ডাঃ রায় তখন কলিকাতায় ছিলেন না। তাঁহার শিলং-এর গিরিনিবাসে বিশ্রামের জন্য গিয়াছিলেন। সেই দুঃসংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি কলিকাতায় রওনা হইয়া আসেন। মহাত্যাগী অবিস্মরণীয় লোকনায়কের মৃতদেহ কলিকাতায় আনিয়া দাহ করা হইল। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রীষ্টান, পার্সী —নানা শ্রেণীর লক্ষাধিক শোকসন্তপ্ত পৌরজন তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ডাঃ রায় সদ্য-শোকাতুরা বাসন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার

জন্য দেশবন্ধুর ভবানীপুরের বাড়িতে (বর্তমানে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন') যান। সেই সময়ে গান্ধীজীও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। ডাঃ রায়কে দেখামাত্রই বাসন্তী দেবীর শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যে, ডাঃ রায় যদি দার্জিলিং-এ তখন উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইত না। গান্ধীজী যদিও যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ্ ডাঃ বিধান রায়ের নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ইতঃপূর্বে উভয়ের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হয় নাই। বাসন্তী দেবীর শোক-বেগ প্রশমিত হইলে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ডাঃ রায়কে পরিচিত করিয়া দিলেন। দেশবন্ধু তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নারীকল্যাণের জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ দানপত্রে তিনি বিধানচন্দ্রকেও অন্যতম ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া যান। তাই এ বিষয়ে ডাঃ রায়ের সহিত গান্ধীজী আলোচনা করিলেন। কিরূপ পরিকল্পনায় দাতার প্রদত্ত সম্পত্তি তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজে লাগানো যাইতে পারে সেই বিষয়ে গান্ধীজী বিধানচন্দ্রের অভিমত জানিতে চাহিলেন। দেশবন্ধু বিধানের সম্মতি না লইয়াই তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে একজন ন্যাসরক্ষক ('ট্রাষ্টী') মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। বিধানের উপর দেশবন্ধুর বিশ্বাস যে কতটা দৃঢ় ছিল, তাহার কতক প্রমাণ ইহাতে মিলিবে। ডাঃ রায় গান্ধীজীকে বলিলেন যে, তাহার মতে এই বাসভবনে একটা হাসপাতাল স্থাপন এবং সেই সঙ্গে নারীদের 'নার্সিং' শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, দেশবন্ধুর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হইতে পারে। গান্ধীজী সেই অভিমত সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাবিত আরোগ্যশালা এবং নার্সিং শিক্ষায়তনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে হইলে আরও বহু অর্থের প্রয়োজন। গান্ধীজী তাহা বুঝিতে পারিয়া আরও কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন স্থির করিলেন। দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ দেশবাসী নরনারীর নিকট তিনি আবেদন জানাইলেন মুক্তহস্তে সাহায্য দানের জন্য। অর্থসংগ্রহ-কল্পে গান্ধীজী ডাঃ রায়কে সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে যাইতে লাগিলেন। অন্যান্য নেতারাও এই সাধু প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীকে নানাভাবে সাহায্য করিলেন। অনেক ধনী দাতার গৃহে উভয়ে একসঙ্গে দ্বারস্থ হইতেন। বিধানচন্দ্র বলিয়াছেন, প্রচণ্ড শীত এবং জল-ঝড়ের মধ্যেও গান্ধীজী তাঁহার অভ্যস্ত স্বল্পবাসেই যাতায়াত করিতেন। ইহা বিধানচন্দ্রকে বিস্মিত করিত। এইভাবে কয়েক দিন কাজ করায় অর্থ-সংগ্রহের কার্য অনেক দূর অগ্রসর হইল। বিধানচন্দ্রের কর্মতৎপরতা এবং ঐকান্তিকতা দেখিয়া গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইলেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গান্ধীজীর উপদেশে ন্যাসরক্ষক পর্ষদ্ (বোর্ড অব্ ট্রাষ্টীজ্) ডাঃ রায়কে পর্ষদের অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত করিলেন। 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল, তাহা দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দেশবন্ধুর স্মৃতিপূত ওই 'প্রতিষ্ঠানের জন্য গান্ধীজী দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরের বৎসর (১৯২৬ খ্রীঃ) ডাঃ রায় গিয়াছিলেন মধ্য-প্রদেশের রায়পুরে একটি রোগীর চিকিৎসার জন্য। একটা রেলস্টেশনে নামিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন পাশের কামরায় গান্ধীজীকে। তাঁহার দিকে গান্ধীজীরও দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ডাক পড়িল। গান্ধীজী তাঁহাকে একটা চামড়ার বাক্স দিয়া বলিলেন জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া যেন টাকা ও হিসাব পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উহার ভিতরে অনুমান হাজার চারেক টাকার জিনিস ছিল, ওইগুলি গান্ধীজী পাইয়াছেন জনগণের নিকট হইতে দানস্বরূপ। ডাঃ রায়ের সততা এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত না হইলে কখনও এইভাবে এত টাকার জিনিস কোন তালিকা প্রস্তুত না করাইয়া এবং রসিদ না লইয়া দিতেন না। ডাঃ রায় ফিরিয়া আসিয়া ওই জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট হিসাবসহ টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। ডাঃ বিধানচন্দ্র যেদিন জেল হইতে ছাড়া পান, তাহার পরদিনই তিনি পণ্ডিত মতিলালকে দেখিবার জন্য এলাহাবাদ যাত্রা করেন। ঐ সময়ে ডাঃ রায় মতিলালের মৃত্যু পর্যন্ত কয়েকদিন এলাহাবাদে মতিলালের নিকট ছিলেন। মতিলালকে দেখিবার জন্য গান্ধীজীও আসিয়াছিলেন। একদিন ডাঃ রায় দেখিলেন, গান্ধীজী দুধ বা শস্যজাত কোন খাদ্য খাইতেছেন না, কেবল কাঁচা সবজি খাইতেছেন। ইহা দেখিয়া ডাঃ রায় বলিলেন, "আপনার দেহের ওজন কম আছে, তাহার উপর এইরূপ খাদ্য খাইলে এবং দুধ ও শস্যজাত খাদ্য না খাইলে আপনার ওজন আরও কমিয়া যাইবে। আপনার এইরূপ খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।" গান্ধীজী ঐ সময় ৯৯ পাউণ্ড ছিলেন। তিনি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আমার এখন কত ওজন থাকা উচিত ?" বিধানচন্দ্র বলিলেন, "আপনার বয়স ও উচ্চতা অনুসারে এখন আপনার ওজন থাকা উচিত অন্ততঃ ১০৬ পাউণ্ড।" গান্ধীজী বলিলেন, "বেশ, আমাকে দশ দিন সময় দাও, আমি এই খাদ্য খাইয়াই আমার দেহের ওজন ১০৬ পাউণ্ড করিয়া দিব। ডাঃ রায় বলেন, "ইহা একটা অলৌকিক ঘটনা বলিয়াই মনে হইবে, শারীরতত্ত্বের ভিত্তিতে ইহার ব্যাখ্যা মিলে না।" তবুও সত্যই দেখা গেল, ঐ খাদ্য গ্রহণ করিয়াই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গান্ধীজী নির্দিষ্ট ওজন লাভ করিলেন। এইসব বিস্ময়কর ঘটনা তাঁহাদেরই দ্বারা সম্ভব, যাঁহারা নিজেদের দেহকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছেন।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসার পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজীকে গ্রেফতার করিয়া বিনা-বিচারে বন্দী

করা হইল। ইহা তাঁহার পঞ্চম বারের কারাবরণ। তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে পর্যন্ত। তৎকালে তিনি হিন্দুসমাজকে অস্পৃশ্যতাব অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটা পরিকল্পনা বচনা কবিলেন, সমগ ভাবতে কাজ করাব জন্য 'অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘ' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইল। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা নির্বাচিত হইলেন উহাব সভাপতি। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক পর্ষদ্ (বোর্ড) গঠনেব ব্যবস্থাও নিয়মাবলীতে বহিল। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হইল প্রাদেশিক পর্ষদ্গুলিব সভাপতি মনোনয়নের। তদনুসারে বিড়লাজী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে গান্ধীজীব সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপতি মনোনীত করিলেন। কোন কার্যের ভাব গ্রহণ কবিলে তাহা আন্তবিকতা ও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে যত্নবান হওয়া ডাঃ রাযের স্বভাবজাত গুণ। কলিকাতায় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে লইয়া ডাঃ রায় প্রাদেশিক বোর্ড গঠন করেন। সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রাক্তন সদস্য কংগ্রেসনেতা শ্রীসাতকড়িপতি রায়। ডাঃ রায়ের বাসভবনে (৩৬ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে) বোর্ডের কার্যালয়ের স্থান নির্দিষ্ট হইল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক বোর্ডের সদস্যগণেব প্রথম সভার অধিবেশন হইল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর রবিবার অপবাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় বোর্ডেব কার্যালয়ে। ডাঃ বায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিখিল ভাবত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘের উদ্দেশ্যকে সফল করাব জন্য সমগ্র বঙ্গদেশের উপযোগী একটি কার্যক্রম সভায় আলোচনান্তে গৃহীত হইল। সভায় ইহা স্থির হইল যে, অস্পৃশ্যতা বর্জনের নিমিত্ত সকল শ্রেণীর হিন্দুর, বিশেষ করিয়া গোঁড়া দলের, সহযোগিতা ও সাহায্য লাভে সঙ্ঘকে চেষ্টিত হইতে হইবে। সেই সভায় আরও স্থিব হইল যে, বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক বোর্ডের পরিচালনাধীন শাখা স্থাপন করিতে হইবে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে প্রথমেই তাঁহাকে একটি বাধার সম্মুখীন হইতে হইল। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ রায়ের সভাপতি পদে মনোনয়নে গান্ধীজীর নিকট প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের আপত্তির প্রধান হেতু এই যে, ডাঃ রায় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে দলবিশেষের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাঁহার সভাপতিত্বে গঠিত প্রাদেশিক পর্ষদ্ একটা বিশেষ দলের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং সেইজন্য অনেকে তাহাতে যোগ দিতে সম্মত হইবেন না। গান্ধীজী অবিলম্বে ডাঃ রায়কে একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহাদের আপত্তির কারণাদি জানান এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ সভাপতির পদ ছাড়িয়া দিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে সবিনয়

অনুরোধ করেন। বিধানচন্দ্র পত্র পাওয়ার পরই পদত্যাগ-পত্র কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সভাপতি বিড়লাজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে তাহা জানাইয়া দিয়া লিখিলেন যে, ইহাতে ত্যাগ স্বীকারের কিছুই তিনি দেখিতে পাইতেছেন না; তিনি সভাপতির পদ চাহেন নাই, কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সভাপতি বিড়লাজী গান্ধীজীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহার সভাপতিত্বে প্রাদেশিক পর্ষদ্ কাজ আরম্ভ করিয়া কিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছে; হঠাৎ তাঁহাকে কেন যে সভাপতির পদ ছাড়িয়া দিতে হইল, সে বিষয়ে জনসাধারণের নিকট একটা বিবৃতি প্রদান আবশ্যক; তজ্জন্য তিনি গান্ধীজীর পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ বিবৃতিতে প্রকাশ করার অনুমতিও চাহিয়া পাঠাইলেন। ওই পত্রে ডাঃ রায় ইহাও লিখিলেন যে, সতীশবাবু এবং সুরেশবাবুর দল ব্যতীত আরও বহু দল বাংলা দেশে রহিয়াছে, ওই দুইজনের দল ভিন্ন আর সমস্ত দলই প্রাদেশিক পর্ষদে যোগ দিয়াছে; অথচ আহ্বান করা সত্ত্বেও তাঁহারা আসেন নাই। গান্ধীজীর প্রতি বিধানচন্দ্রের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে কত প্রগাঢ়, তাহা ইতঃপূর্বে প্রসঙ্গত একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন বিষয় তাঁহার কাছে ন্যায়সঙ্গত মনে হইলে তাহা গান্ধীজীকেও স্পষ্টভাবে খুলিয়া লিখিতে বা বলিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। ডাঃ রায়ের পত্রোত্তর পাইয়া গান্ধীজী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে লেখা ঠিক কাজ হয় নাই। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তারযোগে ডাঃ রায়কে জানাইলেন, তাঁহার পত্রখানা যেন বাতিল বলিয়া ধরা হয় এবং ডাঃ রায় যেন পদত্যাগপত্র অবিলম্বে প্রত্যাহার করেন। ডাঃ রায় গান্ধীজীর অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করিলেন। তারের পরে তিনি পাইলেন গান্ধীজীর পত্র—তাহাতে গান্ধীজী নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন এবং ডাঃ রায়কে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া পূর্বের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ওই পত্রে তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পত্রের দ্বারা ডাঃ রায়কে যে মানসিক আঘাত দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেন ডাঃ রায় নিজের উদারতায় ভুলিয়া যান; সেই পত্রখানি লেখার জন্য তিনি নিজেকে সহজে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। "The mental hurt that I have caused you, you will generously forget. I shall not easily forgive myself for writing that letter to you······ ···"

মহাত্মাজীর নির্দেশে ১৮ই ডিসেম্বর সমগ্র ভারতে অস্পৃশ্যতা-বর্জন দিবসরূপে পালন করার জন্য হিন্দুসমাজের নিকট অনুরোধ জানান হইল। পুণার বন্দী-নিবাস হইতে ওই ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধীর আবেদন প্রচারিত হয়। সংবাদপত্র হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:

"মহাত্মাজীর ইচ্ছা যে, ১৮ই তারিখ ভারতের প্রত্যেক গ্রাম, শহর কিংবা নগরীতে অস্পৃশ্যতা-বর্জন দিবসরূপে প্রতিপালন করা হউক। তিনি উক্ত দিবসের জন্য নিম্নলিখিত কার্য-তালিকার প্রস্তাব করিয়াছেন :

"প্রত্যেক স্থানে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘের কার্যের জন্য বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। হরিজনদিগের পাড়া পরিষ্কার করিয়া এবং তাহাদের জন্য অনুরূপ অন্য প্রকার কার্য করিয়া কয়েকজন উচ্চবর্ণের হিন্দু অন্য সকলকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। হরিজনগণ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধূলা ও প্রীতি-সম্মিলনীর সম্মিলিত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। হরিজন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকে লইয়া শোভাযাত্রা এবং কীর্তনের দল বাহির করিতে হইবে; এবং বিশেষ করিয়া হরিজনদিগের পাড়ায় এই উভয় শ্রেণীর হিন্দুকে একত্রিত করিতে হইবে। সর্বত্র জনসভার অধিবেশন করিতে হইবে, এই সকল সভায় অস্পৃশ্যতা-পাপের স্বরূপ পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিতে হইবে, এবং দ্রুত ঐ পাপ সমূলে উচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত প্রচারকার্য চালাইবার জন্য এবং সমস্ত হিন্দুমন্দিরে বিশেষ করিয়া গুরুভায়ুর মন্দিরে হরিজনগণের প্রবেশ সমর্থন করিয়া এই সকল জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।"
(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পর্ষদ্‌ও পূর্বোক্ত কার্যক্রমকে ফলপ্রদ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিল। ১৮ই ডিসেম্বর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলা দেশেও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী দিবস সাফল্যের সহিত পালন করা হইল। সেইদিন কলিকাতায় টাউন হলে ওই উপলক্ষে বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল, এবং বস্তিতে বস্তিতে সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই বিবরণ ২০শে ডিসেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"কলিকাতায় অস্পৃশ্যতা পরিহার দিবস
"বস্তিতে বস্তিতে সেবাকার্য
"পল্লীতে পল্লীতে অনুষ্ঠান
"টাউন হলে বিরাট জনসভা

"১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টার সময় অস্পৃশ্যতা পরিহার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় অস্পৃশ্যতা পরিহার সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতায় টাউন হলে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় তথাকথিত অস্পৃশ্যশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর লোকের এক বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল এবং সভায় প্রভূত উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বক্তাদের বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেরই মনে একটা যুগ-প্রবর্তনকারী নব ভাবের সঞ্চার হয়। সভায় নিম্নলিখিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন : কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জাগ্রাজন নিয়োগী,

সাতকড়িপতি রায়, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, মিথি বেন, শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্র দাস, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসন্তলাল মুবারকা, সীতারাম সাকসেরিয়া, বৈজনাথ কেদিয়া, পণ্ডিত জীবনলাল, ডাঃ সুবোধ বসু ও কিরণ দাস। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

"সভাপতি মহাশয় বলেন: 'আপনাদের কাছে আমার এই নিবেদন যে, আজ আমরা এক অপূর্ব মহান সংস্কারের কামনা হৃদয়ে লইয়া এইখানে সমবেত হইয়াছি। আমার প্রথম কথা এই যে, পূর্বে যাহা অনুভব করা যায় নাই, এখন মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ফলে এই বিরাট হিন্দুসমাজে এক অপরূপ চাঞ্চল্য আসিয়াছে। আমরা এই জাগরণ আজ শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে একান্তভাবে অনুভব করিতেছি। আমরা জানি পৃথিবীর সর্বত্র কি হইয়াছে এবং কেমন করিয়া সকল জাতি মানুষের দাবিকেই একমাত্র স্বীকার করিয়া লইয়া আজ কি প্রকার গৌরবের শিখরে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই অতি বিস্তীর্ণ মাতৃভূমির অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে মানুষ মানুষের অধিকারকে, মানুষের দাবিকে স্বীকার করে নাই। অতি তুচ্ছ কুসংস্কারের আবরণ দিয়া মানুষের সরস সত্তাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। আজ সেই সব অবজ্ঞাত, যাঁহারা নিম্নে রহিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, আমাদের অধিকার দাও। এই অধিকারের দাবি শাশ্বত। তাই আমরা কাহারও জন্মগত প্রাধান্য স্বীকার করিব না। জাতীয়তা বৃদ্ধির সময় আজ ভারতবর্ষে আসিয়াছে; এখন একা উপরে উঠিতে চাহি না, হয় সকল ভ্রাতা-ভগ্নী একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া নব উদয়াচলের দিকে যাত্রা করিব, নতুবা কখনও আমার অবজ্ঞাত অনুন্নত তথাকথিত ভ্রাতা-ভগ্নীদের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া একাকী গৌরবের পথে চলিব না। আজ জারবেদা কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হইতে এই বাণীই আমরা লাভ করিয়াছি। জীবনপণ অনশনে যে সত্য মহাত্মা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, আমাদেরও সেই সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। বন্ধুগণ! আমরা সত্যের বন্দনায় যেন পিছনে পড়িয়া না থাকি।'

"সভাপতির আহ্বানে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করেন:

'এই সভায় সমবেত হিন্দুগণ প্রত্যেকে ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে, আমরা জন্মগত অস্পৃশ্যতা বিশ্বাস করি না; যে অস্পৃশ্যতা এতকাল ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ আনয়ন করিয়াছে, অতি সত্বর উহা দূর করিয়া সাম্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।'

"প্রস্তাবক উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, মহাত্মাজী আমাদের অনুভবের কৃষ্ণ যবনিকাখানি উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের এই জাতি যে ক্রমশঃ অধোগতির দিকে নামিয়া যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই—প্রায় আট কোটি

মানব-সন্তানকে বড় হইবার, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার অধিকার দিতেছি না, হিন্দু যাহাতে মহৎ হইয়া গৌরব-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত, সেই পরম প্রয়োজনীয় সত্যকেই আমরা এ যাবত অস্বীকার করিয়া আসিতেছি। আজ মহাত্মাজীর জীবনরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমাদের—সেই কথা যেন বিস্মৃত না হই।

"উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বলেন—প্রস্তাবের মৌলিক অনুভূতি নূতন নহে, কারণ পূর্বেই তাহা আমাদের কানে আসিয়া পৌছিয়াছে—

'শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

"আমাদের দেশে যুগে যুগে যে সকল মহাজনের আগমন হইয়াছে, তাঁহারাও এই বাণী দিয়াছেন। তবু এই জিনিসটাকে আজ আমাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, কেননা বিগত কয়েক শত বৎসরের অন্ধ সংস্কার আমাদের ভিতরে আশ্রয় পাইয়া এই মনুষ্যত্বের পরম দাবিকে চাপা দিয়াছে। আজ মানুষের অন্তরের চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে। এই যুগ-যুগ-সঞ্চিত অন্ধকারের বিরুদ্ধেই মহাত্মাজীর পণ, মহাত্মাজীর সংকল্প। হিন্দুসমাজ! আজ তোমার পরিচয় কায়স্থ নয়, বৈদ্য নয়, নমঃশূদ্র নয়, তোমার একমাত্র অখণ্ড পরিচয় হইবে—হিন্দু। আজ সম্মুখে যে আলেখ্য দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নবারুণ দীপ্তির বিকাশ দেখিতেছি। আমাদের মহাত্মার অনশন বৃথা হয় নাই, উহা আমাদের বহু শতাব্দীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

"অতঃপর সভাপতি মহাশয় সভার নিকট উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মত সমর্থনের জন্য আবেদন করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবের প্রতিটি কথা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

"তদনুসারে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিরাট জনসঙ্ঘ প্রস্তাবের প্রতি কথাট সভাপতির সহিত আবৃত্তি করিয়া গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের দৃশ্যটি অপূর্ব হইয়াছিল।

"তারপর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সভায় আনয়ন করেন :

" 'এই সভায় সমবেত সর্বশ্রেণীর হিন্দুগণ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক সাধারণ দেব-মন্দিরেই শ্রেণী বা জাতি নির্বিশেষে সকল হিন্দুরই প্রবেশের অধিকার আছে। অতএব মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কালিকটের জামোরিনকে আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি প্রতি মানবের এই ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া অচিরে গুরুভায়ুর মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করুন এবং এই সৎকার্য দ্বারা তিনি মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার অনশনের প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত করিয়া সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।'

"প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত খৈতান এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

"উক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্র দাস তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, এই রকম একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আবার সভার প্রয়োজন হয়; পৃথিবীর আর কোথায়ও মানুষের দেবতার উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশের জন্য এমন সভা করার আবশ্যক হয় না। হিন্দুজাতির ইহা হীন কলঙ্কের কথা। এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। অস্পৃশ্যকে যেন টানিয়া লই, মানুষের ভিতর অবস্থিত সত্যকে যেন অবজ্ঞা না করি।

"অতঃপর সভায় উপরোক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত জীবনলাল, মিথি বেন সর্বশেষ বক্তৃতা করেন। ডাঃ সুবোধকুমার বসু সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়।"

কলিকাতায় বস্তিতে বস্তিতে যেসব প্রচারসভা হয়, তাহার বিবরণ-ও সংবাদপত্রে নিম্নরূপ প্রকাশিত হয়:

"গত রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য, সত্য মজুমদার, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু ভট্টাচার্য, সুধাংশু কর, দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য, পি. দত্ত, এস. কে. তেওয়ারী, শুকদেব চৌধুরী প্রভৃতি অ্যালবার্ট-হল হইতে বিভিন্ন বস্তি পরিদর্শন করিতে বাহির হন। তাঁহারা ২০নং রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, ৬৪।১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, ১নং গৌরীবাড়ী লেন, ১৪নং উল্টাডাঙ্গা রোড, ৪২।৪৩নং আপার সার্কুলার রোড পরিদর্শন করেন। তাঁহারা সকল বস্তিতেই সভা করেন এবং বস্তিবাসীদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য অনুরোধ করেন। প্রত্যেক স্থানেই সভার শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়, জাতিনির্বিশেষে সকলেই উহা গ্রহণ করেন।"

অনশনের মাধ্যমে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন, কোন ন্যায্য দাবির প্রতি বিদেশী সরকার অথবা জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ, কিংবা আত্মশুদ্ধি—গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনশনকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন একটা পবিত্র ব্রতরূপে। সেই ব্রত পালন করিতে যাইয়া কোন কোন বার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজী অনশন-ব্রত পালন করিয়াছিলেন আঠার বার। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বারের (১৯১৩ এবং ১৯১৪ খ্রীঃ) অনশন-ব্রত তিনি পালন করিয়াছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতে অনশন উপলক্ষে অনেক বারই ডাঃ রায় গান্ধীজীর নিকটে ছিলেন। আগস্ট-বিপ্লবের পরে গান্ধীজী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ২১ দিনের জন্য অনশন করেন। 'ভারত ছাড়িয়া যাও' আন্দোলন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর অন্যায়ভাবে যে দোষারোপ করেন, উহারই প্রতিবাদে ওই অনশন। ইহার আরম্ভ হইল

১০ই ফেব্রুয়ারি হইতে এবং সমাপ্তি হইল ৩রা মার্চ। গান্ধীজী তখন আগা খাঁ প্রাসাদে (পুণায়) বন্দী। অনশনব্রত পালনের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"…গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। কাছে ছিলেন কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন। ডাঃ গিল্‌ডার ছিলেন য়েরোড়া জেলে, তাঁহাকে নিয়ে আসা হল পুণায় বন্দীবাসে।

"বাহিরে যখন খবর গিয়ে পৌঁছালো, তখন গান্ধীজীর স্বাস্থ্য খারাপের দিকে যেতে শুরু করেছে— বমির ভাব, রাত্রে ঘুম নেই। ক্রমে অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল, সামান্য যে জলটুকু তিনি পান করতেন, তাতেও কষ্ট হতে লাগলো। চারদিক থেকে ডাক্তাররা ছুটে গেলেন--কলিকাতা থেকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার সুশীলা নায়ার, বোম্বাই থেকে সার্জেন জেনারেল মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি। নাক, কান, গলার বিশেষজ্ঞ এসে গান্ধীজীকে পরীক্ষা করলেন। সারা ভারতের জনগণের উৎকণ্ঠা শান্ত রাখার জন্য সকালে বিকালে ছ'জন ডাক্তারের স্বাক্ষর দিয়ে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য-সংবাদ ঘোষণা করার ব্যবস্থা হোল,– ডাক্তার গিল্‌ডার, মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভাণ্ডারী, ডাক্তার সুশীলা নায়ার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল শা। বোম্বাই সরকারের উপদেষ্টা ব্রিস্টো সাহেব এলেন গান্ধীজীর অবস্থাটা চাক্ষুষ দেখবার জন্য।

"২১শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজীর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে উঠলো। বেলা ৪টার সময় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ধমনীর গতি অনুভব করা যায় না।

"পরদিনও অবস্থা বিশেষ ভালর দিকে গেল না, ইউরিমিয়ার ভাব দেখা গেল। এবার বুঝি গান্ধীজী আর বাঁচেন না। সারা ভারত থমথম্ করতে লাগলো, বড়লাটের দরবার থেকে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন—হোমি মোদী, নলিনীরঞ্জন সরকার, মাধব শ্রীহরি আনে।

"২৫শে গান্ধীজীকে গরম জলে গা মুছিয়ে গাত্র-মর্দনের ব্যবস্থা করা হোল, কিন্তু তথাপি অবস্থা বিশেষ কিছু ভালর দিকে গেল না।

"২৭শে তারিখে তিনি লোক চিনতে পারলেন না। কিন্তু ডাক্তারদের তিনি অনুরোধ করেছিলেন যখন তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন তখন যেন তাঁরা জোর করে কোন কিছু না করেন। তাই গান্ধীজীর মুখ থেকে যখন লালা ঝরতে শুরু করলো তখন ডাক্তাররা কিছুই করতে সাহস পেলেন না, উপরন্তু গান্ধীজী অ্যালোপাথিক চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন, তাঁর মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ করতেও ডাক্তাররা শঙ্কিত হয়েছিলেন।"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিলাতে চার্চিল সাহেবের কাছে 'তার' করলেন—আমি শেষ মুহূর্তে আপনার কাছে আবেদন করছি মহাত্মাজীকে মুক্তি দিন।…গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে হৃদ্যতার সম্ভাবনা আছে তা চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুক্তি দেবার জন্য ব্রিটিশের তখন মোটেই আগ্রহ ছিল না।

শোনা যায় এই সময় ভারত সরকার মহাত্মাজীর মৃত্যু অবধারিত মনে করে পুণায় প্রচুর চন্দনকাঠ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুদের ইচ্ছা সফল হোল না, গান্ধীজীর অবস্থা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হোল। ৩রা মার্চ সকাল ৯টায় তিনি যখন অনশন শেষ করলেন, তখন সমস্ত অসুস্থতা তিনি জয় করেছেন, শুধু দৈহিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বললেন—গান্ধীজী আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুর অত্যন্ত কাছে তিনি গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

অনশন শেষ করে গান্ধীজী বললেন—"জানি না ভগবান কেন আমার জীবন রক্ষা করলেন, সম্ভবতঃ তিনি আমাকে দিয়ে আরো অনেক কাজ করিয়ে নিতে চান।" (উদ্ধৃতি—'আমাদের গান্ধীজী'—ধীরেন্দ্রলাল ধর।)

এই প্রসঙ্গে বিধানচন্দ্রের জীবনীকার মিঃ টমাস এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন : সরকারের পক্ষ হইতে তিনজন ডাক্তার ছিলেন, জেনারেল ক্যান্‌ডি (ইনিই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করিয়াছিলেন), কর্নেল শ এবং কর্নেল ভাণ্ডারী। গান্ধীর পক্ষের ডাক্তার ছিলেন ডাঃ বি. সি. রায়, ডাঃ গিল্‌ডার ও ডাঃ সুশীলা নায়ার। অনশনের ত্রয়োদশ দিনে গান্ধীজী বমি করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা কবিয়া দেখা গেল, তাঁহার অবস্থার দ্রুত অবনতি হইতেছে এবং কোনও কিছু তাঁহার পেটে থাকিতেছে না। ঐদিন বেলা দুটার সময় জেনারেল ক্যান্‌ডি ও অন্যান্য সরকারী ডাক্তাররা বোধ করিলেন যে, গান্ধীজীর মৃত্যুক্ষণ ঘনাইয়া আসিয়াছে ; ডাঃ ক্যান্‌ডি ডাক্তার রায়কে বলিলেন যে, গান্ধীজী তাঁহার অনশন আর চালাইতে পারিবেন না ; এখন তিনি যদি কিছু খাইতে না চান, তবে তাঁহাকে গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দিতে হইবে। বিধানচন্দ্র বলিলেন, গান্ধীজী তাঁহাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া, গ্লুকোজ খাওয়ানো বা গ্লুকোজ রেক্টাম ফীডিং করা চলিবে না। তবে তিনি বন্দী। সরকার ইচ্ছা করিলে জোর করিয়া উহা করিতে পারেন। কিন্তু উহা করিবার ঝুঁকি আছে। উহাতে তিনি যে মানসিক আঘাত পাইবেন, তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি ঘোষণা করিব যে, আমার নিষেধ সত্বেও গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দিয়া আপনারা তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছেন।

বিধানচন্দ্রের এই কথায় সরকারী ডাক্তাররা গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দিতে সাহস করিলেন না। জেনারেল ক্যান্‌ডি গান্ধীজীকে গ্লুকোজ লইবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু গান্ধীজী রাজী হইলেন না। তখন ডাক্তাররা বুলেটিন প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, গান্ধীজীর অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বিধানচন্দ্র গান্ধীজীর নিকট গিয়া তাঁহাকে মোসাম্বির রস খাইতে অনুরোধ করিলেন এবং বুঝাইলেন যে, গান্ধীজী অনশনকালে যখন টক লেবুর রস খান, তখন মোসাম্বির রসে ব্রত ভঙ্গ হইবে না। কারণ, মোসাম্বিও লেবু মাত্র। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত রাজী হইলেন এবং মোসাম্বির রস পান করায় কল্পনাতীত কাজ হইল। বমি বন্ধ হইয়া গেল; তিনি জল খাইতে পারিলেন এবং প্রস্রাবও হইতে লাগিল। রাত্রি নটার সময় বিধানচন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আগা খাঁ প্রাসাদ হইতে নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন। তবে প্রাসাদের বাহিরে সমগ্র দুনিয়া দুরু দুরু বক্ষে প্রহর গুণিতে লাগিল।

পরদিন সকাল আটটায় বিধানচন্দ্র যখন আবার আগা খাঁ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, বহুসংখ্যক ইংরেজ, আমেরিকান ও ভারতীয় সাংবাদিক প্রাসাদের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। প্রাসাদের বাহিরে প্রহরীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিধানচন্দ্র বুঝিলেন, জেনারেল ক্যান্ডি সরকারের কাছে গোপন রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন যে, গান্ধীজী রাত্রিতেই মারা যাইবেন। সেইজন্য ভারত সরকার পুণার রাজকর্মচারীদের নিকট গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কে সম্ভবত প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। গান্ধীজীর মৃত্যু হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া কি হইবে, সে সম্পর্কেও সরকার শঙ্কিত ছিলেন, সেজন্য সামরিক প্রহরার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। বিধানচন্দ্র আগা খাঁ প্রাসাদে ঢুকিয়া কিন্তু অন্য চিত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। গান্ধীজীর মুখের ভাব আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। আগের দিন তিনি কুঁকড়াইয়া শুইয়া ছিলেন। তাঁহার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তিনি যে মৃত্যুর সহিত পাঞ্জা কষিতেছেন, তাহা বোঝা যাইতেছিল। এখন সে ভাব নাই, তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর সহিত যুদ্ধে যে জয়লাভ করিয়াছেন, এখন তাহা সুস্পষ্ট। বিধানচন্দ্র এ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন : গান্ধীজী সরকারকে ও যমকে বোকা বানাইয়া দিয়াছেন।

যেখানে দুইটি মানুষের মধ্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়, সেখানে প্রভাব-বিস্তারও একতরফা হয় না। গান্ধীজী যেমন বিধানচন্দ্রের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, বিধানচন্দ্রও গান্ধীজীর উপর সময়-বিশেষে কম প্রভাব বিস্তার করেন নাই। বিধানচন্দ্রের দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধি। সেইজন্য তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তার রায় খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। গান্ধীজী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া ডাক্তার রায় ভারতবিশ্রুত চিকিৎসক হইয়াও গান্ধীজীর অসুস্থ অবস্থায় কাছে আসিতেন না। কিন্তু একবার ডাক্তার রায়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খাইলেন এবং সহজেই রোগমুক্ত হইয়া গেলেন। সেই কাহিনী 'আমাদের গান্ধীজী' হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"বন্দীবাসে মহাত্মাজীর ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ঘুসঘুসে জর, তারই সঙ্গে আমাশয়। শোক ও নিঃসঙ্গতা তাঁর মন ও শক্তিকে বিষাদক্লিষ্ট করে তুললো।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কি একটা কাজে গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ে, বোম্বাই সরকারের অনুরোধে তিনি গান্ধীজীকে দেখতে গেলেন পুণায়। ডাক্তার বিধানকে দেখে গান্ধীজী খুশী হলেন, কিন্তু চিকিৎসা করার কথা শুনে বললেন—ডাক্তার বিধান, তোমার চিকিৎসা তো আমি নিতে পারবো না।

বিধান বিস্মিত হলেন, বললেন—আমার অপরাধ কি জানতে পারি না?

গান্ধীজী বললেন—আমার দেশের চল্লিশ কোটি দীন-দুঃখীর অসুখে যখন চিকিৎসা করতে পার না, তখন আমিই-বা তোমার চিকিৎসা নেব কেন?

বিধানচন্দ্র বললেন—এই কথা। মহাত্মাজী, আমি চল্লিশ কোটি নরনারীর চিকিৎসা করতে পারিনি একথা সত্যি, কিন্তু এই চল্লিশ কোটি নর-নারীর যিনি আশা-ভরসা, চল্লিশ কোটি পরাধীন মানুষ যাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে, চল্লিশ কোটি নর-নারীর দুঃখ লাঘবের ভার যাঁর হাতে, যিনি বাঁচলে চল্লিশ কোটি বাঁচবে, যাঁর মৃত্যুতে চল্লিশ কোটি মরবে, তাঁর চিকিৎসার ভার সেই চল্লিশ কোটি নরনারী আমার উপর দিয়েছে, আপনি 'না' বললেই বা আমি শুনবো কেন?

গান্ধীজী বললেন—কিন্তু ডাক্তার বিধান, তোমার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তো আমি নিতে পারি না।

বিধানচন্দ্র বললেন—মহাত্মাজী, আপনি তো বলেন যে—পৃথিবীর সব কিছু, এমন কি ধূলিকণাটি পর্যন্ত ভগবানের সৃষ্টি—একথাটা কি সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন?

মহাত্মাজী বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, সমস্তই ভগবানের সৃষ্ট।

—তাহলে মহাত্মাজী, অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাও কি তাঁর সৃষ্টি নয়?

গান্ধীজী এবার হেসে ফেললেন,—তোমার উকিল কি ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল, তুমি কেন যে আইনজীবী হওনি আমি তাই ভাবছি।

—ভগবান আইনজীবী না করে চিকিৎসাজীবী করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁর সব-সেরা ভক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিকিৎসার ভার পড়বে আমার উপর। উকিল ব্যারিস্টার হয়ে হয়তো আমি অনেক বেশী টাকা উপায় করতে পারতাম, কিন্তু ভগবানের প্রিয়তম সন্তানের চিকিৎসা করার সৌভাগ্য তো পেতুম না। এইজন্যই ভগবান আমাকে ডাক্তার করেছেন।

মহাত্মাজী হেসে উঠলেন, বললেন—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, তুমি কি ওষুধ দেবে দাও, খাই।

অ্যালোপ্যাথিক মতেই সেবার গান্ধীজীর চিকিৎসা হোল, এবং ক'দিনের মধ্যেই বিধানচন্দ্র তাঁকে নিরাময় করে কলকাতায় ফিরলেন।"

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই সকাল বেলায় গান্ধীজী কলিকাতায় আসেন হরিজন ভাণ্ডারে অর্থ-সংগ্রহের জন্য। এক ঘণ্টা বিশ্রামের পরে ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া ডাক্তারেরা বিবৃতি দেন। সারা দিন অর্থ সংগ্রহের কার্যে গান্ধীজীকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। পরদিবস তিনি কংগ্রেসকর্মিগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় পৌর-সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। এই দিন সন্ধ্যায় ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার স্বাস্থ্য পুনর্বার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তাহাতে দেখা গেল, তাঁহার রক্তের চাপ (ব্লাড্ প্রেসার) সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে মোটের উপর তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক। তৃতীয় দিবস (২১শে জুলাই) অপরাহ্ণে দেশবন্ধু পার্কে প্রায় দশলক্ষ নরনারীর এক বিরাট জনসভায় গান্ধীজী বক্তৃতা দেন। কলিকাতায় কার্যসমাপনান্তে তিনি বিহার ভূমিকম্প-দুর্গত জনগণের সাহায্যদান উপলক্ষে পাটনা গেলেন ৩রা আগস্ট। ইহার দিন কয়েক পরেই (৭ই আগস্ট হইতে) তিনি এক সপ্তাহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত রূপে অনশন করিলেন। আজমীরে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের সমর্থকগণের মধ্যে একটি দল সনাতনীদের আক্রমণ করিয়া প্রহার করিয়াছিল ; সেইজন্যই ওই অনশন-ব্রত পালন। তিনি অনশন করিবেন জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বোম্বে হইতে ডাঃ জীবরাজ মেহতা 'তার' করিয়া জানান যে,—অনশনকালে তাঁহারা গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে চাহেন। গান্ধীজীর নির্দেশে তাঁহার একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই জানাইলেন--তাঁহারা যেন নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, এখন আসিবার প্রয়োজন নাই ; যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ডাকা হইবে। এই সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার ৮ই আগস্টের সংখ্যায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"Dr. Bidhan Chandra Roy and Dr. Jeevraj Mehta have both offered their services during Mr. Gandhi's fast, but at the latter's instance Mr. Mahadev Desai has written to them both urging them not to disturb their work and assuring them that Mr. Gandhi would not hesitate to summon them if it was found absolutely essential."

কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের ডাকিবার কোন আবশ্যকতা হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর সপ্তাহ-ব্যাপী অনশনের দিনগুলি নিরাপদে কাটিয়া গেল। গান্ধীজী এবং ডাঃ রায়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল, উহার কতক নিদর্শন পূর্বোক্ত বিবরণ হইতেও মিলিবে।

২০

পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি

মহাত্মা গান্ধীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য যে এক বিরাট, অহিংসাপন্থী ও শক্তিশালী বাহিনী সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহা সুস্পষ্ট দেখা গেল। আইন অমান্য আন্দোলনের পথেই মুক্তিকামী জাতি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে,—সে বিষয়ে গান্ধীজী নিশ্চিত হইলেন। ডাঃ আন্‌সরি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অভিমত ছিল এই—আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় কখন আরম্ভ হইবে ঠিক নাই, সুতরাং দেশকে কর্মব্যস্ত করিয়া তুলিতে এবং ব্রিটিশ সরকারের চালবাজি পুরাপুরি ধরাইয়া দিতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি কংগ্রেসের পূর্ববৎ গ্রহণ করা সমীচীন। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের সমর্থনে 'হোয়াইট পেপার' বা সুপারিশপত্র ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ডাঃ রায় এবং ডাঃ আন্‌সারি আলাপ-আলোচনা করিয়া একমত হইলেন। তাঁহারা কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের মতের সমর্থক আরও আছেন। ডাঃ রায় কোন কাজে একবার হাত দিলে তাহা কখনও অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া দেন না। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি দেশের তৎকালীন অবস্থায় যখন পুনর্বার গ্রহণযোগ্য বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল, তখন তিনি বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতৃবর্গের মতামত অবগত হইতেও চেষ্টিত হইলেন। এই চেষ্টাতে কাটিয়া গেল দুই মাসেরও অধিক কাল। অতঃপর (১৯৩৪ খ্রীঃ মার্চ) তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিমতও জানিয়া লইলেন। ডাঃ আন্‌সরি এবং ডাঃ রায় উভয়ে মিলিয়া নয়া দিল্লীতে বিশিষ্ট নেতাদের একটা ঘরোয়া সম্মেলনের আয়োজন করিলেন; নয়া দিল্লীতে ডাঃ আন্‌সারির ভবনে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইল ৩১শে মার্চ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চল্লিশজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ডাঃ আন্‌সারি, আসফ আলি, ভুলাভাই দেশাই, কে. এম. মুন্সী, কে. এফ. নরিম্যান, চৌধুরী খালেকুজ্জমান, সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সত্যমূর্তি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসী গোস্বামী, সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ।

পূর্বোক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল—দেশের তাৎকালিক পরিস্থিতি সঠিক অবগত হওয়া এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে অবিলম্বে কর্তব্য নির্ধারণ। দুই দিনের অধিবেশনে নেতৃবর্গ আলোচনান্তে একমত হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনর্বার গ্রহণ করা সমীচীন; তবে মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন ব্যতীত ওই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা হইবে না। অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতার দিল্লী হইতে ১লা এপ্রিল তারিখে সম্মেলন সম্বন্ধে প্রেরিত যে সংবাদ ৩রা এপ্রিল প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি:

"Whether Ansari-Roy-Desai trio will be as powerful as Matilal-Das-Patel trio was, when the first Swaraj Party was formed, remains to be seen." অর্থাৎ—প্রথম স্বরাজ্য দল গঠিত হইবার সময়ে মতিলাল-দাশ-প্যাটেল ত্রিনেতা যেমন শক্তিমান ছিলেন, আন্‌সারি-রায়-দেশাই ত্রিনেতা তদ্রূপ শক্তিমান হইবেন কিনা তাহা এখন বলা যায় না—ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবার জন্য ডাঃ আন্‌সারি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভুলাভাই দেশাই ৩রা এপ্রিল প্রাতঃকালে নয়া দিল্লী হইতে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন তাঁহারা তথায় পৌছিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন অপরাহ্ণ প্রায় ছয়টার সময়ে। তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইল তিন ঘণ্টার উর্দ্ধকাল অর্থাৎ রাত্রি সওয়া নয়টা পর্যন্ত। পরের দিন সকালবেলায় নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে আইনসভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হইল। অবশেষে স্বরাজ্যদলকে পুনরুজ্জীবিত করার সম্মতি দিলেন গান্ধীজী। সেই দিনই (৫ই এপ্রিল) এই সম্পর্কে তিনি ডাঃ আন্‌সারির নামে যে পত্র লিখিলেন, তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হইল। পত্রের সারমর্ম এই: কংগ্রেসী নেতৃগণের মধ্যে যাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন না, অথচ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁহারা দেশের কল্যাণসাধনার্থ ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে পারেন। পত্রের শেষাংশে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন: এই দলের কার্যে সাহায্য করিতে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিব। আমার ক্ষমতায় যতটা সাহায্য করা সম্ভবপর, আমি ততটা সাহায্যই করিব। "I shall be at the disposal of the party at all times and render such assistance as it is in my power to give." অতঃপর ডাঃ রায় স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে এক বিবৃতি প্রচার করিলেন। ৭ই এপ্রিলের সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইল। সেই বিবৃতি হইতে জানা যায়—স্বরাজ্য দলকে পুনর্বার উজ্জীবিত করার কথা রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারই প্রথম বলেন এবং ডাঃ রায়ের সঙ্গে তিনিই প্রথমে সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার

মৃত্যু হয়। তারপর ডাঃ রায় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ওই সম্পর্কে ডাঃ আন্সারির সহিত আলোচনা করেন। উভয়ে স্থির করিলেন নয়া দিল্লীতে আগামী মার্চ মাসের (১৯৩৪ খ্রীঃ) শেষে একটা ঘরোয়া সম্মেলন ডাকিবেন। তৎপূর্বে ডাঃ রায় গান্ধীজীর সঙ্গে ১৮ই মার্চ পাটনায় সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইল। গান্ধীজী বলিলেন যে, তিনি তাঁহার আইন অমান্য আন্দোলনেব কার্যক্রম পরিবর্তন করিবেন না, তবে গঠনমূলক কার্যক্রম সমর্থন করিবেন; গান্ধীজীর মতে, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া কাজ করাও গঠনমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

দেখা যাইতেছে—ডাঃ রায়ই প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া স্বরাজ্য দলকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াসী হইয়া কাজে না নামিলে এত সহজে ও এত সত্বর ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি গৃহীত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার ওই প্রচেষ্টা হইতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁহার আস্থা কিরূপ দৃঢ়। সম্মেলন ডাকিবার পূর্বেই তিনি গান্ধীজীর সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়া লইয়াছিলেন, যদিও তৎকালে তিনি তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন নাই। ডাঃ রায়ের রাজনৈতিক জীবনে গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতি তাঁহার অবিচলিত আনুগত্যের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছে। আমাদের মতে, ওইরূপ আনুগত্যের প্রধান কারণ এই যে,—গান্ধীজী ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নেতা হইয়াও নিজের মত এবং পথকেই গোঁড়ার মতো আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেন না; যুক্তিসঙ্গত মনে হইলে তৎস্থলে অপরের মত এবং পথকে-ও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেন। কোন প্রকার পূর্বধারণার বশবর্তী না হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অপরের যুক্তিকে যাচাই কবিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল সেই মহানায়কের। ওই দুর্লভ গুণ বিধানচন্দ্রকে তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল,—এইরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা-লাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যক্রম পরিবর্তিত করিলেন না সত্য, কিন্তু দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় তাহা স্থগিত রাখিলেন। পাটনায় অবস্থানকালেই তথা হইতে ৭ই এপ্রিল (১৯৩৪ খ্রীঃ) ওই সম্পর্কে তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি পাঠাইলেন। ৮ই এপ্রিলের সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন যে,—স্বরাজের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হইল; এবং কংগ্রেসপন্থীগণকে বলিলেন, তাঁহারা যেন জাতিগঠনাত্মক কার্যাবলীতে, সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধনে এবং অস্পৃশ্যতা অপসারণে আত্মনিয়োগ করেন।

পূর্বোক্ত ঘোষণার প্রায় চার মাস পরে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বেনারসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে। ২৭শে জুলাই হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইয়া ৩০শে জুলাই সমাপ্ত হইল। মহাত্মা গান্ধী,

রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, আবুল কালাম আজাদ, যমুনালাল বাজাজ, জয়রাম দৌলতরাম, কে. এফ. নরিম্যান, সর্দার শার্দুল সিং, মাধব শ্রীহরি আনে প্রভৃতি নেতৃবর্গ অধিবেশনে যোগদান করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীরাজাগোপালাচারিয়া বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সাধারণ কর্মসচিবদ্বয় ভুলাভাই দেশাই ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। পূর্বোক্ত চারজন নেতাই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে পাঁচ ঘণ্টা আলোচনা চলিল। কংগ্রেস ইতঃপূর্বে সেই রোয়েদাদের বিরোধিতা করে নাই কিংবা সমর্থনও করে নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং মাধব শ্রীহরি আনে ওই নীতির বিপক্ষে ছিলেন। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় পূর্বোক্ত নীতি মানিয়া চলা সমীচীন, ইহাই নীতির সমর্থকগণ মালব্যজী ও আনেজীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মতের কোন পরিবর্তন ঘটিল না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডাঃ আন্সারি, ডক্টর আলাম, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইতঃপূর্বে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বোম্বাই অধিবেশনে যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল, তাহা কোনরূপ পরিবর্তিত হইল না। ওয়ার্কিং কমিটিতে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল যে, কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য থাকায় কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ্ গ্রহণও করিতে পারে না কিংবা বর্জনও করিতে পারে না। মালব্যজী এবং আনেজী কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য-পদে ইস্তফা দিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে কংগ্রেসের গৃহীত না-গ্রহণ-না-বর্জন নীতির প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় আইনসভার পরবর্তী নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'কংগ্রেস ন্যাশন্যালিস্ট্ পার্টি' নামে একটি দল গঠন করিলেন। ৩০শে জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হইল। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড এবং ওয়ার্কিং কমিটির একটি যুক্ত অধিবেশনও বসিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যগণকে তাঁহাদের কার্যে তাঁহার পূর্ণ সমর্থনের আশা দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই উপদেশও প্রদান করিলেন যে, পার্লামেন্টারি বোর্ডের কার্যের উপর যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব বিস্তারিত না হয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচন ওই বৎসরেই, নভেম্বর মাসে। ডাঃ রায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের অন্যতম সম্পাদক রূপে সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। বাংলা-দেশের জনমত কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-সংক্রান্ত নীতির বিরোধী ছিল। এমন কি কংগ্রেসপন্থীদিগের মধ্যেও অনেকে কংগ্রেসের অনুসৃত না-গ্রহণ-না-বর্জন নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ডাঃ রায়কে নির্বাচন অভিযান

চালাইতে.হইয়াছিল। তিনি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্মে তোমার অধিকার, ফলে কোন অধিকার নাই—গীতার ওই শাশ্বতী বাণী ডাঃ রায়ের কর্মজীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিলে হয়তো ভুল হইবে না। অক্টোবর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ইত্যাদি শহরে এবং নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা শহরে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকার্য উপলক্ষে গমন করেন। প্রত্যেকটি শহরে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দেন। প্রচারকার্যে ডাঃ রায়ের সহকর্মী-রূপে আমরাও তাঁহার সঙ্গে ওই সমুদয় স্থানে গিয়াছিলাম এবং চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার জনসভা ব্যতীত অন্যান্য জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছিলাম। চট্টগ্রামের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার রায়চৌধুরী ভ্রাতৃগণের (যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী) এবং সেই পরিবারের তরুণ কংগ্রেস-সেবক সুধীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ রায় চট্টগ্রামে ছিলেন বারো-তেরো ঘণ্টা, তথায় তিনি রায়চৌধুরী পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কয়েকটি রোগী দেখিবার আহ্বান আসিলে তিনি দর্শনী ও সময় নির্ধারণ ইত্যাদির ভার দিলেন সুধীনকে। দর্শনী বা ফী বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত টাকা (৮০০৲) তিনি তাহাকে দিয়া আসিলেন কংগ্রেসের নির্বাচনকার্যের আংশিক ব্যয়নির্বাহের জন্য।

৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে যাত্রামোহন হলে চট্টগ্রাম-শহরবাসীগণের এক বিরাট জনসভায় ডাঃ বিধান রায় বক্তৃতা দিলেন। সভাপতিত্ব করিলেন চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ জে. কে. ঘোষাল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-সংক্রান্ত কংগ্রেস-নীতির বিরোধীদল সভায় গোলযোগ সৃষ্টির দ্বারা ডাঃ রায়ের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতা বন্ধ হইল না দেখিয়া বিরোধীপক্ষের কিছুসংখ্যক যুবক ডাঃ রায়কে লক্ষ্য করিয়া ঘুঁটে ছুঁড়িয়া মারার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ক্ষণকালের জন্য ডাঃ রায় বক্তৃতা বন্ধ করিলেন এবং গোলযোগকারী যুবকদের লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই—এমনি করে আমাকে ঘুঁটে ছুঁড়ে মারলেই আমি ভয়ে পালিয়ে যাব না। ঘুঁটে কেন, পাথর ছুঁড়ে মারলেও যাব না। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনসভা ডাকা হয়েছে, সকলের সম্মতিতে এখানকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর আহ্বানে আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের তরফ থেকে বক্তৃতা দিচ্ছি। এ আমার ন্যায্য অধিকার। তাতে জোর-জবরদস্তি করে বাধা দিলেই আমি হটে যাব না। নির্বাচনের পূর্বে সমস্ত দলই জনসাধারণের কাছে

নিজ নিজ বক্তব্য বলে থাকেন। আধুনিক যুগে সকল সভ্য দেশেই এ নীতি মেনে চলা হয়। যাঁরা এ নীতি লঙ্ঘন করেন কিংবা করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা গণতন্ত্রের শত্রু। এই সতেজ ও সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে সুফল ফলিল। গোলযোগ বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পর ডাঃ রায় বিনা বাধায় অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। উল্লিখিত স্থানগুলি ব্যতীত বাংলাব আরও কয়েকটি স্থানে তিনি কংগ্রেসেব পক্ষে নির্বাচনী প্রচার-কার্য চালাইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করিতে পাবে নাই।

২১

প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি-পদে

১১ই অক্টোবর (১৯৩৪ খ্রীঃ) কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য সদস্যগণের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হইলেন ১১৩-৮৬ ভোটে। সুভাষচন্দ্র বসু তখন ইউরোপে অবস্থান করিতেছিলেন; ইহা সত্ত্বেও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁহার নাম ডাঃ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে প্রস্তাব করেন। তৎপূর্বে প্রস্তাব করা হইয়াছিল ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের নাম, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মত হন নাই বলিয়া তাঁহার স্থলে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব করেন রাজসাহীর সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র এবং সমর্থন করেন মৌলবী জালালুদ্দিন হাসেমী। সহসভাপতিদ্বয় নির্বাচিত হইলেন সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র এবং গাইবান্ধার মৌলবী মহিউদ্দিন। কমলকৃষ্ণ রায় এবং কিরণশঙ্কর রায় যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। পরবর্তী দিবসের (১২ই অক্টোবর তারিখের) সংবাদপত্রে পূর্বোক্ত নির্বাচনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একটিকে ডাঃ বিধান রায়ের দল এবং অন্যটিকে সেনগুপ্তের দল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ডাঃ রায়ের সম্মতি না লইয়া এবং তাঁহাকে পূর্বে না জানাইয়া সভাপতি নির্বাচন করা হইয়াছিল। তবে তিনি সেই পদ গ্রহণে আপত্তি করেন নাই। অতঃপর ডাঃ রায় যথাসময়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন; এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও তাঁহাকে সদস্য মনোনীত করা হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচনকালে শরৎচন্দ্র বসু কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। নির্বাচনের সময় নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই ডাঃ রায় কারাগারে শরৎবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শরৎবাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি নির্বাচন-প্রার্থী হইলেন কংগ্রেস ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে এবং জয়লাভ-ও করিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহার কারামুক্তি হইল। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 'বিগ্‌ ফাইভ্‌' বা বৃহৎ পঞ্চকের এক বৈঠক বসিল। একাধিক বিষয়ে শরৎবাবুর সহিত অবশিষ্ট চারজন ডাঃ বিধান রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী এবং

নলিনীরঞ্জন সরকার একমত হইতে পারেন নাই। ওই দিন হইতে 'বিগ ফাইভ্'-এর জোট ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহাদের মধ্যে ভবিষ্যতে আর পুনর্মিলন হইল না। বাংলা দেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে দলাদলি জোরালো হইয়া উঠিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মতানৈক্য অধিকতর প্রবল হইল। প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচন উপলক্ষে দলাদলি ও মতবিরোধ বৃদ্ধি পাইল। প্রার্থী মনোনয়নের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্য হইতে ডাঃ রায়, শরৎচন্দ্র বসু এবং আরও দুইজনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। ডাঃ রায় কমিটির চেয়ারম্যান (সভাপতি) নির্বাচিত হইলেন। কিঞ্চিদধিক দুইশত প্রার্থীর মনোনয়ন লইয়া কোন মতান্তর ঘটে নাই। গোলযোগের সৃষ্টি হইল চারজন প্রার্থীর মনোনয়ন সম্পর্কে। সভাপতির কাস্টিং-ভোটে সেই চারজন প্রার্থী মনোনয়ন পাইলেন। কিন্তু শরৎবাবু কমিটির সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের নিকট উহার পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিলেন। বোর্ড আদেশ দিলেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় অবশিষ্ট চারজন প্রার্থীর মনোনয়ন-কার্য সম্পন্ন হউক। তদনুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সাধারণ সভার অধিবেশন বসিল। ডাঃ রায়ের কাস্টিং ভোটে যে চারজন মনোনয়ন পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই ওই অধিবেশনে পুনরায় মনোনীত হইলেন। সাধারণ সভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত শরৎ-বাবুর প্রতিকূলে যাওয়ায় তিনি তাহা মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট আবেদন করিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির মতে বিষয়টি আপস-মিটমাট করিয়া দেওয়া উচিত। সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেসকে নির্দেশ দিলেন—উভয়পক্ষ হইতে দুইজন করিয়া আপসে মনোনীত করার বিষয় যেন পুনর্বিবেচনা করা হয়। সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের পরে ওইরূপ নির্দেশ দান ডাঃ রায়ের মতে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। সেই কারণে তিনি মনোনয়ন কমিটির সদস্য-পদে ইস্তফা দিলেন। প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচন অভিযান পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইল শরৎবাবুর উপর।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইল। জনাব মৌলবী ফজলুল হক বাখরগঞ্জ জেলায় নিজের গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনকেন্দ্র হইতে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইলেন। তৎকালে তিনি ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা। সেই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস হক সাহেবকে সমর্থন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার পার্টির পক্ষ হইতে কংগ্রেস পার্টির নেতা শরৎচন্দ্র বসুর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, বাংলায় কংগ্রেস-পার্টির সঙ্গে মিলিয়া তিনি মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করিতে প্রস্তুত আছেন। শরৎবাবু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। হক সাহেব এইরূপ প্রস্তাবও করিলেন যে, শরৎবাবু নিখিল

ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী এপ্রিল মাসের অধিবেশনে অনুমোদনসাপেক্ষে যদি সম্মতি দেন, তাহা হইলেও তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু শরৎবাবু তাহাতেও সম্মত হইলেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। তবে এইরূপ শর্ত দেওয়া হইল,—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আশ্বাস পান যে, কংগ্রেসীদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রি-পরিষদকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইবে, তাহা হইলে কংগ্রেস শাসনকার্যের দায়িত্ব লইবে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের বড়লাট পূর্বোক্তরূপ আশ্বাস দিলে অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসী দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়া শাসনকার্যের দায়িত্ব লইল। কিন্তু ইতোমধ্যে জনাব মৌলবী ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলিয়া মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করিলেন। সুতরাং বাংলায় মুস্লিম লীগের হাতেই শাসনভার চলিয়া গেল।

কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসনে আত্মনিয়োগ করায় দেশে আন্দোলন স্তিমিত হইয়া গেল। রাজনৈতিক কাজের চাপ কমিয়া যাওয়ায় ডাঃ রায় চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অধিকতর সময় ও শক্তি নিয়োগ করার সুযোগ পাইলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বেশির ভাগ সময়ই তাঁহার কাটিল চিকিৎসা-ব্যবসায়ের কাজে। কেবল কলিকাতা মহানগরীতে তিনি সেই কাজে নিযুক্ত থাকেন নাই, ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে চিকিৎসার কাজে তাঁহার আহ্বান আসিতে লাগিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা পৌরসভা (কর্পোরেশন), বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে কাজ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে ডাঃ রায়ের তেমন কোন সম্বন্ধ ছিল না। তখন বাংলাদেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে দলাদলি প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বসুকে বহিষ্কার করাই ছিল ইহার প্রধান কারণ। মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়ন পাইয়া সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরের বৎসর (১৯৩৯ খ্রীঃ) তিনি গান্ধীজীর অসম্মতি সত্ত্বেও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার সঙ্গে সভাপতির পদের জন্য প্রতিযোগিতা করিলেন এবং তাহাতে জয়ী হইলেন। গান্ধীজী ডাঃ সীতারামিয়ার পরাজয়কে তাঁহার নিজের পরাজয় বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ফলে কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলের ('হাই কমাণ্ড্'-এর) সহিত সুভাষচন্দ্রের বিরোধ বাধিল। গান্ধীপন্থী প্রবীণ কংগ্রেসনেতারা তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে সেই বৎসর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। এই উপলক্ষে গান্ধীজী কলিকাতায় আসেন এবং সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানের ভবনে বাস করেন। ডাঃ রায় তথায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে ডক্টর প্রফুল্ল

ঘোষের সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদ গ্রহণ করিতে বলেন। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে দলাদলি প্রবল থাকায় বিধানচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদান করিতে অনিচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর কথা অমান্য কবিতে পারিলেন না। পুনরায় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইলেন।

এ ছাড়াও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রায়ের উপর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আসিয়া পড়িল। তিনি অল্‌-ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সভাপতির কর্তব্যকাজ সম্পাদনেব জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সময় নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। তিনি সেই পদে ১৯৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কবেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইল দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নীতিরও পরিবর্তন ঘটিল। তদানীন্তন ভারত সরকারের বিঘোষিত যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও নীতির সহিত কংগ্রেস একমত হইতে পারিল না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিব অধিবেশনে আইন-সভাগুলি বর্জনের নীতি গৃহীত হইল। যে দুইজন সদস্য সেই নীতির বিবোধী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ রায় একজন। এই বিরোধিতার ফলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদে ইস্তফা দিলেন। কমিটিব অধিবেশনের পরে এই সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হইল। তিনি যুক্তি ও দৃঢ়তার সহিত আপন অভিমত ব্যক্ত করিলেন। ডাঃ রায় বলিলেন যে, ওই যুদ্ধ সর্বব্যাপক বলিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকার উপায় নাই, কোন-না-কোন ভাবে সকলকেই ইহাতে জড়াইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে জাতীয় অগ্রগতি সাধনের জন্য যতটা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভবপর হয়, ততটাই সদ্ব্যবহার করা দেশবাসীর পক্ষে সমীচীন। তাঁহার মতে, যুবকগণকে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য গবর্নমেন্টের নিকট প্রস্তাব করা জননায়কগণের উচিত; তবে এইরূপ শর্ত রাখিতে হইবে যে, সামরিক শিক্ষা-সমাপনান্তে যুবক-বাহিনীর পরিচালনভার ন্যস্ত করা হইবে এমন একটি জাতীয় পবিচালক-সঙ্ঘেব উপর, যাহা গঠিত হইবে দেশবাসীগণের দ্বারা। কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃমণ্ডলী ডাঃ রায়ের মত সমর্থন করিলেন না। নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইল মওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে। ডাঃ রায় মওলানা সাহেবকে কমিটি গঠনের পূর্বেই অনুরোধ করিলেন—তাঁহাকে যেন সদস্য মনোনীত করা না হয়।

১৯৪০ এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র কংগ্রেসের কার্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার সামরিক বিভাগের জন্য চিকিৎসক-বাহিনী গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করিলেন। সেই বিষয়ে কর্তব্য স্থির করার জন্য তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করিলেন। ভারত

সরকারের অনুরোধ রক্ষা করিতে গান্ধীজী ডাঃ রায়কে সম্মতি দিলেন। ডাঃ রায়ের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ভারত সরকার চিকিৎসক-বাহিনী গঠন করিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় চিকিৎসক-বাহিনীর যে সকল ন্যায্য দাবি ছিল সেগুলি পূরণ করা হইল। কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা সুসম্পন্ন করার জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করা ছিল ডাঃ রায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চিকিৎসক-বাহিনী গঠনের কার্য ভারত সরকার দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেন—ডাঃ রায়ের মতো একজন বিচক্ষণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও জনপ্রিয় নেতার সাহায্যে ও সহযোগিতায়। ভারত সরকার সেইজন্য তাঁহাকে উচ্চ প্রশংসা জানাইয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতের পক্ষ হইতে মালয়ে প্রেরিত মেডিকেল মিশন ডাঃ রায়ের অন্যতম জনকল্যাণকর প্রশংসনীয় কার্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মালয় ভ্রমণান্তে ভারতে ফিরিয়া আসেন। চিকিৎসক এবং ঔষধাদির অভাবে মালয়ের অধিবাসীগণের দুর্দশা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি ডাঃ রায়কে অবিলম্বে একটি মেডিকেল মিশন গঠন করিয়া ঔষধাদি ও প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সহ পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ডাঃ রায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া নেহরুজীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় সেই কঠিন কার্য সমাধা করিলেন। নেহরুজী মেডিকেল মিশন গঠনের জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে আবেদন প্রচার করেন, তাহাতে দেশবাসী আশানুরূপ সাড়া দিয়াছিল। মিশনের সেবাব্রতী সদস্যগণ মালয়ের দুর্গত অধিবাসীগণের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সেবাকার্য সম্পন্ন করিয়া প্রায় সাত মাস পরে ১৫ই আগস্ট ডাঃ রায়ের অনুমতিক্রমে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা মেডিকেল মিশনের মালপত্রাদি সহ প্রথমে ডাঃ রায়ের ৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাসভবনে উঠিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন না, ছিলেন তাঁহার শিলঙের বাসভবনে। তাঁহারা মালপত্রাদি ডাঃ রায়ের বাড়িতে রাখিয়া নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান।

পরের দিন ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) মুসলিম লীগের তথাকথিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। তখন বাংলাদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল মিঃ হাসান সুরাবর্দির নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার উপর। দাঙ্গাকারী মুসলমানেরা ডাঃ রায়ের বাড়িও আক্রমণ করিরয়াছিল। তাহারা দরজা জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া নীচের তলায় প্রবেশ করে, মালপত্র লুণ্ঠন করে এবং পরে আগুন লাগাইয়া দেয়। ডাঃ রায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুকুমার রায় পুলিসের সাহায্য চাহিয়া পান নাই; পরে তিনি গবর্নরের সেক্রেটারীকে ফোনে জানাইলে প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী হিন্দুগণও দলবদ্ধ হইয়া ডাঃ রায়ের বাড়ি রক্ষা করার জন্য

অগ্রসর হইল। আক্রমণকারী মুসলমানেরা সরিয়া পড়ে। কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদ পাইয়াই ডাঃ রায় শিলঙ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন বিমানযোগে কলিকাতা-শিলঙের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবস্থা ছিল না। ব্যারাকপুর পৌঁছিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় পৌঁছিতে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। তিন সপ্তাহ কাল তিনি অন্যান্য শান্তিপ্রিয় নেতা ও কর্মীদের সহিত মিলিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ডাঃ রায় শত শত নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ করিবার দ্রুত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিপন্ন ব্যক্তিদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। তিনি বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ঘুরিয়া ছাত্রদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। এই সমুদয় কাজ করিতে যাইয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি দেশনায়ক-রূপে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে বিরত হন নাই।

২২

রবীন্দ্রনাথ ও বিধানচন্দ্র

কবিগুরুর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিধানচন্দ্রের পিতামাতা অঘোর-প্রকাশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ধর্ম-সাধনায় তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ ও পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষির চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহনের ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। একবার (১৮৮৬ খ্রীঃ জুন) অঘোর-প্রকাশ দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পথে কার্শিয়াঙে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রমে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং অন্যান্য ধর্মবন্ধুদের সহিত পতি-পত্নী উভয়ে তথায় উপাসনায় যোগদান করিলেন। প্রতাপচন্দ্রের উপাসনা তাঁহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহার পরে তাঁহারা মহর্ষির দর্শন পান। সেই বিবরণ প্রকাশচন্দ্রের লিখিত 'অঘোর-প্রকাশ' গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :

..."তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তথায় ছিলেন। একদিন তাঁহাকে দেখিতে যাইবার প্রস্তাব হইল। তোমার (অঘোরকামিনীর) ইচ্ছা ছিল, সকলের সঙ্গে হাঁটিয়া যাইবে। যখন গৃহ হইতে যাত্রা করা হয়, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অন্যান্য গুরুজনগণ মীমাংসা করিলেন, নারীর পক্ষে পদব্রজে যাওয়া অবিধেয়। তাই তোমাকে ডাণ্ডিতে যাইতে হইল। তাঁহাদের এই আদেশ পালন করিতে গিয়া তোমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তুমি ডাণ্ডিতে চড়িয়া কিছুদূর গিয়া পরে হাঁটিয়া চলিলে। মহর্ষির উজ্জ্বল ভাব, তাঁহার উৎসাহ ও আমাদের প্রতিজনের প্রতি সম্ভাষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলে। আমাকে তোমাদের রাখিয়া কিছু আগেই মতিহারী চলিয়া আসিতে হইল। তোমরা ২২শে জুন ফিরিয়া আসিলে।..."

মহর্ষির তিরোধানের (১৯০৫ খ্রীঃ জানুয়ারি) পরে ভক্ত প্রকাশচন্দ্র একবার শান্তি-নিকেতনে যাইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত 'অঘোর পরিবার' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাবধি সম্যক্ অবগত ছিলেন। তিনি পূজনীয় অতিথিকে স্বাগত জানাইলেন সশ্রদ্ধ সমাদরে। আতিথেয়তা বিদগ্ধ ঠাকুর পরিবারের বৈশিষ্ট্য। ইহাও তিনি জানিতেন যে, পূজ্যজনের পূজার ব্যতিক্রম হইলে অমঙ্গল হইয়া থাকে—'প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ'। সুতরাং তদ্বিষয়ে কবিগুরুর

পক্ষে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে নাই। প্রকাশচন্দ্র পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি-পূত শান্তিনিকেতনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের সহিত কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নির্মল আনন্দ উপভোগ করেন। কবিগুরু ছিলেন প্রকাশচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ; উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় চৌদ্দ বৎসর। প্রকাশচন্দ্র তাঁহাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

গুণগ্রাহী ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সহিত অঘোর-পরিবারের যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, বিধানচন্দ্র তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। বরং তিনি উহাকে আরও ঘনিষ্ঠ এবং গাঢ় করিয়া তুলিলেন। লোকাতীত প্রতিভার অধিকারী বিশ্ববরেণ্য কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ গুণগাহিতায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রতিভাশালীর প্রতিভা এবং গুণিজনের গুণ তাঁহার নিকট হইতে উপযুক্ত সমাদর পাইত। বিধানচন্দ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরূপে যে প্রতিভার পরিচয় দেন, অধ্যাপকরূপে যে সুখ্যাতি লাভ করেন, জনসেবকরূপে বিবিধ জনসেবার ক্ষেত্রে নিরলস ও নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যেভাবে লোকপ্রিয় হন এবং রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কর্মকুশলতা, আদর্শ-নিষ্ঠা ও সৎসাহসের বলে অল্পকালমধ্যে যে সম্মান ও মর্যাদা পান, তাহা কবিগুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিধানচন্দ্র ধন্য হইলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, শুভেচ্ছা ও আশীবাদ পাইয়া।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের (১৯২৫ খ্রীঃ, ১৬ই জুন) পরে তাঁহার অন্তিমশয্যায় শায়িত অবস্থার ফটো তোলা হয়; এবং উহার উপরে কবিগুরু তাঁহার রচিত চারছত্রের ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী কবিতা স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া স্বাক্ষর করেন। দেশবন্ধুর স্মৃতি-রক্ষা কমিটির পক্ষ হইতে ওই আলোকচিত্রের ব্লক করাইয়া মুদ্রিত প্রতিলিপির ব্যাপকভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অল্পকালমধ্যে লক্ষ লক্ষ ছবি বিকাইয়া যায় এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ‘চিত্তরঞ্জন সেবাসদন’ ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। স্মৃতি-রক্ষা কমিটির পক্ষে অর্থ-সংগ্রহের জন্য ওই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্যোগী হইয়া। সেই সম্পর্কে স্বনামখ্যাত শিক্ষাব্রতী, অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বর্তমান জীবনী-লেখককে গত ১৯৫৭ সালের ১৪ই মে তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল:

“শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আমার শুধু একটা ঘটনা জানা আছে, বলিতেছি।

চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গিয়েছেন। তাঁর একটা ছবি নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় কবির কাছে গিয়ে বললেন,—

এর উপর একটা কবিতা লিখে দিন।

ডাক্তার, এ তো প্রেসক্রিপশন করা নয়, কাগজ ধরলে আর চট্‌চট্‌ করে লেখা হয়ে গেল।

বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছবির উপর সেই অপূর্ব কবিতাটি লেখা হল—

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ভবদীয়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য"

ডাঃ বিধান রায়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে কবিগুরুর যথেষ্ট আস্থা ছিল। সেইজন্য তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে স্বর্গীয় ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গে বিধানচন্দ্রকেও ডাকা হইত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর কবিগুরু বিসর্প রোগে (Erysipelas-এ) আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। ডাঃ সরকার এবং ডাঃ রায়কে ডাকা হইল তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার জন্য। ওই কঠিন ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকগণ যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় তাঁহার অবস্থা বিপজ্জনক হইতে পারে নাই। দিনদশেক রোগ-যন্ত্রণা ভোগের পরে কবিগুরু নিরাময় হইলেন।

প্রায় তিন বৎসর পরের (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের) কথা। কবি গেলেন কালিম্পঙে বায়ুপরিবর্তনের জন্য। সেখানে তিনি সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্মসচিব অনিল চন্দ্র ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলিকাতা হইতে তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমিয় বসু, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র এবং ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকারকে সঙ্গে লইয়া কালিম্পঙে পৌঁছিলেন ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে। পূর্বোক্ত তিনজন ডাক্তার এবং দার্জিলিঙের সিভিল সার্জন কবিগুরুকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, অবিলম্বে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে, কবিগুরু বৃক্ক-পীড়ায় (Kidney trouble-এ) ভুগিতেছিলেন। সেই দিনই পূর্বোক্ত তিনজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। পরদিবস রবিবার (২৯শে সেপ্টেম্বর) কবিগুরু রোগার্ত দেহে শয্যাশায়ী অবস্থায় কলিকাতায় পৌঁছিলেন। তাঁহাকে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে করিয়া তাঁহার জোড়াসাঁকো বাসভবনে আনা হইল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন; এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ডাঃ পি. এন. রায় এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তীও কবিগুরুকে পরীক্ষা করিয়া

দেখিলেন। অতঃপর চিকিৎসক তিনজনের মধ্যে আলোচনা হইল। তাঁহারা একমত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার কোন প্রয়োজন হইবে না। বিধানচন্দ্র প্রত্যহ একাধিকবার কবিগুরুকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহার উপদেশমতো প্রতিদিন রোগীর অবস্থা সম্পর্কে বুলেটিন প্রচারিত হইত। তৎকালে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন নয়া দিল্লীতে। তিনি গুরুদেবের অসুখের সংবাদ পাওয়ার পর হইতে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে শুনিয়া গান্ধীজী স্বস্তিবোধ করিলেন। মহাত্মাজী তাঁহার কর্মসচিব মহাদেব দেশাইকে কলিকাতায় পাঠাইলেন গুরুদেবের নামে একখানি পত্র দিয়া। তখনও কবিগুরুর শয্যাগৃহে কোন দর্শনার্থীকে যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু ওই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল মহাদেব দেশাইর বেলায়। গুরুদেবকে লিখিত পত্রখানি এই :

Delhi, Oct. 1.

"Dear Gurudev,

You must stay yet a while. Humanity needs you. I was pleased beyond measure to find that you were better. With love,

Yours

M. K. Gandhi"

পত্রের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল :

দিল্লী, ১ অক্টোবর

প্রিয় গুরুদেব,

আপনাকে আরও কিছুকাল অবশ্যই থাকিতে হইবে। বিশ্বমানব আপনাকে চাহিতেছে। আপনি পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন জানিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই। আমার প্রীতি জানিবেন।

ভবদীয়

এম. কে. গান্ধী

কয়েক সপ্তাহ রোগে ভুগিয়া গুরুদেব ভগবৎকৃপায় ডাঃ বিধান রায়ের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রতিদিনই তাঁহার জ্বর হইতে থাকে। তিনি পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণ করিতে পারিতেন না; এবং দিনের পর দিন তাঁহার দুর্বলতা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চিকিৎসার সময়োপযোগী ব্যবস্থার জন্ত কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের পরামর্শ লওয়া হইল। স্থির হইল, প্রথমে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করা হইবে। ১লা জুলাই কলিকাতার স্বনামখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ

বিমলানন্দ তর্কতীর্থ রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসায় ভার গ্রহণ করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে গেলেন। তিনি ১০ই জুলাই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বেশ কাজ করিয়াছে। কিন্তু ১৩ই জুলাই কবিগুরুর অসুস্থতা পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। সেই দিন ওই সংবাদ পাইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতন যাত্রা করিলেন। ২৬শে জুলাই কবিগুরুকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা হইল; ৩০শে জুলাই চিকিৎসকমণ্ডলীর উপদেশমতে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইল। মূত্রাশয়ের (bladder-এর) অসুখের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন কলিকাতার নিম্নলিখিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ: ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জি, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র, ডাঃ ইন্দু বসু, ডাঃ অমিয় সেন, ডাঃ দীননাথ চ্যাটার্জি এবং ডাঃ কে. সি. মুখার্জি।

অস্ত্রোপচার সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হওয়ায় পরবর্তী দুইটি দিন কবিগুরুর অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। তৎপর তাঁহার অবস্থা অবনতির দিকে যাইতে থাকে। চিকিৎসকগণের বিশ্রাম ছিল না। তাঁহাদের আপ্রাণ পরিশ্রম সত্ত্বেও অবনত অবস্থার গতি রোধ করা যায় নাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁহার সঙ্গী চিকিৎসকগণের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অবধি ছিল না, কেননা তাঁহারা কবিগুরুকে ভারতীয় মহাজাতির অমূল্য সম্পদ বলিয়া জানিতেন। ৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯টার সময়ে কবির অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হওয়ায় তাঁহাকে ইন্‌জেক্‌শন করা হয়। তারপর ৯টা ১০ মিনিট হইতে তাঁহাকে অক্সিজেন দেওয়া হইতে থাকে। বেলা ১০টায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জি উভয়ে মিলিয়া কবিগুরুকে পরীক্ষা করিয়া ঘোষণাঃ করিলেন যে, তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ। ওই দুঃসংবাদ মহানগরীতে প্রচারিত হইয়া গেলে দলে দলে বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবির বাসভবনে আসিতে লাগিলেন। অন্তিমশয্যায় শায়িত কবিগুরুর শেষদর্শন লাভের জন্য বিপুল দর্শনার্থী সমাগম হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ৮১ বৎসর বয়সে বৃহস্পতিবার (১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ) বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসীম ধৈর্য ও অপূর্ব সহনশীলতার সহিত রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন।

কবিগুরুর দেহাবসান হইল বটে, কিন্তু বিধানচন্দ্রের কর্ম-বিরতি হইল না। কেননা উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা রোগী ও চিকিৎসকের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আরও প্রসারিত হইয়াছিল। সে সম্বন্ধ স্নেহ-প্রীতি এবং শ্রদ্ধাভক্তির মধ্য দিয়া নিবিড় হইয়াছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনিও অপরাপর জননায়কের এবং রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজনগণের মতো কর্মব্যস্ত ছিলেন।

ভারত-গগনের জ্যোতির্ময় রবি চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেলেন। সমগ্র দেশ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শোক-জ্বালা প্রশমিত হইলে দেশের গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, বিদ্বজ্জন, জননায়ক, সমাজসেবক এবং অগণিত রবীন্দ্র-ভক্তের মনে এই চিন্তা জাগিল যে, কবিগুরুর প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে এবং ওই সমুদয়ের কালোপযোগী উন্নয়ন কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে। ওই শ্রেণীর দেশবাসীগণের মধ্যে বিধানচন্দ্র অন্যতম। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের পরে তাঁহার মনে বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ইত্যাদির কথা বেশী করিয়া জাগিতে লাগিল।

প্রায় ছয় বৎসর পরে ভারত-ব্যবচ্ছেদের অভিশাপের সঙ্গে আমরা পাইলাম স্বাধীনতা। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া (১৯৪৮ খ্রীঃ, জানুয়ারি) বিধানচন্দ্র কবিগুরুর প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। বিধান-মন্ত্রিসভার শাসন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন ইত্যাদিকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দান করা হইয়াছে। ডাঃ রায় সর্বদা বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেন। বিশ্বভারতী যে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার অবদান কম নহে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে ডাঃ রায় যে তথ্যপূর্ণ উপাদেয় ভাষণ দিয়াছিলেন, উহার মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং কবিগুরুর আদর্শের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল। ভাষণের প্রারম্ভেই তিনি কবিগুরুকে প্রণতি জানাইয়াছিলেন এই বলিয়া :

"এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসবে সকলে সমবেত হইয়া সর্বাগ্রে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ ও প্রণাম করি।"

শান্তিনিকেতনের 'পুরাতন ইতিহাস' বর্ণনা করিতে গিয়া ডাঃ রায় ওই সম্পর্কে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে উদ্ধৃতি দেন। তাহা হইতে জানা যায়—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে কবির মনে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের তপোবনের কল্পনা জাগিত। ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন :

"...এই কল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মনে এই ধারণা নিশ্চয়ই ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রচলিত শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে সর্বাংশে শুভ নয়। তাঁহার তৎকালীন রচনা ও বক্তৃতা হইতে আমরা একথাও জানিতে পারি, সেই শিক্ষা যে ছাত্রদের মনকে স্ট্যাটিক বা স্থাণু করিয়া দেয়, নূতন সত্য বা তথ্য আবিষ্কারের মৌলিক শক্তি হ্রাস করে এবং আত্মনির্ভরতা নষ্ট করে—এই উপলব্ধিও তাঁহার হইয়াছিল। ইহারই প্রতিকারের জন্য তিনি নগর

কলিকাতার কর্মকোলাহল হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে বোলপুরের এই উন্মুক্ত অবাধ প্রান্তরে প্রকৃতির কল্যাণকর পরিবেশে সঙ্গীত, শিল্পকারু ও সাহিত্যকলার মধ্য দিয়া দেশের তরুণেরা যাহাতে আত্মস্থ হইয়া ভারতের পূর্বগৌরব ফিরিয়া পায়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঋষিদের তপোবনের আদর্শে গুরু এবং ছাত্রেরা পরস্পর একাত্ম ও স্থিরচিত্ত হইয়া অধ্যাপন ও অধ্যয়নে নিরত থাকিবেন, সেই ব্যবস্থাও তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন; চাহিয়াছিলেন—অধ্যাপকেরা 'অধ্যাপনকার্যকে যথার্থ ধর্মব্রত স্বরূপ গ্রহণ' করিবেন, 'বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইয়া বসিবে', এবং 'বালিকারা গোদোহন কার্য সারিয়া কুটির প্রাঙ্গণে গৃহকার্যে শুচিস্নাতা কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ' দিবে। অতীত ভারতের যে ইতিহাস আমরা উপনিষদে ব্রাহ্মণে পাই, তাহাতে দেখি এই তপোবন-আশ্রিত শিক্ষায় ছাত্রদের মন জীবনের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কেও সর্বদা জাগ্রত ও জীবন্ত থাকিত। তাহারা অহরহ নিজেদের পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার সাধনা করিত, জগৎ ও জীবনের জটিল সমস্যার সমাধানে তাহাদের চিন্তাধারা গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিত। তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এক দিকে এই আরণ্যক তপোবনের বাণীসম্পদ এবং অন্যদিকে কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ সম্পদে ভারতবর্ষ তখন এমন খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, আমরা দেখিতে পাই ক্রমে ক্রমে নানা দেশবিদেশ হইতে ভারতবর্ষকে জয় করিবার জন্য উপর্যুপরি অভিযান চলিয়াছে। সেই গৌরবমণ্ডিত যুগে শুধু আধ্যাত্মিক শক্তিতেই নয়, পার্থিব শক্তিতেও ভারত প্রভূত পরিমাণে সম্পন্ন ছিল; সেই ভারতবর্ষ কখন কেমন করিয়া দুর্বিপাকে পতিত হইল, নিদারুণ হীনতার মধ্যে তাহার অধোগতি হইল—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালেই এই সকল প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া থাকিবে। পশ্চিমের ছকে ও ছাঁচে ফেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনে ধিক্কার জন্মাইল। ভারতীয় তপোবনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা ছাড়াও নিজেদের প্রতি আস্থাহীন মানুষদের আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার জন্য কবির মন ব্যাকুল হইল।

"সুখের বিষয়, তিনি তখন একক ছিলেন না। বঙ্গমাতার অনেক কৃতবিদ্য গুণী জ্ঞানী সুসন্তানও বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া লোককল্যাণ-কর একটা কিছু করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। আমি ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দরুন বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ নবজাগরণের কথা আপনাদের স্মরণ করাইতেছি। আন্দোলন আরম্ভ হইল এই ব্যবচ্ছেদের উদ্দাম প্রতিবাদে। কিন্তু অচিরাৎ এই বিদেশী ও বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। লোকে বুঝিল, এই প্রাণহীন গতানুগতিক শিক্ষাই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শাসনকর্তা স্বয়ং বৈদেশিক,

সুতরাং জনমত উপেক্ষিত হইতে লাগিল, যাঁহারা তখন দেশের মুখপাত্র তাঁহারাও শিক্ষায় দীক্ষায় সম্পূর্ণ বিদেশীভাবাপন্ন, কাজেই দেশবাসীর ঐকান্তিক আবেদন রাষ্ট্র কর্তৃক সহজেই উপেক্ষিত হইল। দেশের লোক যখন বুঝিল, এই বৈদেশিক শিক্ষার মোহেই প্রধানেরা দেশের দাবি অগ্রাহ্য করিতেছেন, তখন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি পড়িল সর্বাধিক—অর্থাৎ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানতঃ শিক্ষার আন্দোলন হইয়া দাঁড়াইল। ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, পল্লীতে, শহরে আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা, আন্দোলন চলিতে লাগিল। দেশের তরুণেরা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' আখ্যা দিয়া তাহা হইতে বাহির হইতে চাহিল। আমি নিজে যদিও এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগ দিই নাই, তথাপি এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি নাই এবং এখনও পারি না যে, প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দুর্বল এবং মনুষ্যত্বকে খর্ব করে। সে শিক্ষায় সর্বতোভাবে মনের বিকাশ হয় না, সেই শিক্ষা মানুষকে যন্ত্রচালিত নির্জীব পুত্তলিকামাত্রে পরিণত করে; যেটুকু তাহারা মুখস্থ করে, সেইটুকুই উদ্‌গীরণ করে মাত্র, আয়ত্ত ও জীর্ণ করিয়া সেই শিক্ষাকে নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না। স্বদেশী আন্দোলনের আনুষঙ্গিক এই শিক্ষা-আন্দোলনের মধ্যে এই কথাটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, ছাত্রেরা কোনও প্রকারে একটা ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া অর্থোপার্জনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে অর্থাৎ ডিগ্রিটাই লক্ষ্য, শিক্ষাটা নয়। ক্রমে ক্রমে দেশের বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নেতারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতার কথা উপলব্ধি ও স্বীকার করিলেন। তাঁহারা সমবেত হইয়া প্রতিকারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ঠিক ৪১ বৎসর পূর্বে কলিকাতার টাউন হলে বাংলাদেশে একটি আদর্শ জাতীয় বিদ্যামন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আহ্বানে সর্বজনমান্য ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হইল। বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দেশপূজ্য ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় বঙ্গীয় জাতীয় পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবৃতি-শীর্ষক দীর্ঘ লিখিত ইংরেজী ভাষণ পাঠ করেন।"

ডাঃ রায়ের সমাবর্তন ভাষণের পূর্বোল্লিখিত অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে,—তিনি সংক্ষেপে শান্তিনিকেতনের অতীত ইতিহাসের কতক বিবৃত করিয়া দেশের শিক্ষার তৎকালীন অবস্থা ও ব্যবস্থার নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কবিগুরুর মত ও পথ যে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে, সে বিষয়েও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষণ হইতে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়া ডাঃ রায় বলিয়াছিলেন:

"আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ উহারও ঠিক চৌদ্দ বৎসর পূর্বে, এমন কি তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও নয় বৎসর আগে, তাঁহার সুবিখ্যাত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিও সেই ১৫ই আগস্টের (১৯০৭) মহতী সভায় উপস্থিত থাকিয়া 'জাতীয় বিদ্যালয়' নামক প্রসিদ্ধ ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াও তাঁহার মনে নূতনতর বৈজ্ঞানিক ও কারুশিল্প-সঙ্গীত শিক্ষার সহায়তায় ছাত্রদের জীবনযুদ্ধে জয়ী দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন। ··

"শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রথম পর্ব, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ দ্বিতীয় পর্ব, ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের তৃতীয় বা শেষ পর্ব বিশ্বভারতী।"

কবির উক্ত ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্টের ভাষণের মধ্যেই বীজাকারে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাটি কিভাবে ছিল তাহা ডাঃ রায় কবির ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় 'এই বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইতে আরও দীর্ঘ তেরো বৎসর সময় লাগিল।' ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১৩২৬) কবি সর্বপ্রথম এইভাবে নাম-প্রস্তাব করিলেন—

"আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থাপনের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

"এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

ইহার মাস কয়েক পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই (১৮ই আষাঢ়, ১৩২৬ সাল) আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার প্রায় আড়াই বৎসর পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ ১৩২৮ সাল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে এবং সারা বিশ্বের বহু মনীষীর উপস্থিতিতে কবি সর্বসাধারণের হস্তে তাঁহার

বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।"

ডাঃ রায় দেশবাসীকে বিশ্বভারতীর গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া উহা স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং ক্রমবিকাশের কথাও সংক্ষেপে শুনাইলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন ঃ

"জনসাধারণের হাতে বিশ্বভারতীকে সমর্পণের পর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রায় কুড়ি বৎসর ইহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতির গুণে, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের ঔদারতায় কবির জীবদ্দশায় ও তাঁহার তিরোধানের পরও এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তবুও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব কি? এই সভায় এমন অনেকে উপস্থিত আছেন, যাঁহারা ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন অথবা এখনও যুক্ত আছেন; যাঁহারা এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেকে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের কাছে আমার এই প্রশ্ন—এখানকার শিক্ষা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কোনও তারতম্য কি তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন? অন্যত্র অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা এখানকার প্রণালী যে উচ্চতর সে ধারণা কি তাঁহাদের মনে দৃঢ়? বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রেরা কি এমন কিছু পাইয়াছেন যাহা অন্যত্র দুর্লভ? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বকবি; তাঁহার ভাব-দৃষ্টিতে যাহা উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এই প্রতিষ্ঠানের যে ভাবী পরিণত রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা হয়তো আমাদের ধারণার অতীত। যে আবেগ এবং উদ্দেশ্য এই বিশ্বভারতী স্থাপনে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল তাহা আজ আমাদের বিচারের বিষয় নয়, যাঁহারা এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের জীবনে ইহা কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—সেই সাক্ষ্যই বিশ্বভারতীর সার্থকতার প্রমাণ দিবে।"

কবি-গুরুর প্রতি বিধানচন্দ্রের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁহার অখণ্ড অনুরাগ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল এই ভাষণের মধ্য দিয়া।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁহার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাই পরে তাঁহাকে একদিন রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রণোদিত করিয়াছিল।

২৩

সুভাষচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র বসুর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় গান্ধী-যুগে। ১৯২০ আগস্ট মাসে তিনি আই সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ২৪ বৎসর। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তৎকালে কংগ্রেস নবজীবন লাভ করিতেছিল, সমগ্র ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলিতেছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সুভাষচন্দ্র আই. সি এস হইতে পদত্যাগ করেন। সেই বৎসরের মে মাসে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (অনার্সসহ) ডিগ্রি লইয়া জুলাই মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সুভাষের আই সি. এস. ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করার সিদ্ধান্তের সংবাদ প্রচারিত হইলে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে ফিরিয়া তিনি দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে দেশবন্ধু অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ওই তরুণ দেশসেবককে সস্নেহ সমাদরে গ্রহণ করেন। তদবধি সুভাষচন্দ্র ওই মহানায়কের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিতে থাকেন। অল্পকালমধ্যেই তিনি স্বীয় আদর্শনিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবল, বিনয়নম্র ব্যবহার ইত্যাদি গুণে বড়-ছোট সকল কর্মীর প্রিয়পাত্র হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের এমনই আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সকল শ্রেণীর কর্মীই কাজ করিবার জন্য উৎসাহ বোধ করিত। তৎকালে কলিকাতা মহানগরীতে স্থাপিত জাতীয় শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের পদ তিনি গ্রহণ করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদের জন্য নির্বাচন অভিযান চলিল। তৎকালে ওই দলের সমর্থিত ডাঃ বিধান রায়ের পক্ষে কয়েকটি নির্বাচনী সভায় সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দেন এবং সহকর্মিগণকে লইয়া স্বরাজ্য দলকে জয়ী করিবার জন্য দিবা-রাত্রি কাজ করেন। সেই বৎসর সুভাষচন্দ্র ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। নির্বাচন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ডাঃ রায়ের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সুভাষের গুণাবলী বিধানচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিল বিশেষভাবে। নানা গুণের অধিকারী প্রতিভাবান তরুণ দেশসেবকের উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। সুভাষচন্দ্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায্য-প্রাপ্য আসনে অধিষ্ঠিত হইবার ব্যাপারে ডাঃ রায়ের নিকট হইতে যে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন পাইয়াছেন,

তাহা তিনি কোনদিনই ভুলিয়া যান নাই। সুভাষের প্রতি ডাঃ রায়ের স্নেহ যে কত গভীর ছিল, তাহা সুভাষ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিও ডাঃ রায়কে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতো শ্রদ্ধা করিতেন। এই বিষয়ে ডাঃ রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সুভাষ রাজনৈতিক জীবনে এমন উচ্চাসন পাইবেন, যাহাতে বাংলার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং বাঙালীর দেশসেবায় অবদান, ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মহিমাময় ঐতিহ্য রক্ষা পাইবে।

বিধানচন্দ্র যে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে 'বিগ ফাইভ' অর্থাৎ বৃহৎপঞ্চকের একজন ছিলেন, তাহা পূর্বেই যথাস্থানে বলা হইয়াছে। দেশবন্ধুর তিরোধানের (১৯২৫ খ্রীঃ ১৬ই জুন) পরে সুভাষচন্দ্র 'বিগ ফাইভ'-এর সমর্থন না পাইলে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহিত প্রতিযোগিতায় কখনও জয়ী হইতে পারিতেন না। শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচরণ গোস্বামী এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ প্রভাবশালী পঞ্চনেতার সমর্থন যে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে উত্থানকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পাবে। দেশসেবার মধ্য দিয়া বিধানচন্দ্রের সহিত সুভাষচন্দ্রের যে স্নেহ-প্রীতি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা কোনদিনই ছিন্ন হয় নাই। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে (১৯৩৯ খ্রীঃ) সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করিয়া আপন মনোনীত পথ ধরিয়া দেশের সেবা করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে সুভাষের সঙ্গে ডাঃ রায় একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর হইল বটে, কিন্তু মনান্তর হইল না। ডাঃ রায়ের স্নেহ হইতে সুভাষ কোনদিনই বঞ্চিত হন নাই।

ডাঃ রায়েব নিজের বসিবার কক্ষে দুইটি প্রতিকৃতি সযত্নে রক্ষিত ছিল—একটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, অন্যটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় সুভাষচন্দ্র ডাঃ রায়ের কত প্রিয়, কত আদরের ছিলেন।

ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি। সেই দিনটি ছিল ভারতের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিনেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র, যিনি উত্তরকালে 'নেতাজী' বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বিপঞ্চাশোত্তর জন্মদিনে (১৯৪৮ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারি) ডাঃ রায় কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা আনন্দবাজার পত্রিকার পরবর্তী দিবসের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মূলকথা ছিল—"নেতাজী সুভাষ নিজেই একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস", "সকল ধর্মের মিলনমন্ত্র সুভাষচন্দ্রের 'জয় হিন্দ্'।"

সেই ভাষণের মাধ্যমে যে মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা হইতে কতকটা বুঝা যাইবে যে, ডাঃ রায় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কি প্রকারে তাঁহার ঐ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার বেতার-ভাষণটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"আজ সুভাষের জন্মদিন। একান্ন বৎসর পূর্বে বাংলা মায়ের প্রিয় সন্তান সুভাষ জন্মেছিল। আজ মনে পড়ে তাঁদের কথা, যাঁরা এসেছিলেন সুভাষের সাথে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ধ্বনিত করে বললেন—'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং মাতরম্।' আজ মনে পড়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সেই কথা—'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই। আজ বাংলাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই অপূর্ব অভিনব আহ্বান—ব্রাহ্মণ আমার ভাই।...

"এক শতাব্দী অতীত হোল। বঙ্গভঙ্গের যুগ এলো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সারা বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীনতার স্বর্ণপ্রদীপ জ্বেলে দিলেন। আজ মনে পড়ে আশুতোষের সেই সিংহনাদ—Give me money in one hand and slavery with other, I despise the offer —Freedom first, freedom second, freedom always. মনে পড়ে চিত্তরঞ্জনের বাণী—If love for country is a crime, I am a criminal.

"দেশবন্ধু যখন বাংলার তথা ভারতের রাষ্ট্রগুরু, সুভাস ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের সেবায়, দেশের কাজে। কেমন করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন? তরুণ সুভাষ, কতই বা তার বয়স? বাইশ-তেইশ বড় জোর—হেলায় সে ইংরেজের দেওয়া সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলা দেশ- শ্রীচৈতন্যের বাংলা, চিত্তরঞ্জনের বাংলা, সুভাষ ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের সেবায়। তার সামনে—

'অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও।
জীবনের সর্বস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।'

"আজ মনে পড়ছে যেদিন সুভাষ ফেরে বর্মা থেকে। শরীর ভেঙেছে, মনে কি উন্নত তার উৎসাহ! সুভাষকে তখন খুবই কাছে পেয়েছিলাম, খুবই কাছে দেখেছিলাম, সে বোধ হয় ১৯২৭-১৯২৮ সালের কথা। আজ বিশ বছর পরে ছোট একটি কাগজের টুকরোয় এ ক'টি কথা দেখেছি লেখা রয়েছে—'Freedom is life'. এ ক'টি কথাই ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবন। সারাজীবন সুভাষ ঐ কথামত কাজই করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে সেকথা লেখা আছে; আজাদ হিন্দ্ ফৌজেও ঐ কথা লেখা ছিল। সুভাষের জীবনের বিভিন্ন ধারার ভেতর আজ আর আমি যাব না; তবে এই কথা অবশ্যই বলবো যে, সুভাষচন্দ্র নিজেই একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। অতীতের কাহিনীকেই ইতিহাস বলা হয়; বর্তমানের কাহিনীকে কেউ ইতিহাস বলে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের

সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। সুভাষ কালকের মানুষ হলেও ইতিহাসে আদৃত ও পূজিত।

"সুভাষ ছিল অনেক গুণের আধার। সুভাষ বহু ভিন্নমতের লোককে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করতে পারতো। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া খণ্ডে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অদ্ভুত সাফল্য তারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খ্রীষ্টান এক সঙ্গে এক লক্ষ্যে এক উদ্দেশ্যে কাজ করেছিল সুভাষের সঙ্গে। সর্ব ধর্মের লোক নিতে পারে এমন এক মন্ত্রই দিয়েছিল সুভাষচন্দ্র। সে মন্ত্র জয় হিন্দ্। ভারতের জয় হোক।

"এই মিলন-মন্ত্রে সে সকলকে দীক্ষিত করেছিল। এই মন্ত্র ভুললে চলবে না। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ভুলে যেতে হবে আমাদের; ভারতের জয় যাতে হয়, তাই করতে হবে আমাদের সকলকে।

"আজ ভারত ভীষণ সঙ্কটের ভিতর দিয়ে চলেছে। দেশের স্বাধীনতা এসেছে; কিন্তু অন্ন নাই, চারিদিকে হাহাকার। তার ওপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কারও ঘর গেছে, কারও বাড়ি গেছে, স্বামী-পুত্র গেছে, মাতাপিতা গেছে,—অনেকের আবার সব গেছে। আজকের এই বিষম সঙ্কটের দিনে বেশী করে মনে পড়ছে সুভাষের অমর কথা—'Freedom is life'.

"আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি এসেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি কই? বিদ্বেষ-বিষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হবো, সুভাষের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারবো।

"বাংলাকে গড়ে তোলবার কাজ এসেছে। আমাদের বাংলা ত অভাবের বাংলা নয়; আমাদের বাংলা সুজলা সুফলা, আমাদের সব আছে। শুধু একত্র হয়ে কাজ করা, এক হয়ে এক মনে আমাদের অফুরন্ত সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। আজ বাংলার সম্মিলিত চেষ্টায় অসাধ্য অনায়াসে সাধিত হবে।

"সুভাষের জন্মদিবসে বাঙালী যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, আমি তোমাদের বলি, এক হও, কাজ কর। এই খণ্ড ছিন্ন ভারতকে এক করে দাও। তোমরা পারবে, তোমাদেরই এ কাজ, তোমরা কর। সুভাষের মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করো। আমি সুভাষের সেই মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনছি—Unite and work ceaselessly, do not resort to fear.

'আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন সাধন
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।' "

দক্ষিণেশ্বরের অধিবাসীগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তথায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মর্মর-মূর্তির আবরণ-উন্মোচন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া পরে নেতাজীর মর্মর-মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে ২৬শে জানুয়ারির গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা উপস্থিত জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কবিয়া বলেন যে—কেবল নেতাজীর মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, নেতাজী যেরূপ একাগ্রতার সহিত জন্মভূমির দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ ঐকান্তিক প্রেরণা ও ইচ্ছা লইয়া দেশ সংগঠনের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

ডাঃ রায় ক্ষুদ্রশিল্প এবং কুটির-শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জাপান যাত্রা করেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর এবং তথা হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ৭ অক্টোবর। তাঁহার জাপানে যাইবার কয়েক দিন পরে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ জানাই যে, তিনি রঙ্কোজী মন্দিরে যেন যান এবং বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর কন্যার সঙ্গে যেন দেখা করিয়া আসেন। উভয় স্থানে ফটো তোলার কথাও আমি পত্রে লিখিয়াছিলাম। রঙ্কোজী মন্দিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চিতা-ভস্ম রক্ষিত আছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ডাঃ রায় আমার চিঠি পাইবার পূর্বেই রঙ্কোজী মন্দিরে যাইয়া নমস্কার জানাইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা হইতে নেতাজীর প্রতি তাঁহার স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার আরও একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি টোকিও নগরের ইম্পিরিয়াল হোটেল হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি ১লা অক্টোবর পাইয়াছি। পত্রের প্রতিলিপি (facsimile) পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

Dr. B. C. ROY

প্রিয় নগেন্দ্র

[illegible]

Sri Nagendra Nath Guha Roy
4/D MADAN DUTTA LANE
Calcutta.

ডাঃ রায় আমার নামের 'কুমার' স্থলে প্রায়ই 'নাথ' লিখিতেন।

২৪

কর্মবীর বিধানচন্দ্র

বিধানচন্দ্রের মাতাপিতা অঘোর-প্রকাশের জীবন ছিল কর্মময়। দৈনন্দিন জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করিয়াও তাঁহারা পরার্থে অনেক কাজ করিতেন। তাঁহাদের জীবনে কর্মের বিরাম ছিল না। ধর্মসাধনা, শিক্ষাপ্রচার, সমাজসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ ও নিরলস কর্মের মধ্য দিয়া পতি-পত্নী উভয়ে যে দাগ কাটিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনদিনই মুছিয়া যাইবে না। বিধানের কর্মানুরাগও যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতে তাঁহার জীবন কর্মব্যস্ত। তখন আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় তাঁহাকে অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহার্থ অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। পঞ্চম অধ্যায়ে ('মেডিকেল কলেজে বিদ্যার্থী বিধান') এবং সপ্তম অধ্যায়ে ('ইংলণ্ডে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিধানের উচ্চতর শিক্ষালাভ') তৎসম্পর্কে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিদ্যার্থী-জীবনের সমাপ্তির পরে যখন ডাঃ রায়ের কর্মজীবন আরম্ভ হইল তখন তাঁহার কাজও বাড়িতে লাগিল দ্রুতগতিতে। কলিকাতার মতো বিরাট নগরে কঠিন প্রতি-যোগিতার মধ্যেও চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তাঁহার পসার হইতে লাগিল। স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইল পরিশ্রমের মাত্রা। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইলেন। নূতন কর্মক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব ও কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সহিত তিনি সংযুক্ত হইলেন। ডাঃ রায়ের বয়স তখন প্রায় ৩৪ বৎসর। তাঁহার নিরলস কর্ম, সুচিন্তিত মতামত এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিবার আগ্রহ সহকর্মিগণের এবং শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় তাঁহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই; কয়েক বৎসর পরে ডাঃ রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সেই দায়িত্বপূর্ণ জটিল কাজও সুসম্পন্ন করিয়া তিনি সেই পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী কার্য ছাড়িয়া বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে (পরবর্তীকালে 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ' এবং বর্তমানে 'আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ') অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার কার্য কেবল অধ্যাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; কলেজটিকে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে একটা আদর্শ শিক্ষায়তনরূপে গড়িয়া তোলা যায়, সেই দিকেও

তিনি তাঁহার চিন্তা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করিলেন। ভাবীকালে ডাঃ রায় কলেজের পরিচালক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশ করেন রাজনীতিক্ষেত্রে। তৎকালে ডাঃ রায় কলিকাতা মহানগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। চিকিৎসা-ব্যবসায় হইতে তাঁহার প্রচুর আয়, এবং তৎসঙ্গে সুনাম ও খ্যাতি তো আছেই। বিধানচন্দ্রের বয়স তখন ৪১ বৎসর। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কার্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইল। জনপ্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় কাজ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে চিন্তা ও শ্রম দুইয়েরই আবশ্যক। সেইজন্য ওই দুইটি নিয়োগ করিতে তিনি কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। তৎকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এ. কে. ফজলুল হক প্রভৃতির মতো লোকপ্রিয় নেতৃবৃন্দ সদস্যের আসনে আসীন ছিলেন। বিধানচন্দ্রের যোগ্য পার্লামেন্টারিয়ান রূপে সুখ্যাতি লাভ করিতে বেশী সময় লাগে নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনগুলির সরকারী বিবরণ পাঠ করিলেই তাঁহার কার্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি বাড়ি হইতে লিখিয়া লইয়া গিয়া বক্তৃতা পাঠ করিতেন না, তিনি ছিলেন উপস্থিত-বক্তা। তাঁহার বক্তৃতাবলী সারগর্ভ, তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো হইত। বাজেট অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে যে কয়জন সদস্য বক্তৃতা দিবার জন্য মনোনীত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ রায়ের নাম বরাবরই থাকিত। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপনের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইত।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে আর একটি দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কার্যের ভার ডাঃ রায়কে লইতে হইল। 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'-এর তিনি ছিলেন একজন ট্রাস্টী বা ন্যাসরক্ষক। তাঁহাকে উহার সেক্রেটারী বা কর্মসচিব নির্বাচন করা হইল। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের সহিত তিনি কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' যে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ডাঃ রায়ের অবদান রহিয়াছে যথেষ্ট। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল (বর্তমানে কুমুদশঙ্কর যক্ষ্মা হাসপাতাল) যে ভারতবর্ষে একটি সুপরিচালিত শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মা চিকিৎসালয় বলিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহার মূলে ছিল এই কর্মবীরের সংগঠনী প্রতিভা, সমাজসেবার প্রেরণা, চিন্তা ও শ্রম। ডাঃ রায় মৃত্যু পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-পরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের বিখ্যাত সংবাদ-পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। উহার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি ডিরেক্টার বোর্ডের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দীর্ঘকাল। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা

'ফরোয়ার্ড' পরিচালনায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ডিরেক্টার বোর্ডে থাকিয়া। কর্পোরেশন পরিচালনার কর্তৃত্ব কংগ্রেসের হাতে আসিবার পর ডাঃ রায় দুইবার মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অলডারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন আট বার। তিনি কর্পোরেশনের একুশটি কমিটিতে থাকিয়া কোন-না-কোন কমিটির সভাপতি-রূপে এবং কোন-না-কোন কমিটির সদস্য-রূপে মহানগরীর অধিবাসিগণের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিত্রিক বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা সুসম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া ডাঃ রায় উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলার) রূপে কাজ করিয়াও অসামান্য কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর ডাঃ রায়ের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল। তিনি কিছুকালের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিব সভাপতিত্ব করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রূপেও তাঁহার কার্য ছিল উল্লেখ-যোগ্য। কর্মবীর বিধানচন্দ্রের কর্মে বিরাগ ছিল না, বিরামও ছিল না। তাঁহার কর্মধারা প্রবাহিত হইয়াছিল বেগবতী নদীর স্রোতের মতো দুর্নিবার গতিতে। তাঁহার কর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায়, নদীর মুখ যেমন ক্রমেই গভীরতর ও প্রশস্ততর হয়, সেইভাবে। তৎসত্ত্বেও তিনি কাজ করিতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। তাঁহার কাছে কর্মের সফলতায় কিংবা নিষ্ফলতায় কিছু আসিয়া যাইত না। কর্মের উদ্দেশ্য যদি দেশের ও দশের সেবা হয়, তবে কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফল যাহাই হউক না কেন। ইহাই ছিল বিধানচন্দ্রের কর্মজীবনের সারকথা। তাঁহার ৭৫তম জন্মদিনে (১৯৫৬ খ্রীঃ ১লা জুলাই) প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন :

"...দেশের ও দশের কাজে জয়-পরাজয়ের কোন মূল্য নাই। চেষ্টা করাই মানুষের জীবনে প্রধান ব্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চেষ্টা করিয়া যদি সফল না হই কোনও ক্ষতি নাই। চেষ্টা তো রহিয়াই গেল। সেই চেষ্টাই মানুষের কর্মশক্তি বৃদ্ধি করিবে। চেষ্টার ভিতর দিয়া যে শক্তি সৃষ্ট হইয়া উঠে, উহা কোন-না-কোন কাজের মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবেই।

"রাজনীতি আমি বুঝি না। এইটুকু জানি আমার সম্মুখে যে কাজ আছে, তাহা সমাধা করিতে হইবে। দেশকে আমি সেবা করিতে চাই। দেশকে উচ্চে তুলিতে চাই। জয়পরাজয় কিছুই নয়। আমার সম্মুখে যে কোন কার্যই উপস্থিত হউক না কেন, প্রথমেই দেখি উহাতে দেশের কিংবা দেশবাসীর উপকার হইবে কিনা। যে কাজ আমাদের দেশের

শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে উহাতে আত্মনিয়োগ করি। আমাদের দেশ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কার্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া অগ্রসর হইলে একদিকে দেশের দ্রুত অগ্রগতি ও অন্যদিকে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে।"

স্বনামখ্যাত সাংবাদিক বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে 'অক্লান্ত কর্মোৎসাহ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রতীক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন (যুগান্তর—১লা জুলাই ১৯৫৫ খ্রীঃ) তাহার ৭৭তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে। 'ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা' তাহার 'জীবনের এক অমূল্য সম্পদ' বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাহার মতে—

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আধুনিক ভারতের প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রতীক। পশ্চিম বাংলার এক দুর্দিনে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উদার বুদ্ধি, আশ্চর্য সংগঠন-সাধনা ও অনন্যসাধারণ প্রাণশক্তিবলে দেশকে তিনি উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছেন দুর্যোগ থেকে সাফল্যে, দুর্গতি থেকে সমৃদ্ধির সোপানে।"

এই সম্পর্কে আমিও তাহার সহিত একমত। বিধুবাবুর সুচিন্তিত অভিমতে আমরা কোন অত্যুক্তি দেখিতেছি না। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"বিচিত্র কর্মতরঙ্গে উত্তাল জীবন ডাঃ বিধানচন্দ্রের। শাণিত বুদ্ধি, অপরাজেয় উদ্যম, অক্লান্ত কর্মোৎসাহ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম তাঁকে সার্থক জীবনের বরণমাল্য পরিয়েছে। জীবনে কখনো তার পরাজয় ঘটেনি, এমন অপরাজেয় ভাগ্য বড় একটা দেখা যায় না। বড়ো বড়ো কাজে যেমন তিনি অপ্রতিহত, ছোট ছোট কর্মেও তিনি সর্বদা অপরাজিত।"

ডাঃ রায়ের কর্মব্যস্ত জীবনের বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহার অকপট গুণগ্রাহী ঐ প্রবীণ সাংবাদিক লিখিয়াছেন :

'সকাল আটটায় তিনি সেক্রেটারিয়েটে যান। রাত্রি সাতটা পর্যন্ত সমানে চলে কাজের চক্র। ইদানীং অসুস্থতার জন্য মধ্যাহ্নভোজনের পর সামান্য সময় বিশ্রাম করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজের মধ্যে আনন্দ তাঁর জীবনের বিশেষত্ব।

"নানা মানুষ আসেন তার সঙ্গে দেখা করতে। নানা স্থান থেকে আসেন দেশের নানা লোক নানা রকম আবেদন নিয়ে। সবকিছুর ব্যবস্থা করতে হয়—বৈদেশিক সরকারী কর্মচারী আসেন, অন্য প্রদেশের নেতা ও রাজকর্মচারীরা তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাঁর সময় অল্প, এই স্বল্পকালের মধ্যেই সকলের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তাঁদের সকলকে সন্তুষ্ট করতে হয়।

"লোকে বলে সেক্রেটারিয়েটে নাকি 'ফিতে বাঁধা কাজের চক্র'। এ ফাইল থেকে ও ফাইলে যায়। এ দপ্তর থেকে ও দপ্তরে ঘোরে কাজের নির্দেশ। ফলে সবকিছু পেছিয়ে যায়, উচিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে না। ডাঃ বিধানচন্দ্র এই 'ফিতে বাঁধা

ফাইল-চক্র' থেকে সরকারী কর্মচালনাকে মুক্ত করতে চান। অনেক সময় দ্রুত কর্ম-চালনার জন্য কোনযোগেই তাঁর আদেশ ও নির্দেশ দেন, অর্ডার যথাযথ ফাইলভুক্ত হয়ে আসে পরে।

"পরাধীনতার আমলে সরকার ছিল ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিভূ। আজ স্বাধীনতা-উত্তর দিনে সরকার হচ্ছে জনসাধারণের সেবক। এই সেবা-মনোবৃত্তিটা তিনি সর্বদা সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন সরকারী কর্মস্রোতে।

"বহুবার বিদেশে গেছেন তিনি। যখন বিদেশে গেছেন পরিমুক্ত মন নিয়ে দেখেছেন বিদেশের শিল্প-উন্নয়ন-প্রচেষ্টা। দেশে ফিরে এসে স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন। পশ্চিমবাংলার কতকগুলি উন্নয়ন-প্রচেষ্টা আজ বাস্তবে রূপায়িত অথবা পরিকল্পনাবদ্ধ হয়ে আছে, তার প্রত্যেকটির মূলে আছে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ, তাঁর চেষ্টা, তাঁর নির্দেশ। মাতৃভূমির উন্নতিই তাঁর কর্মযোগের একমাত্র আদর্শ।"

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাংলাদেশে যখনই দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝটিকা ইত্যাদিতে দেশবাসী বিপন্ন হইয়াছিল, তখনই ডাঃ রায় তাহাদের ত্রাণের জন্য নিজের শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে সকল বেসরকারী আর্তত্রাণ কমিটি গঠিত হইত, তৎসমুদয়ে যোগ দিয়া কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন।

ডাঃ রায়ের সহকর্মীদের মধ্যে সকলেই জানেন যে তিনি দিবারাত্র কিভাবে কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ডাঃ রায়ের কর্মানুরাগ ও কর্মদক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন—"দিনরাত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ডাঃ রায় যেমন পারেন, তেমন আমরা কেউই পারি না। তিনি বাড়িতে থাকেন কতক্ষণ? সেক্রেটারিয়েটে কাজ নিয়েই তো থাকেন। He has made Secretariat his home." অমৃতবাজার পত্রিকাতে (১৯৫৬ খ্রীঃ, ২৩শে মে বুধবার) ডাঃ রায়ের কর্মানুরাগ সম্পর্কে একবার একটা ছোট বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশ যে, একদিন (২২শে মে মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে-ছয়টায় তিনি সেক্রেটারিয়েটে আসিয়া কাজ করিতে বসিয়া গেলেন। তখন ঝাড়ুদারদের ঝাঁট দেওয়ার কাজও শেষ হয় নাই। সরকারী দপ্তরখানায় তিনি আসেন সকলের আগে, চলিয়া যান সকলের শেষে। অমৃতবাজার পত্রিকায় রিপোর্টার ওই ব্যাপারটিকে আদর্শস্থানীয় কর্মানুরাগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

"He does not go by normal routine—nevertheless the time of the arrival of the Chief Minister Dr. Roy at the Writers' Buildings on Tuesday was a surprise even for those prepared to see him working through his files in odd hours. When the Chief Minister's

car drew under the Secretariat's portico it was half past six in the morning and even the sweepers had not then completed their cleansing. But then, for Dr. Roy often, the first to arrive and last to leave the Secretariat, no hours are odd hours for office work."

ডাঃ রায় যে এক অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে কর্মযোগী বলিলেই ঠিক হইবে। ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো তিনি তাঁহার কর্তব্যকর্মের মধ্যে সমাহিত থাকিতেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে এমন একনিষ্ঠ কর্মযোগীকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে পাওয়া ছিল সত্যই এক দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা।

২৫

মুখ্যমন্ত্রীর পদগ্রহণ

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে বাঁ চোখে ছানি পড়িতে শুরু করে। কিন্তু বিধানচন্দ্র দেশের রাজনৈতিক আবর্তে নানাভাবে আটক থাকায় এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার সময় পান নাই। অবশেষে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে তিনি ইউরোপ গিয়া চক্ষু-রোগবিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ঐ সময়ে দেশের সম্মুখে এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছিল। মুসলিম লীগ দেশবিভাগ করিয়া যে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি তুলিয়াছিল এবং যাহার ফলে ভারতের নানা স্থানে প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়াছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পরোক্ষ সমর্থনে তাহা আরও জোরদার হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষকে, এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবকে, দ্বিধাবিভক্ত করার যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল, তাহা লইয়া বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে যেসব আলোচনা চলিয়াছিল, সেগুলিতে বিধানচন্দ্র সক্রিয়ভাবে অংশ লইয়াছিলেন। কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই দেশব্যবচ্ছেদ সর্বতোভাবে এড়াইতে চাহিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ লইয়াছিল এবং যাহার ফলে দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার ফলে কংগ্রেস নেতারা ভারতবিভাগে সম্মত হইয়াছিলেন। বিধানচন্দ্রও এই সমাধানে পরিপূর্ণ বিষণ্ণতার সহিত সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি এই দেশবিভাগ চান নাই, কিন্তু এই দেশবিভাগ এড়াইবার মতো কোনো উপায়ও ছিল না। ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, তাহাতে বিধানচন্দ্রের মনে হইয়াছিল, তাঁহার এখন আর সক্রিয়ভাবে করিবার কিছুই নাই। তিনি ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনেও প্রার্থীরূপে অংশ গ্রহণ করেন নাই। এখন তিনি তাঁহার নিজস্ব পেশায় পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন মনে করিয়া কিছুটা খুশিই হইয়াছিলেন। তিনি এই অবকাশে নিজের চক্ষুর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইতে এবং কিছুদিন যাবৎ তিনি ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে যে গবেষণা চালাইতেছিলেন, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিবেন স্থির করিলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন বিধানচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকা সফরের জন্য রওনা হইলেন। ঐদিন যাত্রার প্রাক্কালে তিনি দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে গান্ধীজী 'সীমান্ত-গান্ধী' খান আবদুল গফুর খানের সহিত ভারত-

বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। গান্ধীজী বিধানচন্দ্রকে বলিলেন, "এই প্রস্তাবিত দেশবিভাগ আমি সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা করিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা হিন্দু ও মুসলমানকে দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করিয়াছে।" বিধানচন্দ্র ইউরোপ রওনা হইবার পরদিন ভারতবিভাগ সংক্রান্ত মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষিত হইয়াছিল। বিধানচন্দ্র গান্ধীজীর আশীর্বাদ লইয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। তাঁহার মন আনন্দ ও বিষাদে পূর্ণ ছিল। আনন্দ—ভারতবর্ষ তাঁহার বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা অবশেষে লাভ করিতেছে; বিষাদ—এই স্বাধীনতার মূল্য দিতে বাংলাদেশ বিভক্ত হইতেছে।

আমেরিকা যাওয়ার পথে বিধানচন্দ্র কয়েকদিন লণ্ডনে ছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আর্মি মেডিক্যাল সার্ভিস সম্পর্কে তাঁহাকে খোঁজ-খবর লইবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাকে লণ্ডনে কয়েকদিন থাকিতে হয়। ইতিমধ্যে মাউণ্ট-ব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ায় কংগ্রেস নেতারা বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে থাকেন। অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাই চাহিতেছিলেন যে, বিধানচন্দ্র ভারতে ফিরিয়া আসুন এবং তাঁহার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হউক। এজন্য লণ্ডনে তাঁহার সহিত বারবার টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় এবং বার বার তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়া তারবার্তা পাঠানো হয়। কিন্তু বিধানচন্দ্র ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন না, প্রধানতঃ এই কারণে যে, মন্ত্রিত্ব বা মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নাই।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকা পৌঁছিবার অল্পকাল পরেই তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট হইতে একটি তারবার্তা পাইলেন। উহাতে পণ্ডিতজী তাঁহাকে সংযুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) রাজ্যপালের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বিধানচন্দ্র পণ্ডিতজীকে জানাইলেন যে, এই নয়া ব্যবস্থায় রাজ্যপালের কাজ কি তাহা তাঁহার জানা নাই, তবে সে কাজ যাহাই হউক না কেন, তাহা যে তাঁহার কাজ নহে, সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত। তবে তাঁহার রাজ্যপালের পদ লওয়া যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে তিনি ঐ পদ পাঁচমাসের জন্য লইতে পারেন। তবে সেপ্টেম্বর মাসের আগে তাঁহার পক্ষে দেশে ফেরা অসম্ভব, কারণ ঐ সময় পর্যন্ত তাঁহাকে ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে থাকিতে হইবে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই সংযুক্ত প্রদেশের রাজ্যপালরূপে বিধানচন্দ্রের নাম ইংলণ্ডের রাজার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইয়া গিয়াছিল। রাজা ঐ নাম অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহা গেজেটে প্রকাশিতও হইয়াছিল। বিধানচন্দ্র রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় মিসেস সরোজিনী নাইডু তাঁহার স্থলে ঐ পদে কাজ করিতেছিলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইয়াছিল। বাংলাদেশ বিখণ্ডিত

হইয়াছিল। পূর্বতন বাংলাদেশের পশ্চিমের এক-তৃতীয়াংশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল নূতন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ সালের ১লা নভেম্বর বিধানচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া রাজ্যপালপদে ইস্তফা দিবেন স্থির করিয়াই আসিয়াছিলেন। মিসেস সরোজিনী নাইডু ঐ পদ গ্রহণ করিয়া দক্ষতার সহিত কাজ করিতে থাকায় সমস্যাও কিছু ছিল না। দিল্লীতে পৌঁছিয়াই বিধানচন্দ্র তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে জানাইলেন এবং রাজ্যপাল পদে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দিলেন। এইদিন সন্ধ্যায় বিধানচন্দ্র গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে গেলে গান্ধীজী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, ' বিধান, তুমি রাজ্যপাল পদে ইস্তফা দিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আমি 'Your Excellency' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব না।"

বিধানচন্দ্রও চিরদিন রসিকতাপ্রিয় ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সেজন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই। ঐ সম্বোধনের পরিবর্তে আপনি আমাকে অন্য সম্বোধন করিতে পারেন। আমি Roy, সুতরাং Roy-al, আমার উচ্চতাও অনেকের চেয়েই বেশি। সুতরাং ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলে আপনি আমাকে Your Royal Highness বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিবেন।" বিধানচন্দ্রের কথায় গান্ধীজী উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন।

বিধানচন্দ্র নিজের পেশায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা লইয়া কলিকাতা ফিরিলেন। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পরই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত নেতা এবং গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর। তিনি চিরকুমার। তাঁহার কর্মশক্তি, দক্ষতা ও দৃঢ়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করেন এবং গবেষণা করিয়া ডক্টর উপাধি পান। ১৯২০ সালে তিনি কলিকাতা মিন্টে (টাকশালে) অ্যাসে-মাস্টার রূপে যোগ দেন। ঐ উচ্চপদে ইতিপূর্বে কোনও ভারতীয় যোগ দিতে পারেন নাই। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামে সাড়া দিয়া তিনি উচ্চপদ ও মোটা মাহিনা অবহেলায় ত্যাগ করেন। পরে কংগ্রেস সংগঠনে তিনি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার হস্তেই স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রিসভার ভার পড়িল। ডঃ ঘোষ তাঁহার মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য ডাঃ রায়কে আমন্ত্রণ জানান। ডাঃ রায় মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইয়া দেন। তখন অবশ্য তিনি ছিলেন আমেরিকায়।

ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সর্বাধিক সমস্যাসংকুল প্রদেশ। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিদ্বেষে আকাশ-বাতাস পূর্ণ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সে তাহার

প্রধান শস্যভাণ্ডার ও শিল্পের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় পাট হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল ছিন্নমস্তার অবস্থা। খুলনাকে দেওয়া হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং মুর্শিদাবাদকে পূর্ববঙ্গে। অবশ্য, পরে মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসে এবং খুলনা যায় পূর্ববঙ্গে। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুরা প্রবল বন্যার স্রোতের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে। এই ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু পশ্চিমবঙ্গে নানাদিক হইতে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মোকাবিলা করা যে-কোন সরকারের পক্ষেই ছিল দুরূহ। তাহার উপরে ছিল ব্যবসায়ের নামে মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের সর্বব্যাপী লুণ্ঠনের প্রচেষ্টা। সর্বোপরি ছিল বাংলাদেশের কংগ্রেসের চিরাচরিত উপদলীয় কোন্দল। পশ্চিমবঙ্গের এই সকল সমস্যা বিরোধী দলগুলিকে নানাভাবে মানুষের মনে ক্ষোভ ও আন্দোলন সৃষ্টি করিবার সহজ সুযোগ দিয়াছিল। তাহাদের মোকাবিলা করিবারও কঠিন দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছিল মুখ্যমন্ত্রীর উপর। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রিত্বের মুকুট নিঃসন্দেহে ছিল কণ্টকমুকুট। ডঃ ঘোষ সাহসের সহিত এই সকল সমস্যার মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হইলেন।

প্রশাসন ছিল অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। তিনি তাহাকে যথাসম্ভব সৎ ও পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি কংগ্রেসের আদর্শ অনুসারে সরকারী কাজকর্মে বাংলাভাষার ব্যবহার চালু করিতে সচেষ্ট হইলেন। মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সক্রিয় হইলেন। একবার তিনি গোপন সংবাদ পাইয়া নিজেই উত্তর কলিকাতার একটি ময়দা কলে গিয়া হাজির হন এবং বহু বস্তা তেঁতুলবিচি মজুত থাকিতে দেখেন। ঐসব তেঁতুলবিচি গুঁড়াইয়া আটার সহিত ভেজাল দেওয়া হইত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐসব তেঁতুলবিচির বস্তা আটক করেন এবং কল মালিককে শাস্তি দিতে দ্বিধা করেন নাই। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তাঁহার এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যবসায়ী শ্রেণীর ক্রোধের কারণ ঘটায়। পুলিসের নীচের তলার দুর্নীতি দূর করিবার জন্যও তিনি চেষ্টা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, অসাধু ব্যাবসায়ীদের শাস্তি-দান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন পাসের জন্য একটি বিল আনেন বিধানসভায়। ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মিছিলের উপর গুলিও চালাইতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের যৌক্তিকতা ও ঔচিত্য সম্পর্কে বহু কংগ্রেসীও সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১১ জানুআরি (১৯৪৮) তারিখে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিলটি আইনে পরিণত হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ডাঃ রায় দিল্লি গিয়াছিলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হইয়া ঐ সময় দিল্লিতে ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের পিতা

শ্যার আশুতোষ তাঁহার জীবদ্দশায় বিধানচন্দ্রকে পুত্রের মত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার উৎসাহেই বিধানচন্দ্র একদা তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাবলী তুলিয়া ধরিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন এবং এইভাবেই রাজনীতির পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদও তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের নির্বাচনক্ষেত্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ হইয়া দিল্লিতে থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাবলী বিধানসভায় উপযুক্তরূপে তুলিয়া ধরিবার ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হইতেছিল। তাই শ্যামাপ্রসাদ বলেন যে, তিনি বিধানসভায় তাঁহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে চাহেন এবং তাঁহার স্থলে বিধানচন্দ্র যদি ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে দাঁড়াইয়া বিধানসভায় প্রবেশ করেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সমস্যা বিধানসভায় উপযুক্তভাবে উত্থাপিত হইতে পারে। বিধানচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাণের মতই ভালোবাসিতেন এবং শ্যামাপ্রসাদকেও ছোট ভাইয়ের মতোই স্নেহ করিতেন। তিনি শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্যামাপ্রসাদ সুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে বিধানচন্দ্র বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন এবং শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার স্থলে নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, এই শর্তেই বিধানচন্দ্র বিধানসভায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন এবং বিধানচন্দ্র নির্বাচনপ্রার্থী হইলেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি বিধানচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনক্ষেত্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইলে ডঃ ঘোষ তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। বিধানচন্দ্র জানাইলেন যে, প্রশাসনে অংশগ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য তাঁহার সহযোগিতার প্রয়োজন হইলে তিনি সানন্দে সহযোগিতা করিবেন।

বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে অংশগ্রহণে যখন অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনদেবতা অলক্ষ্যে হাসিয়াছিলেন। কারণ, ইহার পক্ষকালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁহার ডাক আসিল। ডঃ ঘোষ আনীত পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিল যেদিন আইনে পরিণত হইল, তাহার পরদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল যে, ডঃ ঘোষ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির ২৫জন সদস্য তাঁহাকে গিয়া বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় দেশের কল্যাণের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠন করা প্রয়োজন। তাঁহাদের অনুরোধেই ডঃ ঘোষ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন॥

বিধানচন্দ্র নিজে এই ধরনের কোন প্রস্তাব বা ডঃ ঘোষের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিতেন না। তাঁহার অজ্ঞাতেই কংগ্রেস লেজিস্‌লেটিভ পার্টি ডঃ ঘোষের স্থলে ডাঃ রায়কে নেতা নির্বাচিত করিলেন। ১৯৪৮ সালের ১২ই জানুআরি বেলা প্রায় ১১টার সময়ে ডঃ ঘোষ টেলিফোনে ডাঃ রায়কে কংগ্রেস লেজিস্‌লেটিভ পার্টির সিদ্ধান্তের কথা জানাইলেন এবং অবিলম্বে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া তাঁহাকে দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিতে বলিলেন। ঐ সময়ে দিল্লিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী তাঁহার জীবনের শেষ অনশন শুরু করিয়াছিলেন। ডাঃ রায় গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে থাকিবার জন্য বিমানে দিল্লি রওনা হইতেছিলেন। তাই তিনি বলিলেন যে, তিনি কংগ্রেস লেজিস্‌লেটিভ পার্টির সিদ্ধান্তের কথা জানেন না, তাহা ছাড়া, কোনও অবস্থাতেই তিনি দিল্লি যাওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন না। ডঃ ঘোষ বলিলেন, তিনি এখনই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া পরদিন দিল্লি যাইতে পারেন। ডাঃ রায় সম্মত হইলেন না, দিল্লি চলিয়া গেলেন।

তিনি গান্ধীজীর অনশনের কয়েকদিন দিল্লিতে থাকিলেন। তিনি দিল্লিতে থাকার সময়ে বার বার কলিকাতা ফিরিয়া অবিলম্বে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডাক পাইলেন। গান্ধীজী তাঁহার অনশনভঙ্গ করিয়া সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দিল্লি হইতে কলিকাতা ফিরিতে সম্মত হইলেন না। ১৮ই জানুআরি তারিখে গান্ধীজী তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিলেন। পরদিন বিধানচন্দ্র তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস লেজিস্‌লেটিভ পার্টির সিদ্ধান্তের কথা জানাইলেন। সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব লইতে চাহেন না, তিনি চিকিৎসাতেই আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন যে যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যরা তাঁহার সাহায্য চান, তবে তাঁহাদিগকে তাঁহার সাহায্য করা উচিত। গান্ধীজীর পরামর্শে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন।

ডাঃ রায় কলিকাতা ফিরিয়া ডঃ ঘোষ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের জানাইলেন যে তিনি এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সম্মত। এখন এই নবগঠিত মন্ত্রিসভায় তিনি কাহাকে কাহাকে লইবেন, তাহাই হইল তাঁহার সমস্যা। তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভায় দক্ষ ব্যক্তিদেরই গ্রহণ করিতে চাহিলেন, তিনি বিধানসভার সদস্য না হইলেও ক্ষতি নাই। ইহাতে বিধানসভার অনেক কংগ্রেসী সদস্য, যাঁহারা নূতন মন্ত্রিসভায় স্থান পাইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন, হতাশ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা বাহিরের লোককে মন্ত্রিসভায় লওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করিলেন। কিন্তু বিধানচন্দ্র স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, পার্টি যদি তাঁহার কাজে হস্তক্ষেপ করে, তবে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বিধানচন্দ্রের সুবিধা এই ছিল যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব

ছিলেন না। তাই তিনি জানাইয়া দিলেন যে, যদি তাঁহাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছামতো তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচন করিতে দিতে হইবে এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁহার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে—তাহাতে দলীয় হস্তক্ষেপ চলিবে না। শেষ পর্যন্ত বিধানচন্দ্রের শর্তেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মতি দিলেন।

.৯ ৮ সালের ২৩শে জানুআরি, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শুভ জন্মদিনে, বিধানচন্দ্র তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন রাজাগোপালাচারী। ডঃ রায়ের নবগঠিত মন্ত্রিসভায় রহিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, ভূপতি মজুমদার, কালীপদ মুখার্জি, বিমলচন্দ্র সিংহ হেমচন্দ্র নস্কর মোহিনীমোহন বর্মণ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।

বিধানচন্দ্র যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার সমস্যাবলী ডঃ ঘোষের মন্ত্রিত্বকালের সমস্যাবলী অপেক্ষা কম ছিল না, বরং অনেকাংশে বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। কিন্তু বিধানচন্দ্র অসামান্য দক্ষতার সহিত সেই সকল সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন এবং অসংখ্য সমস্যাজর্জর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি, অসাধারণ কর্মশক্তি, দুর্জয় সাহস, ক্লান্তিহীন ধৈর্য সহনশীলতা এবং সহানুভূতি তাঁহাকে উত্তরোত্তর সাফল্য আনিয়া দেয়। তিনি একাদিক্রমে সাড়ে চৌদ্দ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। বিধানসভায় তাঁহার একচ্ছত্র নেতৃত্ব তাঁহার বিধান নামটিকেই নূতন অর্থ দিয়াছিল। ঐ সাড়ে চৌদ্দ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বিধানচন্দ্রেরই সভা ছিল!

২৬

মুখ্যমন্ত্রীরূপে বিধানচন্দ্র

বিধানচন্দ্রের জীবনে দেখা যায়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে তিনি উচ্চাশার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহা করেন নাই। তাঁহার শিক্ষার্থী জীবনে দেখা যায়, কয়েক ঘণ্টা আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরিবর্তে চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার জন্য ভর্তির অনুমতিপত্র আসিয়া পৌঁছায়। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়িয়া ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন। যদি দৈবক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চিঠি আগে আসিয়া পৌঁছিত, তবে তিনি ডাক্তার না হইয়া ইঞ্জিনিয়ারই হইতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যার মতোই তাহাতেও হয়তো শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। দৈবক্রমেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়া রাজনীতিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি অবলীলাক্রমে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীপদে বৃত হইলেন তখনও তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসকরূপে পদে পদে আপন প্রতিভার অমর স্বাক্ষর রাখিয়া গেলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইবার উচ্চাশা দূরের কথা, সামান্য বাসনাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন, তখন তিনি তাহাতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন এবং আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার রূপে অমর হইলেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, "Whatever thy hand findeth, do it with thy might." এই মূলমন্ত্রই তাঁহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসক রূপে সাফল্যের উচ্চশীর্ষে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

মনে রাখা দরকার, বিধানচন্দ্র যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল পঁয়ষট্টি বৎসর। তখনও তাঁহার অদম্য কর্মশক্তি তরুণদেরও হার মানাইত। সাধারণতঃ তিনি খুব ভোরে ঘুম হইতে উঠিতেন এবং সকাল ছটার মধ্যেই স্নান সারিয়া সারাদিনের কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতেন। তাঁহার বহু টাকার চিকিৎসা ব্যবসায় তিনি বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতো একজন চিকিৎসকের সাহায্য হইতে দেশবাসী যাহাতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য তিনি প্রতিদিন সকালে দুই তিন ঘণ্টা বিনা ফিতে রোগী দেখিতেন। তাঁহাকে দেখাইবার জন্য রোগীর ভীড় এতই হইত যে তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে দুইজন সহকারী ডাক্তার রাখিতে হইয়াছিল। ঐ ডাক্তাররা ডাঃ রায় দেখিবার আগে রোগীর সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। উহাতে ডাঃ রায়ের শ্রমের কিছুটা লাঘব হইত।

রোগী দেখা শেষ করিয়া সাড়ে আটটা-নটার সময়ে ডাঃ রায় মহাকরণে পৌঁছিতেন। মুখ্যমন্ত্রী হইবার সময় হইতে তিনি রোজ ইহা করিতেন। আগে মহাকরণে পদস্থ কর্মচারীরা সাড়ে দশটা-এগারোটার পূর্বে কেহ আসিতেন না। মুখ্যমন্ত্রী রোজ সাড়ে আটটা-নটায় আসায় তাঁহাদিগকেও এখন বাধ্য হইয়া ঐ সময়ে মহাকরণে উপস্থিত হইতে হইত। ডাঃ রায় বেলা দুইটা পর্যন্ত টেবিলে বসিয়া একটানা কাজ করিতেন, তারপর সেখানেই দুপুরের লঘু আহার সারিয়া লাগোয়া কামরায় আধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া লইতেন। তারপর আবার টেবিলে আসিয়া বসিতেন এবং সন্ধ্যা ছটা, সাতটা, কখনও কখনও রাত আটটা পর্যন্ত অবিরাম কাজ করিতেন। এই নিয়মিত কাজের মধ্যে তিনি সকল শ্রেণীর দর্শনার্থী, কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং দেশবিদেশের সম্মানীয় অতিথি-অভ্যাগত, সকলের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করিতেন। এইভাবে মহাকরণে কর্মচারীদের উপস্থিতি বিনা হুকুমেই নিয়মিত হইয়াছিল। বিধানচন্দ্রের এই অনলস কর্মশক্তি সরকারী পদস্থ ও সাধারণ কর্মচারীদের কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইত। বিধানচন্দ্র কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতিও সহানুভূতির সহিত সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন।

বিধানচন্দ্রের ক্লান্তিহীন কর্মশক্তি সম্পর্কে তাঁহার অন্যতম জীবনীকার মিঃ পি. কে. টমাস একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। বিধানচন্দ্র একদিন মহাকরণ হইতে ফিরিয়া সাড়ে নয়টা পর্যন্ত একান্তে টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। এমন সময় একটি ফোন আসিল। এতক্ষণ মিঃ টমাস কাজে ব্যাঘাত ঘটাইবার ভয়ে চুপচাপ বসিয়াছিলেন। ফোন আসার সুযোগে বলিলেন, "সাড়ে নটা বাজে।"

ডাঃ রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাতে কি ?"

"এখন আপনার বিশ্রাম নেওয়ার সময় হয়েছে।"

"কিন্তু তাহলে আমার কাজগুলো করবে কে ?"

মিঃ টমাস বলিলেন, "কিন্তু কাজেরও সীমা আছে। আপনি বিবাহিত নন, তাই এটা করতে পারছেন। বিবাহিত হলে যদি আপনার স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে থাকতেন, তবে নিশ্চয় তাঁরা আপনাকে এখন বিশ্রাম নিতে বলতেন।"

ডাঃ রায় মৃদুহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু তুমি কি জান না, কাজের সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়েছে ?"

এমন মানুষ যে তাঁহার নিকটের সকল মানুষের মধ্যেই কর্মশক্তি সঞ্চারিত করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে!

বিধানচন্দ্রের কেবল কর্মশক্তিই ছিল না, তাঁহার ছিল সহাস্যমুখে সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইবার বিস্ময়কর শক্তি। তিনি সহজে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না।

বিধানসভায় বিরোধী সদস্যরা যখন তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিতেন, তখনও তিনি কখনও ক্রোধ ও ধৈর্যহীনতা প্রকাশ করিতেন না। বিক্ষোভকারীদের মিছিল যখন তাঁহার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাসগৃহে বা মহাকরণে গিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিত, তখনও তিনি অধীর না হইয়া শান্ত ও সংযত ভাবে তাহার মোকাবিলা করিতেন। তিনি রাজনীতিতে যেমন কোন উপদলীয় দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যে থাকিতেন না, তেমনি তিনি বিরোধীদের যুক্তিপূর্ণ মতামতও গ্রহণ করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না। সকলকে লইয়া মানাইয়া চলিবার একটা অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁহার। এ বিষয়ে তাঁহার সদাহাস্যময় মুখ, শালপ্রাংশু সমুন্নত দেহ এবং সদয় সুমধুর ব্যবহার অনেকখানি কাজ করিত। প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিরা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তখন তাঁহার শান্ত, সংযত ব্যবহার, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিশীল আচরণ তাহাদিগকে প্রায়ই মন্ত্রমুগ্ধ করিত। তাঁহার এই শান্ত, সংযত, সুমধুর আচরণ ছিল তাঁহার রাজনৈতিক শক্তির একটি প্রধান আকর্ষণ। তাঁহার রাজনৈতিক সমালোচক ও বিরোধীরাও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করিতেন। তাঁহার রাজনৈতিক সমালোচক ও বিরোধীদের প্রতিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না।

তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লইয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন, কি গুরুদায়িত্ব তিনি লইতেছেন। ঐ সময় ভারতের সর্বাধিক সমস্যাপূর্ণ প্রদেশরূপে পরিচিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের। একদা বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেমন পুরোভাগে ছিল, স্বাধীনতার পরে সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল। এখানে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে উপদলীয় কলহের অভাব তো ছিলই না, বরং অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বেশিই ছিল। বিধানচন্দ্রকে এই উপদলীয় কলহ কখনও স্পর্শ করে নাই, যদিও কোন কোন সময়ে তাঁহার পশ্চাতে কোন কোন উপদল তাঁহার বিরুদ্ধে কাজ করিতেও চেষ্টা করিত, এ সমস্তকে তিনি কখনও গ্রাহ্য করিতেন না। কারণ, কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ক্ষমতালিপ্সার বশবর্তী হইয়া তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন নাই, উহা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই, কিছুটা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁহার উপর বর্তাইয়াছিল। এজন্য তাঁহাকে কম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। যে মাসে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব লইয়াছিলেন, তাঁহার আগের মাসে তাঁহার ডাক্তারি হইতে আয় ছিল ৪২ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর তাঁহার মাসিক বেতন হইল মাত্র ১৪০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার বেতনের পরিমাণটা তিনি নিজেই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ইহার পূর্বে যাহা উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহাও যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন এমন নহে। তাঁহার

আয়ের অধিকাংশই তিনি দান-খয়রাতে ব্যয় করিতেন। তিনি যেসব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেগুলির জন্যও তাঁহাকে নিয়মিত অর্থসাহায্য দিতে হইত। কংগ্রেস সংগঠনের জন্যও তাঁহার ব্যয় ছিল প্রচুর। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসকে টাকা দিতে গিয়া তাঁহাকে তাঁহার বসতবাড়িটি পর্যন্ত বাঁধা রাখিতে হইয়াছিল। বহু অভাবী মানুষ, বহু দুঃস্থ রাজনৈতিক কর্মী এবং বহু গরীব নিঃস্ব উদ্বাস্তুকে তাঁহাকে অর্থসাহায্য দিতে হইত। তাঁহার গৃহস্থালির খরচও কম ছিল না। তাঁহার ব্যক্তিগত ভৃত্য, পাচক, পরিচারক এবং সহকারী ডাক্তার প্রভৃতির বেতনের জন্য কম টাকা লাগিত না। তাহার উপর ছিলেন দেশ বিদেশের অতি-সম্মানীয় অতিথি-অভ্যাগত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব। এইসব ব্যয়ের চাপে তাঁহাকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব করিবার দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কলিকাতার শহরতলীতে যে জমি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। দিন যতোই গড়াইতে থাকে, তাঁহাকে অর্থ সংস্থানের জন্য ততোই ব্যস্ত হইতে হয়। বিভিন্ন কোম্পানিতে তাঁহার যে শেয়ার ছিল, তাহাও তিনি বিক্রয় করিয়া দেন, এইসব কোম্পানির অনেকগুলিতে তিনি নিজে চেয়ারম্যান ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার শিলংস্থিত প্রাসাদোপম সাধের 'রায়-ভিলা' নামে বাড়িটিও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু দেশবন্ধুর আদর্শই অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন। তাই বৃদ্ধ বয়সেও এইভাবে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিতে তাঁহার একটুকুও বাধে নাই। দেশের জন্য, দশের জন্য ব্যয় করিয়া ধন-সম্পত্তির বোঝা তিনি হাসিমুখেই কমাইয়া চলিতেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত সংসারবৈরাগী এক কর্মযোগী সন্ন্যাসী।

বিধানচন্দ্রের এই চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলকে মন্দীভূত করিয়া দিয়াছিল। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সকলের সহিত তাঁহার নিবিড় সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের সপ্তাহকাল পরেই মহাত্মা আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বিধানচন্দ্রকে অগ্রজের সম্মান দিতেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু একদা স্বরাজ্য দলের নেতারূপে বিধানচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বিধানচন্দ্র ও ডাঃ আনসারীকে বলিতেন তাঁহার জীবনের দুই ট্রাস্টী বা অছি। ইন্দিরা গান্ধী তাঁহাকে বলিতেন 'কাকাবাবু' এবং বিধানচন্দ্র ইন্দিরা গান্ধীকে বলিতেন 'প্রিয় ইন্দু'। ভারত-রাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্তম্ভ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিতও ছিল বিধানচন্দ্রের গভীর সৌহার্দ্য। নেহরুজী এবং সর্দারজীর সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গের বহুবিধ সমস্যার সমাধান ও দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের সেই চরম দুর্দিনে

দৃঢ়হস্তে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরিবার জন্য বিধানচন্দ্রই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি।

মুখ্যমন্ত্রী হইয়াই বিধানচন্দ্রকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সকল সমস্যার মধ্যে প্রধান ছিল আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, কংগ্রেসের উপদলীয় চক্রান্তের সমস্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের সমস্যা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি প্রধান শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইউরোপের অনেকগুলি দেশে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এশিয়ার সুবিশাল দেশ চীনেও কমিউনিস্টরা জয়ের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। ইহার ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও পূর্বাপেক্ষা অনেকখানি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেশের শ্রমিক অশান্তি, খাদ্যাভাব, ক্রমিক মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারি, মজুতদারি, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আগমন ও তাহাদের ব্যাপক অসন্তোষ, কৃষকদের ভূমিসমস্যা প্রভৃতির ফলে দেশে যে প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা এই সুযোগে দেশে বিপ্লব ঘটাইয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারিবে। ফলে তাহারা ক্রমাগত বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভাসমিতি করিয়া কংগ্রেস ও সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিল এবং স্থানে স্থানে হিংসারও আশ্রয় লইতেছিল। পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি প্রধান ঘাঁটি হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে এমন বাড়াইয়া তুলিয়াছিল যে. বিধানচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, এই পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন তো দূরের কথা, কোনও সমস্যারই সমাধান সম্ভব নহে। এজন্য বিধানচন্দ্র তাঁহার মন্ত্রিসভাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভায় আনিতে চাহিলেন এমন একজন লোককে প্রশাসন বিষয়ে যাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা আছে। পূর্বেই তিনি যুক্তবাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভার মন্ত্রী, বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য, বিখ্যাত ব্যবসায়ী নলিনীরঞ্জন সরকারকে মন্ত্রী করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতেই তিনি সরকারের অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছিলেন। গোড়ায় তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-শৃঙ্খলার সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হওয়ায় এজন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিয়োগের কথা চিন্তা করিলেন। কিরণশঙ্কর রায় ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন। বিধানচন্দ্র ১৯৪৮ সালের ফেব্রুআরি মাসের গোড়াতেই তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আনাইয়া মন্ত্রিসভায় লইলেন এবং তাঁহার উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার দিলেন। কিরণশঙ্কর রায়ের পরামর্শে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করার বিষয়টি ১৯৪৯ সালের মুখ্যমন্ত্রীদের

সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মতামত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আলোচিত হইলে মন্ত্রিসভা এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার মতো কোনও পদক্ষেপ এই মুহূর্তে সমীচীন নহে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, কমিউনিস্ট পার্টি খুবই ক্ষতিকর কাজকর্ম করিতেছে। এইসব কাজকর্ম খোলাখুলি বিদ্রোহের দিকে যাইতেছে, ধ্বংসাত্মক ঘটনা ও সন্ত্রাসবাদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্যই কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্য সরকার—উভয় সরকারই ঐ পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, যে সংগঠন গোপনে থাকিয়া কাজ করে তাহাকে সহজে দমন করা যায় না। উহাতে উহাদিগকে আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের মতোই দেখাইতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করিয়া যে দীর্ঘস্থায়ী ফললাভ হয় নাই, তাহা বিধানচন্দ্রও পরে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সাময়িকভাবে তাহা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সহায়ক হইয়াছিল।

বাহিরের শত্রুদের সাময়িকভাবে ঠেকাইলেও তিনি শীঘ্রই বুঝিলেন, তাঁহার নিজের দলের মধ্যেও তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। বিধানচন্দ্র সেই সবে মাস ছয়েক মুখ্যমন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, কয়েকজন স্বার্থান্বেষী কংগ্রেস নেতা বিধানচন্দ্রকে সরাইয়া তাঁহার স্থলে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করিতে চাহিলেন। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির চীফ হুইফ অমরকৃষ্ণ ঘোষ। ইনিই একদা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে সরাইয়া ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আনিবার জন্য কলকাঠি নাড়িয়াছিলেন। বিধানচন্দ্রকে সরাইবার একমাত্র কারণ ছিল অমরবাবুর ইচ্ছামত সবকিছু হইতেছিল না। তাঁহার অযৌক্তিক কতকগুলি অনুরোধ ডাঃ রায় রাখেন নাই। কেবল তাহাই নহে, ঐ ধরনের অনুরোধের জন্য ধমকও দিয়াছিলেন। তাই তিনি এখন বিধানচন্দ্রকে সরাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসী বলিতে লাগিলেন, বিধানচন্দ্রের মন্ত্রিসভা খাঁটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা নহে; উহাতে কংগ্রেসের বাহিরের লোক রহিয়াছেন; এই মন্ত্রিসভা চলিতে থাকিলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীদের অসুবিধা হইবে। সুতরাং অবিলম্বে এই মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে খাঁটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হউক। ২২শে এপ্রিল (১৯৪৮) তারিখে তিনি কয়েকজন কংগ্রেসী এম. এল. এ.-র, এমন কি দুইজন মন্ত্রীর এবং তিনজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারির স্বাক্ষরও সংগ্রহ করিলেন। ২৬শে তারিখে বিধানচন্দ্র এক বিবৃতিতে জানাইলেন যে, চিঠিগুলি তাঁহার কাছে পৌছিবার পূর্বেই যাঁহারা সই দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ইহার সহিত কয়েকজন মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি জড়িত থাকায়, সাংবিধানিক দিক হইতে ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে এবং

এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষই শক্তিবৃদ্ধি করিয়া সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হইলেন। বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব ছিলেন বিধানসভার নির্দল সদস্য, তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকাও কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ঐ যে বেলা ৪টার ডাঃ রায়ের বাড়ির দোতলার হলঘরে কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির বিশেষ অধিবেশন বসিল। বাড়ির বাহিরে বিশাল এক জনতা ফলাফল জানিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বমোট ৫৩ জন সদস্য, তাহার মধ্যে চারজন মন্ত্রী যাঁহারা বিধানসভার সদস্য নন। তিনজন মন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সেচমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার। কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির সেক্রেটারি দেবেন সেন চীফ হুইপ অমরকৃষ্ণ ঘোষের দলে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থা বুঝিয়া তিনি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিতেছেন। এ প্রস্তাবে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, জে. সি. গুপ্ত প্রভৃতি ২২জন স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অন্য ৩১ জন ডাঃ রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করিলেন। ডাঃ রায় কিন্তু এই অবাধ্যতা সহ্য করিলেন না। তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিলেন। এই নূতন মন্ত্রিসভা হইতে হেম নস্কর, মোহিনী বর্মণ, ভূপতি মজুমদার বাদ পড়িলেন। অবশ্য, কয়েকমাস পরে যাঁহারা অনুতপ্ত হইলেন ডাঃ রায় পুনরায় তাঁহাদিগকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্রের এই দৃঢ়তা অন্তরাল হইতে মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টাকে প্রতিহত করিল।

প্রশাসনকে শক্তিশালী ও দুর্নীতিমুক্ত করিবার জন্য বিধানচন্দ্র সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামোতেও কিছু উন্নতি ঘটাইলেন।

উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছিল। বন্যার স্রোতের মতো উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছিল। বিধানচন্দ্র পূর্ব হইতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন প্রতিরোধ করার কথা বলিলেও কার্যত তাহা সম্ভব ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, হিন্দু নেতারা পূর্ববঙ্গে থাকিয়া সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু অধিবাসীদের মনোবল গড়িয়া তুলুন। কিন্তু একে একে হিন্দু নেতারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছিলেন এবং পূর্ববঙ্গে সরকারী কর্মচারীরাও নানাভাবে সংখ্যালঘুদের ভীতিপ্রদর্শন করিয়া হিন্দুদিগকে বাস্তুত্যাগ করিতে উস্‌কানি দিতেছিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ডাঃ রায়কে এ বিষয়ে লেখেন:

"প্রথম হইতেই আমি বলিয়া আসিতেছি, পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসা যে-কোন প্রকারেই হউক রুখিতে হইবে। ইহা যদি খুব বড় আকারে

দেখা দেয়, তবে সর্বনাশের সীমা থাকিবে না। আমার মতে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু নেতারা যাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সেখানকার জনগণের প্রতি কোনও কর্তব্যই পালন করেন নাই। এই উদ্বাস্তু আগমন আমি শেষ পর্যন্ত রোধ করিবই, আর সেজন্য যদি যুদ্ধ করিতে হয় তো তাহাও স্বীকার। আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে, উড়িষ্যার ভিতরে দেশীয় রাজ্যগুলি পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের লইতে রাজী হইয়াছে। এজন্য অবশ্যই তাহারা প্রস্তুত হইতে পারে এবং পারা উচিতও, যেমন তোমার সরকার করিতেছে। কিন্তু তোমরা যে একাজ করিতেছ, তাহা জানিতে পারিলে আরও উদ্বাস্তু না উৎসাহিত হইয়া আসিয়া পড়িতে পারে। সেটা অবশ্যই এড়াইতে হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের অভিযোগ পূর্ববঙ্গ সরকারের কাছে পেশ করিবার জন্য এবং তাহাদের পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসা ঠেকাইবার জন্য যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানে একজন ডেপুটি হাইকমিশনার নিয়োগ করা হয় সেজন্য ডঃ রায় প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ দিতেছিলেন। তিনি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম এ বিষয়ে প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই পূর্ববঙ্গে যাইতে সম্মত না হইলে কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র ও ডাঃ রায়ের সহকর্মী সন্তোষকুমার বসুকে পাঠানো হয়। তিনি তাঁহার আইন-ব্যবসায়ের বিপুল আয় ত্যাগ করিয়া ঐ পদ গ্রহণ করেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণকে পশ্চিমবঙ্গে যথাসম্ভব পুনর্বাসিত করা হইতেছিল। তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য এবং স্থানও দেওয়া হইতেছিল। বহু চাকরিতেও তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসিত করা সম্ভব ছিল না। তাই ডাঃ রায় তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সময়ে উদ্বাস্তুদিগকে আন্দামানে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় আসে। তিনি নভেম্বর মাসে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতির নেতৃত্বে এগারজনের একটি পর্যবেক্ষক দলকে আন্দামানে পাঠান। এই পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্ট তিনি ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী উপপ্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট পেশ করেন।

ঐ সময়ে কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ৫০টি উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবির খোলা হইয়াছিল। সেগুলিতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। শিবিরবাসী এইসব উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যেসব উদ্বাস্তুরা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। শিয়ালদা রেলওয়ে জংশনেও অসংখ্য উদ্বাস্তু প্ল্যাটফর্মে ও ফুটপাতে আশ্রয় লইয়াছিল। প্রায় আড়াইলক্ষ উদ্বাস্তুকে নগদ খয়রাতি দেওয়া হইতেছিল। ইহাতে সরকারের মাসে ব্যয় হইতেছিল ৪২ লক্ষ টাকা। এজন্য রাজ্য সরকারের উপর প্রচণ্ড আর্থিক চাপ পড়িয়াছিল।

রাজ্যের নিজস্ব অর্থসম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য বিধানচন্দ্র গোড়া হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিতেছিলেন। ১৯৪৮ সালের বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশনে ভারতের সংবিধানের খসড়া পেশ করিয়াছিলেন ডাঃ রায়। ঐ খসড়া সংবিধানে অর্থ-সংক্রান্ত কিছু বিষয়ের রদ-বদল করিবার জন্য সুপারিশ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করা হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ও বরাদ্দ সম্পর্কে সংবিধানে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তাই প্রস্তাব করা হইল যে, রাজ্যে আয়কর ও পৌরকর বাবদ মোট যে আয় হইবে তাহার অন্ততঃ শতকরা ষাটভাগ রাজ্যকে দিতে হইবে। রাজ্যকে আরও দিতে হইবে তামাকের উপর ধার্য আবগারী শুল্ক হইতে আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানে বর্ণিত 'অবশিষ্ট সম্বন্ধীয় ক্ষমতা'-বলে যেসব কর স্থাপন করিবেন, সেইসব করের পুরা অংশ বা কিছু অংশ রাজ্যকে দিতে হইবে। পাট ও পাট-জাত দ্রব্যের রপ্তানির লভ্যাংশও রাজ্যকে দিতে হইবে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতার পর হইতেই অর্থ-বণ্টন ও বরাদ্দ-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া কেন্দ্রের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে ডাঃ রায় ও তাঁহার অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার খুবই সোচ্চার ছিলেন।

১৯৪৮ সালের জুনমাসের মাঝামাঝি অন্য একটি বিষয় লইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সহিত ডাঃ রায়ের মতভেদ হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবির দুইটি সংগীতের মধ্যে কোন্‌টি জাতীয় সংগীত করা হইবে, তাহা লইয়া ঐ সময় খুবই আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল চাহিতেছিলেন বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটি জাতীয় সংগীত হউক, অন্যদল চাহিতেছিলেন জাতীয় সংগীত হউক রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটি। এ বিষয়ে বিধানচন্দ্রের সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর যে মতভেদ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের মধ্যে তৎকালীন কয়েকটি পত্রালাপ হইতে সুন্দরভাবে বোঝা যায়। পত্রগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

বিধানচন্দ্রের পত্র :

কলিকাতা
১৪ই জুন, ১৯৪৮

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

জাতীয় সংগীতের ব্যাপারে ভারত সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি ই. গেনরু সাহেবের একখানা চিঠি এবং আপনার দপ্তরের একটি নোট আমরা পাইয়াছি।

এ বিষয়ে আমাদের মন্ত্রিসভায় আমরা আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য, আইন-

সভাই ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবে। তবে যে পর্যন্ত তাহা না হইতেছে, সে পর্যন্ত কাজ চালাইবার যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝিতে পারিতেছি না যে, জাতীয় সংগীত হিসাবে 'জনগণমন' ব্যবহার করা আপনার নির্দেশ, না, এ বিষয়ে আপনি আমাদের মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। যদি ইহা নির্দেশ হয়, তবে আমাদের বলার কিছু নাই। কিন্তু যদি মতামতের প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার মতে, জাতীয় সংগীত হইবার ব্যাপারে 'বন্দে মাতরম্'-এর দাবি যে অনেক বেশি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। নির্ধারিত মান অনুযায়ী ইহার সুর করা যাইতে পারিবে এবং তাহা বাজাইতে ৪৫ সেকেণ্ড বা ১ মিনিট সময় লাগিবে। কিন্তু এসব ছাড়াও দেখা উচিত, জাতীয় সংগীতের পিছনে কোন ঐতিহ্য আছে কিনা। বন্দে মাতরম্-এর তাহা আছে। ১৯০৫ সাল হইতে আত্মদান ও নিপীড়নের এক মহান ঐতিহাসিক ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার পিছনে। ব্রিটিশ আমলে সরকারী আদেশ অমান্য করিবার জন্য মানুষ এই গান গাহিত এবং সেজন্য অবলীলায় শাস্তি ভোগ করিত। এই গান কণ্ঠে লইয়া মানুষ জেলে গিয়াছে, বন্দুকের গুলির সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে, ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়াছে। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, জনগণমনে'র পিছনে তেমন কোনও ঐতিহ্য নাই। এ কথা বলা বাহুল্য যে, কোনও দেশের জাতীয় সংগীত যে কোনও বড় কবির দ্বারা লিখিত হইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। এমন অনেক দেশ আছে, যাহাদের জাতীয় সংগীত এমন লোকে লিখিয়াছেন, যাঁহার কবি বলিয়া সুখ্যাতি অতি অল্প। এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা একযোগে বলিয়াছেন, বন্দে মাতরম্ই জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত। আমরা এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ যে, আমরা এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মতামতই ব্যক্ত করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত

বি. সি রায়.

ইহার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিখেন ঃ

নয়া দিল্লী

১৫ই জুন, ১৯৪৮

প্রিয় বিধান,

তোমার ১৪ই জুনের চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

'জনগণমন'-এর ব্যাপারে তোমাকে বলি, জাতীয় সংগীত কি হইবে, তাহা যে আইনসভাই স্থির করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'বন্দে মাতরম্'-এর ব্যাপারে

কয়েকজন মুসলমান যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা কোনও কাজের কথা নয়। এ চিন্তাটা এখানকার অনেককেই প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই, এবং সেই সঙ্গে আমিও, বিশেষভাবে অনুভব করি, এখনকার পরিস্থিতিতে জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্' একেবারেই খাপ খাইতেছে না। 'বন্দে মাতরম্' আমাদের জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান হিসাবে এখন কেন চিরকালই মর্যাদা পাইবে, কারণ ইহার সহিত আমাদের জাতীয় সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু যে গান জাতীয় সংগ্রাম ও আবাজ্ঞার প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন 'বন্দে মাতরম্' করিতেছে,—তাহার সহিত জাতীয় সংগীতের কিছুটা তফাত আছে। জাতীয় সংগীত এমন হওয়া চাই, যাহাতে জয়ের কথা থাকিবে, আশাপূরণের কথা থাকিবে—অতীতে কি সংগ্রাম করা হইয়াছে, তাহার কথা নহে।

জাতীয় সংগীত হইতেছে প্রধানতঃ সংগীত, কথার সমষ্টি নহে। ইহার এমন একটি সুর থাকা দরকার যাহার লালিত্য থাকিবে, যাহা তালে তালে গাওয়া যায়, এবং পৃথিবীর এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্যন্ত বাজাইয়া ফল পাওয়া যায়। সত্য কথা বলিতে কি, ইহা নিজের দেশেও বাজাইতে হইবে, দেশের বাহিরে হয়তো বাজাইতে হইবে আরও বেশি। আমাদের প্রত্যেকটি দূতাবাসেও ইহা বাজাইতে হইবে। বিদেশী দূতাবাস ও অফিসগুলিও ইহা বাজাইবে। 'জনগণমন' এইভাবেই সামনে আসিয়া গিয়াছে। আমাদের দিক হইতে ইহাকে ঠেলিয়া ধরিবার চেষ্টা আদৌ করা হয় নাই। গত অক্টোবরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওয়াল্ডর্ফ-অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে ইহা বাজানো হইয়াছিল। ইউনাইটেড নেশন্স্ এর সভা যখন বসিয়াছিল, তখনকার কথা। এ সঙ্গীতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বিদেশী প্রতিনিধি যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, এমন সুন্দর জাতীয় সঙ্গীতের সুর তাঁহারা আর কখনও শোনেন নাই। উপস্থিত আমেরিকান ও আরও অনেকের কাছে ইহার বিরাট চাহিদা দেখা দিয়াছিল। সে কথা শুনিয়া আমরা ইহার রেকর্ড চাহিলাম। আর তাহা পাইবার পর আমরা প্রস্তাব দিলাম, সৈন্যদের ব্যাণ্ড পার্টি ইহা বাজাইতে শিখুক। দেখিতে দেখিতে সৈন্যদের মধ্যে ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। জাতীয় সঙ্গীত বাজাইবার সময় হইলে এখন স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সবাই ইহা নিয়মিত বাজাইতেছে।

আমরা বহু নামকরা সংগীতবিশারদের পরামর্শ লইয়াছি, তাঁহার মধ্যে বিদেশের সব থেকে বড়ো অর্কেস্ট্রা-পরিচালকও কেহ কেহ আছেন। আসলে অর্কেস্ট্রা বা মিলিটারিতে বাজাইবার পক্ষে 'বন্দে মাতরম্' তেমন জুতসই নয়। 'জনগণমন'-

এর এমন একটা লালিত্য ও তাল আছে, যাহা ঐ কাজের পক্ষে খুবই উপযুক্ত বলিয়া সকলে অনুমোদন করিয়াছেন।

এইভাবে 'জনগণমন' যখন মিলিটারি বা অন্যান্য বাজনার ব্যাপারে আপনা হইতেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, তখন আমি সব প্রদেশের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত চাহিয়া চিঠি লিখিলাম। দুই-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সবাই একযোগে 'জনগণমন'-এর পক্ষে মত দিলেন। আর শুধু তাহাই নহে, অধিকাংশই একথা জানাইলেন যে, তাঁহাদের প্রদেশে এই গানটি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে।

যখন অবস্থা এই রকম দাঁড়াইল, তখন আমরা এখানকার মন্ত্রিসভায় বসিয়া স্থির করিলাম, যতদিন না পাকাপাকি কোনও সিদ্ধান্ত হইতেছে, ততদিন জাতীয় সংগীত হিসাবে 'জনগণমন' ই চলিতে থাকুক। এই ব্যবস্থার খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কী ভারতে, কী বিদেশে, এমন সব উপলক্ষ্য হইতে লাগিল, যাহাতে জাতীয় সংগীত বাজাইতেই হইবে। বার বার চাহিদা আসিতে লাগিল এবং আমাদের তাহাতে সাড়া দিতেই হইল।

আমি এখানে আবার কথাটা বলিতে চাই, জাতীয় সংগীতের কথা ততটা নয়, যতটা দরকার উপযোগী সুরের। যদিও কেহ কেহ বলেন, 'বন্দে মাতরম্'-এর তাহা আছে, কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা নাই। বিশেষ করিয়া বিদেশী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে ও সুর একেবারে অচল। জানি না, 'জনগণমন'-কে গ্রহণ করা হইবে কিনা, তবে 'বন্দে মাতরম্'-কে লওয়া হইবে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সংশয় আছে।

তাহা ছাড়া, কথার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও 'বন্দে মাতরম্'-এর ভাষা বেশির ভাগ লোকই বুঝিতে পারিবে না, আমি ত নয়ই।

তোমার বিশ্বস্ত
জওহর

এই চিঠির উত্তরে ডাঃ রায় লিখিলেন :

কলিকাতা
২৪শে জুন, ১৯৪৮

প্রিয় জওহর,

জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে ১৫ তারিখে তুমি যে চিঠি লিখিয়াছ, তাহা আমি খুব মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি। আমি এ বিষয়ে দক্ষ মতামত দিতে পারি না। যদিও সুদূর অতীতে আমি একসময় যন্ত্রসংগীত লইয়া কিছু নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম।

কিন্তু যাহাই হউক, তোমার চিঠির তৃতীয় অনুচ্ছেদে যে যুক্তি তুমি দেখাইয়াছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'বন্দে মাতরম্' আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত জড়িত ছিল, এবং এই গান জাতীয় সংগীত হিসাবে আমি অযোগ্য মনে করি না। বরং এ গান ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, ভারত যাহা হইবে, শক্তিশালী এক দেশ, সুজলা এবং সুফলা,—বিজয়ের প্রতীক, প্রত্যাশা পূরণের প্রতীক। আসলে পুরানো দিনের সংগ্রামের কোনো কথাই ইহাতে নাই।

তোমার চিঠির পরের অনুচ্ছেদে গানের সুষম ছন্দ ও কথার প্রশ্ন তুলিয়াছ। আমি তোমার সহিত একমত যে, জাতীয় সংগীতের সুরে একটা সুষম ছন্দ থাকা প্রয়োজন। যাহা সহজেই দেশে ও বিদেশে বাজানো যাইবে। গত অক্টোবরে ওয়াল্‌ড্রফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে যখন 'জনগণমন' বাজানো হইয়াছিল, তখন আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি ইহাও জানি যে, এই সুর বিদেশের প্রতিনিধিদের খুবই ভালো লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইতে ইহা দাঁড়ায় না যে, 'বন্দেমাতরম্'-কেও তেমনি সুরে গাওয়া যাইবে না, সে সুর অন্য দেশের লোকদের ততো ভাল লাগিবে না, বা আরও বেশি ভালো লাগিবে না। যেভাবেই হউক, যদি তেমন সুর করা যায়, তবে 'জনগণমন'-এর তুলনায় 'বন্দে মাতরম্' অধিক প্রাধান্য পাইবে বলিয়া আমার ধারণা। 'জনগণমন' সেইভাবে সুরারোপিত হইয়াছে বলিয়াই সেনাবিভাগ উহা ভালভাবে বাজাইতে পারিয়াছে। আমার দৃঢ় ধারণা, 'বন্দে মাতরম্-' এর সুর যদি তেমন ভালো করিয়া করা যায়, তাহা হইলে তাহাও তাহারা সুন্দর করিয়া বাজাইতে পারিবে। তুমি চিঠিতে বলিয়াছ, বিদেশের নাম করা সংগীত-বিশারদদের সহিত তুমি 'জনগণমন' লইয়া আলোচনা করিয়াছ। আমি তোমাকে অনুরোধ করিব, তুমি তাঁহাদিগকে 'বন্দে মাতরম্'-এর নূতন সুর শুনাইয়া তাঁহাদের মতামত জানিয়া লও।

কিছুদিন পূর্বে তোমার জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত চিঠিখানা যখন পাইয়াছিলাম, তখন আমি সঙ্গে-সঙ্গেই লিখিয়াছিলাম, আমার মতে 'জনগণমন'-এর পরিবর্তে 'বন্দে মাতরম্'-কেই পছন্দ করা উচিত। তুমি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলে যে, আপাততঃ 'জনগনমন'-কেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ধরা হউক। আমি তোমার কাছে প্রস্তাব দিব, 'বন্দে মাতরম্'কেও অনুরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত। নূতন সুরের 'বন্দে-মাতরম্'। এই সুর বিদেশে শুনাইয়া দেখা হউক, তাহারা 'জনগণমন'-এর অপেক্ষা ইহাকে বেশী পছন্দ করে কিনা।

এবার 'বন্দে মাতরম্'-এর ভাষা সম্বন্ধে বলি। তুমি বলিয়াছ, এ ভাষা অনেকেই হয়ত বুঝিবে না। তুমি নিজেই বলিয়াছ, অন্যের কথা দূরে থাক, তুমি নিজেই এ

গানের ভাষা বুঝিতে পার না। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, সে অসুবিধা 'জনগণমন'-এর ক্ষেত্রেও আছে।

জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারত সরকারের নির্দেশ আমি পাইয়াছি, কিন্তু তোমার চিঠিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা নাই।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

বলাই বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থ-বণ্টন ও বরাদ্দ ব্যবস্থা এবং জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যে দাবি রাখিয়াছিল, ভারত সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থ-বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪২ সালে বাংলাদেশে যে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে যে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব তীব্রভাবে দেখা দিয়াছিল, খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে তাহার সমস্যা আরও জটিল হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর স্রোত ক্রমাগত আসিতেছিল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অন্নবস্ত্রের অভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ খনি, শিল্প ও চা বাগানে সমৃদ্ধ হইলেও পূর্ববঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহা তাহার 'খাদ্যভাণ্ডার' হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। ফলে খাদ্যাভাব ক্রমেই তীব্রতর হইতেছিল। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পাইতেছিল না। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা বিধানচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার দাবী অনেকক্ষেত্রে উপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে নাই। উদ্বাস্তুদের অবস্থাও দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে তাঁহাদিগকে এইসব ছিন্নমূল সর্বহারা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নিজ নিজ রাজ্যে ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। সংযুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) এ বিষয়ে ভালো ব্যবস্থা করিলেও পার্শ্ববর্তী বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা দেখায় নাই। যেসব রাজ্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিল, তাহাও আশানুরূপ হইল না। উদ্বাস্তুদিগকে বাসের জন্য যে জমি দেওয়া হইল, তাহা বাসোপযোগী ছিল না, তাহাদিগকে চাষের জন্য যে জমি দেওয়া হইল, তাহা চাষের উপযোগী ছিল না। ফলে এইসব উদ্বাস্তু তাহাদের নূতন বাসস্থান ছাড়িয়া দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাকে তাহা আরও জটিল করিয়া তুলিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খাদ্যবস্ত্রের সমস্যা, তাহার সহিত উদ্বাস্তুদের আগমন

ও চাপ দেশের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই অবস্থায় বিধানচন্দ্র তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া অবস্থার মোকাবিলা করিতে লাগিলেন।

তিনি মুখ্যমন্ত্রী হইয়াই হাওড়ার কতকগুলি লক-আউটে বন্ধ চটকল খুলাইলেন। ঐ সকল চটকলে প্রায় বিশ হাজার শ্রমিক কাজ করিত। তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের চাকরি দেওয়ার জন্য এবং শহরের যানবাহনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই কলিকাতায় সরকারী বাস চালু করিলেন। ঐ সংস্থায় চাকরির ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইল। তিনি সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও চোরা চালান বন্ধ করিবার জন্য আধা-সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন এবং তাহার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজ ও দক্ষতা দেখিয়া তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিআপ্পা বাঙ্গালী তরুণদের সৈন্যবাহিনীতে লইবার ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়া ময়ূরাক্ষী প্রকল্প গ্রহণ করাইলেন। এই বহুমুখী প্রকল্পে ছিল একটি বড় বাঁধ নির্মাণের কথা (এখন যাহাকে ক্যানাডা বাঁধ বলা হয়), দু হাজার কিলোওয়াটের একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরির কথা, আর ছিল ছয় লক্ষ একর জমিতে জলসেচের উপযোগী কয়েকটি খাল খননের কথা। এই জমির বেশির ভাগই পড়িবে বীরভূম জেলায় এবং কিছু বর্ধমান জেলায় ও কিছু মুর্শিদাবাদ জেলায়। বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে বিহার সরকার আপত্তি তোলেন। তাঁহারা বলেন, এই বাঁধ নির্মাণ করিলে সাঁওতাল পরগনার বিশ হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হইয়া যাইবে। দুই সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে যখন কিছুতেই নিষ্পত্তি হইল না, তখন ডাঃ রায় নেহরুকে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। দিল্লীতে আলোচনা হইল। ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গে ঐ বিশ হাজার মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি প্রকল্প পেশ করিলে বিহার সরকার তাহার আপত্তি তুলিয়া লইল।

এইভাবে বিধানচন্দ্রের মুখ্যমন্ত্রিত্বের এক বৎসর পূর্ণ হইল। কিন্তু মানুষের অসন্তোষের সীমা ছিল না। অন্ন-বস্ত্র, অর্থ ও চাকরির যে সমস্যা ছিল, তাহাকে বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। তাই অনেক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সহজেই ফাটিয়া পড়িতেছিল। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঐ রকম একটি বিক্ষোভ অকস্মাৎ ফাটিয়া পড়িল। উদ্বাস্তুদের একটা অংশের উপর পুলিস টিয়ার গ্যাস চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করিল। তাহারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মিছিল লইয়া মহাকরণের দিকে অগ্রসর হইলে গোলমাল বাধিল। পুলিস মিছিলকে বাধা দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী

এলাকায় ছাত্ররা এবং ছাত্রদের নামে সমাজবিরোধীরা তাণ্ডব শুরু করিল। স্টেট বাস ও ট্রাম পুড়িল। পুলিসের গুলিতে চারজন মারা গেল এবং পনেরজন আহত হইল। পরদিন ছাত্র ও উদ্বাস্তু মিলিয়া প্রায় দুই হাজার লোক পুলিস মর্গে আসিয়া হানা দিল, গতকাল পুলিসের গুলিতে যাহারা মারা গিয়াছিল তাহাদের দেহগুলি চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে পুলিস পাহারা ছিল, তাহার উপর ইঁট বোমা প্রভৃতি পড়িল। ফলে পুলিস গুলি চালাইল। পুলিসের গুলিতে ৫ জন মারা গেল এবং ২০০ জন গ্রেপ্তার হইল। অবস্থা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিল। অবস্থা পুলিসের আয়ত্তের বাহিরে গেলে শেষে মিলিটারি আনিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনিতে হইল। ঐ দুই দিনে ৫ খানি নূতন স্টেটবাস ও ১০ খানি ট্রাম পুড়িয়াছিল। ক্ষতি হইল কয়েক লক্ষ টাকা। বিধানসভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল; প্রকাশ্য সমালোচনা করিল কেবল বিরোধীরা নহে, বিধানবিরোধী কংগ্রেসীরাও ইহার মধ্যে প্রশাসনিক দুর্বলতার সন্ধান পাইল। বিধানচন্দ্র পুলিসের কার্যের সমর্থন না করিয়াই বিরোধীদের হিংসাত্মক রাজনীতিকেই এজন্য দায়ী করিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি সমস্ত ব্যাপারটাই তদন্ত করিয়া দেখিবেন; তবে হিংসা কোন সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে না। হিংসা হিংসারই জন্ম দেয়, শেষে তাহা ধ্বংসই ডাকিয়া আনে। দুইদিন পরে একটি ছাত্র-প্রতিনিধি দল বিধানচন্দ্রের বাড়িতে আসিয়া সকালে দেখা করিল। তাহাদের দাবি, কয়েকজন পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লইবে হইবে এবং ১৪৪ ধারা উঠাইয়া লইতে হইবে। বিধানচন্দ্র বলিলেন, আর কোনও গোলমাল ও মারদাঙ্গা হইবে না এবং পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখিবে, তোমরা আগে এই প্রতিশ্রুতি দাও। কয়েকদিন ধরিয়া যদি দেখি যে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি রাখিয়াছ, তখন ১৪৪ ধারা তুলিয়া লইব এবং পুলিসী বাড়াবাড়ির তদন্ত করিব। ছাত্ররা এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে ঘটনার এখানেই ছেদ পড়িল। স্বরাষ্ট্র (পুলিস) মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় কিছুদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। এই ঘটনার মাসখানেক বাদে (২০শে ফেব্রুআরি ১৯৪৯) তিনি মারা গেলেন।

ফেব্রুআরি মাসের শেষাশেষি আর একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটিল। আর.সি.পি.আই. (রিভলুসনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া) নামে একটি রাজনৈতিক দল এই ঘটনার নায়ক। ঐদিন বিকালে বসিরহাটের মহকুমা শাসক ডাঃ রায়কে ঘটনার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ দেন: ২৬শে ফেব্রুআরি সকালে দমদম বিমান বন্দরের মাইলখানেকের মধ্যে একদল লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সমবেত হইয়া তিন দলে বিভক্ত হয় এবং একই সঙ্গে জেশপ কোম্পানির কারখানায়, যশোর রোডের উপর সরকারী অস্ত্র তৈয়ারির কারখানায় ও বিমান বন্দরে হানা দেয়। তারা জেশপ

কোম্পানির কারখানায় কয়েকজন ইউরোপীয় কর্মীকে জ্বলন্ত ফারনেসের মধ্যে ফেলিয়া দেয়, বিমান বন্দরে তিনজনকে খুন করে, একটা বিমানে আগুন ধরাইয়া দেয়, গৌরীপুরের পুলিস ফাঁড়ি ও বসিরহাট থানার উপর গুলি চালায়, পুলিসের সঙ্গে সেখানে একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়, তাহারা থানা লুঠ করে, তারপর জেল ও ট্রেজারি আক্রমণ করে। তাহারা হানা দেওয়ার পর সীমান্ত পার হইয়া পালাইবার চেষ্টা করে। স্থানীয় লোকদের সাহায্যে তাহাদের দুইজনকে ধরিয়া ফেলা সম্ভব হয়। বিকালে বসিরহাট পুলিসের সঙ্গে চল্লিশজন সশস্ত্র লোকের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। উহারা স্টেনগান, রাইফেল ও পিস্তলে সজ্জিত ছিল। পুলিসের চেষ্টায় ২৫ জন হানাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস স্টেনগান, রাইফেল, পিস্তল মিলাইয়া ১৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করে।

এইরূপ ঘটনা যাহাতে আর না ঘটে, সেজন্য ডাঃ রায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিলেও এইরূপ সংঘবদ্ধ আক্রমণ ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই। তাই এই ঘটনায় সারা দেশে সাড়া পড়িল। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী নেহরু এ বিষয়ে একটি বিবৃতিও দিলেন। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ যে খুবই উদ্বেগের কারণ, তাহাও তিনি বলিলেন। গত বৎসর (১৯৪৮) সি. পি. আই. গভর্নমেন্টের উপর কেবল খড়্গহস্তই ছিল না, তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহা বিদ্রোহেরই সমতুল্য। তিনি ইহাও বলেন যে, যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহারা আর সি. পি. আই.-এর লোক। ইহারা সি পি. আই. হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার সহযোগিতাও করিয়া থাকে।

স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক বৎসর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন ছিল শোচনীয়, রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল তেমনি অশান্ত ও অস্থির, একথা বলাই বাহুল্য। এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আবর্তের বিরুদ্ধে বিধানচন্দ্রকে কয়েক বৎসর সর্বশক্তি দিয়া লড়াই করিতে হইয়াছিল।

ঐ বৎসর (১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি) আবার এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া যাইবার, অর্থাৎ বিধানচন্দ্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হইবার উপক্রম হইল।

শরৎচন্দ্র বসুর দাদা সতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে একটি সদস্যপদ খালি হইয়াছিল। ফলে দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচন কেন্দ্রে একটি উপনির্বাচন হইল। শরৎচন্দ্র বসু ঐ সময়ে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া রিপাবলিকান সোসালিস্ট পার্টি নামে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ পার্টির তরফ হইতে নির্বাচনে প্রার্থী হইলেন। কংগ্রেস তাঁহার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করাইলেন দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি

সুরেশ দাসকে। শরৎচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসবিরোধী ও সরকারবিরোধী সকল দলই সমর্থন করিল। দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে কংগ্রেস যে প্রথম নির্বাচনী সভা করিল, তাহা গণ্ডগোল ও মারামারিতে পণ্ড হইল। ইটপাটকেল, অ্যাসিড বাল্‌ব্‌ প্রভৃতি ছোঁড়া হইল। প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, বিজয় সিংহ নাহার প্রভৃতি সহ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী আহত হইলেন। দাঙ্গাকারীরা কংগ্রেস পতাকা পুড়াইল, সুরেশ দাসের নির্বাচনী অফিসে হানা দিয়া সবকিছু তছনছ করিয়া দিল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, পুলিস ডাকিতে হইল। অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পুলিস গুলি চালাইল এবং গুলিতে একজন লোক মারা গেল। সমস্ত অঞ্চলে উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল।

এইরূপ অবস্থাতেই ১২ই জুন (১৯৪৯) ভোটগ্রহণ হইল। ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হইল ১৪ই জুন রাত সাড়ে সাতটায়। শরৎচন্দ্র ১৯,৩০০ ভোট পাইয়া বিপুল ভোটে বিজয়ী হইলেন এবং সুরেন দাস পাইলেন মাত্র ৫৭৫০ ভোট। দক্ষিণ কলিকাতায় কংগ্রেসের এই পরাজয়ের দায়িত্ব আসিল ডাঃ রায়ের উপর। ২০শে জুন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর একটি ভাষণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। তাহাতে বলা হইল, তিনি মন্তব্য করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা উচিত। বলাই বাহুল্য, নেহরুর এই মন্তব্য ডাঃ রায়ের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্র লিখিলেন :

প্রিয় জওহর,

নয়া দিল্লিতে প্রাদেশিক রাজনৈতিক পরিষদের প্রকাশ্য বৈঠকে তুমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলে, তাহা আজিকার সকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি দুইটি বিষয় বলিয়াছ বলিয়া সংবাদপত্রগুলি বলিয়াছে। এক, দেখা যাইতেছে যে, ঐ নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণ হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের উপর, নয় প্রাদেশিক সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে। দুই, সরকারে মন্ত্রীরা আছেন জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে, কিন্তু এই জনপ্রতিনিধিত্বের ভাবমূর্তি যখন তাঁহারা হারাইয়াছেন তখন তাঁহাদের পদত্যাগ করাই উচিত।

তোমার অভিমতের এই দুইটি দিক আমাকে ভীষণভাবে ভাবিত করিয়াছে। প্রথমতঃ, আমি স্বীকার করি না যে, দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি জনসাধারণের রোষ ও ঘৃণা সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।……প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের সময় ধ্বংসাশ্রয়ী ও ঈর্ষাকাতর কিছু লোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা কেন্দ্রীয়

সরকারের ও তাঁহাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ প্রচার চালাইয়া যাইতেছিল। যাহাই হউক না কেন, আমার মনে হইয়াছে, তোমার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া আমার মনে কি হইয়াছে, তাহা তোমাকে জানানো দরকার।

রাজ্যের স্বার্থে আমি যখন আমার জীবিকা ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াই, তখন আমার মনে হইয়াছিল, ব্যক্তিগতভাবে রোগীর সেবা করার অপেক্ষা সমগ্রভাবে রাজ্যের সেবা করিলে তাহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। এ কর্তব্য শিরোধার্য করায় আমি আমার সময় ও স্বাস্থ্য কোনটার দিকেই ভ্রূক্ষেপ করি নাই। একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসাবে তুমি যদি মনে কর যে, দাক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে পরাজয়ের মাধ্যমে আমার সরকারের বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমি যাহা করিব তাহা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট। তোমার দ্বিতীয় বক্তব্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় আর জনমতের প্রতিনিধিত্ব নাই এবং সেক্ষেত্রে আমার একমাত্র সংগত কাজ হইতেছে পদত্যাগ করা। এ বিষয়ে আমি সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করি নাই। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে তোমার ভাষণ পড়িয়াছি; এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছে, তোমাকে আমার মতামত জানাইতে আদৌ বিলম্ব করা উচিত নহে, যাহাতে আমি আগামী বৃহস্পতিবার সকালে সুইজারল্যাণ্ড রওনা হইবার আগেই তোমার উত্তরটা পাইয়া যাইতে পারি। বিশ্বাস কর, যে দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি আমাকে ত্যাগ করিতে বলা হয়, তাহাতে আমি আদৌ দুঃখিত হইব না। শুধু আমার সহকর্মীদের কথাটা জানাইতে হইবে এবং তাহা আমি তোমার উত্তর পাওয়া মাত্র জানাইব। তাহাতে আমার ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা কার্যে পরিণত করা যাইবে।...

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

এই সঙ্গে ডাঃ রায় উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকেও একখানি পত্র লিখিলেন :

প্রিয় বল্লভভাই,

পণ্ডিত নেহরুকে আজ যে চিঠি লিখিয়াছি, তাহার একটি কপি তোমাকে এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। ইহাতে আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিয়াছি, ইহার প্রত্যেকটি কথা আমার দৃঢ়বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। আমার একমাত্র দুঃখ পণ্ডিত নেহরু এই কথা উড়াইয়া দিতে চাহেন যে, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের কোনও

প্রতিরোধ-প্রবৃত্তি নাই, যদিও ভারতের কমিউনিস্টদের তিনি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতামতের এই অভিব্যক্তি, তুমি হয়ত স্বীকার করিবে, এই রাজ্যে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক করিয়া তুলে। পরিস্থিতি কিরূপ, তাহা তিনি উপলব্ধি করুন, ইহাই আমার ইচ্ছা। ইহাও আমার ইচ্ছা যে, তিনি নিজে আসিয়া এই প্রদেশে কিছুদিনের জন্য সরকার চালাইয়া দেখুন, তাহা হইলে সঠিক বুঝিতে পারিবেন, সমস্যাটা কোথায়। তোমাদের এই ধরনের অভিব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকাকে আরও কঠিন করিয়া তুলে। কবে যে তিনি ইহা বুঝিবেন কে জানে। অপরপক্ষে দেখ, আমাদের জনসাধারণের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য খাদ্যের বরাদ্দ বাড়াইবার যতবার প্রস্তাব করিয়াছি, ততবার সে প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছেন খাদ্য দপ্তর। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যদি সমস্যাগুলি পুরাপুরি উপলব্ধি না করেন বা সহযোগিতা না করেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব নয়।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

দুইদিন পরই জওহরলাল পত্রে জানাইলেন :

"আমি তোমাকে এখন তাড়াহুড়ো করিয়া কিছু করিতে পরামর্শ দিতেছি না। তুমি তোমার চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ায় চলিয়া যাও সেখানে পুরাপুরি বিশ্রাম নাও, দুশ্চিন্তা দূরে সরাইয়া রাখো, যতদূর সম্ভব কলিকাতা ও তাহার সমস্যাবলীর কথা ভুলিয়া থাকিও।'

দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য যখন জওহরলালের মতো লোকও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দায়ী করিয়াছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অবস্থা কি, সে সম্পর্কে ডাঃ রায় একটি গোপনে নোট দিল্লিতে পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কথা তুলিয়া ধরিলেন। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি, বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিহ্বলতা, শোচনীয় অবস্থায় পূর্ববঙ্গ হইতে সুবিপুলসংখ্যায় ক্রমাগত উদ্বাস্তুদের আগমন, দারুণ খাদ্যাভাব, পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে কাপড় সংগ্রহের অসুবিধার জন্য বস্ত্রাভাব, দেশ-বিভাগের ফলে পরিবহণ ব্যবস্থায় বিপর্যয়, এই সব কারণে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই যে সময়ে সময়ে গণবিক্ষোভ ও হিংসার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা ডাঃ রায় সুস্পষ্টভাবে জানাইলেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গঠন সম্পর্কে বলিলেন, দেশবিভাগের পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাদের একটি বড় অংশ পূর্ববঙ্গের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গকেই তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া

লইয়াছিলেন। কী জেলাস্তরে, কী প্রদেশস্তরে বেশ কয়েক বৎসর কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন হয় নাই। তখনকার কংগ্রেস সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দেশে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৪৭ জন সভ্য যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে এখানকার কংগ্রেস কমিটিতে স্থান পাইলেন অথচ পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের কোনও নির্বাচনকেন্দ্র ছিল না, যে নির্বাচনকেন্দ্র হইতে তাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পাবেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতিই হউন বা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিই হউন, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের কোনও সংযোগ নাই। ডাঃ রায় দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কেও বলিলেন যে, প্রার্থী মনোনয়ন বিষয়ে যদি কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারি বোর্ড তাঁহাকে তার করিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিতেন, তবে সুরেশ দাসকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাইবার অসুবিধা যে কী, তিনি তাহা জানাইতে পারিতেন।

২৩শে জুন তারিখে ডাঃ রায় বিমান যোগে সুইজারল্যাণ্ড রওনা হইয়া গেলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর কাহিনীর উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ তাহাতে বিধানচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত ঘটিবে। কাহিনীটি বলিয়াছেন, ডাঃ রায়ের পার্শ্বচর তাঁহার পি. এ সরোজ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' পুস্তকে।

কাহিনীটি এইরূপ :

ডাঃ রায় জ্যোতিষে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ইউরোপ রওনা হইবার দুইদিন আগে সন্ধ্যাবেলা তাঁহার এক বন্ধু 'বুক কোম্পানি'র গিরীন মিত্র একজন ময়লা-কাপড়-পরা ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ডাঃ রায় তখন মহাকরণ হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। গিরীনবাবু সরোজবাবুকে বলিলেন, ইনি উড়িষ্যাবাসী একজন জ্যোতিষী। নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। ডাঃ রায় বিদেশে যাইতেছেন তাই তাঁহাকে যাইবার আগে হাতটা দেখাইতে বলিয়াছিলাম। তিনি রাজী হইয়াছেন। তাই আমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। সরোজবাবু বলিলেন, তাহা হইলে ভিতরে যান। গিরীনবাবু জ্যোতিষীকে লইয়া ভিতরে গেলেন। ভিতরে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল, তারপর গিরীনবাবুরা বাহিরে আসিলেন। গিরীনবাবু সরোজবাবুকে বলিলেন, ইনি ডাঃ রায়কে কি বলিয়াছেন জানেন? যেদিন ডাঃ রায় রওনা হইতে চান, সেদিন রওনা হইতে পারিবেন না—দুদিন পরে রওনা হইবেন। চোখের অপারেশন এখন হইবে না। প্লেনের টিকিট কাটা হইয়া গিয়াছিল, তাই ইহা অসম্ভব মনে হইল। কিন্তু কোম্পানির এজেন্ট ফোন করিয়া জানাইলেন যে, ভারতের বাহিরে বিমানের যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় বিমান ঠিক সময়ে আসিতে পারিতেছে

না। তাই নির্দিষ্ট দিনে বিমান ছাড়িতে পারিবে না। সত্যই, দুইদিন পরেই ডাঃ রায় রওনা হইয়াছিলেন। ইউরোপে গিয়া ঐবার চোখের অপারেশনও হয় নাই। এই ঘটনার পরে ঐ মলিন-বস্ত্র-পরিহিত জ্যোতিষীকে প্রায়ই ডাঃ রায়ের বাটীতে আসিতে দেখা যাইত। ডাঃ রায় তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। সরোজবাবু লিখিয়াছেন: "সব থেকে অবাক হবার মতো যে ভবিষ্যদ্‌বাণী জ্যোতিষীটি করেছিলেন, সেটি তাঁর আয়ু সম্পর্কে। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা মিলিয়ে দেখেছিলাম বাঁটয় কাঁটায় তা সত্যি। তাঁর কোষ্ঠীতে ১৯৬২-র ১লা জুলাইয়ের পর আর কোনও ঘর কাটা ছিল না।"

যাহাই হউক, ডাঃ রায় ২০শে জুন (১৯৪৯) ইউরোপ রওনা হইয়াছিলেন। তিনি ইহার পূর্বে কয়েকবারই ইউরোপ-আমেরিকা সফরে গিয়াছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর এই তাঁহার প্রথম ইউরোপ সফর। তিনি ইউরোপ যাইবার সময় নলিনী-রঞ্জন সরকারকে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী করিয়া গিয়াছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ইউরোপ যাওয়ার পর জওহরলাল ডাঃ রায়কে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিজে কলিকাতা যাইতেছেন। তিনি সেখানে গিয়া প্রকৃত অবস্থাটা কি সরেজমিনে দেখিবেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও লিখিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ১৬ই জুলাই বসিতেছে। ইহাতে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাই সর্বাধিক প্রাধান্য পাইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাহার ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। যথাসম্ভব দ্রুত এই পরিস্থিতির আলোচনা করিতে হইবে। ১০ই জুলাই নেহরুজী কলিকাতা আসিলেন এবং অনেকের সহিত আলোচনা করিয়া এখানকার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হইলেন। তিনি কলিকাতায় থাকিবার সময়েই কলিকাতা হইতে ডাঃ রায়কে একটি তারবার্তা পাঠাইয়া জানাইলেন যে, এখন ডাঃ রায়ের চোখের অপারেশন যখন হইতেছে না, তখন তিনি যেন ফিরিয়া আসিয়া দিল্লিতে ১৬ই জুলাই তারিখের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এবং ২০শে জুলাই তারিখে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেন। ইহার উত্তরে ডাঃ রায় তারবার্তায় নেহরুকে জানাইলেন, ওয়ার্কিং কমিটি ও মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগদান আমার পক্ষে সম্ভব নহে। জুরিখের ডাক্তার অপারেশনের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। তিনি চশমার কাচ বদলাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এখনও পর্যন্ত কোনও সুফল হয় নাই। আরেকজন ডাক্তার চিকিৎসা চালাইয়া যাইতে এবং পাঁচ সপ্তাহ পরে আবার দেখাইতে বলিয়াছেন। প্যারিসে এবং ভিয়েনাতেও বিশেষজ্ঞকে দেখাইয়াছি। আমার বাঁ চোখটা ইতিমধ্যেই অকেজো হইয়া গিয়াছে, ডান চোখটা

ভালো আছে, কিন্তু তাহার আরও ক্ষতি হউক তাহা আমি চাহি না। ডাক্তাররা যতদিন না শেষ নির্দেশ দিতেছেন ততদিন আমার পক্ষে ভারতে ফেরা অসম্ভব। সেজন্য দুঃখিত। নলিনী সরকারকে আমার পুরোপুরি নির্দেশ দেওয়া আছে। তিনিই মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও উপস্থিত থাকিবেন।

১৬ই জুলাই প্যারিস হইতে ডাঃ রায় নলিনীবাবুকে তার করিয়া জানাইলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে তিনি যেন কেন্দ্রীয় খাদ্যবণ্টন নীতির উন্নতির জন্য চাপ দেন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য রেশনিং সম্পর্কে তিনি নোট পাঠাইতেছেন; নলিনীবাবু যেন এ বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া রাখেন। কলিকাতার বাহিরে শিক্ষায়তন খোলার বিষয়ে কেন্দ্র হইতে ভরতুকি দেওয়ার বিষয়ে চাপ দেওয়ার জন্যও তিনি ঐ তারের বার্তায় বলিলেন।

ডাঃ রায় চোখ দেখাইতে ইউরোপ গেলেও তিনি পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য অনেকগুলি প্রকল্পের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং ঐসব বিষয়ে ইউরোপে কিভাবে কাজ হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিতেও চাহিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন জার্মানির সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে একটি নুনের কারখানা খুলিতে। কলিকাতার যানবাহনের ভিড় কমানো এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ভূগর্ভস্থ রেলপথের চিন্তাও করিয়াছিলেন। তাই তিনি প্যারিসে যাহারা পাতাল রেল নির্মাণ করিয়াছে, সেইসব বিশেষজ্ঞদের আনাইয়া কলিকাতার জমি পরীক্ষা করাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। পরে সত্যই তাঁহার চেষ্টায় ফ্রান্স হইতে এ ব্যাপারে একটি বিশেষজ্ঞ দল আসিয়াছিল এবং কয়েকমাস ধরিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়া রাজ্য সরকারের কাছে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছিল। এই ঘটনার ২৩ বৎসর পরে কেন্দ্রীয় সরকার রাশিয়া হইতে বিশেষজ্ঞ দল আনিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই এখন কলিকাতায় পাতাল রেলের কাজ চলিতেছে। কলিকাতার পরিবহণের জন্য যাহারা ডবল-ডেকার বাস তৈয়ারী করে, তাহাদের সহিতও তিনি যোগাযোগ করেন। তিনি হল্যাণ্ডের একটি সংস্থার সহিত যোগাযোগ করিয়া সমুদ্রের গভীর জলে মাছ ধরিয়া মাছ সরবরাহ করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এ বিষয়ে পরে কাজও আরম্ভ করেন। উদ্বাস্তুদের জন্য সস্তায় কংক্রিটের বাড়ি তৈয়ার করা যায় কিনা সেজন্য তিনি কোপেনহেগেনে একটি কোম্পানির সঙ্গেও আলাপ করেন। ডাঃ রায় ছিলেন মনে-প্রাণে বৈজ্ঞানিক। পাশ্চাত্যদেশে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রথায় কিভাবে নানা সমস্যার সমাধান করা হইতেছে, সে সমস্ত বিষয়ে ছিল তাঁহার অপরিসীম কৌতূহল ও উৎসাহ। কলিকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী-

গুলিকে কিভাবে সংস্কার করা যায় এবং তাহা হইতে গ্যাস উৎপাদন করিয়া গ্যাসের অভাব মিটানো যায় কিনা সে বিষয়েও তিনি অনুসন্ধান করেন। তাঁহার চিন্তাধারা এতই অগ্রগামী ছিল যে, তাঁহার অনেক প্রস্তাব ও প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে উদ্ভট বলিয়া মনে হইত, সমালোচনাও কম হইত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ সব প্রকল্প কার্যকরী হইয়াছে এবং তাহা যে পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত উন্নয়নে কতখানি সহায়ক হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রই তাহা জানেন।

যাহাই হউক ডাঃ রায় যখন ইউরোপে ছিলেন, তখন দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হইল। ২৮শে জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ছয়মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন করিতে হইবে, নূতন অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে, প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। মন্ত্রিসভাকে ঢালিয়া সাজানোর ব্যাপারটা কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির নেতা যতদিন না দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, ততদিন স্থগিত রাখিতে হইবে।

প্রদেশ কংগ্রেসে ঐ সময় দুইটি উপদল ছিল। একটি উপদল ডাঃ রায়ের পরিবর্তে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে লেজিসলেটিভ পার্টির নেতা অর্থাৎ পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী করিতে চাহিতেছিল। আর ডাঃ রায়ের সমর্থকরা চাহিতেছিলেন ডাঃ রায় ইউরোপ হইতে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হউক। শেষোক্ত দলই এ বিষয়ে সফল হইয়াছিল। ঐ সময়ে ডাঃ রায় ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া তারবার্তায় জানাইলেন। এই খবর পাইয়া ডাঃ রায়ের সমর্থকরা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে বোম্বাই পাঠাইয়া দিলেন। বোম্বাইয়ে নামিয়া ডাঃ রায় যাহাতে তাঁহার পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া না দেন, সেজন্য তাঁহাকে বিরত করিতে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব জানিয়া ডাঃ রায় যে উহাকে তাঁহার মন্ত্রিসভার উপর দোষারোপ বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। এবং সেজন্য তিনি পদত্যাগের জন্য প্রস্তুতও হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একটি পদত্যাগপত্র লিখিয়া সঙ্গেও আনিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন :

১৯৪৮ সালের ২০শে জানুআরি গান্ধীজী তাঁহার অনশনের অব্যবহিত পরেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব লইতে বলিয়াছিলেন। কারণ জনসাধারণ আমাকে চাহিতেছিল। আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়াছিলাম। আজ যাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে একটি পুনর্গঠিত অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার প্রয়োজন আছে; প্রয়োজন আছে শীঘ্রই একটি সাধারণ নির্বাচনের। আমার কর্তব্য হইতেছে বিনা দ্বিধায় সেই

নির্দেশ মানিয়া লওয়া। বিগত ১৮ মাস আমি পশ্চিমবঙ্গের সেবা করিবার যে সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আমি যথাসাধ্য করিয়াছি। হয়ত আমি পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে তাঁহাদের সঙ্গত দাবি অনুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, কিন্তু আমি এইটুকু দাবি করিব যে, আমি সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি এবং বহু অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। আমি এখন আমার পুরাতন জীবিকাতেই ফিরিয়া যাইতেছি এই সান্ত্বনা লইয়া যে, কোনও কিছু করিবার চেষ্টা না করা অপেক্ষা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হওয়া ভালো। আমার বিশ্বাস, আমি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার একটি ভিত্তি রচনা করিয়া যাইতে পারিতেছি। আমার নিজের ধারণা, এই সংকটকালে নূতন কোনও অন্তর্বর্তী মন্ত্রি-সভা খুব কাজে আসিবে না। কিন্তু তবু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যখন তাহা চাহিতেছেন, আমি তাহার অন্তরায় হইব না। আমার এখন কর্তব্য হইল অবিলম্বে পদত্যাগ করা যাহাতে আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

নেহরু ১০ই জুলাই কলিকাতা আসিয়া তিনদিন ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট হইবার কারণ কি, সে সম্পর্কে সন্ধান চালাইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি অরুণচন্দ্র গুহ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মত ছিল খাঁটী কংগ্রেসীদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হউক। তাঁহাদের আরও অভিমত ছিল এই যে, মন্ত্রিসভা দক্ষ নয়, তাঁহাদের অদক্ষতা কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী দিল্লী যাইবার পূর্বে বিধানসভার অন্যতম কংগ্রেসী সদস্য জে. সি. গুপ্ত তাঁহার হস্তে বিভিন্ন অভিযোগের একটি তালিকা দিয়াছিলেন। তালিকায় দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৭টি অভিযোগ ছিল, তাঁহার মতে সেগুলির ফলে বর্তমান মন্ত্রিসভার দুর্নাম হইয়াছে এবং কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট হইয়াছে। অফিসের ফাইল দেখিয়া এগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য জে. সি. গুপ্ত প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তখন ঐসব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারকে নির্দেশ দেন। ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতিতে নলিনীবাবু ঐ সকল অভিযোগের তদন্ত করান এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নোটসহ ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে জবাব ও মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ১২ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি লেখেন, তাহাতে তিনি লেখেন যে, ১০টি অভিযোগের মধ্যে বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু বাকি ৫টি অভিযোগ সম্পর্কে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, হয়ত ভুল পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, নয়তো আরও তদন্ত করিয়া দেখা প্রয়োজন। তিনি ঐ পাঁচটি অভিযোগ সম্পর্কে

নূতন কিছু তথ্য থাকিলে তাহা জানাইতে বলেন। ইহার উত্তরে ১৫ই সেপ্টেম্বর ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্র লেখেন এবং ঐ অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, ইহাতে ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে এবং পূর্ব প্রতিবেদনে যে ফাঁক ছিল, তাহা ইহাতে পূর্ণ হইয়াছে।

যাহাই হউক, প্রধানমন্ত্রীকে যে অভিযোগগুলি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সেইসময় সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করিয়া ছাপা হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রগুলিও বাদ যায় নাই। ডাঃ রায় বোম্বাইয়ে নামিবার পর সাংবাদিকদের সহিত তাঁহার এক বৈঠকে তাঁহাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, যিনি এইসব অভিযোগ করিয়াছিলেন, তিনি যে মাত্র ১৭টি অভিযোগে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে আমি বিস্মিত। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা যে বিভিন্নমুখী কার্যোদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে আরও বেশী ঘটনা বা অভিযোগ আসা উচিত ছিল। যাহারা কাজ করে, তাহাদের বিরুদ্ধেই সমালোচনার ঝড় উঠে। যাহারা মৃত, মৃতকল্প বা নিদ্রিত, যাহারা নিষ্ক্রিয়, তাহাদের সমালোচনাও হয় না।

যাহাই হউক, মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগপত্র পেশ করিলেন না। ১০ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস লেজিস্লেটিভ পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে ডঃ রায়ের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করিল এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানাইল যে, তাঁহারা যেন মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন। অক্টোবর মাসের গোড়ায় দিল্লিতে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে ডাঃ রায় উপস্থিত থাকিয়া এখন মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের এবং সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব যে কত বিপজ্জনক, তাহা বুঝাইলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত লইলেন যে, ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা এখন কাজ করিতে থাকিবে এবং ডাঃ রায় যতক্ষণ না নিজে পরিবর্তন করিতে চান, তাহাতে পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে না। কংগ্রেস প্রাদেশিক কমিটি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল যে, সাংগঠনিক নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কমিটিও অপরিবর্তিত থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের মূল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা। উহার পশ্চাতেই রাজ্যের তহবিল উজাড় হইতেছিল, উন্নয়নের কোনও কাজ যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হইতেছিল না। তাই তিনি অধৈর্য হইয়া ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে একটি কড়া চিঠি লিখেন এবং ঐ চিঠির এক কপি উপপ্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে পাঠাইয়া দেন।

ঐ চিঠিতে তিনি লিখিলেন :

'..... তোমার ধারণা, তোমার সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে আমাদিগকে বেশ

মোটা টাকা দিয়াছে। কিন্তু তুমি কি জান যে, ঐ বাবদ মোট অনুদান বা তোমার সরকারের নিকট হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে, দুই বৎসরে, ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সালে, তাহা হইতেছে তিন কোটি টাকার সামান্য কিছু বেশি, আর অবশিষ্ট প্রায় পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে ঋণ হিসাবে? পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত উদ্‌বাস্তুদের জন্য যাহা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই টাকাটা যে নগণ্য, তাহা কি তুমি জান? আমি তুলনা করিতে চাহি না, কারণ, তুলনা করার ব্যাপারটা সব সময়ই বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। কিন্তু এ কথা আমি বলিতে চাই যে, ষোল লক্ষ উদ্‌বাস্তুর পক্ষে এই অনুদান অতি সামান্য। এই অঙ্ক দুই বছরে জড়াইয়া হিসাব করিলে দাঁড়ায় প্রায় মাথাপিছু কুড়ি টাকা। ইহাকে কি তুমি মোটা টাকা বলিবে?

......আমি তোমাদের অনুরোধ করিয়াছিলাম এক কোটি টাকা অনুদান অথবা দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণ হিসাবে দিলে কলিকাতা হইতে ছাত্রদের ভীড় অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া যাইবে। ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক গোলমাল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হইবে। ছাত্রদের অত্যধিক ভীড় কলিকাতার পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রচণ্ড ভীড়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত কোনও বৃহৎ ঘটনার অর্থ হইতেছে খাদ্যাভাব প্রভৃতির জন্য জীবনহানি এবং পুলিস ও মিলিটারি ব্যবস্থা করিবার জন্য অতিরিক্ত খরচ। যেসব ছাত্রের জন্য ঋণ আমরা চাহিয়াছিলাম, তাহার বেশির ভাগই হইতেছে উদ্‌বাস্তু ছাত্র এবং সমস্ত ব্যাপারটাই প্রদেশের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

যাহা আমি একাধিকবার বলিয়াছি, তাহা আমি পুনরায় বলি। বাংলা যখন ভাগ হইয়াছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গ শুরু হইয়াছিল আড়াই কোটি টাকার ঘাটতি লইয়া। এখনও তাহা পুরাইয়া দেওয়া হয় নাই। এইদিক দিয়া আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সুবিচার পাই নাই। আয়কর ও পাটের মাশুলের দরুন আমাদের প্রাপ্য অংশ আমরা পাই নাই। আয়করের দরুণ আমাদের প্রাপ্য অংশ তাঁহারা অন্য প্রদেশগুলিকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং পাটের মাশুলের দরুন আমাদের প্রাপ্য অংশ তাঁহারা নিজেদের হস্তগত করিয়া বসিয়া আছেন। আগেভাগে আমাদিগকে না জানাইয়া ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তাঁহারা আমাদের নিকট এক ফতোয়া পাঠাইলেন যে আমাদের প্রাপ্য অংশকে শতকরা কুড়ি হইতে কমাইয়া শতকরা বারো করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই খাতে আমাদের বাৎসরিক প্রাপ্য ছয় কোটি টাকাকে কমাইয়া সাড়ে তিন কোটি টাকা করা হইল। নূতন ব্যবস্থা যে কি রকম বৈষম্যমূলক হইয়াছে, তাহা তোমাকে দেখাইতেছি। দুই কোটি দশ লক্ষ লোকসংখ্যা লইয়া বোম্বাই পাইয়াছে শতকরা কুড়ি হইতে বাড়িয়া শতকরা একুশ, আর সেই স্থলে ঐ লোকসংখ্যা বা আরও কিছু বেশি লইয়া পশ্চিমবঙ্গের

কমিয়া গেল শতকরা কুড়ি হইতে শতকরা বারোতে। আয়কর আদায়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাইয়ের দান কিন্তু প্রায় সমান সমান ছিল। ইহার কারণ দেখানো হইয়াছে, বাংলাদেশের আয়কর আদায়ের এলাকা ছোট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। বাংলার যে অংশ লইয়া পূর্ববঙ্গ গঠিত হইয়াছে, সে অংশ অবিভক্ত বাংলার মোট আয়করের মাত্র পাঁচ শতাংশ আদায় দিত। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলই আয়করের সর্বাধিক অংশ দিত এবং দেশবিভাগের পর ঐ অংশ পশ্চিমবঙ্গেরই রহিয়াছে। সেজন্য আয়কর বণ্টনের এই নূতন ব্যবস্থা যে কোন্ যুক্তি বা নীতি অনুসারে করা হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহার ফলে আমাদের অর্থসঙ্গতি বিশেষভাবে আঘাত পাইয়াছে। সংকীর্ণ মনোভাব লইয়া কথাটা বলিতেছি না, অবস্থা গতিকেই বলিতে হইতেছে।

এইভাবে ভাঙাচোরা অর্থনীতি লইয়া যখন আমরা হিমসিম খাইতেছি, তখন আবার সীমান্ত পাহারা দেবার জন্য নূতন সীমান্ত পুলিসের আমদানি করিতে হইয়াছে। আমাদের প্রদেশের পক্ষে ইহা এক বিরাট বাড়তি বোঝা। সীমান্ত অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য পথঘাট করিয়া দিতে হইয়াছে; ইহার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না; এবং এগুলি সাধারণ প্রশাসনের দিক হইতে প্রয়োজনীয়ও ছিল না। সীমান্ত এবং সীমান্তের যেসব অঞ্চল দিয়া নিষিদ্ধ ও বে-আইনী জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হইতে পারে, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আমাদেরই করিতে হইয়াছে। এই দুইটি বিষয় নিশ্চয় সমগ্র ভারতের স্বার্থের মধ্যে পড়ে, অথচ বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এই বিষয়ে কেন্দ্র হইতে আমরা কোনও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পাই নাই।

তারপর আসিল পনেরো লক্ষ মানুষ। ইহারা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের লোক। বুভুক্ষু একদল সর্বহারা মানুষ, নূতন জায়গায় কিছু খুঁটিয়া খাইবার আশাটুকু পর্যন্ত তাহাদের নাই। মাসের পর মাস ধরিয়া ভারত পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সমস্যার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিতে চাহে নাই, আর সেজন্য নিজের ঘাড়ে কোন দায়-দায়িত্বও লইতে চাহে নাই। প্রাদেশিক সরকার তাহার সাধ্যমতো যতদূর করিবার করিয়াছে। এইসব উদ্বাস্তুর জন্য কেন্দ্র দুই বছরে যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা হইতেছে মাথা পিছু কুড়ি টাকার মতো সুবৃহৎ অনুদান।

আমি নিজে শিল্প ও অন্যান্য গঠনমূলক পরিকল্পনা রচনার জন্য দায়ী বলিয়া কেন্দ্রকে যে ভয়ংকর অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা আমি ভালোভাবে বুঝি। কিন্তু ইহাও জানি ও বিশ্বাস করি যে, এইসব অসুবিধার জন্য কেন্দ্রের দোমনা নীতিই দায়ী। কেন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলি একযোগে টীম হিসাবে কাজ করে না। তুমি যে বলিয়া থাক, কেন্দ্রের অসুবিধাগুলি আরও বেশী, সে বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারিলাম

না। আমি অবশ্য তীব্র সমালোচনায় নামিতে চাহি না, কারণ, অপরের সমালোচনা করিব, অথচ তাহার কাজের দায়িত্ব লইব না—ইহা কোনও বাস্তবসম্মত কথা নহে।

এই প্রসঙ্গে আমি আবারও চাপ দিতেছি। ছাত্রদের ভীড় কমানোর ব্যাপারে এই পরিকল্পনা আমি পেশ করিয়াছি, প্রদেশের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া। যদি তোমরা এই ঋণটা দিতে সম্মত না হও, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐ ঋণটা সংগ্রহ করিবার অনুমতি দাও। তাহাতেই আমরা খুশী হইব। সময় হইতেই তোমাকে বিপদ-সংকেতও জানাইয়া রাখিলাম।"

বিধানচন্দ্রের এই চিঠিতে ফলোদয় কিছুই হয় নাই। উপরন্তু বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, একটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে ঐ ধরনের চিঠি লেখা উচিত নয়। তিনি সরকারীভাবে না লিখিয়া ঐ চিঠি যদি ব্যক্তিগত ভাবে লিখিতেন, তাহাতে কোনও দোষ হইত না।

১৯৪৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ডাঃ রায় জওহরলালের এক চিঠির উত্তরে তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন করার ব্যাপারে লিখেন :

"তোমার মনে থাকিতে পারে যে, রোম হইতে আমি তোমাকে একটি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহাতে বলিয়াছিলাম, বাস্তবে নহে, কল্পনায় ইহা ধারণা করা যায় যে, নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ যেহেতু বিধানসভার বর্তমান সদস্যরা ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পূর্বে নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই হেতু ১৯৪৯-এর জুলাই মাসে জনসাধারণের মনোভাব তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়।

আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, কিছু লোক যাঁহারা কলিকাতায় তোমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক, উভয় সরকারের প্রতিই অসন্তুষ্ট। ইহা হইতে বোঝা যায়, তাঁহাদের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশার ভাব বিরাজ করিতেছে। সম্ভবত তখন তুমি বুঝিতে পার নাই যে, আসল গোলমালটা মোটেই রাজনৈতিক নয়, এমন কি তাহাদের হতাশা বিধানসভার সদস্য বা মন্ত্রিসভার উপর তাহাদের আস্থা নাই বলিয়া নহে, আসল কারণ হইতেছে পুরোপুরি অর্থনৈতিক। আগে তোমাকে বহুবার লিখিয়াছি আসল সংকট যাহা পশ্চিমবাংলার মানুষকে পীড়িত করিতেছে তাহা হইল :

ক. খাদ্যের অভাব

খ. চাকরির অভাব

গ. জমির অভাব, যে জমিতে তাহারা, বিশেষতঃ উদ্বাস্তরা, পুনর্বাসিত হইতে পারে।

সম্ভবত এইসব সমস্যার সমাধান সাধারণ নির্বাচন এবং নূতন একদল বিধানসভার সদস্য বা মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া করা যায় না।"

এইভাবে ১৯৪৯ সাল শেষ হইল। বিধানচন্দ্র কেবল মানবদেহের রোগ নির্ণয়েই সুপটু ছিলেন না। তিনি নির্ভুলভাবেই সমাজদেহের রোগও নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলী তথা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাধির মূলকে উপেক্ষা করিয়া উপসর্গের চিকিৎসা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই বিধানচন্দ্রের সহিত প্রায়ই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সহিত মতদ্বৈধ ঘটিত।

১৯৫০ সাল ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরই স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসেও এই বৎসরটি গুরুত্বপূর্ণ। এই বৎসরই গোড়ার দিকে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হইল। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি ডাঃ রায় তাঁহার চীফ সেক্রেটারি ও ডিভিজনাল কমিশনারকে লইয়া বিমানযোগে কোচবিহার গেলেন। সেখানে তিনি সংযুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করিলেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দূত নানজাপ্পার নিকট হইতে সংযুক্তি সংক্রান্ত দলিলপত্র লইলেন। এই সভাতেই ডাঃ রায় ঘোষণা করিলেন, "এখন হইতে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলারূপে পরিগণিত হইবে, ইহার সদর থাকিবে কোচবিহার শহরে। জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কোচবিহারের জনপ্রতিনিধিত্ব থাকিবে। কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের কর্মচারীরা সরকারী চাকরির অন্তর্ভুক্ত হইবেন।" কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ভূমির পরিমাণ ১৯১৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা আট লক্ষ বৃদ্ধি পাইল। পশ্চিমবঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার গড়িমসি করিতেছিলেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গবাসীর যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে কোচবিহার সংযুক্ত হওয়ায় জনমত কিছুটা শান্ত হইল।

ডাঃ রায় কলিকাতা ফিরিবার কয়েকদিন পর ৮ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী জানাইলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের আগামী সাধারণ নির্বাচন ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে হইবে না, হইবে বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। প্রধানমন্ত্রী ইহাও বলিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তদনুসারে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হইল। রাজ্যপাল কাটজু জনসাধারণের সর্বশ্রেণীর মানুষের মতামত লইয়া অন্তর্বর্তী নির্বাচন স্থগিত রাখার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সুপারিশ করিয়াছেন। ডাঃ রায় ও তাঁহার মন্ত্রিসভার পক্ষে ইহা ছিল একটি শুভ সংবাদ। কিন্তু ঐদিন ডাঃ রায়

যখন দুপুরে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার গাড়ি একদল লোক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহারা গাড়িতে পাথর ছুঁড়িয়া মারে এবং গাড়ির কাচ ভাঙিয়া দেয়। ডাঃ রায়ের দেহরক্ষী রিভলভার হইতে গুলি চালাইতে উদ্যত হইলে ডাঃ রায় তাহাকে নিরস্ত করেন এবং অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। রিভলভার দেখিয়া গুণ্ডার দল পলায়ন করে। যাহাই হউক, ডাঃ রায়ের উপর এইরূপ পরিকল্পিত আক্রমণ এই প্রথম এবং এই শেষ।

১২ই জুন উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কলিকাতা আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসীদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন এবং পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করা। তিনি পরদিন, ১৩ই জানুয়ারি, ময়দানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের এক জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং হিংসাত্মক কার্য-কলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিলেন।

২৬শে জানুয়ারি নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইল এবং সারা দেশে সাধারণতন্ত্র দিবস-রূপে প্রতিপালিত হইল। ঐদিনটি পশ্চিমবঙ্গেও মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল। এইদিন নূতন সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও বিধানসভার অধ্যক্ষ শপথ গ্রহণ করিলেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসটি একরকম বেশ ভালভাবেই কাটিল।

কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে দেখা দিল এক অপ্রত্যাশিত বিপদ। পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক অত্যাচার করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে প্রায় ১৩০০০ উদ্বাস্তু নরনারী ও শিশু বনগাঁ সীমান্ত পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানেও দাঙ্গা শুরু হইল। সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিল বরিশালে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভারতে পলাইয়া আসিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রাণ লইয়া পলাইবার সুযোগ ছিল না। রেল স্টেশনে, স্টীমার ঘাটে এবং ঢাকার বিমান বন্দরে অসহায় উদ্বাস্তুর দল আটক পড়িল। ডাঃ রায় ইহাদিগকে নিরাপদে ভারতে আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। তিনি ছিলেন 'এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া নিজ দায়িত্বে ১৬খানি বিমান উদ্বাস্তুদের আনিবার জন্য ঢাকায় পাঠাইলেন এবং উদ্বাস্তুদের নিকট হইতে ভাড়া না লইতে বলিয়া দিলেন। ট্রেনে ও স্টীমারে যে সকল হিন্দু আসিতেছিল তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার কাহিনী ছড়াইয়া পড়িল। স্থলপথে ও জলপথে বন্দুকধারী রক্ষীর সাহায্য ছাড়া পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু-দের চলিয়া আসা অসম্ভব হইয়া পড়িল। একদিন ডাঃ রায় সন্ধ্যাবেলা মহাকরণ হইতে বাড়ি ফিরিয়া শুনিলেন, সীমান্ত হইতে কয়েকটি রেলের বগি আসিয়াছে সম্পূর্ণ খালি,

তাহাতে ভাঙা শাঁখা, ছেঁড়া শাড়ি ও ধুতি-জামার টুকরা ও রক্তের দাগ ছিল। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে টেলিফোন করিলেন। উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। এই অবস্থায় এখানে সংখ্যালঘুদের আর রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। মানুষের এই চরম দুর্ভোগের অবসান ঘটাইতে হইলে চাই যুদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় ও হাওড়ায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নিরপরাধ মুসলমান নরনারী ও শিশুরা নির্বিচারে নিহত হইল, গৃহ লুণ্ঠিত হইল, যে যেখানে পারিল পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিল। দাঙ্গা কলিকাতা ও হাওড়া হইতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানেও ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কারফিউ জারি করা হইল, পুলিস ও মিলিটারি নামিল। এই সময়ে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি একদিন সন্ধ্যায় ডাঃ রায়ের বাড়িতে আসিয়া তাঁহার পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহা করিলেন এবং হক সাহেবকে অবিলম্বে বরিশাল ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কারণ কলিকাতায় তিনি নিহত হইয়াছেন এই গুজব ছড়াইয়া পড়ায় বরিশালে দাঙ্গার অবস্থা চরমে উঠিয়াছিল। ফজলুল হক দ্রুত বরিশালে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে শান্তি স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

১৯৫০ সালের দাঙ্গায় পুনরায় যে বিপুল জনস্রোত পশ্চিমবঙ্গে আসিল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও প্রশাসন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

এবার কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম বারের তুলনায় বেশি সক্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান পূর্ব পাকিস্তানে আসিলেন এবং উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেন। জওহরলাল নেহরুও এই সাম্প্রদায়িক ও উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য মার্চ মাসে দুইবার কলিকাতায় আসিলেন। তিনি উদ্বাস্তুদের শিবিরগুলি নিজে পরিদর্শন করিলেন এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে অবিলম্বে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

পাকিস্তানের এখন টনক নড়িয়াছিল। ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারই বুঝিয়াছিল যে, শান্তিপূর্ণ ভাবে দুই দেশের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় সম্ভব নহে। আর যদি এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকে, তবে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ। ভারত সরকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দিল্লিতে আমন্ত্রণ করিলেন। ১৯৫০ সালের ২রা এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান সদলবলে দিল্লিতে আসিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। অবশেষে সংখ্যালঘু সমস্যা, বিশেষতঃ দুই বাংলা, ত্রিপুরা ও আসাম সম্পর্কে উভয় সরকার

একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তিই নেহরু লিয়াকত আলি চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তি অনুসারে স্থির হইল, উভয় সরকারই ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে সকল অধিবাসীকেই নাগরিকত্বের অধিকার দিবে, দেশের অসামরিক ও সামরিক সকল চাকরিতে ধর্মনিরপেক্ষভাবে থাকিবে সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার। দুই বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা হইতে আগত সকল শরণার্থীকে দিতে হইবে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং করিতে হইবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বসিবে দুইটি কমিশন। প্রত্যেকটি কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী। তাঁহারা দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় ঘুরিয়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে সাহস ও বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবেন।

নেহরু লিয়াকত আলি চুক্তিতে অনেকে খুশি হইয়াছিলেন, অনেকে ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে গোড়া হইতেই সন্দিহান ছিলেন। এই চুক্তির প্রতিবাদে দুইজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পদত্যাগ করিলেন। নেহরু শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া লইলেন এবং ক্ষিতীশবাবুকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করাইবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষিতীশবাবু পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলেন না। অনেকে আশা করিয়াছিল, এই চুক্তির প্রতিবাদে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভাও পদত্যাগ করিবে। কিন্তু এই চুক্তির বিকল্প যাহা ছিল, তাহা হইল পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যেমন হইয়াছে, তেমনভাবে সম্পূর্ণরূপে সংখ্যালঘু বিনিময় করা বা যেসব উদ্‌বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে পুনর্বাসনের জন্য পাকিস্তানের কাছে কিছু অঞ্চল দাবি করা। বর্তমান অবস্থায় সংখ্যালঘু বিনিময় ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ পূর্ববঙ্গের উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু অঞ্চল দাবি করিলেই তাহা যে বিনা যুদ্ধে আদায় করা যাইবে তাহাও ছিল কল্পনাতীত। পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ বাধাইলে তাহার ফল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভালো হইবে এমন আশা ছিল না। ভারতে মুসলমানের সংখ্যা কম ছিল না। তাহাদের আনুগত্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে, এমন সম্ভাবনাও ছিল। সুতরাং শান্তিপূর্ণভাবে আপোসমীমাংসার মাধ্যমেই ধৈর্যের সহিত এই ভয়ংকর সমস্যার সুরাহা করা ছাড়া যে গত্যন্তর নাই, সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় উভয় সরকারই একমত ছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিল না। বরং ডাঃ রায় এই চুক্তিকে কার্যকর করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই চুক্তির ফলে সাময়িকভাবে কিছু সুফল হইল। পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমন কিছুটা হ্রাস পাইল। বিধানচন্দ্র নিজেও ঢাকা গেলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে যতদূর

সম্ভব ভরসা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন। গোড়ার দিকে এই চুক্তির ফলে কিছু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গেল এবং পূর্ব পাকিস্তান হইতে মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিল। ঐ সময় বড রকমের কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামাও পূর্ব পাকিস্তানে হইল না। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উদ্বাস্তুদের যাতায়াতও চলিতে লাগিল।

ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সবকার নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তিকে আন্তরিক-ভাবেই কার্যকর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে এখান হইতে যেসব মুসলমান চলিযা গিয়াছিল, তাহারা নির্ভয়ে ফিরিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কোনও চেষ্টাই করা হয় নাই, সেরকম ইচ্ছাও তাহাদের ছিল না। তাই আবার দলে দলে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসিতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গেব সরকারী উদ্বাস্তু শিবিরগুলি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল, সরকারকে নূতন নূতন উদ্‌বাস্তু শিবির খুলিতে হইল। শিয়ালদা স্টেশন হাজার হাজার আশ্রয়হীন উদ্বাস্ততে ভরিয়া গেল। মানুষের দুর্দশা যে কোথায় পৌছিয়াছে, তাহা কলিকাতার মানুষ সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। এই সময়ে ভাবত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরা এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সকলেই বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। ভারত সরকারের সংখ্যালঘু মন্ত্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী ডাঃ মালেক, উভয়েই শান্তির আবহাওয়া এবং সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমন ঠেকানো সম্ভব হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী নেহরু পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের অবিরাম আগমনের কারণ সম্পর্কে বলেন, এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের ভাঙিয়া-পড়া অর্থনীতি এবং সাংবাদিকদের সাম্প্রদায়িক সংবাদ ও মন্তব্য প্রচার বিশেষভাবে দায়ী। কারণ যাহাই হউক, ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের আগমনের পরিসংখ্যান সম্পর্কে যে প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছিল. তাহাতে দেখা যায়, ১৯৫০-এর এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আগষ্ট মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তু আসিয়াছে ৪,৬০,৬১৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে মুসলমান গিয়াছে ১,৩৯,৯৯০ জন।

কেবল পূর্ববঙ্গের অর্থনীতিই যে ঐ সময় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহা নহে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিও ভালো ছিল না। তাই রুজি-রোজগার ও অর্থনৈতিক সুযোগের জন্যই যে উদ্বাস্তুরা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা ঠিক নহে। আসলে ছিল পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের নিরাপত্তা ও আস্থার অভাব। ১৯৫০ সালে যেমন একদিকে হঠাৎ উদ্বাস্তুদের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাবও সংকট সৃষ্টি করিয়াছিল। সারা

দেশেই খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল। বিহারে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গে জুলাই মাসের গোড়াতেই প্রায় দুই লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিয়াছিল। ঐ খাদ্যাভাবের মূলে ছিল প্রধান দুইটি কারণ। এক, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন। দুই, পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি পূর্ববঙ্গের পাট হইতে বঞ্চিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে আউশ ধানের জমিতে ব্যাপকহারে পাটচাষের প্রবর্তন। ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মজুত খাদ্য ছিল ছয় সপ্তাহের মতো। উদ্বাস্তুদের জন্য প্রয়োজন ছিল চল্লিশ হাজার টন চাউল। এই অবস্থায় রেশনিং ব্যবস্থা অটুট রাখা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ রেশনিং ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িলে কলিকাতায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। এই অবস্থায় ডাঃ রায় ক্রমাগত কেন্দ্রের কাছে খাদ্যসাহায্য চাহিতেছিলেন এবং খাদ্য-মন্ত্রীকে ঘন ঘন দিল্লি দৌড়াইতে হইতেছিল। চাউলের অভাবই ছিল সর্বাধিক। 'ভেতো' বাঙালীর ভাত না হইলে চলে না; তাই চাউলের উপর চাপ কমাইয়া গম ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীকে পরামর্শও দেওয়া হইতেছিল। গমের সরবরাহও যথেষ্ট ছিল না। এই সময় ডাঃ রায় নিজেও ভাত খাওয়া প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সময়কার বর্ণনা প্রসঙ্গে সরোজ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন: "অমন যার অটুট স্বাস্থ্য সেই ডাঃ রায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের চাপে বেশ শুকিয়ে গিয়েছিলেন সেই সময়। খাদ্য-সংকটের সময় তাঁর খাদ্য-তালিকা থেকে তিনি ভাত উঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভাত খেতেন শুধু রবিবার অথবা বিশেষ কোনও উপলক্ষ ঘটলে। এসব খবর প্রচার লাভ করেনি।"

১৯৫০ সাল নানাদিক হইতেই ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার পক্ষে দুর্বৎসর হইলেও ঐ বৎসর হইতেই প্রদেশ কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন লাভ ডাঃ রায়ের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ঐ বৎসর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন অতুল্য ঘোষ। তিনি হুগলীর গ্রামাঞ্চল হইতে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের অতিশয় ঘনিষ্ঠ ও অনুগত সহকর্মী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহুবার প্রফুল্লবাবুর সহিত জেলও খাটিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মশক্তি ছিল যেমন অসাধারণ, রাজনৈতিক বুদ্ধিও ছিল তেমনি সুতীক্ষ্ণ। তিনি পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নীতিনিয়ামকগণের অন্যতম হইয়াছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং ডাঃ রায়ের কার্যাবলীকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেন। এইভাবে ডাঃ রায়কে সরাইয়া নূতন নেতা নির্বাচন ও নূতন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের আশা চিরতরে নির্মূল হইল। এখন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের খাদি গোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রায় একশত জন কংগ্রেসী কংগ্রেস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি নামে একটি নূতন দল গঠন করিলেন। ইহার কিছুদিন

আগে কংগ্রেস পরিষদীয় সম্পাদক হেমন্তকুমার বসু কংগ্রেস এম. এল. এ. পদে ইস্তফা দিয়া কংগ্রেস হইতে বাহিরে গেলেন এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি সর্বভারতীয় দল গঠন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ডাঃ রায় তাঁহার একটি অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্মীকেও হারাইলেন। ইনি ভারতের 'লৌহমানব' বলিয়া পরিচিত ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। প্যাটেলের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়াই ডাঃ রায় কলিকাতা হইতে ঔষধ সঙ্গে লইয়া বিমানযোগে দিল্লিতে পৌছিলেন। তিনি প্যাটেলকে দেখিয়া তাঁহার কলিকাতা হইতে আনা ঔষধ দিলেন এবং প্যাটেলের চিকিৎসক ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থাপত্র দিলেন। ডাঃ রায়ের ঔষধে কাজ হইল, সেদিন প্যাটেল ভালোভাবে ঘুমাইলেন এবং কিছুটা সুস্থবোধ করিলেন। ডাঃ রায় বলিলেন, দিল্লির ঠাণ্ডা আবহাওয়া রোগীর পক্ষে ভালো নয়। তাঁহাকে বোম্বাইয়েব অনুকূল আবহাওয়ায় লইয়া যাওয়া হউক। তাঁহার পরামর্শমতো প্যাটেলকে বোম্বাই লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ প্রচণ্ড হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৫০) তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন না থাকায় ডাঃ রায়কে যে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, কেন্দ্রেও জওহরলাল নেহরু সেইরূপ একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী যে উদার অসাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন, কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতাদেব প্রাধান্য থাকায় তাহা নির্বিবাদে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৫০ সালে নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন লইয়া কংগ্রেস নেতাদের উর্ধ্বতন মহলে মতবিরোধ বাধিয়াছিল। সর্দার প্যাটেল সমর্থন করিতেছিলেন পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে। কিন্তু নেহরু তাহা পছন্দ করিতেছিলেন না, কারণ ট্যাণ্ডন ছিলেন দক্ষিণপন্থী। ট্যাণ্ডন কংগ্রেসের সভাপতি হইলে স্বভাবতই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিও দক্ষিণপন্থী হইবে। তখন নেহরুর পক্ষে নির্বিবাদে কাজ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেহরুই বিজয়ী হন এবং নেহরুই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ফলে কেন্দ্রে কংগ্রেসেব নীতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যে মতানৈক্যের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। ঐ সময়ে কেন্দ্রে একদল কংগ্রেসী একটি বিরোধী গোষ্ঠী গড়িয়া তুলেন। তবে তাহারা সরাসরি কংগ্রেস ত্যাগ করেন নাই। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিতেছিলেন আচার্য কৃপালনী।

১৯৫১ সালের বাজেট অধিবেশন শুরু হইল একটি পরিবর্তিত পরিবেশে। ঐসময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন পাইলেও মন্ত্রিসভাকে বিধানসভায় একটি শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের সম্মুখীন হইল। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আটজন এম. এল. এ. কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি নামে বিরোধী পক্ষে বসিলেন। এ

পর্যন্ত কয়জন মুসলিম লীগ সদস্য এবং দুইজন কমিউনিস্ট সদস্য—জ্যোতি বসু ও রতন লাল ব্রাহ্মণ—বিরোধী পক্ষে বসিতেন। এখন বিরোধী দলের সদস্য-সংখ্যা হইল ১৯ জন। কিন্তু সংখ্যা কিছুই নহে, এখন বিরোধী পক্ষে এমন সব ব্যক্তি বসিলেন, যাঁহারা একদা কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহাদের জীবন বহু সংগ্রাম ও ত্যাগস্বীকারের অতীত গৌরবে মণ্ডিত। অন্যপক্ষে, ডাঃ রায় তাঁহার দুইজন সুদক্ষ সহকর্মীর সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিরণশঙ্কর রায় মারা গিয়েছিলেন এবং নলিনীরঞ্জন সরকার পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইল। বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপাল যে ভাষণ দিলেন, তাহাতে বলা হইল, যে ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১২ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছে। ২৩ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ১২ লক্ষকে সম্পূর্ণ পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সরকার দাবি করিলেন। অবশ্য, ইহাও স্বীকার্য যে, তখন সরকারী হিসাবমতোই ১১ লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পায় নাই। দশ-বারো লক্ষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন ও কর্মহীন মানুষ যে একটি রাজ্যের পক্ষে ভয়ংকর বোঝাস্বরূপ তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ যে সামান্য সুযোগেই রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। হইয়াছিল-ও তাহাই। বিরোধীরা এখন এই অসহায় মানুষগুলিকেই তাঁহাদের রাজনীতির দাবা-খেলার প্রধান খুঁটি করিয়া ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়াছিলেন। অথচ ডাঃ রায় এই মানুষগুলির ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আর কেহ করেন নাই।

উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষের সুযোগে তাহাদিগকে নিজ নিজ দলে টানিয়া নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতে-ছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে উদ্বাস্তুদের অপরের জমি জবর দখল করিয়া তাহাতে বসবাস করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিল। এইভাবে বহু জবর-দখল কলোনি গড়িয়া উঠিল। সরকার ভূমি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আইন অনুসারে যে জমি অধিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহাতেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু জমির মালিকরা আদালতের ইঞ্জাংশনের সাহায্যে সরকারের সেই প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিতেছিল। এই অবস্থায় জোর করিয়া জমি দখলের আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার সুযোগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি পাইয়া গেল। এখন কমিউনিস্টরাও এই সুযোগ কাজে লাগাইতে লাগিল। এককালে যাঁহারা কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচক ছিলেন, সেই

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মতো লোকেরাও এই কাজে কমিউনিস্টদের সহিত হাত মিলাইলেন। কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. সি. পি. আই.(সৌম্যেন ঠাকুর গোষ্ঠি) প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি ও কমিউনিস্টরা মিলিতভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিল। সরকার এইভাবে জমি-দখলের বিরোধী ছিলেন। তাই জবর-দখলকারীদের হটাইবার জন্য বিধানসভায় সরকার 'অননুমোদিত ব্যক্তিদের উচ্ছেদ বিল' আনিলেন। ঐ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের বিরাট এক মিছিল বিধানসভার উদ্দেশ্যে অভিযান করিল। ১৪৪ ধারা অমান্য করায় ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লীলা রায়, সৌম্যেন ঠাকুর প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হইল। কয়েক ঘণ্টা পরেই অবশ্য তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ডাঃ রায় ও তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কলিকাতা শহরে উদ্বাস্তুদের লইয়া এইরূপ আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেও ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও চাকুরিদান, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব দূরীকরণ এবং পশ্চিমবঙ্গের সঠিক উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা বহু পূর্ব হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ময়ূরাক্ষী প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হইয়াছিল। ১৯৫১ সালের ৩০শে জুলাই তিনি এই প্রকল্পের তিলপাড়া বাঁধ ও সেচখালগুলির উদ্বোধন করিলেন। ১৫০ মাইলব্যাপী খালগুলিতে জলের স্রোত প্রবাহিত হইল। এইভাবে এক সুবিশাল অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা করিয়া তিনি কৃষির উন্নতি ঘটাইয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব দূরীকরণের একটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ ঘটাইলেন। বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও এই প্রকল্পের মধ্যে ছিল।

কলিকাতা শহরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র থাকিবার সময়ে কলিকাতা হইতে খাটালগুলি তুলিয়া দেওয়ার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। ডাঃ রায়েরও ঐ চিন্তা ছিল বহুদিন হইতেই। কলিকাতায় দুধ সরবরাহের সমস্যাও ছিল। তাই ডাঃ রায় ১৯৪৯-৫০ সালে নদীয়া জেলায় হরিণঘাটা গ্রামে একটি ডেয়ারি স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ঐ সময়ে একটি ছোট ডেয়ারি স্থাপন করা হয়। তখন ঐ ডেয়ারি হইতে দৈনিক ২০০ লিটার দুধ সরবরাহ করা হইত। এই হরিণঘাটাতেই কয়েক বছর পরে বিধানচন্দ্র একটি সুবৃহৎ দুগ্ধ প্রকল্প রূপায়িত করেন। বিধানচন্দ্র এই সময় দুর্গাপুরেও একটি কোক কয়লা উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রকল্পকে পরবর্তী কালের পশ্চিমবঙ্গের 'রুর' (Rhur) নামে পরিচিত দুর্গাপুর শিল্পনগরীর অঙ্কুর বলা চলে।

পূর্ববঙ্গ হইতে যেসব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের কর্ম সংস্থানের জন্য ডাঃ রায় নানাভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। বাংলাদেশের মাঝিমাল্লা ও নাবিকদের

কাজে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাই ছিল সুপটু এবং পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ কলিকাতা বন্দরে তাহারা বিপুল সংখ্যায় কাজ করিত। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং দেশবিভাগের ফলে ঐ সকল মুসলমান মাঝিমাল্লা ও নাবিকরা পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গে এবং কলিকাতা বন্দরে এখন মাঝিমাল্লা ও নাবিকের অভাব দেখা দিয়াছিল। ডাঃ রায় এই সমস্যা সমাধানের জন্য হিন্দু তরুণদের নাবিকবৃত্তিতে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে একটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালেই এখানে ১০০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে এবং তাহাদের মধ্যে ৬১ জন উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরিতে বহাল হয়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ডাঃ রায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং সেগুলিকে দ্রুত রূপায়িত করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে যথাসম্ভব দ্রুত দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। তাই তাঁহাকে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না।

এই সময়কার পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তরে ডাঃ রায় লিখিয়াছিলেন :

"...এই প্রদেশে, তুমি জানো, আমাদের শুধু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নই বিদ্যমান নাই, রহিয়াছে উদ্বাস্তুদের প্রশ্ন। তাহারা আসিতেছে এক ধরনের উত্তেজনা লইয়া, আর সেই সুযোগ লইয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার প্রচার চালাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ব্যবহার করিতেছে।

আমাদের শুধু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর সমস্যাই নাই। এই প্রদেশে আজ অবাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা প্রায় পঁচিশ বা তাহারও বেশী। আমাদের শুধু কমিউনিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সমস্যাই নাই, ইহারা এখন উভয়েই খুবই সক্রিয়। আমাদের প্রদেশে রহিয়াছে বড়ো সংখ্যার একদল পাকাপোক্ত পুরাতন কংগ্রেসকর্মীর সমস্যা যাহারা চূড়ান্ত ভাবে কংগ্রেস ছাড়িয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারকে উচ্ছেদ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ইহা ছাড়া রহিয়াছে এমন সব এলাকা যেখানে তামিলী সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা খুব বেশি। ইহাদের অনেকেই এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগিতেছে এবং এই বলিয়া অভিযোগ করিতেছে যে, তাহাদের যতখানি প্রাপ্য ততখানি কংগ্রেস দিতেছে না। কিন্তু এসব সমস্যাকে ছাপাইয়া যে সমস্যা সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা হইল এই প্রদেশে বহাল-তবিয়তে থাকা গুণ্ডার দল। ইহারা যে সবসময় কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে এমন নয়, ইহারা শুধু খারাপ পরিস্থিতির সুযোগ লইবার অপেক্ষায় থাকে এবং বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে।"

বিধানচন্দ্র এখন হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে সমস্যাটি সর্বাধিক ভয়ংকর বলিয়া

ভাবিয়াছিলেন, সেই সমস্যা আজ আরও ভয়াবহ রূপ লইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার সময়ে গুণ্ডার দল মহল্লায় মহল্লায় বীরের সম্মান লাভ করিয়াছিল। পরে ঐ শ্রেণী ক্রমেই পুষ্ট হইয়াছে এবং দারিদ্র্য ও তীব্র বেকার সমস্যার ফলে বহু বুদ্ধিমান তরুণ পথভ্রষ্ট হইয়া ঐ শ্রেণীতে যোগ দিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলিও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। এইভাবে বর্তমানে সমাজ-জীবনে একপ্রকার মস্তান-তন্ত্র দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা বহুগুণে বিঘ্নিত হইতেছে। ডাঃ রায়ের মতো পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নেতারা যদি ইহাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় না দিয়া বা ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা না করিয়া ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকিতেন, তবে নিশ্চয় দেশের অবস্থা আজ এইরূপ হইত না।

যাহাই হউক, এইসকল সমস্যার মধ্যেও ডাঃ রায় আপনার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি ও সততা দিয়া পশ্চিমবঙ্গকে দ্রুত উন্নতির পথে লইয়া যাইতে এবং তদ্দ্বারা কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে সতত সচেষ্ট রহিলেন। ডাঃ রায় যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

নূতন সংবিধান অনুসারে বয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে ১৯৫২ সালের গোড়াতে নির্বাচন হইল। ঐ সময়ে একদিনে ভোটগ্রহণ হইত না। নূতন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল ১৯৫২ সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কলিকাতায় ভোটগ্রহণ হইয়াছিল ২২শে জানুয়ারি। কলিকাতায় সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বৌবাজার নির্বাচনকেন্দ্রের উপর। কারণ, ঐ কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন ডাঃ রায় নিজে। তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন বামপন্থী দলগুলির সমর্থনে ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট)-মনোনীত প্রার্থী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছিল সরাসরি। ডাঃ রায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষের সহিত সারা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচার চালাইয়া ঘুরিতেছিলেন। তাই নিজ কেন্দ্রের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু নির্বাচনের তিনদিন আগে তিনি নিজে পথে নামিয়া বস্তিতে বস্তিতে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরিয়া ভোটদাতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহাতে ডাঃ রায়ের প্রতি ভোটদাতাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা যেমন বাড়িয়া যায়, তেমনি তাহারা আত্মপ্রসাদও লাভ করে। তথাপি এই কেন্দ্রে বিরোধী দলগুলি তাহাদের মিলিত শক্তি নিয়োগ করায় জয়-পরাজয় যথেষ্ট অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। ২৮শে জানুয়ারি বৌবাজার কেন্দ্রের ভোটগণনার সময়ে উভয়পক্ষের মধ্যে এই অনিশ্চয়তার ভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। যদি ডাঃ রায় পরাজিত হন, তবে বিশৃঙ্খল জনতার যে তাণ্ডব কলিকাতায় শুরু হইবে, সেকথা ভাবিয়া অনেকে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। শান্তি-রক্ষার

জন্য অশ্বারোহী পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হইল। সেনাবাহিনীকেও প্রস্তুত থাকিতে বলা হইল। ভোটগণনায় গোড়ার দিকে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। কখনও ডাঃ রায় অগ্রসর হন, কখনও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যপ্রিয়বাবু অগ্রসর হন। প্রতি মুহূর্তে খবরে ও গুজবে উত্তেজনা বাড়িতে থাকে। অবশেষে ডাঃ রায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলিয়া যথেষ্ট ব্যবধানে আগাইয়া যান। ভোটগণনা-শেষে দেখা যায় ডাঃ রায় ৪,১১১ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল যখন ঘোষিত হইল, তখন দেখা গেল কংগ্রেস ২৩৮টি আসনের মধ্যে ১৪১টি আসন পাইয়াছে। কিন্তু দেখা গেল বড় বড় সাতজন মন্ত্রী—প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ভূপতি মজুমদার, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও বিমলচন্দ্র সিংহ—পরাজিত হইয়াছেন। মন্ত্রীদের মধ্যে ডাঃ রায় নিজে এবং হেমচন্দ্র নস্কর, যাদবেন্দ্র পাঁজা ও শ্যামাপদ বর্মন নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহা ছিল কংগ্রেসের উপর এক বিরাট আঘাত।

ডাঃ রায় পরাজিত মন্ত্রীদের লইয়াই মন্ত্রিসভার কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ ছিল, পরাজিত মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভায় ফিরাইয়া আনা চলিবে না, বিধান পরিষদের সদস্য করিয়াও নয়, উপনির্বাচনে জিতাইয়াও নয়। পশ্চিমবঙ্গে ঐ সময় আইনসভায় তুইটি পরিষদ ছিল—বিধানসভা ও বিধান পরিষদ (উচ্চতর পরিষদ)। এই নির্দেশের ফলে ডাঃ রায় খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্রে জানাইলেন, "নির্বাচনে আমার মন্ত্রী সাতজন পরাজিত হইয়াছেন। অন্য পাঁচজনের কথা আমি ভাবিতেছি না, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখার্জি আমার মন্ত্রিসভার কেবল অতি প্রয়োজনীয় সদস্যই নন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগ সম্পর্কে অসামান্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। পরের নির্বাচনে প্রার্থী হইলে অন্যরা ফিরিয়া না আসিলেও ইঁহারা তুইজন যে ফিরিয়া আসিবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। বিধানসভায় এমন কেহ আছেন বলিয়া আমি জানি না, যাঁহারা ইঁহাদের শূন্য স্থান পূরণ করিতে পারেন। যদিও জানি, এই প্রস্তাবে সমালোচনার ঝড় উঠিবে, তাহা হইলেও পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি, তাহাতে ইঁহাদের তুইজনকে আমার মন্ত্রিসভায় রাখা দরকার। অবশ্য যদি বাস্তবে তাহা সম্ভবপর হয়।"

ডাঃ রায়ের এই চেষ্টার কথা জানিতে পারিয়া সংবাদপত্রগুলি সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিল। প্রধানমন্ত্রীও জানাইলেন ইহাতে জনমত অনুকূল হইবে না। তাহা সত্ত্বেও ডাঃ রায় তাঁহার অভিমত প্রধানমন্ত্রীকে বুঝাইতে সক্ষম হইলেন এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়কে বিধান পরিষদের সদস্য করিয়া নূতন মন্ত্রিসভায় আনিলেন। ডাঃ রায় নির্বাচনের প্রায় সাড়ে চার মাস বাদে তাঁহার মন্ত্রিসভা

গঠন করিলেন (১১ই জুন, ১৯৫২)। আগের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী ছিলেন ১৩ জন, এবার হইলেন ১৪ জন। সেই সঙ্গে ডাঃ রায় ১৬ জন উপমন্ত্রী লইলেন। পূর্বে উপমন্ত্রী বলিয়া কিছু ছিল না। ইহা নূতন ব্যবস্থা। ডাঃ রায় বলিলেন, যে বিরাট উন্নয়নমূলক কাজ-গুলিতে হাত দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে গতি সঞ্চার করিতে হইলে তরুণতর জনপ্রতি-নিধিদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। এইভাবেই ইহারাও প্রশাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবেন।

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর বিধানসভায় বিরোধী দল পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছিল সত্য,—জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতির মতো জনপ্রিয় নেতারা বিধানসভায় বিরোধীপক্ষে ছিলেন—কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের এবং জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন পাইয়া ডাঃ রায় নবোদ্যমে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি একের পর এক দ্রুত রূপায়ণে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি প্রকল্প রচনা করেন। এগুলির মধ্যে গ্রামীণ শহর (Village Township) প্রকল্প একটি। ১৯৫২ সালেই ডাঃ রায় কলিকাতায় একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপনের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। গঙ্গার মুখে এমন কোনও জায়গায় ঐ শোধনাগার স্থাপন করা যাইতে পারে যেখানে তৈলবাহী জাহাজ যাতায়াতের সুবিধা থাকিবে। ডাঃ রায় প্রধান মন্ত্রীকে বুঝাইয়াছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-শোধনের জন্য বোম্বাই বা অন্যত্র ব্যবস্থা থাকুক, কিন্তু ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত অশোধিত তৈলের জন্য একটি তৈল শোধনাগার কলিকাতা বা তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থাপন করা হউক। উহাতে কেবল তৈল আনয়নের ব্যয়ই কমিবে না, উহাতে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাসও পাওয়া যাইবে। কলিকাতার আশেপাশে আরও বহু রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিবে। রাজ্যের বেকার সমস্যারও সমাধান কিছুটা হইবে। ঐ সময়ে ডাঃ রায় ভাবেন মেদিনীপুর জেলার গেঁওয়াখালিতে, যেখানে রূপনারায়ণ ও হুগলী নদী মিশিয়াছে, একটি কলিকাতার সহ-বন্দর স্থাপনের কথা। ঐ সময়ে কলিকাতা বন্দরের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, সাত হাজার টনের বেশী কোনও জাহাজ কলিকাতায় আসিতে পারিত না। কলিকাতা আসিতে হইলে জাহাজগুলিকে ভিজগাপত্তম্ বন্দরে মালের বোঝা কমাইয়া তবে কলিকাতায় আসিতে হইত। গেঁওয়াখালির মুখে একটি সহ-বন্দর স্থাপিত হইলে কলিকাতা বন্দরের ঐ সমস্যা থাকিবে না। গেঁওয়াখালি হইতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কোলাঘাট স্টেশনের সহিত রেলপথে সংযোগ স্থাপন করিলে মাল দেওয়া-নেওয়ারও সুবিধা হইবে। এই চিন্তা হইতেই পরে শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত এম. পি.-এর চেষ্টায় গেঁওয়াখালির দক্ষিণে হুগলী ও হলদি নদীর মুখে হলদিয়া বন্দরের উদ্ভব হয়। হুগলী নদী ও কলিকাতা বন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করিবার পরিকল্পনাও এই সময়ে

ডাঃ রায়ের মাথায় আসে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠিতে জানান যে, মুর্শিদাবাদ জেলার মাথার উপরে একটি জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করিয়া গঙ্গার জল ভাগীরথীর খাতে অধিকতর পরিমাণে প্রবাহিত করিলে (গঙ্গার জলধারার অধিকাংশই পদ্মায় চলিয়া যাইতেছিল) হুগলী নদীর প্রবাহ বাড়িবে, তাহাতে হুগলী নদী ক্রমাগত পলি পড়ার হাত হইতে বাঁচিবে এবং পুনরুজ্জীবিত হইবে। হুগলী নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাইলে কলিকাতা বন্দরও সুনাব্য হইয়া উঠিবে। আজ যে হলদিয়া বন্দর ও শোধনাগার এবং ফরাক্কা বাঁধ গড়িয়া উঠিযাছে তাহার সূচনা করিয়াছিলেন ডাঃ রায় ১৯৫২ সালে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ঐ সময় ছিল ছিন্নমস্তা অবস্থা। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও মালদহের কোনও যোগাযোগ ছিল না। ইহা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ছিল। ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে ডাঃ রায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া বলিলেন যে বিহারের কিছু বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আসা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনৈক কংগ্রেস-সদস্য-আনীত প্রস্তাব বিধানসভায় পাস হইয়া গিয়াছে। সাঁওতাল পরগনারও কিছু অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে আসা উচিত, যে অঞ্চলের মানুষের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাপনের ধরন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সহিত খাপ খায় এবং সেইজন্য সেখানে তাহাদিগকে সহজেই পুনর্বাসিত করা যাইতে পারে। ইহার ফলে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত বিরোধ দেখা দেয় এবং ইহাতে প্রধানমন্ত্রী অসন্তুষ্ট-ও হন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই দাবি যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শেষ পর্যন্ত এই দাবি কেন্দ্রীয় ও বিহার সরকারকে মানিতে হইয়াছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ তাহার বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা ঘোষণা করিবার পরই ডাঃ রায় ভিয়েনার বিখ্যাত ডাক্তার লিওনারকে দিয়া তাঁহার চোখের ছানি কাটাইবার জন্য ১৬ই আগস্ট (১৯৫২) ইউরোপ যাত্রা করেন। এবার ডাঃ রায় প্রায় আড়াই মাস ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকিয়া দেশে ফিরেন। তিনি তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অনেকখানি ফিরিয়া পান। ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকার সময়েও তিনি পশ্চিমবঙ্গের নানা উন্নয়ন বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। কলিকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর উন্নতিসাধন, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীজাত গ্যাসের উৎপাদন, কয়লা হইতে পিচ ও পিচ-জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য কারখানা, এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে খোঁজখবর লন।

১৯৫৩ সালটি নানা কারণেই স্মরণীয়। ঐ বৎসরের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারের যেসব কৃতিত্ব ও করণীয়ের উল্লেখ করেন, সেগুলির মধ্যে ছিল পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপের বিল, পশ্চিমবঙ্গ সিকিউরিটি বিল, সিটি

সিভিল কোর্ট ও সিটি সেসন কোর্ট গঠনের জন্য বিল। আর ছিল সাতটি উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি ছিল সমষ্টি উন্নয়নের পরিকল্পনাকে কার্যকর করার পদক্ষেপ। গ্রামীণ শহর গঠনের কথা ডাঃ রায় অনেকদিন হইতেই ভাবিতেছিলেন। একশতখানি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে এক-একটি গ্রামীণ শহর। আর ঐ একশতখানি গ্রাম লইয়া হইবে এক-একটি ব্লক। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পশুপালন, মৎস্যপালন, পথ-ঘাট, শিক্ষাদি সকল বিষয়েই গ্রামাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির এক-একটি একক রূপে এই ব্লকগুলি গঠিত হইবে। এই গ্রামীণ নগর বা ব্লকগুলির পূর্ণ রূপায়ণ হইলে কেবল গ্রামাঞ্চলের উন্নতিই হইবে না, বহু শিক্ষিত যুবক ঐগুলিতে চাকরি পাইবে, বহু গ্রামীণ মানুষের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা হইবে, গ্রামাঞ্চলের হইবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি। এই সমষ্টি উন্নয়নের ব্যবস্থা যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলকে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্যান্য প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের সন্নিহিত তেইশ হাজার একরেরও বেশি জমি লইয়া গঠিত একটি জলনিকাশী প্রকল্প। উহা সোনারপুর-আরা-পাঁচমাতলা জলনিকাশী প্রকল্প নামে পরিচিত। এই প্রকল্পটি কার্যকর না হইলে কলিকাতার কিছু অংশ জলের তলায় তলাইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। অন্য একটি প্রকল্প ছিল কলিকাতার পূর্বদিকস্থ লবণহ্রদের জমি উদ্ধার করিয়া শহর সম্প্রসারণ করা এবং শহরের ভিড় হ্রাস করা। ঐ প্রকল্প অনুসারেই হুগলি নদীর পলিমাটি পাম্প করিয়া লইয়া গিয়া লবণহ্রদ বুজাইয়া তাহাতে বাসোপযোগী স্থান সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আধুনিকতম পদ্ধতিতে বিল ভরাইয়া বাসোপযোগী স্থান তৈয়ারী করাও ডাঃ রায়ের আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়।

১৯৫৩ সালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি বিলোপের জন্য সরকারী ব্যবস্থাগ্রহণ। একশ' ষাট বছর আগে গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এদেশে যে জমিদারি-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তাই দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কুখ্যাত জমিদারি-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছিল দেশে। বহু মানুষ এই আন্দোলনের সময়ে জীবন দিয়াছিল, অশেষ নির্যাতন উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছিল। অবশেষে বিধানচন্দ্রই প্রথম এদেশে এ বিষয়ে একটি বলিষ্ঠ ও নির্ভীক পদক্ষেপ লইলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তিনি পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট্স্ অ্যাকুইজিশন বিল পাস করিয়া জমিদারি প্রথা বিলোপের ব্যবস্থা করিলেন। এই আইনের দ্বারা জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বত্ব বিলোপ করিয়া ক্ষতিপূরণ দিয়া সম্পত্তি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করা হইল। মধ্যস্বত্বভোগীরা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত খাস জমি রাখিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে সরকারের অধীনে

সরাসরি প্রজা বলিয়া গণ্য করা হইবে। ভূগর্ভের খনি-সংক্রান্ত স্বত্বও জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ হইতে অধিগ্রহণ করা হইবে। সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা কয়েকটি কিস্তিতে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হইবে। অল্প পরিমাণ জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সম্পত্তির মোট বাৎসরিক আয়ের পনের গুণ এবং অধিক পরিমাণ জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সম্পত্তির মোট বাৎসরিক আয়ের চারিগুণ টাকা।

এই আইন অনুসারে সমস্ত জমিতে আসিবে রাজ্যের অধিকার, মধ্যবর্তী কোনো রাজস্ব-আদায়কারী থাকবে না। এই আইনের পরিপূরকভাবে একটি ভূমিসংস্কার আইন-ও করা হইবে।

এই জমিদারি-প্রথা বিলোপ আইনের দ্বারা জমিদারদের আয় বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইল। ফলে জমিদারদের প্রাসাদোপম বহু অট্টালিকা সংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। অনেক জমিদার তাঁহাদের বড় বড় অট্টালিকা বিক্রয় করিলেন, অনেকে দাতব্যকার্যে দান করিলেন। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের জন্য বহু অট্টালিকা সরকার ক্রয় করিলেন।

ঐ বৎসর ১লা জুন নিউজিল্যাণ্ডের স্যার এডমণ্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে প্রথম এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া কীর্তিস্থাপন করিলেন। এ বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া ডাঃ রায় একটি পর্বতারোহণ শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিংয়ে পর্বতারোহণ শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত লইলেন। বিধানচন্দ্র ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৫৩) একটি পত্রে প্রধান মন্ত্রী জহওরলাল নেহরুর নিকট এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাহাতে ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে তেনজিংকে অধ্যক্ষ করিয়া হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থা) খুলিবার কথা বলা হইল। এইভাবেই হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষণ-কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা ঘটিল।

এই বৎসরেই তিনি দিল্লীতে বঙ্গ-ভবনেরও সূচনা করেন। রাজধানী দিল্লীতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা ও অফিসাররা থাকিবার বড়ো অসুবিধা বোধ করিতেন। ডাঃ রায় একটি অভিজাত পরিবারের বাড়ি বিক্রয় হইবে সংবাদ পাইয়া তাহা কিনিবার ব্যবস্থা করিলেন। এজন্য বিরোধীরা তো বটেই, এমন কি অনেক কংগ্রেসীও তাঁহার সমালোচনা করেন এবং বলেন, সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা এইভাবে অপব্যয় করা হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ রায় তাঁহাদের সমালোচনায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, মন্ত্রী ও অফিসারদের কাছ হইতে কাজ চাহিব, কিন্তু তাহাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিব না, ইহা হইতে পারে না। আমাদের লোক দিল্লীতে আশ্রয়ের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা আমি হইতে দিব না। তখন দিল্লীতে অন্য কোন

রাজ্যের ঐরূপ নিজস্ব ভবন ছিল না। ইহার দেখাদেখি অনেকগুলি রাজ্য নিজস্ব ভবনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। আজ বঙ্গভবন বাঙ্গালীদের একটি মিলনক্ষেত্র ও গর্বের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ রায়ের অনেক কীর্তির মতো এটিকেও একটি কীর্তি বলা চলে।

ডাঃ রায়কে ১৯৫৩ সালেও কিছু ঝুট-ঝামেলা পোহাইতে হইয়াছিল। ঐ বৎসর জুলাই মাসে ট্রাম কোম্পানি হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীভাড়া এক পয়সা বাড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। দরিদ্র মানুষের পকেটে এইভাবে হাত দেওয়া অনেকেই পছন্দ করিলেন না। ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। তাহার সভাপতি হইলেন ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই আন্দোলনের পুরোভাগে রহিলেন কমিউনিস্টরা ও বামপন্থীরা। ডাঃ রায় ভাড়াবৃদ্ধির সমর্থনে বলিলেন যে, সারা দেশের মধ্যে কলিকাতার ট্রামভাড়াই সবচেয়ে কম। আর এক পয়সা ভাড়া বাড়াইবার ফলে ট্রাম কোম্পানির যে লাভ হইবে, তাহাতে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার যখন ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ করিবে, তখন তাহাকে কম ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার এই যুক্তিতে কেহ কর্ণপাত করিল না। ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি ঘোষণা করিলেন, বাড়তি ভাড়া কেহ দিবেন না। এজন্য তাঁহারা পিকেটিংও শুরু করিলেন। আন্দোলন বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিল। উত্তেজনাও ক্রমেই বাড়িল। ৩রা জুলাই জ্যোতি বসু সহ চারজন এম. এল. এ. গ্রেপ্তার বরণ করিলেন। আন্দোলন ক্রমেই হিংসাত্মক হইয়া উঠিল, পটকা ছোঁড়া হইতে ট্রাম জ্বালানো পর্যন্ত ঘটিল।

এই সময়ে ডাঃ রায়ের ডান চক্ষু অপারেশনের জন্য ইউরোপ যাওয়ার কথা ছিল। তাঁহার চক্ষু অপারেশন হইবে ২৩শে জুলাই। তাই তিনি আন্দোলন সম্পর্কে সকল ব্যবস্থা করিবার ভার অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও পুলিস মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জীর হাতে দিয়া ৫ই জুলাই ইউরোপ রওনা হইয়া গেলেন। তিনি যেদিন রওনা হইলেন, সেদিনও কলিকাতা আদৌ শান্ত ছিল না।

ট্রামভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ লইলেন। ৯ই জুলাই তাঁহারা হরতাল ঘোষণা করিলেন। সমস্ত কলিকাতা অশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। ট্রাম বাস তো চলিতে দেওয়া হইলই না, উপরন্তু ট্রেনগুলিকে পর্যন্ত আটকানো হইল এবং অনেকক্ষেত্রে ট্রেনে আগুনও দেওয়া হইল। ঘটনা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিল। শান্তি-শৃঙ্খলার অবস্থার এতোই অবনতি হইল যে, শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু মিলিটারির সাহায্যও লইতে হইল। ইহাতে জনতার উত্তেজনা বাড়িল বই কমিল না। ইহার উপর পুলিস মন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একটি প্রকাশ্য মন্তব্য করিয়া বলিলেন—"শক্তি দিয়া শক্তির মোকাবিলা করিতে সরকার বদ্ধপরিকর।" ইহাতে আগুনে ঘৃতাহুতি হইল। ১৭ই জুলাই দক্ষিণ কলিকাতার এক বিরাট এলাকা উচ্ছৃঙ্খল জনতার নিয়ন্ত্রণে চলিয়া গেল।

পুলিস ছ রাউণ্ড গুলি চালাইল। অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী এবার কিছুটা নমনীয় ভাব অবলম্বন করিলেন এবং পরদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ট্রাম কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সম্পর্কে একটি ট্রাইবুন্যাল বসাইতে এবং আপাততঃ বর্ধিত ভাড়া আদায় স্থগিত রাখিতে বলিলেন। ট্রাম কোম্পানি ইহাতে সম্মত হইল।

কিন্তু সরকার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিলেন না বা আন্দোলনের কালে ধৃত সকল লোককে মুক্তি দিলেন না। বিরোধীরা একটা ব্যাপারে জয়ী হইয়াছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারা তাঁহাদের দাবিতে অনড় রহিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, যতদিন ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত এবং ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া না হইতেছে, ততদিন তাঁহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন।

পরদিন বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় ৩০০ লোক ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া কলিকাতা মনুমেণ্টের (বর্তমান শহীদ মিনারের) তলায় সমবেত হইল। নতি স্বীকার করায় সরকারের মেজাজ ভালো ছিল না। পুলিসও কয়েকদিন যাবৎ জনতার সহিত লড়াই চালাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দেখা গেল, আইন-অমান্যকারীরা সমবেত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লরিবোঝাই পুলিস আসিয়া পৌঁছিল এবং সমবেত লোকদের উপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ শুরু করিল। যে যেদিকে পারিল পলাইল। অনেককে ধরিয়া ভ্যানে তোলা হইল। সাংবাদিকরা যখন এই সভার বিবরণ লিখিতেছিলেন ও ফটো তুলিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের উপরও পুলিস হামলা চালাইল। ১৮ জন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার আহত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করিতে হইল। ৬ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

সাংবাদিকদের উপর হামলার কথা শুনিয়া পুলিস মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জী নিজে লাল-বাজারে গিয়া ধৃত সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শুশ্রূষার ও চিকিৎসার পর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পরদিন কাগজে কাগজে সাংবাদিকদের উপর বর্বর আক্রমণের সংবাদ বাহির হইল, ছবি ছাপা হইল এবং গরম গরম সম্পাদকীয় লেখা হইল। ইহাতে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইল। মন্ত্রীরা ভয় পাইয়া গেলেন। সরকার ২৩শে জুলাই ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। সাংবাদিকদের উপর হামলার তদন্ত করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ করিলেন।

ভিয়েনায় ২৩শে জুলাই ডাঃ রায়ের চোখ অপারেশনের কথা ছিল। তাহা আর হইল না। তিনি কলিকাতায় এই ডামাডোলের সংবাদ পাইয়া প্রথম বিমানেই কলিকাতা রওনা হইলেন। কলিকাতা পৌঁছিয়াই ডাঃ রায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকিয়া ঘোষণা করিলেন যে, বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটি একজনের কমিশন

গঠিত হইবে। ঐ কমিশন ট্রামের ভাড়ার কাঠামো সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করিয়া দেখিবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়বৃদ্ধির যৌক্তিকতা আছে কিনা বিচার করিবেন। তিনি সাংবাদিকদের উপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ সম্পর্কেও তদন্ত করিবেন।

তিনি কলিকাতার প্রধান কয়েকটি সংবাদপত্রের মালিকের—আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও অমৃতবাজার পত্রিকার তুষারকান্তি ঘোষের সহিত গোপনে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহাদের শান্ত করিলেন। ফলে দেখা গেল, ঐ পত্রিকাগুলি সরকারের সম্পর্কে তাহাদের বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করিয়াছে। তিনি আন্দোলনের নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমন্তকুমার বসুর সহিতও আলোচনা করিলেন। ডাঃ রায় আন্দোলনকালে যাঁহারা হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। আন্দোলনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক ধৃত হইয়াছিল। নেতারা আন্দোলন বন্ধ করিলেন। এইভাবে 'এক পয়সার লড়াই' শেষ হইল।

কলিকাতাকে একটি পরিচ্ছন্ন নগরীতে পরিণত করার স্বপ্ন ছিল ডাঃ রায়ের চিরকালের। এর অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল খাটালগুলি। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন যখন কলিকাতার মেয়র ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহারা চিন্তা-ভাবনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতা মহানগরীকে দুধ সরবরাহ করিত এই খাটালগুলি। তাই একটি বিকল্প পরিকল্পনা ছাড়া খাটালগুলি তুলিয়া দেওয়াও সম্ভব ছিল না। ডাঃ রায় বোম্বাইয়ের দুগ্ধ কলোনির মতো একটি দুগ্ধ কলোনি গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিলেন। ১৯৪৯-৫০ সালে কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল দূরে নদীয়ার হরিণঘাটায় পরীক্ষামূলক ভাবে একটি ছোট ডেয়ারি স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময় দৈনিক দুশ লিটার দুধ ওখান হইতে সরবরাহ করা যাইত। ১৯৫৩ সালের ৩রা জানুয়ারি ডাঃ রায় হরিণঘাটার দুগ্ধশালার আনুষ্ঠানিক ভাবে শিলান্যাস করিলেন। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে ২২ হাজার গোরু রাখার ব্যবস্থা হইল হরিণঘাটা ও কল্যাণীতে। ১৯৫৪ সালে এখান হইতে কলিকাতায় দুধ সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়াইল প্রায় দশ হাজার লিটারে। হরিণঘাটা প্রকল্প কার্যকর হওয়ায় কলিকাতা হইতে খাটাল অপসারণের কাজও সহজ হইল।

১৯৪৯ সালে ডাঃ রায় স্বাধীন ভারতের প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈয়ারির জন্য যে স্থানটি তৎকালীন রেলমন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গারকে বাছিয়া দিয়াছিলেন, এবং ডাঃ রায়ের চেষ্টায় যেখানে কারখানা স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহারই চেষ্টায় যাহার নামকরণ হইয়াছিল 'চিত্তরঞ্জন', সেইস্থানে আজ একটি শিল্প-নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সেখানে শততম রেলইঞ্জিনটি নির্মিত হইলে রেলমন্ত্রী (পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী) লালবাহাদুর শাস্ত্রী উহার একটি আনুষ্ঠানিক উৎসব করেন। ডাঃ

রায় তাহাতে যোগ দেন এবং যেস্থানে একদিন কয়েকটি অখ্যাত সাঁওতাল-পল্লী ছিল, সেখানে একটি সুপরিচ্ছন্ন শিল্প-নগরী গড়িয়া উঠায় আন্তরিকভাবে আনন্দবোধ করেন। চিত্তরঞ্জন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হইলেও ইহার সাফল্যের মূলে যে ডাঃ রায়ের অবদান কম ছিল না, তাহা ভারতবাসী মাত্রই স্বীকার করিবেন।

কল্যাণীকে ডাঃ রায়ের মানসকন্যা বলা হয়। কল্যাণীতে একটি নূতন শহর গড়িয়া তুলিয়া কলিকাতার উপর হইতে চাপ কমানো ডাঃ রায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখানে একটি উপনগরী গড়িয়া তুলিবার কাজ তিনি আগেই শুরু করিয়াছিলেন। এই উপনগরীটিকে দ্রুত সকলের নিকট পরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য ডাঃ রায় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সুযোগ গ্রহণ করিলেন। স্থির হইয়াছিল ঐ বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইবে পশ্চিমবঙ্গে। ঐরূপ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইয়াছিল ১৯২৮ সালে, কলিকাতায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। ডাঃ রায় কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য কল্যাণীকেই বাছিয়া লইলেন দুইটি উদ্দেশ্যে। প্রথমতঃ, নূতন নগরী কল্যাণী কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ফলে সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিবে; দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার সভ্য ও অতিথিদের জন্য যে বাসস্থান ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা স্থায়িভাবেই কল্যাণীতে রহিয়া যাইবে। ইহাতে কল্যাণীর উন্নয়ন সহজ হইবে। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে মহাসমারোহে কল্যাণীতে কংগ্রেসের যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল, তাহার সাফল্যের সিংহভাগ ছিল ডাঃ রায়ের। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা-রূপে ডাঃ রায়ের গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, যাহা প্রায় অভাবনীয় ছিল। বাসে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে, গোরুর গাড়িতে, রিক্শায়, সাইকেলে ও পায়ে হাঁটিয়া অসংখ্য মানুষ তীর্থযাত্রীর মতো আসিয়াছিল। প্রথম দিনে লোকসমাগম হইয়াছিল পাঁচ লাখেরও বেশি। ডাঃ রায় যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাধিক প্রশংসা লাভ করে। ২২শে জানুয়ারি বিষয়-নির্বাচনী কমিটির অধিবেশনের শেষদিনে ডাঃ রায় ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাব তুলিতে গিয়া বলেন—স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম পাঁচ বৎসরে ভারত যেসব কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছে, তাহার পরিমাণ আমেরিকা বা রাশিয়া তাহাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যাহা করিতে পারিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া আবার কলিকাতায় গোলযোগ দেখা দেয়। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁহাদের অর্থনৈতিক কিছু দাবি-দাওয়া লইয়া রাজভবনের সম্মুখে কয়েকদিন যাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজ্যপাল ছিলেন প্রখ্যাত প্রাক্তন অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। তাই

শিক্ষকগণ তাঁহার নিকট স্বভাবতই সহানুভূতি আশা করিয়াছিলেন। আন্দোলন করিতেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি-প্রভাবিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ফলে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে এমন একটি কাণ্ড ঘটিল, যাহা ইতিপূর্বে ঘটে নাই। রাজ্যপাল তাঁহার সভার উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করিতে গেলে বিরোধীরা তাঁহাকে ক্রমাগত বাধা দিতে লাগিলেন। বিরোধীরা বলিলেন, রাজ্যপাল আগে রাজভবনের সম্মুখে অবস্থান-ধর্মঘটরত শিক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎ করুন। রাজ্যপাল তাহাতে সম্মত না হইলে প্রায় পনের মিনিটকাল সভায় হৈচৈ চেঁচামেচি চলিতে লাগিল। শেষে বিরোধীরা সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

পরদিন এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় আবার গণ্ডগোল দেখা দিল। শিক্ষকরা ও তাঁহাদের সমর্থকরা মিছিল করিয়া বিধানসভা অভিযান করিয়াছিলেন। পথে পুলিস মিছিল আটকাইয়া দিলে রাজভবনের দক্ষিণে পুলিস ও মিছিলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া গেল। পুলিসের গুলিতে চারজন নিহত হইল, আহত হইল ৬৫ জন। ৪৪ জনকে পুলিস গ্রেপ্তার করিল। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কয়েকজন এম. এল. এ.-ও ছিলেন।

কিন্তু ইহাতেও হাঙ্গামা থামিল না। গণ্ডগোল একটি বিরাট অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। শেষে মিলিটারি ডাকিতে হইল। রাত্রি নটা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ম হইতে মিলিটারি আসিয়া উপদ্রুত অঞ্চলটিকে উপদ্রবমুক্ত করিল। এই আন্দোলনে ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই, তবে বিরোধীরা এই প্রথম বিধানসভায় একটি মুলতুবি প্রস্তাব তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বিধানসভায় ডাঃ রায় ১৯৫৪-৫৫ সালের যে বাজেট পেশ করিলেন, তাহাতে ঘাটতি ছিল ১৩ কোটি টাকারও বেশি। তিনি নিজে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাজেট সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিলেন, "সংবিধান অনুসারে কর-বণ্টনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার পরিবর্তন একান্তই আবশ্যক। এখানকার শিল্পসম্পদের উপর রাজ্যসরকারের কর স্থাপনের কোন অধিকার বা সুযোগ নাই বলিলেই চলে। এই অবস্থার নিরসনের জন্য রাজ্য-সরকার 'ট্যাক্সেশন এন্‌কোয়ারি কমিশন' ও ভারত সরকারের কাছে আবেদন করিতেছে।"

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি দিল্লীতে 'ট্যাক্সেশন এন্‌কোয়ারি কমিশনের' কাছে সাক্ষ্য দিতে গেলেন। ২রা মার্চ তিনি সেখানে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া সাংবাদিকদের বুঝাইয়া বলিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন কেন্দ্রের কাছ হইতে আরও বেশি আর্থিক সাহায্য দাবি করিতেছে। তিনি বলিলেন, পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ৪০ কোটি

টাকা আয়কর দেয়, তখন সে কেন্দ্রের নিকট হইতে মাত্র সাড়ে ছয় কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য পাইবে কেন?

কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ডাঃ রায়ের আনুগত্য ছিল পরিপূর্ণ, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে কখনও নীরব থাকিতেন না।

রাজ্যের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ডাঃ রায় সর্বদাই কেন্দ্রের কাছ অধিকতর পরিমাণ দাবি করিতেন। সেজন্য তাঁহার ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ অর্থের স্বল্পতা সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ করিতেন, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যতই তিক্ত লাগুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

১৯৫৪ সালের ১লা জুলাই ডাঃ রায় ৭১ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। ডাঃ রায় তাঁহার জন্মদিনেও মহাকরণের কাজে ক্ষান্তি দিলেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে ভোরে উঠিয়া যেমন ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিতেন, তেমনি ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসংখ্য গুণগ্রাহী এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন আসিলেন ফুলের মালা, ফল ও মিষ্টি লইয়া। তাঁহার জন্মদিনে তাঁহার দর্শনার্থীর যে ভীড় হইত, অনেক সময় তাহা সামলানো কঠিন হইয়া উঠিত। তাঁহার দর্শনার্থীরা যেসব ফল ও মিষ্টি আনিত, তাহা তিনি হাসপাতালগুলিতে রোগীদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন, যেসব স্কুল-কলেজের সঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হইবার আগে জড়িত ছিলেন, সেইসব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও ঐগুলি পাঠাইতেন।

দুর্গাপুর যে আজ ভারতের রূঢ় নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে ডাঃ রায়ের প্রকল্প ও প্রচেষ্টাই কাজ করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে একটি কোক-চুল্লি ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পের একটি কারখানা স্থাপনের জন্য ডাঃ রায় অনেকদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর শিল্প-মন্ত্রক এবং যোজনা কমিশন নানারূপ কারণ দেখাইয়া তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতেছিলেন। দুর্গাপুরকে একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করার পশ্চাতে ডাঃ রায় যেসব যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, সেগুলি ছিল অকাট্য। এইস্থান রেলপথ ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের কাছে, নাব্য খাল রহিয়াছে, যাহা সুলভ পরিবহণে সহায়তা করিবে ভাগীরথী ও হুগলী নদী পর্যন্ত। কয়লাখনিও নিকটে। সুতরাং এখানে একটি কোক-চুল্লি কারখানা, একটি বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র এবং একটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া তোলার ইচ্ছা ছিল। এখানে কোক-চুল্লি হইলে বাড়তি গ্যাসও এখান হইতে সরবরাহ হইতে পারিবে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ রায় তাঁহার দুর্গাপুর প্রকল্প সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্র লেখেন। নভেম্বর মাসেও তিনি আবার পত্র লেখেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আর্থিক লাভ ও বেকার সমস্যা সমাধান, উভয়দিক হইতেই দুর্গাপুর

প্রকল্প অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইবে। এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ১২ হাজার লোক চাকরি পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজকর্ম বৃটিশ আমলের তুলনায় অনেক বাড়িয়াছিল। তাই মহাকরণের পুরানো ভবনে স্থান সংকুলান হইতেছিল না। সেজন্য প্রায়ই এখানে-ওখানে বাড়ি ভাড়া লইয়া সরকারী অফিস খুলিতে হইয়াছিল। তাই ডাঃ রায় একটি নূতন মহাকরণ নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারেই হুগলী নদীর তীরে ইডেন উদ্যানের নিকটে স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর একটি তেরো তলা নূতন সচিবালয় নির্মাণ করা হয়। সে সময় এই ভবনটিই ছিল কলিকাতার উচ্চতম অট্টালিকা। এর উচ্চতা ১৯৫ ফুট। ডাঃ রায় ৪ঠা নভেম্বর এই নূতন সচিবালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

ঐ বৎসরে ডাঃ রায়ের আর এক কীর্তি পশ্চিমবঙ্গ বন্যানিয়ন্ত্রণ বোর্ড স্থাপন। তাঁহার উৎসাহেই যে এই বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ বৎসর পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্যে—বিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসামে ভয়াবহ বন্যা হইয়াছিল। ডাঃ রায়ের নিকট বন্যার ভয়ংকর তাণ্ডবের সংবাদ পাইয়া প্রধান মন্ত্রী নিজে ৫ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার আসেন। ডাঃ রায় ও তাঁহার মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য নেহরুজীর সহিত বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে যান। এইসব অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা হইত। তাই নেহেরুজী বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রকল্প রচনার কথা বলেন। তাঁহার উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের দশদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বন্যানিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠিত হয়। ডাঃ রায় এই পর্ষদের সভাপতি নিযুক্ত হন।

এই সময়ে কলিকাতায় শিশু-পক্ষাঘাত বা পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। ডাঃ রায় নিজে অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে, এজন্য কলিকাতায় একটি পৃথক হাসপাতাল স্থাপন প্রয়োজন। পূর্ব কলিকাতার বেলিয়াঘাটায় একটি বেসরকারী চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছিল প্রথমে। তখন উহার উদ্যোক্তারা উহার নাম দিয়াছিলেন বি. সি. রায় পোলিও ক্লিনিক। প্রধান মন্ত্রী নিজে আসিয়া উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ঐদিন প্রধান মন্ত্রী কল্যাণীতে বিড়লা কলেজ অব্ এগ্রিকালচারেরও দ্বার-উদ্ঘাটন করেন। ডাঃ রায়ের উদ্যোগে জি. ডি. বিড়লা ঐ কলেজের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। পরে উহাই কল্যাণীর কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ডাঃ রায় দার্জিলিংয়ে যে হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, ঐ সময় প্রধান মন্ত্রী তাহারও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দার্জিলিংয়ের বার্চ হিলে। এই শিক্ষায়তনটিই এখন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে।

ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একটি ঘটনা ঘটিল যাহা প্রায় অভূতপূর্ব। পুলিস বিভাগের লোকদের নানা অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া ছিল। ডাঃ ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমল হইতেই এসব দাবি-দাওয়া তুলিয়া পুলিসের লোকেরা ধর্মঘটের হুমকি দিতেছিল।

কিন্তু এতদিন তাহারা তাহা কার্যে পরিণত করে নাই। এখন পুলিসের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় পাঁচ হাজার লোক কলিকাতায় অনশন ধর্মঘট করিল। কলিকাতার পুলিস ধর্মঘট কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যে মিটিয়া গেল। সরকার তাহাদের বেতন-বৃদ্ধি, বাড়ি-ভাড়া বাবদ ভাতা এবং খাদ্যবিষয়ে ভরতুকি প্রভৃতি আগামী চারি মাসের মধ্যেই বিবেচনা করিয়া দেখিবার আশ্বাস দিলে ধর্মঘটীরা কাজে যোগ দিল। নেতৃস্থানীয় যেসব ধর্মঘটীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল কলিকাতা হইতে জেলান্তরে। হাওড়া সহ পাঁচটি জেলায় এই আন্দোলন শুরু হইল। হাওড়ার অবস্থা ছিল সবচেয়ে ঘোরালো। ধর্মঘটের সাতদিনের দিন সরকাব ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লইবার সিদ্ধান্ত লইলেন এবং ধর্মঘটীরা অবিলম্বে কাজে যোগদান না করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হইবে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল। ১৭ই ডিসেম্বর ধর্মঘটীদের একটি বিরাট অংশ কাজে যোগ দিল এবং ধীরে ধীরে অবস্থা স্বাভাবিক হইল।

পুলিসের দুই-সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘটের ফলে যে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে ডাঃ রায়ের উপর অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়িয়াছিল। পুলিসের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা সত্যই তাঁহার এক গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। যেদিন ধর্মঘট ভাঙিবার সংবাদ আসিল, সেদিন তিনি অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন। তিনি মহাকরণেই মধ্যাহ্ন-ভোজন সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন এবং আবার কাজ করিতেন। কিন্তু তিনি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বেশ দুর্বল বোধ করিতেছিলেন। তিনি বাড়ি চলিয়া গেলেন। বিকালের দিকে জানা গেল, তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। ইহা হইল দ্বিতীয় আক্রমণ। ১৯৩০ সালে একবার মৃদু আক্রমণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি রোগের পরোয়া করিতেন না। এবার কিন্তু তিনি একটু ভয় পাইলেন এবং হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগেশ গুপ্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ডাক্তাররা তাঁহাকে হালকা কাজ করিবার অনুমতি দিলেন। তিনি শুইয়া শুইয়া জরুরি চিঠিপড়া ও সেগুলির উত্তর ডিক্টেশন দেওয়ার কাজ করিতেন। বেশি দেখা-সাক্ষাৎ ও ফাইল প্রভৃতি দেখাশোনা নিষিদ্ধ ছিল।

তাঁর অসুস্থতার তৃতীয় দিনে, সেদিন পূর্ব হইতেই কলিকাতার ১৩০ মাইল দূরে রূপনারায়ণপুরে সরকারী কেবল্ ফ্যাক্টরির দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য যাইবার কথা ছিল। ডাঃ রায় যাইতে না পারায় ডাক্তারদের অনুমতি লইয়া তাঁহার ঘরে মাইক্রোফোন বসানো হইল, তিনি শুইয়া-শুইয়াই রূপনারায়ণপুরের অগণিত মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ঐ সময় নেহরুজী শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন-উৎসবে ভাষণ দিতে

আসিয়াছিলেন। ডাঃ রায়েরও সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। নেহরুজী সোজা শান্তিনিকেতন হইতে ডাঃ রায়ের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলেন। দুইজনের মধ্যে মিনিট পনেরো আলাপ হইল। রোগীকে ব্যস্ত না করা সম্পর্কে নেহরুজীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় লইলেন। কিন্তু এই অসুস্থতার মধ্যেও ডাঃ রায় নেহরুজীর প্রিয় মিষ্টি রসগোল্লার একটি প্যাকেট উপহার দিতে ভুলিলেন না।

ডাঃ রায়ের এই অসুস্থতা পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করিল। ডাঃ রায় যদি সুস্থ না হইয়া উঠেন, তবে তাঁহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবে কে? পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যাপূর্ণ রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরিবে কে? প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখার্জী ইঁহারা দুইজন ছিলেন তাঁহার প্রধান সহযোগী। কিন্তু তাঁহারা বিধানসভায় নির্বাচিত হইতে পারেন নাই, বিধান পরিষদের ভোটে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাই সমস্যাটা আরও জটিল ছিল।

অসুস্থতার দিন পনেরো পরে ডাঃ রায় আরও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সরকারী কাজকর্ম দেখা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি তাঁহার পারিবারিক বন্ধু বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক কর্নেল ললিতমোহন ব্যানার্জীকে একদিন বলিলেন, "আমার কাজের প্রতি আমি যখন সুবিচার করিতে পারিতেছি না, তখন এই পদে থাকিয়া লাভ কি? আমি ইস্তফা দিতে চাই।" কর্নেল ব্যানার্জী বলিলেন, "এখনই ইস্তফা না দিয়া আর একটু অপেক্ষা করো। যদি পনেরো দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া না উঠ, তখন ইস্তফা দিও।"

ডাঃ রায় কর্নেল ব্যানার্জীর পরামর্শমতো ইস্তফা দিলেন না, এবং পশ্চিমবঙ্গের সৌভাগ্য যে, ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন আসন্ন হইয়াছিল। ডাঃ রায় নিজে ছিলেন অর্থমন্ত্রী এবং তিনি সকল কিছু নিজে খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতেন। তাই অনেকে চিন্তিত হইলেন। কিন্তু দেখা গেল, তিনি তাঁহার কর্মশক্তি দ্রুত ফিরিয়া পাইলেন। তিনি এ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা ও বৈঠক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মধ্যে যে পত্রালাপ হয়, তাহা হইতে বোঝা যায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সম্পর্কে কতখানি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১০ই জানুয়ারি (১৯৫৫) প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে একটি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লেখেন:

"সম্প্রতি স্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক জি. এ. জনসন আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে কলিকাতা ও কলিকাতার গোলযোগের কথা বলিলেন। মাঝে মাঝে যেসব বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাহার কথাও বলিলেন, শহরে মানুষের অবর্ণনীয় ভীড় উপছাইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর বহু লোক বেকার, যেন গোলযোগের প্রান্তে দাঁড়াইয়া

আছে কলিকাতা, যে কোন মুহূর্তেই গোলযোগ বাধিয়া যাইতে পারে। সামান্যতম প্ররোচনাতেই ভীড় জমিয়া যায় এবং কখনও কখনও তাহারা যাহা খুশি করে। কোন মোটরগাড়ি ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটাইলেও লোকে ড্রাইভারকে, এমন কি আরোহীকে পর্যন্ত, টানিয়া বাহির করে এবং মারপিট করে। ··শান্তভাবেই জনসন আমাকে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, কলিকাতার পশ্চাৎপটে যে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি ধূমায়িত হইতেছে, সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি বলিলেন এ অবস্থার মোকাবিলা করিতে পারেন একটিমাত্র লোক, তিনি হইতেছেন তুমি। কিন্তু সেই তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও। তিনি আমার কাছে এ-ও উল্লেখ করিলেন যে, ব্যাপারটা এখন যে পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির স্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, সব ঠিক হইয়া যাইবে, যদি কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রিত করা যায়।···"

ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ও সচেতন ছিলেন। কোনও দমনমূলক নীতি ও ব্যবস্থার দ্বারা যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে, তাহাও তিনি ভালো করিয়া বুঝিতেন। তাই তিনি কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার মূল কোথায়, তাহা তাঁহার পত্রোত্তরে প্রধান মন্ত্রীকে সবিস্তারে জানাইলেন। প্রধান মন্ত্রীকে ১২ই জানুয়ারি একটি পত্রে তিনি লিখিলেন :

"তোমার ১০ই জানুয়ারির চিঠিতে জনসন সাহেবের সহিত তোমার আলাপের উল্লেখ করিয়াছ, যাহাতে বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতার, সম্পর্কে তাঁহার আশঙ্কার কথা আছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছি। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে মূলতঃ কলিকাতা এবং শহরাঞ্চলের বৃহৎসংখ্যক বেকার যুবকের দল। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কলিকাতায় ২,৩৪,০০০ বেকার লোক আছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই বাঙ্গালী। তাহাদের কোনও পূর্ণ সময়ের চাকরিবাকরি নাই। তাহারা কাজের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সংখ্যার ১,৩৬,৫০০ হইতেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং ৯৭,০০০ হইতেছে শ্রমিকশ্রেণীর। এই ২,৩৪,০০০ লোকের মধ্যে ৭০,০০০ হইতেছে শরণার্থী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ বড় একটা অংশ, শতকরা প্রায় ৮০ জন, সাক্ষর। ইহাদেরও বড় একটা অংশের জানা আছে কিছু-না-কিছু কারিগরী বিদ্যা ও হাতের কাজ। কলিকাতার ইহাই হইতেছে প্রধান সমস্যা।

ইহা ছাড়া শরণার্থী সমস্যা তো আছেই।······

এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, কেন আমি ১৯৪৯ সাল হইতে রাজ্যের অর্থনৈতিক অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি লইয়া এমনভাবে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ পর্যন্ত আমাদের ব্যয় আমাদের প্রাপ্যের উপরেও ১০ কোটি টাকা বাড়তি দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৯ সালে আমি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জেলান্তরে পাঠাইবার

জন্য কেন্দ্র হইতে ৯০ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলাম। জেলান্তরের এই কলেজগুলি খুব ভালো কাজকর্ম করিতেছে। চার বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন মাসিক ৮-১০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২৫-৩০ টাকা করিয়া দিয়াছি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুর্মূল্য ভাতা শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছি। তুমি জানো, শিক্ষাক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের কথা আমি চিন্তা করিতেছি এবং বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে কল্যাণীতে পাঠানো যায় কিনা ভাবিতেছি।

বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সারা বাংলার বিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি কাঠামো আমি খাড়া করিয়াছি। বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে আংশিক ডি. ভি. সি. হইতে, আংশিক ময়ূরাক্ষী হইতে, আংশিক কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা হইতে। গ্রামীণ এলাকা সহ দক্ষিণ বাংলার প্রায় সবটায় গ্রাম বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা করিয়াছি, ইহার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি জানি পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবীদের শতকরা ৭০ ভাগেরই জমিজমা অর্থকরী নয়। আমি ইহাও জানি যে, কৃষিজীবীদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য গ্রামীণ এলাকায় কমিউনিস্টরা কিছুটা প্রতিপত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। এইসব কারণেই আমি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প যাহাতে বিদ্যুৎচালিত হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা করিয়াছি। এখন এগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে, এবং আমি তাহা ধাপে ধাপে করিতেছি। কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্প বৃহৎশিল্পের পরিপূরক বা সহায়ক রূপেই বাঁচিতে পারে। সেইজন্যই আমি আমার দুর্গাপুর প্রকল্পের জন্য তোমাকে সাহায্য করিতে বলিয়াছি। যদি কোন রাজ্য কোকচুল্লি স্থাপন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে ১৯৫১-র শিল্প-উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে পূর্বাহ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লইতে হইবে। এই কারণেই আমি ধৈর্য ধরিয়া বিগত দেড় বছর ধরিয়া অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছি। কিন্তু কোন-না-কোন অছিলা দেখাইয়া অনুমোদন ক্রমাগত স্থগিত রাখা হইতেছে। তাঁহারা যে যে তথ্য চাহিয়াছিলেন, আমার মনে হয়, আমরা তাহা সব সরবরাহ করিয়াছি। বর্তমান পরিস্থিতি হইতেছে এই যে, আমরা যে এলাকায় এই প্রকল্প রূপায়িত করিতে চাহিতেছি, তাহার সবটাই ডি. ভি. সি. (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন) খালি করিয়া দিতেছে। এখানে তাহারা ছোট-বড়ো ৩০০টি বাংলো তৈয়ার করিয়াছিল। আমরা দুর্গাপুর প্রকল্পের জন্য সমস্তটাই লইতে চাই। এখানে প্রাথমিক ভাবেই ১২০০ লোকের কর্মসংস্থান হইবে, পরে এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। আমার এই দুর্গাপুর প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল আলকাতরা হইতে বাড়তি উৎপাদন বাহির করা। আমি জানি ইহা উন্নয়নের এমন একটি উৎপাদন যে, মধ্যবিত্ত যুবকরা ইহার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই রাজ্যকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে ছোট-বড়ো অনেকরকম শিল্প গড়িয়া তোলা। খুব বড়ো শিল্পের

জন্য আমার তেমন সঙ্গতি নাই, কিন্তু পরিপূরক ছোট ছোট শিল্পসহ দুই-একটি বড় শিল্প আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি, যদি এই রাজ্যকে আমরা বাঁচাইতে চাই। এই আশা লইয়াই আমি সমাজ-উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় প্রসারণ ব্লক ও অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে বিশেষ যত্ন লইতেছি। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, আবহাওয়া বদলাইয়া যাইতেছে এবং জনগণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত। জনগণের সহযোগিতা যদি পাই, তাহা হইলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাহিরে গেলেও আমি ভয় পাই না।

কলিকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিতে পারি, আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছি এবং এটুকু গর্ব করিয়া বলিতে পারি যে, আমার বর্তমান শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি, যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো।..."

আগেই বলিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের ছিল ছিন্নমস্তা অবস্থা। নিম্ন ও মধ্য অংশের সঙ্গে উপরের অংশের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ প্রভৃতির যোগ ছিল না। ১৯৫৪ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে বলা হইয়াছিল, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের ৮২ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে বাস করে, তাই পশ্চিমবঙ্গের আয়তন আরও ২১,৩৫২ বর্গমাইল বাড়াইয়া দেওয়া হউক। রাজ্যের আয়তন তখন ছিল ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল এবং ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে লোকসংখ্যা ছিল ২,৪৮,১০,৩০৮। তাই বিহার হইতে পূর্ণিয়া, মানভূম, ধলভূমের কিছু অংশ আর সরাইকেলার কিছু অংশ, সব মিলাইয়া ১৩,৯৪৫ বর্গমাইল, আসাম হইতে গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড়—সবশুদ্ধ ৭,১৪৭ বর্গমাইল, এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার কিছু অংশ ২৬০ বর্গমাইল। জুনের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তাহাতে বলা হইয়াছিল বিহার ও আসামের সীমান্ত এলাকার প্রায় ১৫০০০ বর্গমাইল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির দাবির তুলনায় এই দাবি অনেক কম ছিল। ১৯৫৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির কাছে ডাঃ রায় সরকারের দাবি সম্পর্কে প্রায় দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরিয়া বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবির প্রতিবাদে বিহার যেসব দাবি তুলিয়াছিল, ডাঃ রায় সেগুলিকে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, ইতিহাসগত, ভৌগোলিক এবং বিশেষ করিয়া প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে খণ্ডন করেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের সহিত মধ্য অঞ্চলের সরাসরি সংযোগের প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথাও তিনি বুঝাইয়া বলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের কথাও উল্লেখ করেন। এই চাপ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ছিল সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গ যেসব এলাকা

দাবি করিয়াছিল, সেগুলি ছিল বিহারের পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা জেলা এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলা।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন দার্জিলিংয়ে আসিলেন। পশ্চিমবঙ্গের দাবির উত্তরে বিহার পালটা দাবি করিয়াছিল উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার। এই তিনটি জেলা লইয়া একটি পৃথক রাজ্য গঠনেরও বিকল্প প্রস্তাব রাখিয়াছিল—যে রাজ্যের নাম হইবে উত্তরাখণ্ড। বিহার মালদহ জেলাটিও দাবি করিয়াছিল। কারণ হিসাবে বলিয়াছিল যে, এইসব জেলার সহিত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও মধ্য অংশের কোনও ভূমি-সংযোগ নাই। ডাঃ রায় দার্জিলিং গিয়া রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সামনে এর বিরুদ্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল নানা যুক্তি উত্থাপন করেন। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার জনসংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। তাহার মধ্যে নেপালীর সংখ্যা মাত্র এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আর সেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা ৬১ ভাগ।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর অক্টোবর মাসের গোড়ায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেল। দেখা গেল, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কিছু বাড়িতেছে। বিহারের মানভূম জেলার কিছু অংশ এবং উত্তর অঞ্চলের সহিত মধ্য অঞ্চলের সহিত সংযোগ সাধনের জন্য পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পাওয়া যাইবে।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, দেশবিভাগ পশ্চিমবঙ্গে নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান হইতে কেবল ৩৫ লক্ষ লোকই আসে নাই, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংযোগ-ব্যবস্থাই ১৯৪৭ সাল হইতে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সংযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কতকগুলি সুপারিশ করা হয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের ফারাকায় গঙ্গার উপর একটি জলাধার এবং রেলপথ ও মোটর-পথযুক্ত সেতু নির্মাণ; আসামের ধুবড়ি হইতে আলিপুরদুয়ার হইয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি নূতন রেলপথ খোলা, জাতীয় সড়কের অংশরূপে দুটি সংযোগ-রক্ষাকারী পথ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে স্থাপন করা।

কমিশনের সুপারিশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়াইল ৩৪,৫৯০ বর্গমাইল। এই সুপারিশ প্রকাশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে গভীর নৈরাশ্য দেখা দিল। প্রদেশ কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এখানেই ঘটনা শেষ হইল না। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে সংবাদ আসিল যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে যে মনোভাব লইয়াছেন, তাহা আরও উদ্বেগজনক। শোনা গেল, পশ্চিমবঙ্গের দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহার হইতে যে এলাকা পশ্চিমবঙ্গকে দিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন, বিহারের নেতৃবর্গ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তাহা

অর্ধেক করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা হইল। ডাঃ রায় তাড়াতাড়ি দিল্লি রওনা হইয়া গেলেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্যবাবুর সহিত দিল্লি পৌছিয়াই তিনি কংগ্রেসের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সাব কমিটির সহিত দেখা করিলেন। ডাঃ রায় ও অতুল্যবাবু যেমন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন, তেমনি বিহারের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। প্রশ্নটি ছিল মহানন্দা নদীর পূর্বদিকস্থ কিষণগঞ্জ মহকুমাটি পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া লইয়া। অথচ কমিশনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল যে, ইহা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের সহিত রাজ্যের বাকি অংশের সহিত সংযোগ সাধন করিবে। কেন্দ্রীয় নেতারা পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের বলিলেন যে, সংবাদপত্রে যেরূপ বাহির হইয়াছে সেরূপ কোনও প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার লন নাই। ১৬ই জানুয়ারি রাত্রিতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইল। তাহা হইতে জানা গেল যে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের যে এলাকা দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহার একটি থানা এবং পুরুলিয়ার ছোট একটি এলাকা বাদে আর সবটাই ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। আসল কথা, ডাঃ রায় দিল্লি গিয়া পড়ায় তাঁহার প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্ত বদলাইয়াছিলেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪০০ বর্গমাইল আসার কথা, সেখানে আসিল ২৯০০ বর্গমাইল।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত বিহারে কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। ১৭ই জানুয়ারি কিষাণগঞ্জের বাজারে প্রায় ২০০ বিক্ষোভকারী ছাত্র হানা দিয়া দোকানপাট লুট করিল। পুরুলিয়াতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিল। বোম্বাই শহরকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাখার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার লইয়াছিলেন, তাহার ফলে বোম্বাইয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। সে বিক্ষোভ এমন আকার ধারণ করিল যে, সেখানে মোট ১১৪ বার গুলি ছুঁড়িতে হইল। উড়িষ্যা ও গুজরাটেও পরিস্থিতি ভালো ছিল না।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের যে আদর্শ কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বিশৃঙ্খলা ও প্রাদেশিকতার রূপ লইতেছে দেখিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকার শঙ্কিত হইলেন। তাই প্রাদেশিকতার ওই প্রবণতা উলটাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদের পরামর্শে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ২৩শে জানুয়ারি তারিখে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন। তাহাতে হঠাৎ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এক হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইল। নেহরুজী এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইলেন এবং ডাঃ রায়ও ডঃ সিংহকে অভিনন্দন জানাইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব পাস করিল।

২৪শে জানুয়ারি ডাঃ রায় দিল্লি হইতে কলিকাতা ফিরিলে সাংবাদিকরা তাঁহাকে

এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং আমাদের যুক্ত বিবৃতি ছাড়া আমার আর কিছু বলিবার নাই।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু হঠাৎ এইরূপ ঘটনা ঘটায় হতচকিত হইয়াছিল। বামপন্থীরা ও কমিউনিস্টরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। বিহারেও মতপার্থক্য দেখা দিল। কি পশ্চিমবঙ্গ, কি বিহার, কোথাও জনগণের প্রতিক্রিয়া ইহার অনুকূল ছিল না।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাজেট অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের 'মার্জার' বা একীকরণ বিল আনীত হইল। ২৪শে ফেব্রুয়ারি অ্যান্টিমার্জার বা একীকরণবিরোধী কমিটি বন্ধের ডাক দিলেন। ঐদিন পাটনাতেও ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মিলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব আনিলেন। পরদিন ঐ প্রস্তাব ১৫৭-২৫ ভোটে গৃহীত হইল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অবস্থা ঐরূপ ছিল না। বিরোধীরা তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় 'মার্জার' সম্বন্ধে জনসভা করিয়া লোককে বুঝাইবার সিদ্ধান্ত লইলেন। দক্ষিণ কলিকাতার চাজরা রোডের একটি বাড়ির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে জনসভা ডাকা হইল। সভার দিন ভোরে খবর পাওয়া গেল যে, সভার জায়গার কাছাকাছি বামপন্থীরা বিক্ষোভ দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিকালবেলা ডাঃ রায় সভায় গেলেন। সভাস্থলে জমায়েত হইল শ তিনেক লোক। সভার নিকটে বিক্ষোভকারীরা জমায়েত হইয়াছিল বহুগুণে বেশি। তাহারা মার্জারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেছিল এবং সেই সঙ্গে ডাঃ রায়ের মুণ্ডপাত করিতেছিল। ডাঃ রায় বিহারের কাছে পশ্চিমবাংলাকে বিক্রয় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ইত্যাদি বলিতেছিল। তাহারা ডাঃ রায়কে সভাস্থলে যাইতে বাধাও দিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া সভাস্থলে গেলেন এবং বক্তৃতাও দিলেন।

কিন্তু সভার পরে তিনি যথেষ্ট চিন্তিত বোধ করিলেন। বিধানসভার অধিবেশনে তিনি এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসী এম. এল. এ.-দের সমর্থনসূচক স্বাক্ষরও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি 'মার্জার' শব্দের পরিবর্তে 'মিলন' শব্দটিই ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু মিলন যতোই আদর্শবাদী হউক, যতোই সকলে ভাষা ও জাতি নির্বিশেষে ভারতবাসী বলিয়া প্রচার করা যাউক, এই মিলনের ফল সম্পর্কে সংখ্যালঘু বাঙ্গালীর মনে যে সংশয় ও আশংকা দেখা দিয়াছিল, তাহা যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা বলাও যায় না। প্রতিবাদ না করিলেও বা মৌখিক সমর্থন জানাইলেও যে তাঁহারা ইহাকে মনে-প্রাণে সমর্থন করিতেছেন, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা কঠিন. ছিল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে বিল আনিয়াছিলেন, তাহাতে বিহারের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মিলনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ

কিছু পরিবর্তন করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের যে অঞ্চল দেওয়ার কথা ছিল, তাহা যদি স্থান না পায়, এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রবল বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত মিলন যদি কার্যকর না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ একূলও হারাইবে, ও-কূলও হারাইবে।

বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মিলন যে পশ্চিমবঙ্গের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া দেওয়া নয়, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য মিলনের সময়ে কি কি ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, সে সম্পর্কে ডাঃ রায় একটি ফরমূলা রচনা করিলেন। তাহাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিলেন :

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মিলিত রাজ্যের নাম হইবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সংযুক্ত প্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই সংযুক্ত প্রদেশে থাকিবে দুইটি সরকারী ভাষা—বাংলা ও হিন্দি। সারা প্রদেশেই এই দুইটি ভাষা চলিবে। যদি একটি রাজ্য অন্য রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে চেষ্টা করে, তবে এই মিলন কাযকর থাকিবে না। একটি বিধানসভা হইবে। এক রাজ্যের লোক মুখ্য মন্ত্রী হইলে অন্য অংশের কাহাকেও উপমুখ্যমন্ত্রী করা চলিবে বা মুখ্য মন্ত্রী পর্যায়ক্রমে দুই রাজ্য হইতে হইবেন। স্থানীয় পরিষদ থাকিবে দুইটি—এক অংশে একটি, অন্য অংশে একটি। দুই অংশেরই অভ্যন্তরীণ কাঠামো প্রায় পূর্বের মতোই থাকিবে, একে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। উভয় রাজ্য নিজ নিজ প্রয়োজন-মতো ব্যবস্থা করিবে, তবে প্রধান প্রধান সমস্যার ক্ষেত্রে থাকিবে যৌথ প্রয়াস। রাজ্যের প্রধান রাজধানী হইবে কলিকাতায়, পাটনাকে দ্বিতীয় রাজধানী করা যাইতে পারিবে। বিধানসভা দুই জায়গাতেই পর্যায়ক্রমে বসিতে পারিবে।

এইসব বিষয়ে তিনি কেন্দ্র ও বিহারের নেতৃবর্গের সহিত আলোচনাও করিলেন।

দক্ষিণ কলিকাতায় সভা করিয়া সেখানকার জনসাধারণের বিরোধী মনোভাব কিছুটা তিনি টের পাইয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতায় একটি সভা করিয়া তিনি সেখানকার জনমত কিছুটা যাচাই করিতে চাহিলেন। শোভাবাজারের রাজবাটিতে সভার স্থান ঠিক করা হইল। এখানেও তাঁহাকে বিক্ষোভকারীদের সম্মুখীন হইতে হইল। দক্ষিণ কলিকাতার তুলনায় এখানের বিক্ষোভকারীর সংখ্যা ছিল আরো বেশি। তাহারা ডাঃ রায়কে সভায় যাইতে না দেওয়ার জন্য ঘিরিয়া ধরিল। কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হইল। ডাঃ রায়ও সে ধ্বস্তাধ্বস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইলেন না। তাঁহার জামা ছিঁড়িয়া গেল। তবু এই বৃদ্ধ মানুষটি সকল বাধা ও অপমান উপেক্ষা করিয়া সভাস্থলে গিয়া পৌছিলেন। ঐদিন সকালে উত্তর কলিকাতার কয়েকজন প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের স্বেচ্ছা-সেবকরা প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত থাকিবে এবং বিক্ষোভকারীদের সহজেই মোকাবিলা

করিতে পারিবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল, তাহার বিপরীত। এমন কি উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতারাও প্রায় সকলেই অনুপস্থিত। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্যবাবুও দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার দুই সভাতেই উপস্থিত ছিলেন না। তাই ঝড়ের ধাক্কা এই বৃদ্ধ মানুষটিকেই একাকা সামলাইতে হইল। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তব্য শুনিলেন, আবার অনেকে নানা প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিলেন। সভাশেষে সাদা পোশাকের পুলিসের সাহায্যে তিনি বাড়ি ফিরিলেন। ডাঃ রায় খুবই বিচলিত বোধ করিতেছিলেন।

তবু এ বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের দুই মুখ্য মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হইল। আলোচনাকালে অতুল্যবাবুও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না। বিহারের মুখ্য মন্ত্রী বিষয়টি আগাগোড়া আবার খুঁটাইয়া দেখিবার জন্য পনের দিন সময় লইলেন।

ইতিমধ্যে লোকসভার দুইটি সদস্য পদের উপনির্বাচনের সময় হইয়া গিয়াছিল—একটি মেদিনীপুরের ও একটি উত্তর কলিকাতার। ডাঃ রায় ইহাকে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মিলনের সম্পর্কে জনমত গ্রহণের একটি সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বিরোধীরাও এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন।

হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার অশোক সেনকে ডাঃ রায় ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তি সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিলেন। অশোক সেন ডাঃ রায়ের সংযুক্তি সমর্থন করিলে এবং উত্তর কলিকাতা হইতে লোকসভায় নির্বাচনে প্রার্থী হইতে সম্মত হইলে তাঁহাকেই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মনোনয়ন দেওয়া হইল। সংযুক্তিবিরোধী কমিটির সম্পাদক মোহিত মৈত্রকে বিরোধীরা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাইলেন। পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের সহিত সংযুক্ত করিলেও যে প্রদেশ সৃষ্টি হইবে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে এবং পশ্চিমবঙ্গ কার্যত বিহারীদের উপনিবেশে পরিণত হইবে, এই কথাটা ভারতের ঐক্যের আদর্শ এবং প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ঊর্ধ্বে সহজেই সাধারণ মানুষের মনে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিল।

পাঁচ বৎসর পূর্বে ডাঃ রায়ের উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুরের নিকটবর্তী হিজলিতে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজি নামে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে শিক্ষা-মন্ত্রী ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি মেদিনীপুর হইতেই লোকসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ভারত সরকার ঐ সময় যে পাঁচটি আঞ্চলিক কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, ডাঃ রায় যদি দায়িত্ব লন, তবে তাহার

একটি তিনি পশ্চিমবঙ্গে স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই কথা মাওলানা আজাদ ডাঃ রায়কে জানাইলে ডাঃ রায় তাহাতে সানন্দে সম্মত হন এবং এইভাবেই হিজলিতে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ডাঃ রায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহ্‌রু খড়্গপুরে আসেন। তিনি এই সমাবর্তন উৎসবে দেশের ঐক্যের আদর্শের জন্য এবং প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সচেতন হইতে আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে গেল না। ৩রা মে যখন নির্বাচনের ফলাফল বাহির হইল, তখন ডাঃ রায় ছিলেন দিল্লীতে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল মোহিত মৈত্র পাইয়াছেন ৮৪,৯৫৩ ভোট এবং অশোক সেন পাইয়াছেন ৫১,৮৮০ ভোট। ডাঃ রায়ের কাছে ইহা খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না। তিনি কলিকাতায় মুখ্য সচিবকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে ফোনে নির্দেশ দিলেন। তারপর কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া দেশবাসীকে জানাইলেন: তিনি জনগণের রায় মানিয়া লইলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছেন। তিনি বিবৃতিতে বলিলেন:

নির্বাচনের ফলাফল কাল যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে আমাকে এই কথাই ভাবাইয়া তুলিয়াছে যে, এই প্রস্তাব লইয়া আমার আর অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা। অবশ্য, এই ধরনের একটি মাত্র নির্বাচন হইতেই পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এ সম্পর্কে জনসাধারণের প্রকৃত মতামত কি। তবু এই রায় আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। গত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে আমাদের যে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি এখনও আগের মতোই গভীরভাবে আস্থাশীল। এখনও আমার বিশ্বাস, কিছু ক্ষুদ্র ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইলেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা মিটিবে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সংসদীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়া যে জনমত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার নিকট আমাকে মাথা নত করিতেই হইবে। আমার কথা আমি বলিতে পারি। প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া জনমতের কাছে নতিস্বীকার করাই আমি উচিত মনে করি। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবার জন্য বাংলার মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত লইবে, আমি এইরূপ আশা করি। বিষয়টা আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইতেছি।

পরদিন কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাঃ রায়ের বিবৃতি সাড়ম্বরে মুদ্রিত হইল। জনমতের প্রতি ডাঃ রায়ের এই গভীর শ্রদ্ধাকে উপযুক্ত মর্যাদাও দেওয়া হইল। ডাঃ রায় তাঁহার সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতসহ একটি পত্র বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকেও পাঠাইলেন। খবরটা বিহারের কাগজগুলিতেও ফলাও করিয়া ছাপা হইল। বিহারীরা যে এই সিদ্ধান্তে

সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল বিহারের তিনজন খ্যাতনামা মন্ত্রীর বিবৃতি হইতে। তাঁহারা ডাঃ রায়ের এই সিদ্ধান্তকে দুঃখজনকই মনে করিলেন।

বামপন্থীরা তাঁহাদের মার্জার-বিরোধী আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৪ই জুন বিহারের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়ার জন্য খসড়া বিলটি—বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (অঞ্চল হস্তান্তর) বিল—কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পাঠাইলেন। উভয় রাজ্যের বিধানসভার মতামত লইবার জন্য বিলটি বিহার সরকারের কাছেও পাঠানো হইয়াছিল। বিহার হইতে যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে সংযোজিত হইতেছে, তাহার পরিমাণ ২৯০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার। ফলে এখন পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বাড়িয়া হইতেছে ৩৩,৯৪৪ বর্গ মাইল। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের আসন বাড়াইয়া করা হইল ৩৪ হইতে ৩৬ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন বাড়িয়া হইল ২৪২ হইতে ২৫২।

লোকসভায় কিন্তু এই বিলটি পাস হইতে গড়িমসি চলিতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গের একজন সংসদ সদস্য ডাঃ রায়কে জানাইলেন যে, বিলটি পাস করিতে বিলম্ব ঘটাইবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ঐ সময়ে সংসদে কংগ্রেস দলের মুখ্য সচেতক ছিলেন এস্. কে. পাতিল। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে টেলিফোন করিলেন এবং ফোনে প্রায় গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এটা নিয়ে তোমরা মজা করছ নাকি ?"

পাতিল ডাঃ রায়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বিলটি লোকসভায় আনিয়া পাস করাইলেন। ঐ বিলে একটি ত্রুটি ছিল। উত্তরবঙ্গের সহিত অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য প্রয়োজন ছিল আরও ১৭০ বর্গমাইল পরিমাণ একখণ্ড ভূমির। এই ত্রুটি ডাঃ রায়ের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারও সে বিষয়ে বিল সংশোধন করিলেন।

কিছু অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়া দিতে হওয়ায় বিহার স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ফলে দুই প্রদেশের মধ্যে কিছুটা তিক্ততারও সৃষ্টি হইয়াছিল। ডাঃ রায় এই তিক্ততা দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এইভাবে একটি নাটকীয় ঘটনার যবনিকাপাত হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেগুলির মধ্যে একটি দুর্গাপুরে তৃতীয় ইস্পাত কারখানার প্রতিষ্ঠা। দুর্গাপুরে একটি শিল্প-নগরী গড়িয়া তোলার জন্য ডাঃ রায়ের চেষ্টার সীমা ছিল না। ছোট-বড়ো বহু কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে না পারিলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানের যে অন্য কোন পথ নাই, তাহা তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন। আর বেকার সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে বিক্ষোভ ও অশান্তি যে চলিতেই থাকিবে, সে বিষয়েও তাঁহার কোনও সন্দেহ ছিল না।

দেশের তৃতীয় ইস্পাত কারখানাটি কোথায় হইবে, বিহারের সিন্ধ্রিতে, না পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, ইহা লইয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া টালবাহানা চলিতেছিল। অবশেষে দুর্গাপুরেই তৃতীয় ইস্পাত কারখানাটি স্থাপনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। বৃটিশ ইস্পাত কমিশন একবাক্যে দুর্গাপুরকেই পছন্দ করিলেন। বৃটিশ ইস্পাত কমিশনের এই সুপারিশের কথা কেন্দ্রীয় লৌহ ও ইস্পাত মন্ত্রী ডাঃ রায়কে জানাইয়া দিলেন। ডাঃ রায় দুর্গাপুরের পক্ষে যেসব যুক্তি দিয়াছিলেন, সেগুলি ছিল অকাট্য। দুর্গাপুরে কোক চুল্লির প্রবন্ধ লইয়া পূর্বেই তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উহাতে দুর্গাপুরে যে শিল্প-নগরীর সূচনা হইয়াছিল, তাহাই দুর্গাপুরের উপযুক্ততা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। বিহারের কয়লা সরবরাহের সুবিধার দিকটা জোরালো হইলেও দুর্গাপুরই অন্যান্য দিক হইতে তাহার উপযুক্ততা সহজেই প্রমাণ করিয়াছিল। আজিকার দুর্গাপুর যে ডাঃ রায়ের কল্পনা, দূরদর্শিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিমাত্র, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই বৎসরের আর একটি ঘটনা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভারত সফর। তাঁহাদের সংবর্ধনার জন্য দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মতো কলিকাতাও প্রস্তুত হইয়াছিল। যথাযোগ্য সমস্ত ব্যবস্থাই ডাঃ রায় নিখুঁতভাবে করিয়াছিলেন। বিমান বন্দরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা, দমদম হইতে রাজভবনে তাঁহাদের লইয়া আসা, বটানিক্যাল গার্ডেন পরিদর্শন, ময়দানের প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিশাল জনসভা, রাজভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে করিয়াছিলেন। যদিও এ বিষয়ে অনেকগুলি সাব-কমিটি করা হইয়াছিল। দিল্লী ও মাদ্রাজ সোভিয়েট নেতাদের যে বিপুল সংবর্ধনা দেখাইয়াছিল, তাহার সহিত পাল্লায় কলিকাতা পিছনে পড়িবে, ইহা কোন কাজের কথা নয়। তাই ডাঃ রায় দ্বিগুণ উৎসাহে এই কাজে মাতিয়াছিলেন।

২৯শে নভেম্বর (১৯৫৫) বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ যখন সদলবলে ইলিউশিন জেট বিমান হইতে দমদম বিমান বন্দরে বাংলার মাটিতে পা দিলেন, তখন অপেক্ষমাণ বিপুল জনতার হর্ষধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হইল। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী তাঁহাদিগকে মাল্যভূষিত করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। দমদম হইতে রাজভবন পর্যন্ত দীর্ঘপথ লোকে লোকারণ্য, প্রায় বিশ লক্ষ নরনারী পথের দুইধারে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছিল। একটি মারসিডিস গাড়ির পিছনের আসনে বসিয়াছিলেন ডাঃ রায়। গাড়িটি এই উপলক্ষ্যে লাল রঙে রাঙাইয়া লওয়া হইয়াছিল। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ দুইজনেই ডাঃ রায়ের সামনে দাঁড়াইয়াছিলেন যাহাতে অপেক্ষমাণ জনতা তাঁহাদিগকে ভালোভাবে দেখিতে পায়। অগণিত নরনারী উঁহাদের দেখিতেছিল এবং গোলাপের ফুল ও পাপড়ি ছুঁড়িয়া অভিনন্দন জানাইতেছিল। গাড়িটি যখন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু দিয়া যাইতেছিল, তখন

জনতার চাপ এতই বাড়িয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, মানুষের চাপে গাড়িটি না ভাঙিয়া পড়ে। ডাঃ রায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। জনতার চাপ ঠেকানো পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল। এই জনসমুদ্র পার হইয়া গাড়িটি কিভাবে যে নিরাপদে রাজভবনে গিয়া পৌঁছিবে, তাহাই হইয়া উঠিয়াছিল এক সমস্যা।

এই অবস্থায় তিনি চকিতে দুইজন মাননীয় অতিথিকে লইয়া পিছনের একটি পুলিশ ভ্যানে গিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং নিজেদিগকে দর্শকদের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া ফেলিলেন। কারণ, খালি গাড়িতে করিয়া প্রকাশ্য রাজভবনে পৌঁছা অসম্ভব ছিল। ইহাতে বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ সাময়িকভাবে একটু বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিশাল জনসমুদ্র পার হওয়া যে সত্যই অসম্ভব ছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সত্যই, পশ্চিমবঙ্গে তাঁহারা যে সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর কোথাও কোনও নেতা কখনও পান নাই।

পরদিন বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে ময়দানে প্যারেড ব্রিগেড গ্রাউণ্ডে গণ-সংবর্ধনা জানানো হইল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আসিয়া এই জনসভায় সভাপতিত্ব করিলেন। তিনি নিজেই অতিথিদের রাজভবন হইতে বক্তৃতামঞ্চে লইয়া গেলেন। রাজভবন হইতে বক্তৃতামঞ্চ পর্যন্ত ভীড় সামলাইবার জন্য অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছিল। তাঁহারা সভা আরম্ভের পনের মিনিট আগে দুইটা পনেরো মিনিটে বক্তৃতা মঞ্চে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিশ লক্ষেরও বেশি লোক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই এইরূপ অভূতপূর্ব জনসমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। নেহরু নিজেও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এতোবড়ো জনসভা ইতিপূর্বে ভারতের আর কোথাও হয় নাই।

কলিকাতায় বিপুল সংবর্ধনার ২৪ ঘণ্টা পরে সোভিয়েট নেতারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া রেঙ্গুনে পাড়ি দিলেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ডাঃ রায় ৭৫ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু এখনও তাঁহার কর্মশক্তি ছিল অদম্য। পশ্চিমবঙ্গকে গড়িয়া তোলার যে অনেক কাজ তখনও বাকি, সেগুলি যে দ্রুত করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাঁহার মতো কেহই সচেতন ছিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় যে শিল্পায়ন, তাহা তিনি বুঝিতেন। এজন্য তিনি ছোট শিল্প ও কুটির শিল্পের উপরই বেশি জোর দিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বছর প্রায় একবার করিয়া ইউরোপ পাড়ি দিতেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ইউরোপীয় কৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য লইতে চেষ্টা করিতেন। ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের ব্যাপারে জাপান কি করিয়াছে, কিভাবে যে অল্পকালের মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির সমকক্ষ হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য এইবার জাপানে পাড়ি দিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) তিনি একমাসের জন্য জাপান ভ্রমণে গেলেন।

ডাঃ রায় যখন জাপানে ছিলেন, তখন প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভয়ংকর বন্যা হইয়াছিল। রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়াছিল বন্যার কবলে। ৭ই অক্টোবর দেশে ফিরিয়া ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ কমিটি গঠন করিলেন। কমিটির কার্যালয় বসিল তাঁহারই বাসভবনে। বন্যার্তদের জন্য তিনি মুক্তহস্তে দানের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানাইলেন। সে আহ্বানে অভাবিতপূর্ব সাড়া মিলিল, ধনী, মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, বালক-বালিকা যে যাহা পারিল, তাহা দান করিল। ডাঃ রায় অসামান্য দক্ষতার সহিত এই ভয়ংকর বন্যার মোকাবিলা করিলেন। তিনি বন্যার হাত হইতে ঘরবাড়ি বাঁচাইবার জন্য "নিজের গৃহ নিজে বানাও" প্রকল্প গ্রহণ করিলেন। ইহাতে স্থির হইল, গ্রামবাসীরা নিজ মেহনতে ও ব্যয়ে কাঁচা ইট প্রস্তুত করিবে, সরকার ইট পুড়াইবার জন্য কয়লা দিবেন। বাড়ির ছাদের জন্য সরকার হইতে করোগেটেড টিনও দেওয়া হইবে।

এই বৎসরের স্মরণীয় ঘটনা আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাইয়ের ভারত আগমন। তাঁহারা উভয়েই কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং ডাঃ রায় তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চৌ-এন্-লাইকে সংবর্ধনা জানাইবার জন্য বিমানবন্দরে এবং দমদম বিমানবন্দর হইতে রাজভবন পর্যন্ত পথের দুইধারে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড় হইয়াছিল।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হইল প্রজাতন্ত্রী ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। তাই ১৯৫৬ সালের নভেম্বর হইতেই শুরু হইল তাহার প্রস্তুতি-পর্ব। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনের সহিত এবারের নির্বাচনের কিছুটা অমিল ছিল, বিশেষতঃ বিরোধী শিবিরে জোট বাঁধিবার তোড়জোড় লইয়া। প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি যাহার নেতা ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এবার কমিউনিস্ট পার্টির সহিত নির্বাচনী সমঝওতা ও আতাত গড়িবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইলেন। শেষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, মার্ক্‌সিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, রিভল্যুসনারি সোস্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি জোটবদ্ধ হইলেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি যেখানে ৭০ জন প্রার্থী দিয়াছিলেন, এবার সেখানে তাঁহারা প্রার্থী দিলেন ১০১ জন। প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি প্রার্থী দিলেন ৭০ জন। ফরওয়ার্ড ব্লক দিলেন ২৬ জন। অন্যান্যরাও প্রার্থী দিলেন ১০-১৫ জন করিয়া। জোটের একদলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জোটের অন্য দল প্রার্থী দিবেন না এবং সকলেই একযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচার-অভিযান চালাইবেন, স্থির হইল।

কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা ডাঃ রায় ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার

জন্য কলিকাতার বেলিয়াঘাটায় নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। এই অধিবেশনে দেশী বিদেশী বহু সমস্যা আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইলেও কংগ্রেসের বড় বড় সব নেতাই পশ্চিমবঙ্গে পদার্পণ করায় এবং কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিবরণগুলি সংবাদপত্রে ফলাও ভাবে ছাপা হওয়ায় মার্জারের প্রশ্নে কাবু হইয়া পড়া কংগ্রেস পুনরায় হৃত উদ্যম ও শক্তি লাভ করিল।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন হইবে, একথা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করিলেন। জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নিবাচন শুরু হইবে ১লা মার্চ এবং শেষ হইবে ১৪ই মার্চ। পরে এই তারিখ বাড়াইয়া করা হয় ৩১শে মার্চ। ঐ সময় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দিনে নির্বাচন হইত এবং যে সকল কেন্দ্রের নির্বাচন হইয়া যাইত, তাহার ফলাফল অন্যান্য কেন্দ্রের নির্বাচন শেষ হইবার আগেই বাহির হইত। নির্বাচনে কংগ্রেসের ফল গ্রামাঞ্চলে ভালোই হইত, তাই গ্রামাঞ্চলে কলিকাতায় নির্বাচন হওয়ার আগে নির্বাচন হইলে তাহার ফলাফলের প্রভাব কলিকাতার নির্বাচনে পড়িত এবং কংগ্রেস তাহাতে কিছুটা উপরি সুবিধা পাইত। সকল কেন্দ্রেব নির্বাচন শেষ হইবার পূর্বে এইভাবে ফলাফল ঘোষণার বিরোধিতা করিতেছিলেন বামপন্থীরা। কিন্তু তাহাতে কোনও ফললাভ হয় নাই। যাহাই হউক, কলিকাতায় নির্বাচন কোন্ তারিখে হইবে, তাহা আগে হইবে, না পরে হইবে, তাহা ঘোষিত না হওয়ায় সকলের মনেই কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাঃ রায় ইন্দোরে কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। অধিবেশনশেষেই তিনি দ্রুত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, নির্বাচনী সংগঠন গড়িয়া তোলার মতো একটি জরুরি কাজ এখানে অপেক্ষা করিতেছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের উদবোধন করিতে কলিকাতায় আসিলেন। ডাঃ রায় ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের স্থায়ী সভাপতি। তাই প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী দুইজনেই বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভাষণ দিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া নির্বাচনী অভিযান শুরু করিবার এই সুযোগ প্রদেশ কংগ্রেস তথা ডাঃ রায় ছাড়িলেন না। ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে স্বাধীনতালাভের পর বিগত দশ বৎসর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত কতখানি উন্নতি করিয়াছে, তাহার বিবরণ দিলেন।

২৩শে জানুয়ারি মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার লোকসভার ও বিধানসভার নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক তারিখগুলি ঘোষণা করিলেন। ১লা মার্চ হইতে অন্যান্য অঞ্চলে ভোটগ্রহণ শুরু হইবে, কলিকাতায় ভোটগ্রহণ হইবে ১৪ই মার্চ এবং কলিকাতায় ভোটগ্রহণের ফলাফল ঘোষিত হইবে ১৭ই মার্চ।

এবারও ডাঃ রায় বহুবাজার কেন্দ্র হইতে বিধানসভায় প্রার্থী হইলেন। বহুবাজার কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হইল এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী ভারতীয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাস। ৬৩, ২২৯টি ভোটের মধ্যে মুসলিম ভোট প্রায় ২৯০০০। তাই অনভিজ্ঞ ও বহিরাগত কর্মীদের দ্বারা এই অঞ্চলে নির্বাচনী অভিযান চালানো সম্ভব নহে। যাহারা ইহাদের সহিত মিশিতে পারে, ইহাদের ভাষায় কথা বলিতে পারে, এমন সব কর্মীর একান্তই দরকার।

২রা ফেব্রুয়ারি সারা কলিকাতা এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল হইয়া গেল। বহুবাজার কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টি মহম্মদ ইসমাইল নামে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়াছে। পরবর্তী কালে মহম্মদ ইসমাইল প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট নেতা বলিয়া পরিচিত হইলেও তখন তিনি ছিলেন অখ্যাত। সাধারণ লোকে বলিতে লাগিল মহম্মদ ইসমাইল একজন ট্রাম-কন্‌ডাক্টর, কমিউনিস্ট পার্টি খুব চালই চালিয়াছে—ডাঃ রায় জিতিলে বলিবে, ভারি তো জিতিয়াছেন, একজন ট্রাম-কন্‌ডাক্টরকে হারাইয়াছেন, আবার হারিলে বলিবে, দুয়ো ডাঃ রায় ট্রাম-কন্‌ডাক্টরের কাছে হারিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেস-কর্মীরা প্রধান বিরোধী প্রার্থীকে একজন সাধারণ অখ্যাত লোক হওয়ায় জয় সহজেই হইবে ধরিয়া লইলেন যাহাই হউক, নির্বাচনী কাজকর্ম পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। নির্বাচনী কার্যালয় হইল ডাঃ রায়ের নিজের বাড়িতেই। ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচার অভিযান চালাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নির্বাচন যতোই আগাইয়া আসিল, ততোই ডাঃ রায়ের নির্বাচনী কেন্দ্রের কর্মীরা অনেকেই ডাঃ রায়কে বহুবাজার কেন্দ্রের দিকে একটু নজর দিতে অনুরোধ করিলেন। ১লা মার্চ হইতে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচন শুরু হইয়াছিল, তাহার ফলাফল কংগ্রেসের অনুকূলেই ছিল; সুতরাং তাহার প্রভাব যে কলিকাতাতেও পড়িবে, এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তবু ডাঃ রায় নির্বাচনের কয়েকদিন আগে হইতে নিজের কেন্দ্রের প্রতি মন দিলেন। তিনি সভা-সমিতি না করিয়া নির্বাচনী এলাকায় পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিতে লাগিলেন, প্রত্যেকটি বস্তিতে গেলেন, ছোট ছোট ব্যবসায়ী দোকানদার, গৃহস্থ, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে তিনি কি অক্লান্ত কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহা শত্রু-মিত্র সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিল। মুসলমানরা এই কেন্দ্রে ভোটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইবে জানিয়া তিনি মুসলমানপ্রধান এলাকাতেও সফর করিলেন এবং নাখোদা মসজিদে গেলেন। নাখোদা মসজিদের ইমাম তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। কিন্তু অসতর্কতার জন্য একটি ঘটনা ঘটিল, নির্বাচনে যাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। নাখোদা মসজিদে যাইবার সময়ে যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহাদের মধ্যে এমন লোক ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে যে বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

যাহাই হউক, ১৪ই মার্চ শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোটপর্ব শেষ হইল। বিরোধীদের মধ্যে বিজয়োল্লাস প্রকট হইয়া উঠিল, তাহারা বিজয়-মিছিল পর্যন্ত বাহির করিল। ডাঃ রায়ের নির্বাচনী কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। ডাঃ রায় তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, দুশ্চিন্তার কি আছে, আমি পরাজিত হইলেও কংগ্রেস বিজয়ী হইবে। ইতিপূর্বে নির্বাচনের যেসব ফল বাহির হইয়াছিল, তাহাতে কংগ্রেস যথেষ্ট পরিমাণে সফল হইয়াছিল। গত সাধারণ নির্বাচনে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন, যেমন প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রভৃতি, তাঁহারা বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

অবশেষে আসিল ভোটগণনার দিন, ১৭ই মার্চ। সেদিন ছিল রবিবার। ডাঃ রায় রোজকার মতো সকালে রোগী দেখিয়া কয়েকজন অতিথি ও কর্মীর সহিত কথা বলিয়া মহাকরণে চলিয়া গেলেন। তিনি রোজকার মতো ফাইল দেখিলেন, কতকগুলি চিঠির ডিক্টেশন দিলেন। ভোটের ফলাফল ও ডাঃ রায়ের বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ সঞ্চার করিয়াছিল। তাই মহাকরণে তাঁহারা অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় বেলা বারোটার সময়ে ১৮টি ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রের ভোটগণনার ফলাফল জানা গেল, তখন ডাঃ রায়ের চেয়ে মহম্মদ ইসমাইল আগাইয়া আছেন ১২০০ ভোটে। ডাঃ রায় অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, "এতোটা তফাত?"

তারপর মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিলেন। অন্যান্য দিন তাঁহার আহারের সময় আত্মীয়স্বজনরা কেহ উপস্থিত থাকিতেন না। আজ কিন্তু বিশেষ অবস্থায় তাহারা উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রায় আহারশেষে বিশ্রাম করিতে গেলেন। সেদিন কিছুক্ষণ ঘুমাইলেনও। তারপর বেলা প্রায় আড়াইটার সময়ে বিশ্রামকক্ষ হইতে তাঁহার ঘরে আসিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে আরও ৩২টি কেন্দ্রের ফলাফল বাহির হইয়াছিল। এখন ব্যবধান কমিয়া দাঁড়াইয়াছিল ৫০০-তে। ক্রমেই উত্তেজনা বাড়িতে লাগিল। কি-হয়, কি-হয় ভাব ফুটিয়া উঠিল সকলের মুখে-চোখে। আরও ১০টি কেন্দ্রের ভোট-গণনার ফল ডাঃ রায়কে আগাইয়া দিল ১০০ ভোটে। ক্রমেই ডাঃ রায়ের অনুকূলে ভোটের ব্যবধান বাড়িতে লাগিল। বিকালের দিকে তাহা দাঁড়াইল ৩১৪ ভোটে। শেষের কয়েকটি ভোটের বাক্স ডঃ রায়কে আগাইয়াদিল ৪৩০ ভোটে। ডাকযোগে আসা ব্যালট ভোটগুলি এই সংখ্যাকে পৌছাইয়া দিল ৫৪০-এ। সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত সকলেই রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল। মহাকরণে ও সংবাদপত্রের অফিসগুলিতে অবিরাম টেলিফোনগুলি ক্রিং ক্রিং বাজিতেছিল, কি খবর? কি খবর? ঐ সময় চূড়ান্ত ফল ঘোষিত হইল। হাজার হাজার মানুষের জনতা ডাঃ রায়কে উল্লসিত অভিনন্দন

জানাইল। সকলে যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সেজন্য তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন।

শহরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা আগে হইতেই করা হইয়াছিল। তবুও এখানে-ওখানে কংগেসী ও বিরোধী সমর্থকদের মধ্যে কিছু-কিছু সংঘর্ষ ঘটিল।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনেও কংগ্রেস ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হইল। তবে এবার বিরোধীদের আসনসংখ্যা ৫৭ হইতে বাড়িয়া ৮০ হইয়াছিল। ডাঃ রায়কেই কংগ্রেস সংসদীয় দল পুনরায় নেতা নির্বাচিত করিল। ডাঃ রায় পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন।

ডাঃ রায়ের এত অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ দিল্লিকেও বিস্মিত করিয়াছিল। এক বৎসর পূর্বের বিহার-পশ্চিমবঙ্গ মার্জারের প্রশ্ন এবং মুসলিম ভোটদাতাদের কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব যে এই স্বল্প ভোটের ব্যবধানের জন্য দায়ী ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কংগ্রেসকর্মীদের আত্মসন্তুষ্টিও যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল।

কলিকাতায় কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের শক্তির পিছনে ছিল পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুর দল এবং অগণিত বস্তিবাসীরা। ডাঃ রায় উদ্‌বাস্তু-সমস্যার সমাধানের জন্য আগাগোড়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্যা এত বিরাট ও জটিল ছিল যে, তাহার সমাধান সহজসাধ্য ছিল না। ডাঃ রায় নির্বাচনের পরে কলিকাতার বস্তিগুলির উন্নতিসাধনের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। এইসব বস্তিতে ছিল পাঁচলক্ষ মানুষের বাস। নির্বাচনের সময় এরা কংগ্রেসবিরোধীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। তিনি বস্তিগুলির সংস্কারসাধন করিয়া ঐগুলিকে বামপন্থীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। আদর্শ গ্রাম রচনার জন্য তিনি কিছু-কিছু গ্রাম বাছিয়া লইয়া সেগুলির উন্নয়নের যে প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়েও তিনি এই সময়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন। এইসব কাজের জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের। ঐ সময় কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী ছিলেন টি. টি কৃষ্ণমাচারী। ডাঃ রায় তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আনাইলেন। মে মাসে কৃষ্ণমচারী কলিকাতা আসিলে ডাঃ রায় তাঁহার সহিত বস্তি উন্নয়নের প্রকল্প ও সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তিনি তাঁহার আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের কাজ দেখাইবার জন্য একদিন কৃষ্ণমচারীকে বর্ধমানের একটি গ্রামে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি গ্রামবাসীদের নিজের চেষ্টায় নিজ নিজ বাড়ি নির্মাণের কাজ দেখাইলেন। গত বিধ্বংসী বন্যার সময়ে ডাঃ রায় যে নিজের বাড়ি নিজে বানাও প্রকল্প চালু করিয়াছিলেন, তদনুসারে এখানে গ্রামবাসীরা ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার ইট তৈয়ার করিয়াছিল। এই প্রকল্প চালু রাখার জন্য তিনি কেন্দ্রের কাছে অর্থসাহায্য চাহিলেন।

এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকেও একটি চিঠি লেখেন। তাঁহার আদর্শ গ্রাম বাংলার এই প্রকল্প কৃষ্ণমাচারীর পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া জানান :

"তুমি জানো, গত বন্যায় প্রায় দুই লক্ষ গৃহ এখানে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। গ্রামবাসীদের বলা হইয়াছিল যে, যদি কোন লোক তাহার নিজের নিজের বাড়ি তৈয়ার করার জন্য ইট পুড়াইয়া তৈয়ার করিতে চায়, তবে তাহাকে কয়লা সরবরাহ করা হইবে। বাড়ির দেওয়াল হইয়া গেলে বাড়ির ছাদ তৈয়ার করিবার জন্য করোগেটেড টিন দেওয়া হইবে। আমরা কৃষ্ণমাচারীকে লইয়া যেখানে গিয়াছিলাম, সেখানে তাহারা নিজেরা ঐভাবে ৩৫টি বাড়ি তৈয়ার করা শেষ করিয়াছে অথবা করিতে যাইতেছে। নিজেদের কাজ যে নিজেরা করিতে পারিয়াছে, ইহাতে মানুষ কম আত্মপ্রসাদ লাভ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজের চেষ্টায় তিন মাসের মধ্যে ১০ কোটি ইট তৈয়ার করিয়া পুড়াইয়া লইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ইট তৈয়ারি হয় ১০০ কোটি। আর তার বেশির ভাগ করে পেশাদার ইটের কারখানা। ইটের শতকরা দশ ভাগ তৈয়ার করে লোকে নিজেরা। এইভাবে নিজেরা ইট তৈয়ার করিয়া লওয়ায় বারান্দাসমেত একখানা বাড়ির দাম পড়ে প্রায় ৩০০ টাকা। এইভাবে লোকে যে কতখানি স্বাবলম্বী হইয়াছে তাহা দেখিলে আনন্দ হয়।

আমি কৃষ্ণমাচারীকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে বলিয়াছি।

বিকালে দুইটি জরুরি সমস্যা লইয়া আমরা আলোচনা করিলাম। একটি হইতেছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অন্যটি হইতেছে কলিকাতা শহরের বস্তি-উন্নয়ন। তুমি জানো, গত নির্বাচনে শহরে এবং শিল্পাঞ্চলে আমরা ভীষণভাবে হারিয়া গিয়াছিলাম প্রধানতঃ দুইটি কারণে- একটি হইতেছে যেখানে উদ্বাস্তুরা তাহাদের অস্থায়ী শিবিরগুলিতে জড়ো হইয়াছে, সেখানে তাহাদের অবস্থায় যে তাহারা আদৌ খুশি নয়, তাহা দেখাইবার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে তাহারা ভোট দিয়াছে। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে—আমরা গ্রামে যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিয়াছি, সেখানে আমরা শহরগুলিতে কিছুই করি নাই। কলিকাতা পুরানো সেই যুগের নোংরা কলিকাতাই রহিয়া গিয়াছে। তাহার উপর বাড়িয়াছে আরও জনসংখ্যা, বাড়িয়াছে আরও অপরিচ্ছন্নতা।"

জুন মাসে নূতন বিধান-সভায় ডাঃ রায় ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ করিলেন। এবারও বাজেটে ঘাটতি ছিল ১৩ কোটিরও বেশি। তিনি তাঁহার বাজেট-ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি মূল সমস্যার কথা আবার তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন, অত্যধিক জনসংখ্যার জন্য রাজ্যের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে। প্রচুর সংখ্যায় পুরাতন উদ্বাস্তুরা এখানে রহিয়াছে, তাহার উপর ক্রমাগত পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) হইতে আরও লোক আসিতে থাকায় সমস্যাকে জটিলতর করিয়াছে। পৃথিবীর সর্বাধিক

ঘনবসতিপূর্ণ স্থান হইতেছে কলিকাতা। আর গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৭০ ভাগ কৃষক-পরিবার তাহাদের সংবৎসরের খাদ্যও উৎপন্ন করিতে পারে না। শিল্পাঞ্চলে এ রাজ্যের অধিবাসীরা দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ পায় না। সেখানে বাহিরের লোকের ভিড় ও প্রতিপত্তি বেশী।

কেন্দ্রীয় সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য সংক্রান্ত ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছেন, সে সম্পর্কেও তিনি বলিতে দ্বিধা করিলেন না। কেবল কৃষিজাত সম্পদের উপর রাজ্য সরকার কর বসাইতে পারে, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে কোন কর বসাইবার অধিকার তাহার নাই। এক্ষেত্রে রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন।

১লা জুলাই ডাঃ রায়ের ৭৬তম জন্মদিবস পালিত হইল। তাহার জন্মদিবস একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছিল বলা চলে। সকাল হইতেই দলে দলে আত্মীয়স্বজন ও ভক্তের দল আসিয়া ভীড় করিতেন ফুল, ফল ও মিষ্ট লইয়া। ডাঃ রায় ফুল, ফল ও মিষ্ট হাসপাতালের রোগী ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। টাকাকড়ি, হাতে-বোনা ধুতি-চাদর ও অন্যান্য নানা জিনিস-ও উপহার রূপে আসিত। ঐসব টাকাকড়ি তাঁহার দাতব্য ভাণ্ডারে জমা হইত; তাহা তিনি গরীব ছাত্রছাত্রী ও গরীব মানুষদের দিতেন—ঐসব ছাত্রছাত্রী ও মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল উদ্‌বাস্তু।

কিন্তু এই বৎসর ডাঃ রায়কে একটি ভয়ংকর সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইল। মিল-মালিকরা অত্যধিক পরিমাণে চাউল তাঁহাদের মিলগুলিতে মজুদ করিয়া রাখিল এবং বাজারে ছাড়িল না। ফলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল এবং খাদ্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। যে চাউল প্রতি সের ছয় আনায় বিক্রয় হইত, তাহা এখন প্রতি সের এক টাকায় দাঁড়াইল। খাদ্যাভাব ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধী দলগুলি আন্দোলন শুরু করিলেন। আন্দোলন যাহাতে হিংসাত্মক আকার ধারণ না করে, সেজন্য কলিকাতার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হইল। ১১টি বিরোধী দল খাদ্য-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য যে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার ডাকে কলিকাতায় কৃষকশ্রেণীর একটি মিছিলে আসিলে ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে ৭২৬ জন লোককে গেপ্তার করা হইল। মিছিল পরিচালনার জন্য ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন সেন, জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু প্রভৃতি নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হইল। আন্দোলনের নেতারা ডাঃ রায়ের সহিত দেখা করিতে চাহিলে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। প্রকৃত খাদ্যাভাব ছিল এবং সেই অভাবের সুযোগে অসাধু মিল-মালিকরা প্রচুর মুনাফার লোভে চাউল বাজারে না ছাড়িয়া কালোবাজার সৃষ্টি করিয়াছিল। অথচ, মিল-মালিকদের নিকট হইতে মজুদ চাউল উদ্ধারের আইনগত কোনও ক্ষমতাও রাজ্য সরকারের ছিল না। সে বিষয়ে পূর্ব হইতেই

ডাঃ রায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঐ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী ছিলেন অজিতপ্রসাদ জৈন। তিনি এ বিষয়ে ডাঃ রায়ের সহিত আলোচনা করিয়া অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি মজুত আইন অনুসারে মিলগুলি হইতে চাউল লইবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গকে ষাট হাজার টন গম ও বিশ হাজার টন চাউল কেন্দ্র হইতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ডাঃ রায় কলিকাতায় সংশোধিত রেশনব্যবস্থা চালু করিয়া সাড়ে সতেরো টাকা মণ দরে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেন। সেই সঙ্গে মিল হইতে চাউল বাজারে আসিতে থাকায় খাদ্যাভাব ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইল।

ঠিক দুর্গাপূজার আগে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হওয়ায় আবার এক সমস্যা দেখা দিয়াছিল। ডাঃ রায়ের চেষ্টায় পূজার আগেই এই ধর্মঘটের মীমাংসা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মুখে পূজার আনন্দের হাসি আবার ফুটিয়া উঠে।

এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্যুতিক রেলপথের সূচনা। পূর্ব রেলওয়ে রেলপথ বৈদ্যুতীকরণের কাজ কিছু অংশে শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই অংশটি হইল হাওড়া হইতে শেওড়াফুলি পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার পথ। এই বৈদ্যুতিক রেলপথের উদ্বোধন করিবার জন্য ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ করিলেন। ১৪ই নভেম্বর বৈদ্যুতিক রেলপথ উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী জগজীবন রাম দিল্লি হইতে আসিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর সহিত ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রীও আসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মাননার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল।

সকালবেলা ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীকে লইয়া হাওড়া স্টেশনে গেলেন। সভাস্থলের কাছে নূতন বৈদ্যুতিক রেলগাড়িটি সজ্জিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চারিদিকে যেন জনসমুদ্র। প্রচুর পুলিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু পুলিসের পক্ষে এই ভিড় ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর নেতারা যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেই জনসমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিল। লোকে রেলিং টপকাইয়া, কোথাও কোথাও রেলিং ভাঙিয়া, পুলিসের বেষ্টনী ছিন্নভিন্ন করিয়া বন্যার স্রোতের মতো ঢুকিয়া পড়িল। মানুষ ছুটিল ট্রেনে একটু জায়গা পাইবার জন্য। এই দৌড়াদৌড়ি ও ঠেলাঠেলির ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া পায়ের তলায় পিষিয়া মরিল তিনজন, বহু লোক আহত হইল। এই ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা প্রধান-মন্ত্রী জানিলেন না। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলিলেন, "রেলের বৈদ্যুতীকরণ নূতন নয়, তবে ভারতের এই অংশে নূতন। পৃথিবী আধুনিক যুগে অনেক আগাইয়া গিয়াছে, এখন সে আগাইয়া চলিয়াছে বৈদ্যুতিক যুগের মধ্য দিয়া।"

এই বৎসরই শীতকালীন অধিবেশনে ডাঃ রায় বিধানসভায় একটি নূতন রীতি চালু করিয়াছিলেন—বিরোধী পক্ষের নেতার জন্য বেতন ও ভাতা। শীতকালীন অধিবেশনে যেসব সরকারী বিল আনা হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে একটি ছিল 'বিধানসভা-সদস্য বেতন বিল'। ঐ বিলেই বিরোধী পক্ষের নেতার জন্য মাসিক ১২০০ টাকা বেতন ও ভাতা ধার্য করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিরোধী দল ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বা সি. পি. আই.। বিধান সভায় ঐ দলের নেতা ছিলেন জ্যোতি বসু। ঐ বিল পাস হইয়াছিল। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জ্যোতি বসু এবং পরে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যতদিন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, ততদিন তাঁহারা কেহই ঐ ভাতা ও বেতন লন নাই।

ঐ সময়ে বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসুর সহিত তাঁহার কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহার বর্ণনা ডাঃ রায়ের ব্যক্তিগত সচিব সরোজ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' পুস্তকে সুন্দরভাবে দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

"১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে বিরোধী পক্ষের নেতা হিসাবে তাঁর (জ্যোতি বসুর) ভূমিকার পরিচয় বিধানসভা বিতর্কের নথিপত্রে ভর্তি হয়ে আছে এবং একক ব্যক্তি হিসাবে সংসদীয় বিতর্কে তাঁর অবদান সম্ভবত রাজ্য বিধানসভাগুলিতে অতুলনীয় বলে আখ্যাত হয়ে আছে। দর্শকদের গ্যালারি উপচে পড়ত—ডাঃ বি. সি. রায়ের সরকারকে তিনি যেভাবে আক্রমণ করতেন তা শোনবার জন্য এবং ডাঃ বি. সি. রায়-ও আবার যেভাবে তাকে চোখা চোখা কথায় উত্তর দিতেন, তাও শুনতে লোকের সমান আগ্রহ হ'ত। তবু এই দুই নেতাকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে বলে একটা বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় ছিলাম। আমি জানতাম, এঁদের দুজনের মধ্যে অন্তরালে প্রবাহিত পারস্পরিক একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব ছিল। ১৯৬২-র নির্বাচনের সময় আমি স্বয়ং ডাঃ রায়ের কাছ থেকে শুনেছি, দুজনের মধ্যে এই সমঝোতা ছিল যে, কেউই একে অন্যের নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে জনসভা করবেন না বা প্রকাশ্যে কোনটির তদারকি করবেন না। ১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছাড়া আর কখনো কেউ এই অলিখিত চুক্তি ভাঙেন নি। ডাঃ রায়ের বাড়িতে বিরোধী পক্ষের নেতা যখন কফি খেতে খেতে ওঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন দুজনে একেবারে অন্য মানুষ। আমি এই ঘটনা বহুবার দেখেছি। দেখেছি, কী খুশি মনেই না দুজনে কথাবার্তা বলেছেন। অথচ এই দুজনেরই আবার বিধানসভায় বা জনসভায় দেখেছি অন্য মূর্তি। রাজনীতিকদের লীলা কী দুর্জ্ঞেয়! বিরোধী পক্ষের নেতাকে কিন্তু আমি কখনো দেখিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সুবিধা চাইতে কিংবা এমন কাজ করতে যাতে তাঁর বা তাঁর দলের পক্ষে একটা আপসের মনোভাব প্রকাশ পায়। বিরোধী

পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে ব্যবহারে ডাঃ রায় অত্যন্ত সুবিবেচক ছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী একজনের মতো কখনো দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ পথে পা ফেলেন নি। ..."

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রধান মন্ত্রী শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার কলিকাতা আসার কথা এবং এখানে তাঁহার সহিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাঃ রায়ের যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডাঃ রায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জ্বর হইল, তিনি খুবই দুর্বল হইয়া পড়িলেন। সকলেই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মতো ডাক্তার অসুস্থ হইলে তাঁহার চিকিৎসা করিবে কে? সরোজবাবু এ প্রসঙ্গে একটি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে ডাঃ রায়ের রসিকতাপ্রিয়তা সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :

"মনে পড়লো পুরানো দিনের একটা কথা। ১৯৪৮ সালে তাঁর এরকম জ্বর হয়ে পড়লে তাঁর অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার তাকে বলেছিলেন, 'আপনার অসুখ হলে কে আপনার চিকিৎসা করে?'

ডাঃ রায় উত্তর দিয়েছিলেন: বিধান রায়—আয়নার দিকে তাকাই, আর অমনি সেই প্রতিচ্ছবির বি. সি. রায় আমার চিকিৎসা করে, আমিও ভালো হয়ে যাই।"

কয়েক দিন বাদে ডাঃ রায় একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেই তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য দীঘা রওনা হইলেন। তাহার স্বাস্থ্য বেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

বিধানচন্দ্রের অন্যান্য অনেক কীর্তির অন্যতম দীঘা। ইংরেজরা যখন প্রথম এদেশে রাজত্ব শুরু করিয়াছিল, তখন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের দৃষ্টি পড়িয়াছিল মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার এই শান্ত সমুদ্রসৈকতের উপর। তিনি মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া তাঁহার স্বদেশের শান্ত সমুদ্রসৈকতের অভাব এখানে মিটাইতেন। ডাঃ রায়ের সর্বদাই লক্ষ্য ছিল বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া তাহার আর্থিক উন্নতিবিধানের। ডাঃ রায় দেখিতেন, প্রতি বৎসর অসংখ্য ধনী ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র উপকূলে যায় এবং ডাক্তার হিসাবে তিনিও বহু রোগীকে সমুদ্র-উপকূলের শুষ্ক লবণাক্ত জলবায়ু সেবনের জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু দীঘাকে যদি ঐরূপ একটি ভ্রমণোপযোগী স্থান করিয়া তোলা যায়, তবে বাঙ্গালী ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা অন্য প্রদেশের সমুদ্র উপকূলে গিয়া স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গেই থাকিয়া যাইবে; তাহা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পক্ষে কিছুটা সহায়ক হইবে। তাই ডাঃ রায় দীঘাকে ভ্রমণস্থানের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে অখ্যাত দীঘা একটি সুখ্যাত স্থান অধিকার করে।

বাঙ্গালী স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য অন্য প্রদেশে গিয়া যে অর্থ ব্যয় করে, তাহা নিবারণের জন্য তিনি বীরভূমের বক্রেশ্বরকেও একটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান অনেক রোগের পক্ষে উপকারী। বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণকে সেই কাজে লাগাইবার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা তাঁহার ছিল। অবশ্য, দীঘার মতো বক্রেশ্বরের উন্নতিসাধন তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ডাঃ রায় দীঘায় নাড়াজোলের রাজার বাড়িতে ছিলেন। সমুদ্রের জলবায়ু এবং নাড়াজোলের রাজার স্ত্রী অঞ্জলি খানের সেবাযত্নে ডাঃ রায় অল্পকালের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ডাঃ রায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ করিলেন বিধানসভায়। পরদিন (১৯শে ফেব্রুয়ারি) দিল্লি হইতে সংবাদ আসিল তাঁহার দীর্ঘকালের বন্ধু কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের পক্ষাঘাতসূচক স্ট্রোক হইয়াছে এবং তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই বৃদ্ধ বয়সেও বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া বিকালের বিমানেই তিনি দিল্লিতে ছুটিলেন এবং দিল্লি পৌঁছিয়া মওলানা সাহেবের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া পরদিনই কলিকাতা ফিরিলেন। কারণ, তখন বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলিতেছিল এবং অর্থমন্ত্রীরূপে তাঁহার উপস্থিতিব একান্ত প্রয়োজন ছিল। মওলানা আজাদ সাময়িকভাবে একটু সুস্থ ছিলেন। আবার ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁহাকে ফোনে জানাইলেন যে, ডাঃ রায়কে এখনই একবার দিল্লি যাইতে হইবে। পরদিন সকালের বিমানেই ডাঃ রায় আবার দিল্লি ছুটিলেন। কলিকাতা ও দিল্লি যেন শহরের এপাড়া-ওপাড়া, ডাক্তারকে কল্ দিলেই ডাক্তার ছুটিয়া আসেন। কিন্তু তাহাতেও এই ৭৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ দৃক্‌পাত করিতেন না। এমনই ছিল তাঁহার প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তি। কিন্তু মওলানাকে বাঁচানো গেল না। পরদিন রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

প্রতিপক্ষ ডাঃ রায়কে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্যও সচেষ্ট ছিল। ডাঃ রায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসলেন। বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের সদস্য যতীন চক্রবর্তী তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনিলেন। অভিযোগে বলা হইল, দক্ষিণ কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে রোল্যাণ্ড রোডের উপর ডাঃ রায় বর্ধমানের মহারাজার নিকট হইতে এক একর জমি কিনিয়াছিলেন। সরকার বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ মুখ্যমন্ত্রীর যোগ-সাজসে বেশি দাম দিয়া কেনায় বর্ধমানের মহারাজা মুখ্যমন্ত্রীকে অল্পমূল্যে রোল্যাণ্ড রোডের জমি দিয়াছেন। অধ্যক্ষ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দিন ধার্য করিলে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ডাঃ রায় একরাশি দলিল ও কাগজপত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, তিনি রোল্যাণ্ড রোডের জমির জন্য কম দাম দেন নাই এবং বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ কেনার জন্যও সরকার বেশী দাম দেন নাই। বর্ধমানের বিশাল রাজপ্রাসাদের

যে ন্যায্য মূল্য ধার্য হইয়াছিল, সরকার তাহা অপেক্ষা অনেক কমই দিয়াছিলেন, সরকার মাত্র দুই লক্ষ টাকায় ঐ প্রাসাদ কিনিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে, তিনি তাঁর জমি কিনিয়াছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায়। ঐ টাকা তিনি নগদ দেন নাই, দিয়াছিলেন চেকে। এবং ঐ টাকা তিনি তাঁহার ৩৬ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ি বন্ধক রাখিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পরে ডাঃ রায় ঐ জমিতে একটি দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল ঐ গৃহে তিনি জীবনের শেষ কয় বৎসর বাস করিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই, ঐ গৃহপ্রবেশের পূর্বেই ডাঃ রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ধোপে না টিকিলেও সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ক্রমেই উঠিতে লাগিল। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের অন্যতম প্রার্থীরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র প্রখ্যাত ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দক্ষিণ কলিকাতা হইতে বিজয়ী হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ডাঃ রায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র। নূতন মন্ত্রিসভায় তিনি আইনমন্ত্রী রূপে যোগ দিয়া যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু নানাবিষয়ে ডাঃ রায়ের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটিতে লাগিল। ফলে ১৯৫৮ সালের মার্চমাসে সিদ্ধার্থশঙ্কর ডাঃ রায়ের নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করিলেন। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ এই প্রথম। ডাঃ রায় অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রিসভা হইতে কাহাকে-কাহাকেও পদচ্যুত করিলেও বা বাদ দিলেও তিনি তাঁহাদিগকে পরে মন্ত্রিসভায় স্থান দিতেন, এরকম দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা হইতে এ পর্যন্ত কেহই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন নাই। সিদ্ধার্থশঙ্করের পদত্যাগের ব্যাপারটি ডাঃ রায় গোপন রাখিয়া ঐদিন সন্ধ্যায় নিজেই তিনি সিদ্ধার্থবাবুর বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু নিজ সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন। সিদ্ধার্থবাবুর পদত্যাগের কথা গোপন রাখা গেল না। বিধানসভার তৎকালীন অধ্যক্ষ শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮শে মার্চ তারিখে তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কে বিবৃতিদানের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিলেন। সভাকক্ষ সেদিন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। সিদ্ধার্থবাবু পুরো তিন ঘণ্টা তাহার পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রী হইবার ছয়মাস পরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, প্রশাসন চালাইতে গেলে জনসাধারণের আস্থা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই আস্থা অর্জন করিতে গেলে কয়েকটি কাজ অবশ্যই করা দরকার। এ বিষয়ে তিনি ছয়টি প্রস্তাব দেন :

(১) একজন দপ্তরহীন মন্ত্রী নিয়োগ। এই মন্ত্রী সর্বদা জেলাগুলিতে ভ্রমণ করিয়া দেখিবেন যে, সরকারী প্রকল্পের কাজগুলি ঠিকমতো রূপায়িত হইতেছে কিনা। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনও হইবে তাঁহার অন্যতম কাজ।

(২) কেবল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন। কারণ, খাদ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না।

(৩) খাদ্য ও কৃষি বিভাগ দুইটিকে এক বিভাগে পরিণত করিয়া একজন পূর্ণ মন্ত্রীর হাতে উহার দায়িত্ব দিতে হইবে।

(৪) অর্থ বিভাগেব জন্য একজন পৃথক মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হইবে, যিনি কেবল অর্থ বিভাগই দেখিবেন, অন্য বিভাগ নয়।

(৫) কনস্ট্রাকশন বোর্ডেব পুনর্গঠন বা সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন।

(৬) সরকারী কর্মচারীদেব চাকবির নিয়মকানুনের আশু পরিবর্তন।

সিদ্ধার্থবাবু তাঁহার ভাষণে প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতিব অভিযোগ তুলেন এবং ঐ বিষয়ে তিনি প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের দপ্তবগুলিকেই বেশি দায়ী করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার দুইমাসেব মধ্যেই তিনি মন্ত্রিসভায় এই বিষয় তুলিয়াছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীব চেষ্টায় এবিষয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন কবা হয়। কিন্তু যে দুইজন মন্ত্রীব বিভাগ সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ সব চাইতে বেশি, সেই দুইজন মন্ত্রীবে—প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়কে—এই সাব-কমিটিতে রাখা হয়। ফলে উহাতে বিশেষ ফল হয় না।

দুর্নীতি উচ্ছেদ কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে হতাশ হইয়া সিদ্ধার্থবাবু আইনমন্ত্রী রূপে দুর্নীতিনিবোধক একটি আইন-প্রণয়নে সচেষ্ট হন। ঐ আইনের খসড়াও তিনি মুখ্যমন্ত্রীব কাছে পাঠান। পশ্চিমবঙ্গের চারিটি বিশেষ অনিষ্টকব বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা ছিল এই আইনে। সেগুলি হইতেছে: (১) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি, (২) ভেজাল খাদ্য বিক্রয়, (৩) খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুতকরণ; (৪) ভেজাল ঔষধ বিক্রয়। কিন্তু এই আইন করা হয় নাই। (অবশ্য ডাঃ রায় এই খসড়া-আইন সম্পর্কে অর্থসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে তাঁহাদের মতামতেব জন্য পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, দুর্নীতিরোধের জন্য নূতন কোন আইনেব প্রয়োজন নাই; যে সকল আইন আছে, সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ হইলেই দুর্নীতি নিরোধ হইতে পারে। তাই ডাঃ রায় নূতন আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন নাই।)

সিদ্ধার্থবাবু তাঁহার পদত্যাগের সমর্থনে বিবৃতি দেওয়ার তিনদিন পরেই বিরোধী পক্ষ কর্তৃক আনীত সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হইল। ডাঃ রায় সিদ্ধার্থশঙ্কর ও জ্যোতি বসু প্রমুখ বিরোধী পক্ষের বক্তাদের প্রায় সকল অভিযোগেরই উত্তর দিলেন। তীব্র বাদানুবাদ, চীৎকার-চেঁচামেচিতে তিনি এতটুকুও ধৈর্য হারাইলেন না। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সেদিন আলোচনা চলিয়াছিল। বিরোধী পক্ষের মোকাবিলা ডাঃ রায় একাই করিয়াছিলেন, সামান্য কিছুক্ষণ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক বিজয় সিংহ

নাহার বিতর্কে অংশ লইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার ধীশক্তি, মননশক্তি, ধৈর্য ও ক্লান্তিহীনতা সত্যই ছিল বিস্ময়ের বস্তু।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেবল মন্ত্রীত্বই ত্যাগ করিলেন না। বিধানসভার সদস্য-পদও ত্যাগ করিলেন এবং দক্ষিণ কলিকাতা হইতে নির্দল প্রার্থী রূপে পুনরায় বিধানসভায় প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন।

এই বৎসরই ডাঃ রায়কে আরও বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধিতা ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যাপার ছিল উদ্বাস্তু আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলন।

পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান সমস্যা ছিল উদ্বাস্তু ও তাহাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন। প্রায় ২৯ লক্ষ উদ্বাস্তুকে ইতিপূর্বেই রাজ্যের বাহিরে পুনর্বাসন বা আংশিক পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে এখনও প্রায় পঞ্চাশ হাজার উদ্বাস্তু ছিল। তাহাদের অনেকেই রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রতিশ্রুতিতে সরকারের নিকট বিশেষ সাহায্য লইয়াছিল। এখন ইহারা রাজ্যের বাহিরে যাইতে চাহিতেছিল না এবং ত্রাণশিবিরগুলিতে থাকিয়া সরকারী ডোল ও অন্যান্য সাহায্য দাবি করিতেছিল। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বছরে দশ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছিল। রাজ্যের আর্থিক সংস্থানের উপর ইহাতে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছিল। তাই উদ্বাস্তুদের যথাসম্ভব শীঘ্র রাজ্যের বাহিরে পাঠাইয়া তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে সরকার সচেষ্ট ছিলেন। রাজ্য বাহিরে যাইতে সম্মত হইয়া যাহারা সরকারের ৭০০ এককালীন অর্থসাহায্য লইয়াছিল, তাহারা এখন বাহিরে যাইতে সম্মত হইল না এবং নিয়মিত ডোল ও সরকারী সাহায্য দাবি করিয়া আন্দোলন শুরু করিল। কংগ্রেসবিরোধী প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি দলগুলি তাহাদিগকে সমর্থন করিতে লাগিল। অনেক আন্দোলনকারী উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হইল। ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের রাজ্যের বাহিরে যাওয়ার অনিচ্ছার কারণকে নিতান্ত অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। রাজ্যের বাহিরে গিয়া উদ্বাস্তু পরিবারগুলি যে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে ও হইতেছে, সে বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন এবং এইসব অসুবিধা দূর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের সহিত পরিপূর্ণ যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসি ও অব্যবস্থার ফলে তাঁহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। তাই ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের আন্দোলন সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুদিগকে রাজ্যের বাহিরে পাঠানো হইবে না এবং তাহাদিগকে আবার নিয়মিত ডোল ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হইবে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। ফলে উদ্বাস্তু আন্দোলন বন্ধ হইল।

উদ্বাস্তু আন্দোলন শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে আর একটি আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইল। বিরোধী দলের নেতারা একটি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠিয়া লইয়াছিলেন। এই কমিটি আন্দোলনের ডাক দিলেন। কমিটির পক্ষ হইতে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বিরোধী নেতা ডাঃ রায়ের বাড়িতে আসিয়া তাঁহাকে একটি স্মারকলিপি দিলেন। স্মারকলিপিতে দাবি করা হইল যে, সংশোধিত রেশনে দোকানগুলি হইতে সাড়ে সতেরো টাকা মণ দরে ভালো চাউল এবং পনেরো টাকা মণ দরে আটা বা গম দিতে হইবে, আয়নির্বিশেষে সকল পরিবারকেই সংশোধিত রেশনের আওতায় আনিতে হইবে। তাহা না করা হইলে কমিটি ১৩ই জুন (১৯৫৮) হইতে ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন শুরু করিবে। ডাঃ রায় টেস্ট রিলিফ ও অন্যান্য ত্রাণ-ব্যবস্থা, কৃষিঋণ দান ও সংশোধিত রেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবস্থা করায় কমিটি এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিল।

১লা জুলাই (১৯৫৮) ডাঃ রায়ের ৭৬তম জন্মদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমারোহের সহিত উদযাপিত হইল।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দেওয়ায় দক্ষিণ কলিকাতায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছিল এই জুলাই মাসে। বামপন্থী দলগুলির সমর্থনে সিদ্ধার্থবাবু নির্দল প্রার্থীরূপে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন কংগ্রেস প্রার্থীরূপে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী নেহরু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষকে একখানি পত্র লেখেন এবং সেই পত্রের নকল মুখ্যমন্ত্রীকেও পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া তিনি হতাশ হইতেছেন। দক্ষিণ কলিকাতায় সিদ্ধার্থ রায়ের সমর্থক কর্মীরা প্রচণ্ড উদ্যমে খাটিতেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস কর্মীরা কি করিতেছে তিনি জানেন না। তাঁহার মনে হইতেছে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কলিকাতার আশা ছাড়িয়া দিয়া গ্রামাঞ্চল লইয়াই বেশী ভাবিতেছে। গ্রামাঞ্চল উপেক্ষার বস্তু না হইলেও কলিকাতা যদি কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়, তাহা হইলে গ্রামাঞ্চলেও তাহার প্রভাব পড়িবে।

দক্ষিণ কলিকাতায় নির্বাচন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা আসিবার কথা শুনিয়া কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ ৩৯ জন কর্মী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া ডাঃ রায়কে চিঠি দেন। ডাঃ রায় প্রধান মন্ত্রীকে এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি লিখেন। তাহাতে তিনি বলেন :

"তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন তোমার সহিত দেখা করিবার সুযোগ চাহিয়া ৩৯ জন কংগ্রেস সদস্য আমার কাছে পত্র দিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কয়েকজন বিধানসভার সদস্য-ও আছেন। তাঁহাদের স্বাক্ষরিত পত্রটিও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আমার দৃঢ়

ধারণা, দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচনের স্বার্থে এই ধরনের বৈঠক কার্যকর হইবে না। প্রকৃতপক্ষে, আমি বিস্মিত হইব না যদি স্বাক্ষরকারীদের কাহারও মনের মধ্যে এই অভিসন্ধি থাকে যে, সিদ্ধার্থ যদি জিতে, তাহা হইলে অতুল্যবাবুকে সরিয়া যাইতে হইবে, আর সে যদি হারে, তবে অতুল্যবাবু থাকিয়া যাইবেন। সুতরাং সিদ্ধার্থ জিতুক।' অবশ্য, স্বাক্ষরকারীদের মতলবে কী দুষ্টামি আছে, তাহা বোঝা কঠিন। তবে এইটুকু বলিতে পারি, যদি তুমি এখানে আসো, তবে এই লোকগুলিকে সাক্ষাতের সুযোগ দিও না, যাহাতে আমাদের দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচনী-ব্যবস্থায় তাহারা নানা সৃষ্টি করিতে পারে। কংগ্রেসীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে দক্ষিণ কলিকাতায় আমাদের সাফল্যের আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে।" এখনও যে কংগ্রেসের মধ্যে একদল লোক ঘোঁট পাকাইতেছিলেন, ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

দক্ষিণ কলিকাতায় ২৪শে আগস্ট নির্বাচনের দিন ধার্য হইয়াছিল। সিদ্ধার্থবাবু ও জ্যোতিবাবু অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, নূতন ভোটার-তালিকায় ১১৭১ জনের নাম বাদ পড়িয়াছে। অস্থায়ী মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার কে. ভি. কে. সুন্দরম্ কলিকাতায় আসিয়া তদন্ত করিয়া দেখিলেন এবং তালিকা সংশোধনের নির্দেশ দিলেন। নির্দিষ্ট তারিখে ভোট প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে হইলেও দুই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটপর্ব চুকিল। পরদিন ভোটের ফলাফল বাহির হইল, সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেসপ্রার্থীর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ ভোট পাইয়া জিতিয়াছেন।

ভোটের লড়াই চুকিবার পরেই আবার এক লড়াই শুরু হইল—ট্রাম ধর্মঘটের লড়াই। এই ধর্মঘটে কংগ্রেসী ও কমিউনিস্ট শ্রমিক ইউনিয়নগুলি একযোগে ট্রাম কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়াছিল। তাহাদের দাবি ছিল কর্মীদের বেতন বাড়াইতে হইবে, বেতন-কাঠামো বদলাইতে হইবে, গ্র্যাচুইটি দিতে হইবে, ছুটি-ছাটার সুযোগ দিতে হইবে। কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং একজন ডিরেক্টর বিলাত হইতে ছুটিয়া আসিলেন। স্থানীয় অন্যতম ডিরেক্টর বদ্রীপ্রসাদ পোদ্দারকে সঙ্গে লইয়া তাহারা ডাঃ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহারা বলিলেন, কর্মীদের দাবি মিটাইবার মতো অর্থসঙ্গতি কোম্পানির নাই, প্রতি স্তরে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করিলে তাহারা কর্মীদের দাবি মানিয়া লইতে পারেন। ইতিমধ্যে কোম্পানি একতরফাভাবে ট্রামের ভাড়া বাড়াইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ডাঃ রায় একটি কড়া চিঠি লিখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইলে কোম্পানি এইরূপ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা স্থগিত রাখিল। ইহার পর কোম্পানি, কর্মী-সংগঠন ও সরকারের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। এবার ধর্মঘট চলিয়াছিল পুরা ৪১ দিন। ধর্মঘটে কর্মীদের এমন ঐক্য ও সংহতি অল্পই দেখা যায়। ডাঃ রায়ের মধ্যস্থতায় ও বিচক্ষণতায় শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের মীমাংসা হইল। কর্মীদের

বেতন শতকরা ৫ টাকা, ন্যূনপক্ষে ৫ টাকা বৃদ্ধি পাইল, মূল বেতন ও মহার্ঘভাতা মিলাইয়া যাহা হইবে তাহার ৬১/২ হইবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, চাকুরিকালের প্রত্যেক বৎসরের জন্য ১৫ দিনের মূল বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে গ্র্যাচুইটি। কোম্পানির আর্থিক সংগতি সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন বসিবে। এবং ধর্মঘটের সময়ে যেসব কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহারা মুক্তি পাইবেন।

দুর্গাপুরের উন্নতিসাধনের জন্য ডাঃ রায়ের চিন্তার অবধি ছিল না। দুর্গাপুরে ইস্পাত প্রকল্পের জন্য এক মনোরম আধুনিক শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শিল্প-নগরীর সহিত কলিকাতার সহজ সংযোগ সাধনের চিন্তা করিতেছিলেন তিনি। এজন্য তিনি কলিকাতা ও দুর্গাপুরের মধ্যে একটি দ্রুতগামী যান-চলাচলের উপযোগী পথ নির্মাণের কথা ভাবিতেছিলেন। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়া দুর্গাপুর-কলিকাতা জাতীয় সড়কের একটি নকশা প্রস্তুত করাইলেন এবং এজন্য ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবও প্রস্তুত করিলেন। তারপর দিল্লী চলিয়া গেলেন এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ও অর্থ-সাহায্যের জন্য। অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে, দুর্গাপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক নির্মিত হইবে। এ ধরনের সড়ক ভারতে এই প্রথম। এজন্য ব্যয় হইবে মোট ১৬ কোটি টাকা। ১৬ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটি টাকা দিবেন কেন্দ্রীয় সরকার, বাকী টাকার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিবেন এই রাস্তা দিয়া যেসব গাড়ি যাইবে তাহাদের উপর কর বসাইয়া। এই সড়ক নির্মিত হইয়াছে. দুর্গাপুর ও কলিকাতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ও সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ রায়ের অগণিত কীর্তির মধ্যে ইহাও অন্যতম।

ডাঃ রায় অক্টোবর মাসে (১৯৫৯) পুনরায় ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে গেলেন। উপলক্ষ্য ছিল তাঁহার ডান চোখটি ভিয়েনার একজন বড় সার্জনকে দিয়া পরীক্ষা করানো। ১৭ই অক্টোবর তিনি বোম্বাই হইতে বিমানে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। ভিয়েনাতে তিনি বিখ্যাত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বককে চোখ দেখাইলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ভিয়েনাতেই তাঁহার চোখটির শল্য-চিকিৎসা করিয়াছিলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ লিণ্ডনার। ডাঃ লিণ্ডনারের স্থলে এখন ডাঃ বক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডাঃ বক ডাঃ রায়ের চক্ষু পরীক্ষা করিলেন এবং ভারতে আসিয়া তাঁহার চক্ষু অপারেশন করিতে রাজী হইলেন। এক বৎসর পরে ডাঃ বক ভারতে আসিয়াছিলেন এবং দার্জিলিংয়ে ডাঃ রায়ের চক্ষুতে অপারেশন করিয়াছিলেন।

ডাঃ রায় যতবারই বিদেশে গিয়াছেন, ততবারই তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্পের

জন্য নানা প্রকার সাহায্যের সন্ধান করিয়াছেন। এবার তিনি ইউরোপে যুগোস্লোভিয়ার শিল্পসংস্থাগুলির সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুর্গাপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত গ্যাসের পাইপ লাইন বসাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। পরে ঐ গ্যাসের পাইপ লাইন বসানোও হয়। তিনি পশ্চিম জার্মানিতেও যান। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে তাঁহার পরিকল্পিত কোক-চুল্লির কাজ শুরু হইয়াছিল। ঐ চুল্লি হইতে যাহা যাহা পাওয়া যাইতে পারে সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'কোল-টার'। জার্মানিতে তিনি 'কোল-টার' তৈয়ারির জন্য কয়েকটি জার্মান শিল্প-সংস্থার সহিত কথা পাকাপাকি করেন। তিনি ইউরোপ হইতে আমেরিকা যান। সেখানে তিনি কলিকাতার বাস্তুগুলিতে জল সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল বসানো সম্পর্কে কয়েকটি মার্কিন সংস্থার সহিত কথা বলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার ছিল অনলস প্রচেষ্টা।

এই বৎসরই পশ্চিমবঙ্গের আর এক গৌরবময় কীর্তির সূচনা হইল —হলদিয়া বন্দর। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্বব্যাঙ্কের একজন বন্দর-বিশেষজ্ঞ কলিকাতায় আসিলেন। বিশ্বব্যাঙ্ক কলিকাতার নিকটেই কোন পরিপূরক বন্দর নির্মাণের কাজে আর্থিক সহায়তা করিতে রাজী হইয়াছিল। রাজ্য সরকার ও পোর্ট কমিশনারের সহিত আলাপ-আলোচনার পরে ঐ পরিপূরক বন্দরের স্থান নির্বাচিত হইল হুগলী নদী ও হলদি নদীর সংগমস্থলে হলদিয়ায়। হলদিয়া এখন বন্দর ও শিল্প-নগর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

কেবল পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সামান্যতম স্বার্থরক্ষাতেও ডাঃ রায় সর্বদাই তৎপর ছিলেন। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিতেও তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। পশ্চিমবঙ্গের সহিত বিহারের কিছু অঞ্চল যোগ করিয়া তাহার ছিন্নমস্তা অবস্থা ঘুচাইতে তিনি যেমন তৎপর হইয়াছিলেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখামাত্রই তিনি তাহার প্রতিরোধে তৎপর হইলেন। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর অংশের ক্ষুদ্র একটি এলাকা, 'বেরুবাড়ি' হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রের শিরোনামা হইয়া উঠিল। বেরুবাড়ির আয়তন ৮'৭৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা বারো হাজার। ৯ই ডিসেম্বর লোকসভায় একটি বিবৃতিতে জানানো হইল যে, জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ি ইউনিয়ন পাকিস্তানকে দেওয়া হইতেছে। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই ১৫ই ডিসেম্বর বিরোধীরা এই প্রসঙ্গ তুলিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর ডাঃ রায় বিরোধী পক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া বিধানসভায় বেরুবাড়ি হস্তান্তরের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন

করিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল—এই বিধানসভার মতে উক্ত বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ভূভাগরূপে থাকিবে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি যে আধঘন্টাব্যাপী ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণ দেন, তাহাতে তিনি বলিলেন—বেরুবাড়ি সম্পর্কে এই সরকার যতটা সংশ্লিষ্ট, তাহা হইতেছে, আমরা ঐ অঞ্চলে পথঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের জন্য অর্থব্যয় করিয়াছি, কিছু উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসিত করিয়াছি, সেজন্য ভারত-সরকার অর্থসাহায্যও দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গই ঐ অঞ্চলের প্রশাসনও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেজন্য আমরা বিশেষভাবে চাই যে, বেরুবাড়ি ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গেই থাকুক।

বিধানসভায় ঐ প্রস্তাব আনার কারণ সম্পর্কে তিনি বলিলেন—"আমি বিধানসভায় ইহা আলোচনার জন্য এই কারণে উত্থাপন করিলাম যে, ইহার ফলে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মনোভাব জানিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সীমান্ত পুনর্বিন্যাস করার কথা বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা আমরা তাহার বিরুদ্ধে আমাদের স্পষ্টই মতামত জানাইতে পারিব।" অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হইবেন এই অজুহাতে পাকিস্তানকে পরে বেরুবাড়ি ইউনিয়নের আট বর্গমাইল স্থান দেওয়া হয়।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, পাট-চাষের জন্য ধানী জমির ব্যবহার, শিল্প-সম্প্রসারণ ও নূতন নূতন পথঘাট প্রভৃতি তৈরীর ফলে আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস, ইত্যাদি নানা কারণেই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছিল। তাহার উপর ছিল অজন্মা ও বন্যা। তাহার উপর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অতিবৃষ্টির ফলে হইল প্রচণ্ড বন্যা। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্ধাংশ বন্যাপ্লাবিত হইল। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল। প্রায় দশ লক্ষ একর ধানের জমি ভাসিয়া গেল। ডাঃ রায় এইসব সমস্যা দৃঢ়তার সহিত মোকাবিলা করিলেন। খাদ্যাভাব লইয়া বিরোধী পক্ষের বিক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা কম ছিল না। কিন্তু ডাঃ রায় তাহা দৃঢ়তার সহিত ব্যর্থ করিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী পক্ষ ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। সমস্ত সরকারবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল তাহারা। কিন্তু এই বৎসর (১৯৫৯ সালে) এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে কমিউনিস্টরা জনপ্রিয়তা হারাইল। ২১শে অক্টোবর হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে লাদাকে চীনারা হঠাৎ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হামলা করিল এবং তাহার ফলে ১৭ জন ভারতীয় পুলিস মারা গেল। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত

হানিল। এই হামলার বিরোধিতা বা সমর্থন করা কমিউনিস্টদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কমিউনিস্ট শিবিরেও মতান্তর দেখা দিল। ফলে কমিউনিস্টদের প্রভাব জনমানসে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইল এবং জাতীয়তাবাদী শক্তি পুনরায় প্রভাব বিস্তার করিল। ডাঃ রায় চীনা হামলার বিরোধিতা এবং চীনের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে জাতীয়তাবাদী শক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ঐক্যবদ্ধ হইল। বিরোধী শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ায় ডাঃ রায়ের প্রশাসন পরিচালনা পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইল।

১৯৬০ সালের গোড়ায় ভিয়েনার বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ বক ভারতে আসিয়া দার্জিলিংয়ে ডাঃ রায়ের ডান চোখে অস্ত্রোপচার করিলেন। এই সময় কয়েকদিন ডাঃ রায়কে বাধ্যতামূলক বিশ্রাম লইতে হইলেও তাঁহার চক্ষু সারিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি কাজে মন দিলেন।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল ভরোশিলভ ভারত সফরে আসেন। কলিকাতায় ডাঃ রায়ের উদ্যোগে তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা দেখানো হইল। মার্শাল ভরোশিলভের কলিকাতা সফর শেষের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ, সঙ্গে সোভিয়েট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোমিকো, সংস্কৃতি মন্ত্রী মিখাইলভ প্রভৃতি। তাঁহাদিগকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁহারা সন্ধ্যার সময়ে বিমান-বন্দর হইতে রাজভবনে আসিলেও প্রায় পাঁচলক্ষ মানুষ পথের দুইধারে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইল। কয়েকদিন পরেই আসিলেন ব্রহ্মদেশের নেতা উ নু। সকল বিদেশী অভ্যাগতদের কাছে কলিকাতা ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। তাই তাঁহারা কলিকাতা আসিতেন এবং ডাঃ রায় তাঁহাদের অভ্যর্থনার কাজে ভারতের সকল নগর, এমনকি, রাজধানীকেও ছাড়াইয়া যাইতেন।

কিছুদিন পূর্বে ডাঃ রায় কলিকাতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বসতবাটিতে একটি নূতন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ চারিতল ভবনটি নির্মিত হইলে তিনি তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-নাট্য-সংগীত একাডেমি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে পরে তিনি স্থাপন করিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬০ সালে ডাঃ রায় বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণীতে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক বৎসরে যে হারে শিক্ষাবিস্তার ঘটিয়াছিল, এবং যে পরিমাণ স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সব কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। তাই ডাঃ রায় বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থাকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

ভাগীরথী নদীতে পলি পড়িয়া কলিকাতা বন্দর জাহাজ-চলাচলের অযোগ্য হইয়া

পড়িতেছিল। কলিকাতা বন্দর সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের আমদানি-রপ্তানির প্রধান পথ। এই বন্দরের যদি এইভাবে অকালমৃত্যু ঘটে, তবে তাহা উত্তর-পূর্ব ভারতের কেন, সমগ্র উত্তর ভারতের অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিবে। হলদিয়ায় কলিকাতা বন্দরের একটি পরিপূরক বন্দর স্থাপনের কথা হইতেছিল, সত্য। কিন্তু কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হইলে তাহা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিবে। সেজন্য ডাঃ রায় কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাইবার জন্য হুগলী নদীকে সুনাব্য রাখিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুদিন আগেই পেশ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে আশ্বাস দিলেও এবং অনেক কমিশন ও তদন্ত হইলেও, কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। ১৯৬০ সালে বিদেশী জাহাজ কোম্পানিগুলি এ ব্যাপারে সোরগোল তুলিলে ডঃ রায় আবার তৎপর হইলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। তাহার একখানিতে তিনি গঙ্গা ব্যারেজ (ফারাক্কা বাঁধ) অবিলম্বে না করিলে তাহার বিপদের কথাও জানাইয়া দিলেন। তিনি লিখিলেন :

"এই প্রকল্প (গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প) লইয়া আমি বিস্তর চেঁচামেচি করিয়া আসিতেছি। ১৯৫৪-৫৫ সালে যখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়, তখনই আমি এই প্রকল্পের কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম। মিঃ নন্দা তখন ছিলেন ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের অন্য সকলের সামনে আমাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি হাতে লইবে, এবং সেজন্য ইহাকে পরিকল্পনার অন্তর্গত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কিছুই হয় নাই। কতো কমিশন আসিল, কতো কমিশন গেল। কতবার তদন্ত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কিছুই হইল না। এখন আমি জানিতে পারিলাম, অতীতে যেসব তদন্ত হইয়াছে তাহার ফল লইয়া পরিকল্পনা কমিশন খুব সন্তুষ্ট নহেন। সেজন্য আর একদল বিদেশী বিশেষজ্ঞ দিয়া আর একবার তদন্ত করাইয়া লইতে চান। ইতিমধ্যে যাহা ঘটিতেছে তাহা এই—পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাহাদের কপোতাক্ষ পরিকল্পনার জন্য গঙ্গা হইতে ৮০০০ কিউসেক জল লইয়াছে এবং শীঘ্রই জল পাম্প করিয়া গঙ্গা হইতে কপোতাক্ষ পর্যন্ত ঐ পরিমাণ বাড়াইয়া ২০,০০০ কিউসেক করিবে। তাহার অর্থ, আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিব। আমি গুজব শুনিয়াছি যে, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প লইয়া আমাদের উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়, কারণ তাহাতে পাকিস্তান সরকার বিচলিত হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের নিজেদের রাজ্য যখন সংকটের মুখে, তখন আমরা কি নীরব থাকিতে পারি?"

প্রধানমন্ত্রী এই পত্রের উত্তরে জানান যে, "গঙ্গা ব্যারেজ হইবেই এবং শীঘ্রই হইবে। ইহাকে পরিকল্পনা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।"

গঙ্গা ব্যারেজ বা ফারাক্কা বাঁধ আজ হইয়াছে। কিন্তু উহার মূলে যে ছিল ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা ও অনলস প্রচেষ্টা তাহা কি আমরা ভুলিতে পারি?

মধ্যপ্রদেশের অরণ্যভূমি দণ্ডকারণ্যে ১৮০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু দণ্ডকারণ্য আদৌ পুনর্বাসনের উপযোগী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল। উদ্বাস্তুদের প্রায় সকলেই সেখানে ত্রাণ শিবিরে বাস করিতেছে। তাহাদের বসবাস ও চাষের উপযুক্ত জমির, এমনকি পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয় নাই। ফলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যাইতে চাহিতেছিল না, অন্যপক্ষে যাহারা দণ্ডকারণ্যে গিয়াছিল, তাহারাও ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব লইয়াছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু ও ত্রাণ মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না এবং দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ফ্লেচার এ বিষয়ে ব্যবস্থাদি করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুমাত্র ব্যবস্থা না হইবার সংবাদ পাইয়া ডাঃ রায় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী প্রভৃতি সহ ডাঃ রায় সরেজমিনে অবস্থা দেখিবার জন্য নিজে দণ্ডকারণ্য যাত্রা করিলেন। ডাঃ রায়ের দণ্ডকারণ্য যাইবার সংবাদ পাইয়া কেন্দ্রীয় ত্রাণমন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নাও আসিলেন। ডাঃ রায় কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিবরণের উপর নির্ভর করিলেন না, তিনি নিজে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সহজভাবে মিশিয়া তাহাদের অবস্থা ও সমস্যার কথা শুনিলেন। তিনি কলিকাতা ফিরিয়া দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের অবস্থা সম্পর্কে একটি নোট প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাইলেন এবং সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকেও একটি কড়া চিঠি দিলেন। প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন, দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পুনর্গঠিত করা হইল এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য সচিব এবং পরবর্তী কালের ভারতের নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনকে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান করা হইল। তাঁহার হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইল যাহাতে তিনি তাড়াতাড়ি উদ্বাস্তুদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

জুন মাসের শেষ ভাগে তিনি উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ী শহর রানীক্ষেতে তিন সপ্তাহের ছুটিতে গেলেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি কলিকাতা হইতে তারবার্তায় জানিলেন যে, আসামে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরাও ১১ই জুলাই ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াছিল। তাই ডাঃ রায় দ্রুত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভার ও বিধানসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ও সংসদ সদস্যকে লইয়া একটি বৈঠক করিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল আসামের ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা এবং বাঙ্গালী খেদা বা বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন। প্রধানমন্ত্রী এইসব ঘটনা সম্পর্কে ডাঃ রায়কে যে পত্র দিলেন, তাহাতে তিনি বলিলেন আসামে বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কারণ হইতেছে আসামের চাকরিতে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর প্রাধান্য।

সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হিংসার আগুন জ্বলিতেছিল। বাঙ্গালীপ্রধান কাছাড় অঞ্চলেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ঐ সময় আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে অন্যান্য মন্ত্রীদের উপর প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু বিমলাপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে প্রশাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ফলে আসামে হিংসাত্মক ঘটনাবলী রোধ করিতে যথেষ্ট সময় লাগিল। এদিকে আসাম হইতে দলে দলে বাঙ্গালী বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে জড়ো হইয়াছিল। তাহারা গোলমাল শুরু করিল এবং প্রতিশোধাত্মক ঘটনায় দুইজন লোক মারা গেল।

তাহার উপর বিরোধী দল ১৬ই জুলাই কলিকাতায় হরতালের ডাক দিলেন। শহরে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল যে, অবাঙ্গালীদের উপর হামলা হইবে। হরতালের দিন ডাঃ রায় অবাঙ্গালী পাড়ায় বিশেষভাবে পুলিস মোতায়েন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনিলেন এবং হরতালের দিন ঐরূপ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল না। তবে হরতালের দিন একটিমাত্র লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তিনি হইতেছেন মার্চেন্টস্ চেম্বারের সভাপতি সওয়াইরাম গোয়েন্কা। তিনি বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে মাড়োয়ারীদের ক্ষ্যাপাইতেছিলেন এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট মিথ্যা তারবার্তা পাঠাইয়া অবাঙ্গালীদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের গুজব ছড়াইতেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তিন দিনের সফরে আসাম গেলেন এবং জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। তিনি যেসব এলাকায় ঘরবাড়ি ধ্বংস হইয়াছে, সেইসব এলাকায় পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইবে বলিয়া বলিলেন। ২০শে জুলাই তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া বিবৃতি দিলেন যে, আসাম এখন পুরোপুরি শান্ত, উদ্বাস্তুরা ফিরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ১৫ আগষ্ট ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে জানাইলেন, আসামের পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় নাই। পরে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে বাঙ্গালীরা কিভাবে নির্যাতিত ও আশ্রয়হীন হইয়াছিল তাহার বিবরণ দিয়া তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানাইলেন যে, প্রায় ২৫ হাজার নিরাশ্রয় বাঙ্গালী আসাম হইতে বিতাড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল এবং জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা পশ্চিমবঙ্গের উপর কম চাপ সৃষ্টি করে নাই। ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আসামের ঘটনা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বা বর্তমান বিচারপতিকে দিয়া তদন্ত করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল। লোকসভাতেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

এই বৎসর নভেম্বর মাসে ডাঃ রায় তাঁহার অফিসে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ভারতস্থ অধিকর্তার সহিত কলিকাতায় সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান লইয়া আলোচনা করেন। পরিকল্পনা ছিল দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার হইতে উত্তরে বালী-উত্তরপাড়া

পর্যন্ত সমগ্র শিল্পাঞ্চল লইয়া গঠিত হইবে বৃহত্তর কলিকাতা এবং এই বৃহত্তর কলিকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হইবে। এইভাবেই কলিকাতার উন্নয়নে সি. এম. পি. ও. এবং সি. এম. ডি. এ.-র সূচনা হয়।

১৯৬১ সালে ২৬শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের একদিন আগে ডাঃ রায়কে রাষ্ট্রপতি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক জাতীয় পুরস্কার 'ভারতরত্ন' দানের কথা ঘোষণা করিলেন। ২৭শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার কক্ষে সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তাঁহাকে ভারত-রত্ন পদকটি দেওয়া হয়। সত্যই বিধানচন্দ্র ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন, তা পদক বা উপাধি দিয়া তাহা ঘোষণা করা হউক বা না হউক। তবু ইহা যে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৬১ সাল ছিল রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর বৎসর। এই শতবার্ষিকী উৎসব পালনের সাড়া পড়িয়াছিল সারা ভারতে কেন, সারা পৃথিবীতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই উৎসব পালনের বিশেষ গুরুত্ব ছিল এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, সারা পশ্চিমবঙ্গই তাঁহার জন্মস্থান ও লীলাক্ষেত্র। ডাক্তার রায় যথোচিত গুরুত্বের সহিত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ লইলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সুলভ মূল্যে ১৫ খণ্ডে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করিলেন। কবিগুরু ভবনে তাঁহার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। কলিকাতায় কোন জাতীয় নাট্যশালা ছিল না। তাই নির্মাণ করিলেন রবীন্দ্রস্মৃতি থিয়েটার ভবন।

১৯৬১ সালের ১লা জুলাই ডাঃ রায়ের অশীতিতম জন্মদিন পালিত হইল। এই অনুষ্ঠানে তিনি জাতির উদ্দেশে ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ বাসভবনটি দান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি একটি গোপন উইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিমল রায়কে তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এখন তিনি ৩৬ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বসতবাড়িটি সম্পর্কে একটি নূতন উইল করিলেন। তিনি এই বসতবাড়ির একটি অংশকে কিছুদিন যাবৎ আদর্শ নার্সিং হোমে পরিবর্তিত করিতেছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন অন্য অংশে থাকিবে কিছুসংখ্যক বিনামূল্যের শয্যা এবং সেই সঙ্গে রোগ-নির্ণয়ের জন্য একটি গবেষণাকেন্দ্র। তিনি উইলে তাহারই পাকা ব্যবস্থা করিলেন। নার্সিং হোম পরিচালনার জন্য একটি অবৈতনিক ট্রাস্ট গঠিত হইল। এই ট্রাস্টের ট্রাস্টী হইলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধু। ১লা জুলাই তাঁহার জন্মদিন সমারোহের সহিত পালিত হইল। জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ তাঁহাকে মহাজাতি সদনে একটি বিশেষ সভায় অভিনন্দন-গ্রন্থ উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করিল। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসিলেন এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিতে। এই অনুষ্ঠানে তাঁহার জনৈক ছাত্র তাঁহাকে একটি সোনার স্টেথিসস্কোপ উপহার দিয়াছিলেন।

১লা জুলাই জন্মদিনের অনুষ্ঠান-শেষে রাত সাড়ে নটায় তিনি বিমানে ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে রওনা হইয়া গেলেন। এই আশি বৎসর বয়সেও এমনি ছিল তাঁহার প্রাণশক্তি। জরা বা বার্ধক্য এই মানুষটিকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। অশীতি বৎসর বয়সেও তিনি ছিলেন যুবকের মতোই প্রাণচঞ্চল, শ্রমসহিষ্ণু ও কর্মঠ।

তিনি ইউরোপে লণ্ডনে ছিলেন ১১ দিন। সেখান হইতে প্যারিস হইয়া গেলেন পোল্যাণ্ড, সেখানে তিনি পোল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। বিশেষতঃ আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্পের জন্য পোল্যাণ্ডের যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ে। পোল্যাণ্ড পশ্চিমবঙ্গকে কয়লাখনির জন্য পুরো যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে সম্মত হইল। ডাঃ রায় নিজে পোল্যাণ্ডের কয়লা-খনিগুলি পরিদর্শন করিয়া ঐসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে আধুনিক শিল্পকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আধুনিক শিল্পোন্নত একটি দেশে পরিণত করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্পর্কেই ছিল তাঁহার বিপুল উৎসাহ এবং সেগুলিকে স্বদেশে প্রবর্তন সম্পর্কে দুর্বার উদ্যম।

পোল্যাণ্ড হইতে তিনি গেলেন জার্মানিতে এবং জার্মানি হইতে পাড়ি দিলেন আমেরিকায়, নিউ ইয়র্কে। সেখানে তিনি রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ তহবিলের অধিকর্তা আর্থার গোল্ডস্মিথ এবং রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিষয়ক এজেন্সির সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সহিত বৈঠকে মিলিত হইলেন। বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিল কলিকাতার উন্নয়ন এবং জল সরবরাহ। কলিকাতার ৩০০ বর্গমাইল-ব্যাপী এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে মাস্টার প্ল্যান রচিত হইয়াছিল, তাহার ব্যয় বাবদ ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার অনুদানের অনুমোদন দিয়াছিলেন। ডাঃ রায় এখন রাষ্ট্রসংঘের তহবিল হইতে সংগ্রহ করিলেন আরও তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার ডলার বৃহত্তর কলিকাতার কারিগরি-ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য।

অতঃপর ৭ই আগস্ট তিনি হোয়াইট হাউসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিখ্যাত চিকিৎসকরূপে ডাঃ রায়ের খ্যাতি এমন বিশ্বজোড়া ছিল যে, কেনেডি কেবল ভারত ও কলিকাতা সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলাপ করেন নাই, তিনি নিজের আর্থারাইটিস্‌ রোগ সম্পর্কেও রোগীরূপে ডাঃ রায়ের পরামর্শ নেন। ডাঃ রায় কেনেডিকে পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাপত্রও দিয়া আসিয়াছিলেন।

আমেরিকা হইতে ডাঃ রায় ১১ই আগস্ট দিল্লিতে পৌছিলেন। তিনি যখন বিদেশে ছিলেন, তখন কয়েকটি চিঠিতে নেহরু আসন্ন জাতীয় সংহতি বৈঠক সম্পর্কে তাঁহাকে জানান। তাই দিল্লিতে নামিয়াই তিনি ঐ বৈঠকে যোগ দিলেন। জাতীয় সংহতি বৈঠকে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবটি গৃহীত হইল, তাহা হইল, যে

রাজ্যে যে ভাষা আছে, তাহাই সেই রাজ্যের সরকারী ভাষা থাকিবে, তবে কোনও জেলায় যদি ৬০ বা তাহার বেশি শতাংশ ভাষাগত সংখ্যালঘু থাকে, তাহা হইলে সেই জেলার সরকারী ভাষা হিসাবে আরও একটি ভাষা থাকিবে, সেটি হইবে ঐ জেলার ভাষা।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা। এই কয়লার উপর রাজ্যের অধিকার থাকা যে পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন, সে সম্পর্কে ডাঃ রায় অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু কয়লার উপর অধিকার ছিল কেন্দ্রের। ডাঃ রায় কয়লাকে রাজ্যের অধিকারভুক্ত করার জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। তিনি বিদেশ সফরে যাইবার পূর্বে এ সম্পর্কে দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় তাঁহার দাবিতে কর্ণপাত করে নাই। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এবিষয়ে পত্র লিখিয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবি এবং পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য এই দাবি পূরণ যে একান্তই প্রয়োজন, তাহা জানান। পরিশেষে তিনি বাধ্য হইয়া পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, যেসব রাজ্যে কয়লা আছে, সেইসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অবিলম্বে একটি বৈঠক ডাকা হউক এবং এবিষয়ে মীমাংসা হউক।

ডাঃ রায় বিদেশ সফর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য কলিকাতার শেরিফ যে জনসভার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে ডাঃ রায় বলেন, "প্রত্যেকের বোঝা উচিত যে, পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সম্পদ হইতেছে কয়লা, যাহার উপর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকে আবার গড়িয়া তোলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মাটির তলায় আছে একশত কোটি টন কয়লা। পশ্চিমবঙ্গ ইহার সন্ধান করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রশ্ন উঠিল সন্ধান করিবার অধিকারী কে—রাজ্য, না কেন্দ্র, জাতীয় কয়লা উন্নয়ন পরিষদ, না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আমি কেন্দ্রকে বলিয়া দিয়াছি, কয়লা হইতেছে রাজ্যের সম্পত্তি এবং সেজন্য রাজ্যই একাজ করিবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ইহা হইতেছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। আগামী পাঁচ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিবে, আর তাহার জন্য চাই পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ-শক্তি।...বর্তমানে বিদ্যুৎ-শক্তিকে বাড়াইবার কর্মসূচী আমাদের আছে। গ্রামের মানুষকে দিতে হইবে কোক কয়লা। রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার জন্যও চাই কয়লা উত্তোলন। এজন্য কারখানা নির্মাণ করিতে হইবে, যেখানে কোক কয়লা প্রস্তুত করা যাইবে। আমার বাহিরে যাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইহার জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা। কয়লা যদি তোলা যায়, তাহা হইলে সব কিছুই সম্পন্ন হইবে।' ভূমির উপরে যেমন রাজ্যের অধিকার, তেমনি ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপরও রাজ্যের অধিকার থাকাই স্বাভাবিক।

এই যুক্তির বশবর্তী হইয়া ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের অধীনে একটি খনি সংক্রান্ত বিভাগও খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি একজন খনিসংক্রান্ত উপদেষ্টাও নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই বিভাগের বিশেষ কাজ ছিল রাজ্যের সরকারী

ক্ষেত্রে কয়লা, পাথর, ডলোমাইট, চায়না ক্লে প্রভৃতি খনিজ পদার্থগুলিকে কাজে লাগানো। তাঁহার মতে, কয়লা-খনিগুলিকে নূতন করিয়া লীজ দেওয়া, নূতন খনি খোলা, লাইসেন্স দেওয়া, রয়েল্‌টি বা উপস্বত্ব নির্ধারণ করা—এ সমস্তই রাজ্যের অধিকারভুক্ত হওয়া উচিত।

কয়লা-খনিগুলির উপর রাজ্যের অধিকার আদায় সম্পর্কে ডাঃ রায় ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিতেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যখন প্রায় সফল হইতে যাইতেছিলেন তখনই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি কয়লা-খনিতে রাজ্যের অধিকার সম্পর্কে যে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, তাহা বন্ধ হয় এবং কয়লা কেন্দ্রেরই অধিকারভুক্ত থাকিয়া যায়। সত্যই, কয়লার উপর যদি পশ্চিমবঙ্গের অধিকার থাকিত, তবে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক চেহারা আজ অন্যরূপ হইত। আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাবের মানুষের সহিত একই দরে পশ্চিম-বঙ্গের কয়লা কিনিতে হইত না, আজ পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলিরও এই হাল হইত না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কয়লা-সংকটে মাঝে মাঝে দিশাহারা হইয়া পড়িত না। বলাই বাহুল্য, ডাঃ রায় যদি আর কয়েক মাস বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে কয়লা আজ কেন্দ্রের অধিকারভুক্ত না হইয়া রাজ্যেরই অধিকারভুক্ত হইত। তাঁহার মৃত্যু যে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কী মারাত্মক ক্ষতিকর হইয়াছিল, তাহা এই একটিমাত্র ঘটনা হইতেই বোঝা যায়।

১৯৬১ সালে আবার পাটশিল্পে সংকট দেখা দিল। কাঁচা পাটের দাম অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় চাষীরা ভীত হইয়া পাট চাষ কমাইয়া ফেলিল, এবং তাহার ফলে পাটের অভাব দেখা দিল। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পাট ছিল যেমন অন্যতম প্রধান পণ্য, তেমনি পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই পাট ও পাটশিল্পের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশী। পাটের অভাবে চটকলগুলি চট বোনার যন্ত্র বন্ধ করিল, কাজের সময় হ্রাস করিল, অথবা সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ রাখিল। তাহার ফলে পাটকলের শ্রমিকদের দৈন্য-দুর্দশার সীমা রহিল না। পাটের চাষ বাড়িলে পাটের দাম কমিয়া যায় এবং চাষীরা মার খায়। আবার পাটের চাষ কমিলে শ্রমিকরা অনাহারে মরে, দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রার সংকট। এই ভয়াবহ সমস্যার হাত হইতে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, ডাঃ রায় সে বিষয়ে চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তিনি পাটকলগুলির প্রতিনিধিদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া তিন দফার একটি সমাধান-সূত্র দিলেন: (১) চাষীদের নিম্নপক্ষে একটা নির্দিষ্ট দাম দিতে হইবে, যাহাতে চাষীদের ক্ষতি না হয় এবং তাহারা কিছু মুনাফা পায়; (২) পাটকল মালিকরা ও সরকার একটি 'বাফার স্টক' বা সংকটকালীন ভাণ্ডার সৃষ্টি করিবেন এবং কিছু পরিমাণ সহায়ক-মূল্য দিবেন; (৩) পাট

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাটচাষীদিগকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র দিয়া উৎসাহ দিতে হইবে।

১৯৬১ সালে ডাঃ রায় রাজ্য প্রশাসনে যে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা লইয়াছিলেন, তাহা হইল সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা। এজন্য তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা বিল, ১৯৬১' নামে একটি বিল আনেন। সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি ২৫শে সেপ্টেম্বর বিধানসভায় গৃহীত হয়। এই বিলে সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাভাষার পাশাপাশি নেপালী ভাষাকেও স্থান দেওয়া হয়—দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং কালিম্পং ও কার্শিয়াং-এ, যেখানে নেপালী-ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশি, সেখানে নেপালী ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে।

১৯৬২ সালের গোড়াতেই প্রজাতান্ত্রিক ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই সময়ে ডাঃ রায়ের জনপ্রিয়তা এমন হইয়াছিল যে, বাহিরের কোনও বড় নেতাকে, যেমন প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া নির্বাচনী প্রচারের উদ্বোধন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। দল ও প্রশাসনের সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে বহন করিবার মতো বিপুল ক্ষমতা ছিল অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটির। তখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার শক্তি তাঁহার বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। সেপ্টেম্বর মাস হইতেই নির্বাচনী প্রচার ও সংগঠন গড়িয়া তোলার কাজ শুরু হইয়াছিল। ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই গেলেন। আর তিনি যেখানেই গেলেন, কেবল তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্যই হাজার হাজার মানুষ আসিয়া জড় হইল। উত্তরবঙ্গ হইতে ফিরিয়া তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি অবাক হইয়া দেখিলাম, প্রায় কুড়ি হাজার লোক ফারাক্কায় আমাকে দেখিবার জন্য জড়ো হইয়াছে। এখানে কোন জনসভার কর্মসূচি ছিল না। তাহারা শুধু শুনিয়াছিল আমি এই পথে আসিব। সত্যই মানুষ আমাকে যেভাবে তাহাদের প্রীতি ও স্নেহ দেখাইয়াছে, তাহাতে আমি বিহ্বল হইয়াছি।"

নভেম্বর মাসের গোড়ায় ডাঃ রায় বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ায় নির্বাচনী প্রচারে যান। বাঁকুড়া শহর হইতে শালতোড়া প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ত্রিশ মাইল পথের মাঝে মাঝে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য অসংখ্য তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। গৃহে গৃহে, দোকানে দোকানে, গঞ্জে, বাজারে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছিল। পথের দুই ধারে হাজার হাজার মানুষ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, স্ত্রীলোকেরা শঙ্খধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। কোন রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রীকে জনসাধারণ ইতিপূর্বে এইভাবে বিপুল অভ্যর্থনা জানাইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। সত্য, জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ডাঃ রায় তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট একটি কিংবদন্তী-পুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন। শালতোড়া ছিল পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য

অনুন্নত ও অনগ্রসর গ্রামের একটি। ইহার দৈন্য-দারিদ্র্যও যেমন ছিল অপরিমেয়, তেমনি সমস্যাও ছিল অসংখ্য। ডাঃ রায় জানিতেন, শিল্পোন্নয়ন ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব; তাই তিনি পশ্চিমবঙ্গকে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পায়িত রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও তিনি জানিতেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাণপুরুষ রহিয়াছে গ্রামে, সেই গ্রামের যদি সামগ্রিক উন্নতিসাধন না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটিবে না। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বের গোড়ার দিকেই গ্রামাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন—যাহা পরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও প্রবর্তিত হইয়াছিল। আজ জীবনের সায়াহ্নে আসিয়াও তিনি গ্রামের কথা ভুলেন নাই। বাংলার অসংখ্য গ্রামকে যে তিনি শহর ও শিল্পাঞ্চলের মতোই ভালোবাসেন, তাহার প্রতীকরূপে এবার তিনি নিবাচনে একটি গ্রামাঞ্চল হইতেও নির্বাচনপ্রার্থী হইলেন। এবিষয়ে তিনি তাঁহার নির্বাচন-ক্ষেত্ররূপে শালতোড়াকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য, তাঁহার পূর্ববর্তী নির্বাচনক্ষেত্র তিনি ত্যাগ করেন নাই। এবার তিনি একই সঙ্গে গ্রাম ও শহরের দুইটি নির্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। অবশ্য, কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিধি অনুসারে একই ব্যক্তির দুইটি নির্বাচনকেন্দ্রে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ডাঃ রায়ের ক্ষেত্রে এই বিধি শিথিল করা হইল। তাঁহাকে বাঁকুড়ার শালতোড়া এবং কলিকাতার চৌরঙ্গী হইতে একই সঙ্গে নির্বাচনপ্রার্থী হইবার সুযোগ দেওয়া হইল।

এই সময়ে (২৮শে নভেম্বর) ডাঃ রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবোধচন্দ্রকে হারাইলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু তাঁহার নিকট অত্যন্ত শোকাবহ হইলেও দেশের উন্নতির জন্য তাঁহার অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা কখনও ব্যক্তিগত কারণে ব্যাহত হয় নাই। এই শোকবিহ্বল অবস্থাতেও তিনি দেশের কাজ করিতেছিলেন। ঐদিন তিনি একটি ফরাসী সংস্থার সহিত দুর্গাপুরে ৬ কোটি টাকার রাসায়নিক প্রকল্পের পরামর্শদাতা রূপে কাজ করার জন্য চুক্তি করেন। এই প্রকল্প কার্যে পরিণত হইলে দুর্গাপুরের কোক-চুল্লির কারখানার বাই-প্রোডাক্টকে কাজে লাগাইয়া বহুপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা যাইবে এবং তাহা হইতে সারা পশ্চিমবঙ্গে বহু মূল্যবান ও বহুমুখী রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিবে। ঐ সময় তিনি এই প্রকল্প সম্পর্কে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার একটা স্বপ্ন আছে। আমি যদি আর বছর দুই বাঁচি, তবে আমি বেকার গ্র্যাজুয়েটদের গঙ্গা আর দুর্গাপুর খালের দুই ধারে সারি সারি কুটীরের মতো করিয়া বহু ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া তুলিতে উৎসাহ দিব। আমি তাহাদিগকে জমি দিব, মূলধন দিব, সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ দিব। তাহারা দুর্গাপুর হইতে প্রধান প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাত, লোহা ও কয়লা পাইবে। বাঙালী যুবকদের বুদ্ধি ও সামর্থ্যের

উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি যদি তাহাদের মনকে এইসব শিল্পের প্রতি নিয়োজিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার মোকাবিলা করিতে পারিব। জানি, এই পথেই আছে মুক্তি।"

কিন্তু ডাঃ রায়ের এই স্বপ্ন সফল হয় নাই। কারণ নিষ্ঠুরা নিয়তি তাঁহাকে আর বছর-দুই বাঁচিয়া থাকিতে দেয় নাই।

১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডাঃ রায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝটিকা সফর করিয়া বিরাট বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। ডাঃ রায় বাঁকুড়ার শালতোড়া ও কলিকাতার চৌরঙ্গী নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে দাঁড়াইলেও এই দুই জায়গায় নির্বাচনী প্রচারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নির্বাচনী কেন্দ্রেই অধিক সময় অতিবাহিত করেন।

সারা ভারতেই সাধারণ নির্বাচন হইতেছিল। অন্যান্য সব রাজ্যের আগেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন আরম্ভ হইল। এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ছিল সি. পি আই., আর. এস. পি., এস. ইউ. সি, ফরওয়ার্ড ব্লক, মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর সি. পি. আই.।

এবার কলিকাতায় ভোটের দিন ছিল ২৬শে ফেব্রুয়ারি। এবার ডাঃ রায় তাঁহার চৌরঙ্গী নির্বাচনী-কেন্দ্রের ব্যবস্থাদি নিজেই করিয়াছিলেন। কলিকাতায় শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ হইল। কলিকাতায় যখন ভোটগ্রহণ চলিতেছে, তখন বাঁকুড়ার শালতোড়া কেন্দ্র হইতে সংবাদ আসিল যে, ডাঃ রায় সেখানে ছয় হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়াছেন। পরদিন কলিকাতায় ভোট-গণনায় দেখা গেল তিনি চৌরঙ্গী কেন্দ্র হইতে পনের হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ২৫২টি আসনের মধ্যে ১৫৭টি আসনে জয়লাভ করিল। এবারে কংগ্রেসের এই বিপুল সাফল্যের মূলে ছিল ডাঃ রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিপুল জনপ্রিয়তা। ডাঃ রায় যে এই সময়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সংশয় ছিল না।

১১ই মার্চ ডাঃ রায়ের নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিল। ডাঃ রায় পুনরায় রাজ্য-শাসনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অতিশয় দুর্ভাগ্য, পশ্চিমবঙ্গকে আর অধিকদিন সেবা করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন না। ২৩শে জুন শনিবার তিনি প্রাণঘাতী হৃদরোগে অসুস্থ হইলেন। ইহার সপ্তাহকাল পরেই তিনি ইহলোকের সকল কাজ হইতে ছুটি পাইলেন। বিগত প্রায় চৌদ্দ বৎসর যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ডাঃ বিধানচন্দ্রের সভায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা সেই মহাগৌরব হইতে বঞ্চিত হইল। পশ্চিমবঙ্গ তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসককে হারাইল।

২৭

আর্তত্রাণে বিধানচন্দ্র

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ঝটিকা ইত্যাদির আক্রমণে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিত। সেই দুর্যোগকালে বিদেশী সরকারের সাহায্য দানের অপেক্ষায় না থাকিয়া বাংলার স্বদেশহিতৈষী ও সমাজসেবকের দল আগাইয়া আসিত দুর্গত স্বদেশীয়গণের দুর্গতি দূর করিবার জন্য। অস্থায়িভাবে সমিতি বা কমিটি গঠিত হইত, তাহাতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগ দিতেন, তারপর অর্থ সংগৃহীত হইলে ওই সকল সংস্থার পক্ষ হইতে সেবকদলের সহযোগিতায় সেবাকার্য চলিত। তৎকালে যে সকল স্বদেশানুরাগী নেতা ওইরূপ সেবাকার্যে অগ্রণী ছিলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাদের অন্যতম।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পরের বৎসর মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তিত হইল। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এবং আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণের মধ্যে অনেকে সেই আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করিলেন। ইহার পর সরকারের নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ কংগ্রেসসেবকগণকে মুক্তি দেওয়া হইল। ইতোমধ্যে যুদ্ধের অবস্থা এমন দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইল যে, যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আসিয়া পড়িল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনের উপর জাপানীরা বিমান আক্রমণ চালায়। বোমা পড়ায় অনেক বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত হয় এবং শহরবাসীগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক নরনারী আহত ও নিহত হয়। সেই আসন্ন দুর্যোগের দিনে প্রশ্ন উঠে যে, ওইরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস জনরক্ষা সম্পর্কে কি পন্থা অবলম্বন করিবে? সরকারের প্রবর্তিত এ. আর. পি. (Air Raid Precaution) সংস্থায় কংগ্রেসীরা যোগ দিবে কিনা—এই প্রশ্নও উঠিয়াছিল। এই সময়ে বাংলার শাসনভার ন্যস্ত ছিল ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উপর; কংগ্রেস-কর্মী সন্তোষকুমার বসু ছিলেন সেই মন্ত্রিমণ্ডলে জনরক্ষা-মন্ত্রী। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব বিবেচনা উপলক্ষে মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় আসিলেন। কংগ্রেস-কর্মিগণের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা হইল। মওলানা সাহেবের বালীগঞ্জ

সার্কুলার রোডের বাড়িতে বাংলার কংগ্রেস-কর্মিগণ সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করিলেন। সন্তোষকুমার বসুও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মওলানা সাহেব স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, কংগ্রেস জনরক্ষায় সহযোগিতা করিবে, কিন্তু এ. আর. পি. বা সিভিক্ গার্ডে যোগ দেওয়ার যে শর্ত তাহা মানিয়া কংগ্রেস-কর্মীদের তাহাতে যোগ দিতে তিনি বলিতে পারেন না। তাহা করিতে গেলে কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের সাময়িক বিলোপ ঘটিবে; এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা আত্মহত্যারই নামান্তর। পরন্তু সহযোগিতার জন্য তিনি স্থাপন করিলেন বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতি বা Bengal Civil Protection Committee—যাহাতে কংগ্রেসের লোক ব্যতীত অন্যান্যেরাও যোগ দিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জাস্টিস্ টি. আমির আলি এই জনরক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

সমিতির কাজ হইল দেশবাসীকে আত্মরক্ষায় শিক্ষা দেওয়া, মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সঙ্কটকালে দেশবাসী যাহাতে বিভ্রান্ত না হয় তদুপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সংঘর্ষ এড়াইয়া চলাও সমিতির কাযের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের অসহযোগিতা-নীতি তখনও বলবৎ ছিল। একক সত্যাগ্রহের ধ্বনি (স্লোগান) ছিল—Not a man, not a pice, একটি মানুষও না, একটা পয়সাও না। কংগ্রেসের নির্ধারিত ওই নীতিতে স্থির থাকিয়া জনরক্ষা ব্যাপারে সহযোগিতায় নিপুণ পরিচালনার প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানও বিরাট ও ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। সম্মেলনে আলোচনা হইল—বাংলাদেশে কে পারে ওই কঠিন ও জটিল কাজ চালাইতে। সর্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করিয়া তাঁহার উপর কার্যভার ন্যস্ত করা। তাহাই করা হইল। জনরক্ষা সমিতির দুইটি শাখা হইল—একটি সাধারণ (General) এবং আর একটি মেডিকেল। সাধারণ শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন ভূপতি মজুমদার এবং মেডিকেল শাখার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়।

বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতি স্থাপিত হওয়ার কিছুদিন পূর্ব হইতেই ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত শরণার্থীদের সেবার কাজ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে করা হইতেছিল। এই দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কার্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল নির্যাতিত দেশসেবক বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী জীবানন্দ ভট্টাচার্যের উপর। তিনি শরণার্থীদের ভারতে আসিবার পথের অবস্থা দেখিবার জন্য এবং স্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন বিশ্রাম-কেন্দ্রে সেবার ব্যবস্থা করার জন্য প্রেরিত হইলেন। জাপানীদের আক্রমণে রেঙ্গুনের পতনের পর জাহাজে করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতায় সরাসরি আসা বন্ধ হইয়া গেল। কলিকাতার ডক্ এলাকায় সেবার কাজ চলিতে থাকাকালেই শিয়ালদহ স্টেশনেও সহস্র সহস্র শরণার্থী আসিতেছিল।

তখনও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে আসিবার প্রধান পথ চট্টগ্রাম হইয়া চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, কলিকাতা। শরণার্থীদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই জনই দক্ষিণ-ভারতীয়। উত্তর দক্ষিণ সকল অঞ্চলের শরণার্থীই হাওড়া স্টেশন দিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাইতেছিলেন। সেবার কার্য বিপুল আকার ধারণ করিল। ডাঃ রায়ের নির্দেশ মতে জনরক্ষা সমিতির বিরাট সেবক-বাহিনী বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া সেবার কার্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়া যাইতেছিল। যে সকল দুর্ভাগা কোন রকমে দেহটাকে টানিয়া আনিয়া কলিকাতায় পৌছার পর আর চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করাইবার ব্যবস্থা হইল। হাসপাতালে আশ্রয়প্রাপ্ত ওই সমুদয় শরণার্থীব তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন কংগ্রেস-কর্মীরা।

চট্টগ্রামে জাহাজে আসা বন্ধ হইয়া গেল; বিমানযোগে কয়েক শত লোককে আনা হইয়াছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে হইল। শরণার্থীরা আসিতেছিল হাঁটা-পথ দিয়া—যে পথ দিয়া একদিন পলাইয়া গিয়াছিলেন সাজাহান-পুত্র সুজা। আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালার ভিতর দিয়া এই পথকে কোন কোন স্থানে সুজা রোড বলা হইয়া থাকে। এই পথে চট্টগ্রামের দোহাজাবীতে আসিয়া শরণার্থীরা ট্রেন ধরিতে লাগিল। কাজেই তখন চট্টগ্রামে স্থাপিত হইল প্রধান আশ্রয়-শিবির। তৎকালে চট্টগ্রামের উপর জাপানী বোমারু বিমানের আক্রমণ হইল দুই বার। সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয়-শিবিরের প্রধান অংশ সরাইয়া লওয়া হইল সীতাকুণ্ড স্টেশনে। এই পথেব জনস্রোত ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল। তখন শরণার্থীরা আসিতেছিল আপার বার্মা হইয়া মিচিনা হইতে ভারতের দিকে, উহার নীচে হইতেও টামু, প্যালেল-এর পথে ইম্ফল, কোহিমা হইয়া ডিমাপুরে (মণিপুর রোড স্টেশন) ট্রেন ধরিতে লাগিল। আবার ডিমাপুর আসিবার পথে লক্ষ্মীপুব হইতে বাম দিকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরিয়াও অনেকে আসিতে লাগিল। দুর্গম এই পথ—কিছুদূরে শিলচর। এখানে ক্রমে ক্রমে এক ক্যাসাদ বাধিল। কাছাড়ের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন মিঃ ফ্লেচার। তিনি হুকুম দিলেন যে—যাহাদের সহিত টাকা আছে, তাহাদের কলিকাতা পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট কিনিতে হইবে। টাকা আছে কিনা সঠিক জানিবার জন্ত শরণার্থীদের দেহতল্লাসেরও ব্যবস্থা হইল। অনেকে বাট্টা দিয়া বার্মা-নোট বদল করাইয়া লইতেছিল। তখন ভারত সরকারের বৈদেশিক সম্পর্কের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন এম. এস. আনে। তাঁহার একজন প্রতিনিধি মিঃ ম্যারাথে শিলচর ডাকবাংলোতে ছিলেন। তিনি ওই ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে অসহায় বোধ করিতেছিলেন। তখন জীবানন্দ ভট্টাচার্য মিঃ ম্যারাথের সহিত পরামর্শ করিয়া আনেকে তার করিয়া ডেপুটি কমিশনারের হুকুমের বিষয় জানাইলেন। তিনি ওই সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ কলিকাতায় ডাঃ বিধান রায়কেও

অবিলম্বে অবগত করান। ডাঃ রায় সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্র দিল্লী এবং শিলঙে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ডেপুটি কমিশনারের হুকুম বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানান। দুই দিনের মধ্যেই হুকুম বাতিল হইয়া গেল এবং সরকারপক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে, শরণার্থীগণ বিনা ভাড়ায় ট্রেনে করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম দিকে।

ইহার দুই-তিন মাস পূর্বে কলিকাতার একদল লোক হৈ-চৈ করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল হইয়া মুসলমানদের আসিতে দেওয়া হইতেছে না। কথাটা বাজে ও অসম্ভব মনে হইলেও জীবানন্দবাবু পথে কি ব্যবস্থা আছে এবং শরণার্থীদের জন্য আরও কিছু করণীয় আছে কিনা সঠিক বুঝিবার উদ্দেশ্যে মণিপুর হইয়া টামু প্যালেল পর্যন্ত গেলেন। মণিপুর যাইবার অনুমতি আবশ্যক, কিন্তু তাহা মিলে নাই। কোহিমায় দুই দিন অপেক্ষা করিয়া এক কৌশলে তিনি মণিপুর যাইয়া পৌঁছিলেন। মুসলমানদের সম্বন্ধে ওইরূপ একটা কথা রটনার সামান্য কারণ ছিল। ইম্ফল হইতে কোহিমার দিকে ছয় মাইল দূরে কোরজিয়া নামক স্থানে শিবির হইয়াছিল। একজন মুসলমান শরণার্থী ইম্ফলে বাস হইতে নামিয়া যায় এবং স্থানীয় মুসাফিরখানায় থাকিতে চাহে। কিন্তু একজন পুলিস বলে যে, ওখানে থাকার হুকুম নাই। সেই সময় কাহাকেও ইম্ফলে থাকিতে দেওয়া হইতেছিল না। সমস্ত শরণার্থীকে কোরঙ্গিয়া শিবিরে আনা হইতেছিল এবং তথা হইতে প্রত্যহ ভোরবেলায় ২৫।৩০ খানা বাস্ শরণার্থী লইয়া রওনা হইত ডিমাপুরের পথে। জীবানন্দবাবুর সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে আলাপ-পরিচয় হয় ভোজরমল লোহিয়ার; ইনি মাড়োয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির পক্ষে কাজ করিতে চাহেন। দুজনে ইম্ফল শহরের রাজপথের পার্শ্বে কয়েকটি শরণার্থী পরিবারের সাক্ষাৎ পান; তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা রুগ্ণ ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করাইয়া দিয়া পরিবারের অন্যান্যদের থাকিবার জন্য ধর্মশালা ও মুসাফিরখানা খুলিয়া দিলেন। কর্মীদল প্রত্যক্ষ করিল—পথে মানুষের বর্ণনাতীত দুর্দশা এবং ট্রেনে বিশৃঙ্খলা। স্থানীয় দেশকর্মীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সেবাকার্য করিতেছিলেন; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেবকেরা শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট আশানুরূপ লাঘব করিতে পারেন নাই—কোথায় লোকবল, কোথায়ই বা অর্থবল? জীবানন্দবাবু তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়া প্রতি সপ্তাহে একবার কি দুইবার কলিকাতায় ডাঃ বিধান রায়ের নিকট রিপোর্ট পাঠাইতেন, কখনও কখনও জরুরী ব্যাপারে তার-বিনিময়ে তাঁহার উপদেশ লইতেন। বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতির পক্ষে তিনি ওইভাবে সারা রাস্তা ভ্রমণ করিয়া শরণার্থীদের অবস্থা দেখেন এবং বহু অঞ্চলে স্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেবাকার্য পরিচালনায় ব্যবস্থা করেন।

তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া জনরক্ষা সমিতির সভাপতি ডাঃ রায়, সম্পাদক ভূপতি মজুমদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তাঁহার অভিজ্ঞতা জানান।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসাম যাইবার পথে কলিকাতায় আসিলেন। ডাঃ বিধান রায় তখন কলিকাতায় ছিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে জওহরলালজীর কিছুই আসিয়া যায় না। তিনি ডাঃ রায়ের বাড়িতেই উঠিলেন। লোকে জানে যে, ওই বাড়িই তাঁহার দ্বিতীয় বাসভবন। তাঁহাকে ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত শরণার্থীদের অবস্থা সবিশেষ জানানো হইল। ইতোমধ্যে ফকরুদ্দিন সাহেব আসাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া নেহরুজীর সঙ্গে মিলিত হন। তাই প্রত্যক্ষদর্শী আর কাহারও তাঁহার সহিত আসাম অঞ্চলে যাইবার প্রয়োজন হইল না। পাঁচদিন পরে তিনি আসাম হইতে ফিরিয়া আসেন। নেহরুজী শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়াই বলিলেন যে, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইতে হইবে সীমান্ত অঞ্চলে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব। ওই দিনই তাঁহারা এলাহাবাদ রওনা হইবেন, পরদিন সেখানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিবে। সন্ধ্যায় ডাঃ রায়ের বাড়িতে নেহরুজীর সহিত আলোচনা ও পরামর্শের জন্য কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা ও বিশিষ্ট কর্মী এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইলেন। মওলানা আজাদ এবং ডাঃ রায় নিজেও উপস্থিত ছিলেন। সেইবার নেহরুজীর মণিপুর পর্যন্ত যাইবার অবকাশ হয় নাই, তাই সেই স্থানের ও পথের খবরাখবর তিনি জীবানন্দ ভট্টাচার্যের কাছ হইতে জানিয়া লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা—তিন দিনের মধ্যেই যেন প্রথম ডাক্তার দল সীমান্ত অঞ্চলে রওনা হইয়া যান। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল, কে এই অল্প সময়ের মধ্যে সে ব্যবস্থা করিতে পারিবে? শুধু অর্থ হইলেই তো কাজ হইবে না, ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার, স্বেচ্ছাসেবক, সাজসরঞ্জাম, ঔষধপত্র সংগ্রহ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং আরও আনুষঙ্গিক অনেক কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই সম্পর্কে মওলানা আজাদ যে মন্তব্য করিলেন, উহার মম এই দাঁড়ায় যে,—ওই কাজ করিবার যোগ্য একটিমাত্র লোক আছেন, তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাংলাদেশে একটা চলতি কথা আছে—'ভূতে যোগায়'। ডাঃ রায়ের কাজ সম্বন্ধেও সেই কথাটি প্রযোজ্য। তিনি কোন কার্যের ভার লইলে সব যেন 'ভূতে যোগায়'। তিনি কাজে হাত দিলে খুঁটিনাটি সবকিছু তাঁহার চোখে পড়ে। সূচ হইতে মাইক্রোস্কোপ—কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রথম দল ডাক্তার পাঠান হইল, কিন্তু পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনের দরুন এবং অন্যান্য কারণে সেই দলকে ফিরিয়া আসিতে হইল। দ্বিতীয় দলও প্রেরিত হইল, সেই দলের সেবকগণ শিলচরে যাইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় দলকে অধিকতর সুসজ্জিত ও সুগঠিত করা হইল। কিন্তু সেই দলকে পাঠাইতে সীমান্ত অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবস্থা গেল সামরিক বিভাগের হাতে। ইতোমধ্যে মণিপুরের উপর বিমান আক্রমণ

হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতির নির্ভীক কর্মিদল—ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবক মণিপুর রোড স্টেশনে নিজেদের শিবিরে থাকিয়া সেবাকার্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। কর্মরত সেবকগণের মাথার উপর দিয়া জাপানীদের বোমারু বিমান উড়িয়া যাইতেছে, তথাপি সেবারত কর্মিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ইত্যাদি ছিলেন জনরক্ষা সমিতির মেডিকেল শাখার কর্মী। তাঁহারা তাঁহাদের নেতা ডাঃ বিধান রায়ের বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাঁহাদের বলিয়াছিলেন—'যাও, সীমান্তে গিয়ে পলায়নরত বিদেশী সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, তোমরা কত নির্ভীক, কেমন কর্তব্যপরায়ণ।'

এই স্থলে ডাঃ রায়ের তেজস্বিতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে কয় মাস সেবাকার্য চলিয়াছিল, তাহার মধ্যে জীবানন্দ ভট্টাচার্যকে দুইবার কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও জিনিসপত্র লইয়া যাইতে। একবার প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডুতে জাহাজের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সিঁড়ি দিয়া তাঁহাকে সামরিক বিভাগের কর্মচারী উঠিতে দেয় নাই। তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়া ডাঃ রায়কে খবরটি লিখিতভাবে দিলে পর, তৎক্ষণাৎ ডাঃ রায় আসামের তৎকালীন চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ ডেন্‌হি-কে টেলিফোন করেন। টেলিফোনে সে কী গর্জন! ডাঃ রায় বলিলেন—"আপনি জেনারেল উড্‌কে বলুন যে, আমার লোকেরা তাঁহাদেরই সাহায্য করিতেছে। এ কাজ তো তাঁহাদেরই করা উচিত ছিল, তাঁহারা ও তাঁহাদের তৈরী অর্গেনিজেসন ফেল করিয়াছে। আমার লোকের সম্মানে যদি আঘাত লাগে, তবে আমি তাহা সহ্য করিব না, সমুচিত জবাব দিব।" ইহার পর আর ওইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, বরং জনরক্ষা সমিতির কর্মীদের কাজের সুবিধা হইয়াছিল অনেক। সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীই যেন বদলাইয়া গিয়াছিল।

জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশ হইতে ৬।৭ লক্ষ ভারতীয় নানা পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাঁহাদের সেবার জন্য যে কংগ্রেস মেডিকেল মিশন সীমান্তে কাজ করিতেছিল, তাহা বাংলা ও আসামের কর্মীদের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সর্বভারতীয় লোক লইয়া গঠিত দুইটি কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের প্রথমটি প্রেরিত হইয়াছিল চীনদেশে এবং দ্বিতীয়টি যুদ্ধোত্তর মালয়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল মালয়, যদিও পূর্ব এশিয়ার অনেক স্থানের ভারতীয়গণই ইহাতে যোগ দিয়াছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগঠনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: প্রথম—যাঁহারা নিয়মিত ব্রিটিশ-ভারতীয় সামরিক বিভাগের লোক সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং

যুদ্ধবন্দী রূপে মালয়ে আবদ্ধ থাকেন। আর দ্বিতীয়—যাঁহাদের 'সিভিলিয়ান' বলা যায়, মালয়ের সাধারণ ভারতীয়। ইঁহাদের ভিতরে নানা বৃত্তির লোক ছিলেন, তবে শতকরা আশিজন ছিলেন মালয়ের রবার বাগানের শ্রমিক। প্রথম দলের প্রায় সকলকেই ইংরেজরা পুনর্বার মালয় দখল করিবার পর ভারতে লইয়া আসে এবং অধিকাংশই যুদ্ধবন্দী-রূপে নানা বন্দী শিবিরে আটক থাকে। বাংলায় প্রধান কেন্দ্র ছিল যশোহরে ঝেকড়-গাছায় (এখন স্বাধীন বাংলাদেশে) এবং ব্যারাকপুরের নিকট নীলগঞ্জে। অফিসার কয়েকজনকে দিল্লীর লালকেল্লায় আটক রাখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয় যাঁহারা কোনমতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের ফিরিতে হইয়াছিল মালয়েই।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যাপার লইয়া তখন সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। ফৌজের প্রধান কয়েকজনের বিচার হইতেছিল দিল্লীতে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধী কংগ্রেসী দলের নেতা বোম্বাই-এর দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী স্বর্গত ভুলাভাই দেশাই এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্যারিস্টার ও এ্যাড্ভোকেট বিবাদীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এমন কি জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে ২৪।২৫ বৎসর পূর্বে পরিত্যক্ত ব্যারিস্টারী গাউন পরিয়া দেশাইজীর সহকারীরূপে বিচারালয়ে হাজির হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে বিচারের বিবরণ চিত্তাকর্ষক শিরোনামায় প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছিল। নেহরুজী বিদেশী সরকারকে প্রকাশ্যে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়া যদি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী বীর যোদ্ধাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে ভারতব্যাপী যে অসন্তোষের অনল জ্বলিয়া উঠিবে তাহা নিবাইবার ক্ষমতা ভারতের ইংরাজ শাসকমণ্ডলীর নাই। রসিদ আলি দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতায় ছাত্রদের উপর গুলিচালনা করা হইয়াছিল। তখন সমগ্র ভারতে জনগণের ভিতর চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ বিদ্যমান। এইরূপ অবস্থায় মালয়স্থ ভারতীয়গণের অনাহারে, ব্যাধির আক্রমণে দুঃখদুর্দশা ভোগের করুণ কাহিনী এদেশে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এখানে উহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যাঁহারা নিয়মিত সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সৈনিক বৃত্তি জানা ছিল; সুতরাং তাঁহাদের কার্য মোটামুটি অভ্যস্ততার জন্য সহজ বলা যাইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়েরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজে ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের নানা পদে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন; তবে তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনদানের সংকল্প লইয়া প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। মালয়ে ভারতীয়গণের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ছিল দক্ষিণ-ভারতীয়—তামিল ও তেলেগু। ইহাদের দিয়া জাপানীরা যাহা করাইয়াছে, তাহা হইল জঙ্গল কাটা, রাস্তা, রেলপথ ও পুল নির্মাণ করা। অমানুষিক পরিশ্রমে, অনাহারে বা অল্লাহারে ইহারা অর্ধমৃত হইয়া

পড়িয়াছিল, প্রায় একলক্ষ শ্রমিকের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাদের কর্মস্থানগুলির মধ্যে প্রধান মৃত্যু-কেন্দ্র ছিল শ্যাম-বর্মা রেলপথ। ইহাকে 'Death Railway' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। বিলের উপর দিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া গিয়াছে এই রেলপথ। কথিত আছে যে, এই রেলপথ তৈরী করিতে যতগুলি স্লিপার লাগিয়াছে, ততগুলি শ্রমিককে প্রাণ দিতে হইয়াছিল পথ নির্মাণের জন্য। সেই পথ নির্মাণে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছিল বা অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল, তাহারা সকলেই আসিয়াছিল মালয়ে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মালয় মেডিকেল মিশনের ব্যবস্থাপক রূপে প্রথম পরিদর্শনরত জীবানন্দ ভট্টাচার্য তাঁহার প্রথম রিপোর্টে ওই সমুদয় শ্রমিকের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, উহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

..."Residues of the 'Death Railway' builders are pouring into Malaya and are received at the Jitra Camp situated at the extreme north of the Peninsula. They are ill-clad, ill-fed, devitalised, with sores on legs—hardly one is found without bandage on legs. They are living human skeletons...."

এই প্রকারের বেদনাদায়ক সংবাদ মালয় হইতে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একদিকে যেমন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সামরিক বিভাগের লোকজনের বিচার লইয়া দেশময় আন্দোলন চলিতেছে, আর একদিকে তেমনই মালয়স্থিত বেসামরিক লোকজনের দুঃখকষ্টের করুণ কাহিনী আসিয়া পৌঁছাইতেছে। কংগ্রেস-নেতৃত্ব তখনও মুখ্যত রাজনৈতিক হইলেও সে রাজনীতির ভিত্তি সূক্ষ্ম-মানবতাবোধের উপর। কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে যিনি 'কঠিন মানুষ' (man of iron) বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তিনি হইলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। অন্তর ছিল তাঁহার কোমল এবং এই সূক্ষ্মবোধ সেখানে জাগ্রত হইত অধিক। এইদিকের আন্দোলনের মূল ছিল তাঁহাতে। তিনিই আবার স্থির করিলেন যে, মালয়ের বেসামরিক ভারতীয়দের জন্য ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্য আছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, মালয়ে একটি মেডিকেল মিশন পাঠাইতে হইবে। মালয় তখন সামরিক শাসনাধীন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মালয়ে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও পুনর্বসতির প্রশ্ন তখন প্রবল। দূরদেশ হইতে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ মিশন প্রেরণ সহজসাধ্য নহে। কে পারে এই কঠিন কর্মের ভার লইতে? ব্যবস্থা, ঔষধপত্র, যোগ্য ডাক্তার নির্বাচন, সাজসরঞ্জাম, এমন কি গাড়ি পর্যন্ত এখান হইতে পাঠাইতে হইবে। কে পারিবে এই সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত ও নিপুণভাবে করিতে? ইহা সম্ভব একমাত্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে। কোন কার্যেই 'আমাকে

দেওয়া হউক, আমি করিব' এইভাব তাঁহার কোনদিনই ছিল না। কিন্তু কঠিনতম কাজ আসিয়া পড়িলে তাঁহাকে কোনদিন 'হইবে না' বলিতে কেহ শুনে নাই। মেডিকেল মিশন পাঠাইতে হইবে,—এই কথাটার গুরুত্ব কত এবং কাজ যে কত ব্যাপক ও কত বিচিত্র রকমের তাহা বোধ হয় প্রস্তাবকেরাও সম্যক্ উপলব্ধিকরেন নাই। ইহার প্রয়োজনই বা কি? ইহার জন্য তো ডাঃ বিধান রায়ই আছেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট একটি মিশন পাঠানো ঠিক করিয়া ফেলিলেন মেডিকেল এসোসিয়েসন-এর লোক লইয়া। ইহার নেতৃত্বের ভার দেওয়া হইয়াছিল দক্ষিণ-ভারতের কর্নেল শাস্ত্রীর উপর। এই মিশন কিন্তু মালয়ে গিয়া কোন কাজই করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিছুদিন মালয়ে অবস্থানের পরেই তাঁহাদের ভারতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ডাক্তার হিসাবে বা সেবার ইচ্ছার ত্রুটি তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু যে ব্যবস্থা থাকিলে, যে সকল সাজসরঞ্জাম ও ঔষধপত্র থাকিলে এবং যে ধরনের সংগঠন হইলে ওই পরিস্থিতিতে কাজ করা যায়, তাহা তাঁহাদের ছিল না। এই অবস্থা কল্পনার চোখে দেখা সম্ভব। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো প্রতিভাশালী চিকিৎসক, দূরদর্শী সংগঠক ও ব্যবস্থাপকের পক্ষেই তাহা সম্ভব। ক্ষুরধার-বুদ্ধি ডাঃ রায়ের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে কংগ্রেস মেডিকেল মিশন প্রেরণের অনুমতি আদায় করা। ভারত সরকার মেডিকেল মিশন পাঠাইতেছেন, এই অজুহাতে প্রথমে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মালয় তখন সামরিক শাসনাধীন। অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত বলিয়া যাঁহারা পরিগণিত হইবেন, তাঁহাদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি মিলিতে পারে না। মেডিকেল মিশনের ভার তখন বিধানচন্দ্রের উপর পড়িয়াছে। সুতরাং অনুমতি জোগাড় করিয়া লইবার দায়িত্বও তাঁহার। এদিকে প্রয়োজনীয় জিনিস ও ঔষধপত্র খরিদ করা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার কাজ আরম্ভ করা হইয়া গিয়াছে। ভারতের নানা স্থান হইতে ডাক্তার সংগ্রহ করার কাজও শুরু হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার অকাট্য যুক্তি দিয়া ভারত সচিবের নিকট এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে সক্ষম হইলেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস হইতে অনুমতিপত্র আসিয়া পৌঁছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের শেষের দিকে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু মলয়ভ্রমণে যান। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে সমগ্র মালয় পরিভ্রমণ করেন। যুদ্ধান্তে ভারতের মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, নেহরুজীর মালয় ভ্রমণে তাহার কতকাংশের নিরসন হইল। তাঁহার এই সফর সারা মালয়ে মেডিকেল মিশনের কাজ করার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

ডাঃ রায়ের নির্দেশে দুইজন কংগ্রেস-কর্মী অগ্রগামীরূপে মালয়ে গেলেন। নেহেরুজীর মালয় ত্যাগের দিনই তাঁহারা মালয়ে পৌঁছিলেন। এই অগ্রগামীদ্বয় ছিলেন

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ বসু ও জীবানন্দ ভট্টাচার্য। ডাঃ বসু ছিলেন বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতির মেডিকেল শাখার সম্পাদক এবং বর্মাপ্রত্যাগত শরণার্থীদের সেবার জন্য যে মেডিকেল মিশন পাঠানো হইয়াছিল উহার পরিচালক। তিনি ন্যাশন্যাল মেডিকেল স্কুলের (বর্তমানে কলেজ) ছাত্র এবং ওই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মহামারীতে যখনই শিক্ষায়তনের আহ্বান আসিয়াছে, ডাঃ বীরেন বসু কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন সর্বাগ্রে। ক্ষীণকায়, নিরামিষাশী, একাহারী ডাঃ বীরেন বসুকে কঠিনতম কার্যে পাঠাইতেও ডাঃ রায় কোনদিন দ্বিধা করেন নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে কি যে প্রয়োজন তাহার সবজমিনে তদন্তের জন্য এমন লোকই তো চাই।

ওই দুইজন অগ্রগামী সারা মালয় ভ্রমণ করিয়া ছয়টি সেবা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা করেন। স্থির হইল যে, প্রতি কেন্দ্রে ডাক্তাররা রোগী দেখিবেন সকালবেলায়, বারোটার পরে ভ্রাম্যমাণ ঔষধালয় (মোবাইল ডিস্পেন্সারী) লইয়া তাঁহারা যাইবেন রবারের বাগানে বাগানে। অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল এই পরিকল্পনা। ফলে মিশন সহযোগিতা পাইয়াছিল শুধু সামরিক শাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে নহে, সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ হইতেই। সামরিক বিভাগ মিশনের ছয়টি কেন্দ্রের মোবাইল ইউনিটের জন্য বড় গাড়ী, হেড্ কোয়ার্টার্সের জন্য অফিসার্স্ কার, সবই দিয়াছিল। এই যে সেবাকেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্র হইতে ভ্রাম্যমাণ ঔষধালয় লইয়া সেবার কার্য—ইহা কিন্তু অগ্রগামী কর্মীদ্বয়ের পরিকল্পনা নহে; ডাঃ রায়ের উদ্ভাবিত পরিকল্পনাকে তাঁহারা রূপায়িত করিয়াছিলেন মাত্র।

মিশনের জন্য ডাক্তার সংগৃহীত হইয়াছিল ভারতের কয়েকটি প্রদেশ হইতে, তবে বেশীসংখ্যক ডাক্তার যোগাইয়াছিল বাংলা। নাগপুরের ডাঃ চোলকার নিযুক্ত হইয়াছিলেন ডাইরেক্টার। তিনি চীনা মিশনে ছিলেন ডেপুটি ডাইরেক্টার। ডাঃ রায়ের পক্ষে যাঁহারা কলিকাতা অফিসে থাকিয়া ব্যবস্থা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অফিস-সেক্রেটারী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, কম্যাণ্ডাণ্ট ক্যাপ্টেন এস. কে. রায়। বর্মা-মিশনের সময়েও ক্যাপ্টেন রায় ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইনি দেশবিশ্রুত মনীষী স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির জ্যেষ্ঠপুত্র। নীরব কর্মী ছিলেন তিনি, অদ্ভুত ছিল তাঁহার কর্মনৈপুণ্য। কত বড় বড় কার্যে তিনি ডাঃ রায়ের সহায়ক ছিলেন; অথচ অনেকেই তাঁহাকে সামনে দেখেন নাই, কিংবা সংবাদপত্রেও তাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নাই। তিনি আত্মপ্রচার এড়াইয়া চলিতেন। নেতার যোগ্যতা ও দক্ষতার নিদর্শন মিলে কর্মী মনোনয়নে এবং উপযুক্ত কার্যে তাঁহাদের নিয়োগে। ডাঃ রায়ের মধ্যে সেই গুণের যে অভাব ছিল না, তাহা বুঝা যায় ক্যাপ্টেন রায়ের মতো একজন আদর্শ কর্মীকে দেখিয়া

এবং তাঁহার কর্মের পরিচয় পাইয়া। ক্যাপ্টেন রায় ছিলেন বিধানচন্দ্রেরই নির্বাচিত একজন কর্মী।

মেডিকেল মিশন মালয়ে কাজ করিয়াছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। মিশনের সেবকবাহিনী ৬ই আগস্ট রওনা হইয়া ১৩ই আগস্ট দেশে ফিরিয়া আসে। বিধানচন্দ্রের বিপুল কর্মাবদানে বার্মা মেডিকেল মিশন এবং মালয মেডিকেল মিশন বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। এই স্থলে আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম অগ্রগামী দল মালয়ে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রত্যেক মানুষের পাযে ব্যাণ্ডেজ। অনাহারে বা খাদ্যপ্রাণহীন আহারে দেহের জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সেই অবস্থায় হাঁটিয়া পথ চলিয়াছে বলিয়া পায়ে ক্ষত হইয়াছে। যে ঔষধ মিশনের জন্য পাঠানো হইতেছিল, তাহাতে ওই ক্ষতরোগের প্রতিকার হয় নাই। বিষয়টির প্রতি ডাঃ রায়েব দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। অবিলম্বে এক টিন তৈরী ঔষধ গেল বিমানে, আর ডাঃ রায়েব ওই রোগের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন গেল ডাকে। ভিটামিন ট্যাবলেটের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছিল প্যাকিং বাক্সে। আশ্চর্য ফল ফলিয়াছিল সেই ঔষধ ব্যবহারে এবং সেই ব্যবস্থা অনুসরণে। এই ঔষধ স্থানীয় লোকদের মধ্যে 'গান্ধী দাওয়া' নামে খ্যাতি ও সমাদর লাভ করে।

মালয় মেডিকেল মিশন এবং বার্মা মেডিকেল মিশনের অ-ডাক্তার জীবানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁহার কাজ ছিল প্রধানতঃ ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক দুইটি দিকই ছিল। মেডিকেল মিশন মালয়ে যাইতেছে এবং উহার ব্যবস্থাপক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—এই সংবাদটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পরেই ভারতের নানা স্থান হইতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নানাবিধ করুণ কাহিনী আসিয়া পৌছিতে লাগিল ডাঃ বিধান রায়ের কাছে। কেহ দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার আপনার জনের কোন খোঁজ পাইতেছে না, কেহ বা খোঁজ পাইয়াছে তাহার আত্মীয়টি আছেন কারাগারে, কেহ জানাইয়াছে যে তাহার স্বামী বা পুত্র ওই দেশেই নূতন করিয়া ঘরসংসার পাতিয়াছে। এই রকমের প্রতিটি চিঠির বেদনা ডাঃ রায়ের সমবেদনশীল প্রাণকে ব্যথিত করিয়াছিল। চিঠিগুলি জীবানন্দ ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। ডাঃ রায়ের নির্দেশ ছিল যে, প্রতিটি লোকের যেন খোঁজ লওয়া হয় এবং তাহাদের খবর যেন আত্মীয়স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জীবানন্দবাবু ওই সমুদয় কাজ এবং তৎসঙ্গে সমাজসেবার কাজও করিতেন। মিশনের ডাইরেক্টর ডাঃ চোলকারের স্বকীয় সহায়ক (পার্সন্যাল অ্যাসিস্টান্ট) রূপে তাঁহার উপর মিশনের আরও অনেক কার্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি আদর্শ কংগ্রেস-কর্মীর উপযোগী নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের সহিত কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৫০ সাল) অখণ্ড বাংলায় যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলিয়াও বিদিত। দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুসংখ্যা তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ আমেরীর মতে প্রায় সাত লক্ষ, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত পরিসংখ্যান অনুসারে মৃত্যু-সংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছিল মোটামুটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ। নিদারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। তখন চলিতেছিল দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ। বাংলাদেশের অধিবাসিগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না। দুর্গত দেশবাসীর সাহায্যার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই গঠিত হইল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। কার্যনির্বাহক সমিতিতে ছিলেন—স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা (সভাপতি), ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি), শ্রীভগীরথ কানোরিয়া (সম্পাদক), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, আনন্দীলাল পোদ্দার, স্যার আবদুল হালিম গজনবী প্রভৃতি। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এবং ডাঃ রায় উভয়ে একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহারা একবার বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সদর অফিসে (৮নং রয়েল এক্স্‌চেঞ্জ প্লেসে) যাইতেন এবং কমিটির কার্যে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেন। সেই কমিটি হইতে যে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল বটিকা বিতরণ করা হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। সেই বটিকা প্রস্তুত করিবার ফর্মুলা ডাঃ রায় দিয়াছিলেন। ওই বটিকাকে 'বিধান বটিকা' বলা হইত।

১৯৪৩ সালে মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কংগ্রেস-কর্মীরা 'মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি' নামে একটি সেবা-সমিতি গঠন করেন। নির্যাতিত দেশ-সেবকদ্বয় শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস এবং শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক যথাক্রমে এই সেবা-সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির তমলুক মহকুমার যাবতীয় সেবাকার্য চলিল ওই কমিটির মাধ্যমে। কমিটি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) একদল ছাত্রের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ৮টি মেডিকেল ইউনিট গঠন করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে কোন প্রকার কুইনাইন সরবরাহ না করায় মেডিকেল ইউনিটগুলির কাজে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। সম্পাদক প্রহ্লাদবাবু কলিকাতায় আসিয়া ডাঃ রায়কে সমস্ত বিষয় জানাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টার অফ্‌ পাবলিক হেলথ-এর সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রতি সপ্তাহে ৩৮ পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

২৮

বিধানচন্দ্রের ধর্মজীবন

বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র এবং মাতা অঘোরকামিনী উভয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চস্তরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্মজীবন পুত্রকন্যাদেরও জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অঘোর-প্রকাশ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহত্যাগ না করিলেও শেষজীবনে তাঁহারা গৃহী সন্ন্যাসীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের অনাসক্ত হইয়া সংসারে বাস, সৎকার্যের অনুষ্ঠান, সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ, পরোপকার-সাধন ইত্যাদি আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বজন-পরজন অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। ওই সাধক-সাধিকার জীবনে আমরা দেখিয়াছি—দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্য কার্যগুলি তাঁহারা কিরূপ শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। সময়ের অপব্যবহার বা বৃথা সময় নষ্ট করা তাঁহাদের জীবনে কোন দিন দেখা যায় নাই। তাঁহাদের জীবনযাপন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মনির্ভরতা ও শ্রমশীলতা।

ওই সমুদয় গুণের কিছু কিছু বিধানচন্দ্রেও বর্তিয়াছিল—যেন উত্তরাধিকারসূত্রে জনক-জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই তিনিও ধর্মানুশীলন করিয়া চলিয়াছিলেন। পরমেশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার জীবন-দর্শনের তত্ত্ব-কথা। পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না—এই সত্যোপলব্ধি তাঁহার জীবনের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি ধর্ম-সঙ্গীত বিধানচন্দ্রের জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে তিনি সেই সঙ্গীতটি আবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে আরম্ভ হইত তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবনের দৈনিক কাজ। ওই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি প্রদত্ত হইল:

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে॥
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে॥
তোমার বিচিত্র এ ভব সংসারে কর্মপারাবার পারে হে—
নিখিল ভুবনলোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে॥

তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

পরিবারে যে সকল ধর্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহাতে বিধানচন্দ্র প্রায়ই যোগদান করিতেন ; কোন কোন উপলক্ষে তাঁহাকে আচার্যের কাজও করিতে হইত। এই সমুদয় অনুষ্ঠান সাধারণতঃ তাঁহার বড় দাদা সুবোধচন্দ্র রায়ের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইত। অঘোর-পরিবারভুক্ত নরনারীর চরিত্রের বিশেষত্ব ধর্মানুরাগ। বিধানচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী, খ্যাতনাম্নী কমিউনিস্ট নেত্রী, ভারতীয় লোকসভার সদস্যা শ্রীরেণু চক্রবর্তী (স্বর্গত সাধনচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান) পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন। প্রায় সকলেই কমিউনিস্টদের নিরীশ্বরবাদী বলিয়া জানে। কিন্তু অঘোর-পরিবারে আমরা উহার ব্যতিক্রম দেখিলাম।

সুবোধচন্দ্র রায়ের এক কন্যা কুমারী সুধীরা রায়, এম. এ. লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিধানচন্দ্র স্বয়ং ওই ভ্রাতুষ্পুত্রীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে তাঁহার প্রাণপ্রদীপ নিবিয়া গেল। ভ্রাতুষ্পুত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন বিধানচন্দ্র। তিনিও অন্যান্য শ্মশান-বন্ধুর সহিত শব বহন করিয়া লইয়াছিলেন শ্মশানে। জ্যেষ্ঠ সহোদর শোকাভিভূত। ব্রাহ্ম রীতিতে সুবোধচন্দ্র রায়ের বাসভবনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়াছিল। বড় দাদার ইচ্ছা—বিধানই আচার্যের কর্তব্যভার গ্রহণ করেন। সেই অনুষ্ঠানের আচার্য-রূপে তিনি যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা সময়োচিত এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রার্থনার আরম্ভ ছিল এইরূপ :

"হে ভগবান! লোকে বলে আমি একজন ভালো ডাক্তার, আমার নিজেরও যে ওই রকমের ধারণা কিছুটা না আছে তা নয়। কিন্তু এই কন্যাটিকে তো এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারি নি। কন্যাটির তিরোধানে আমার পূর্ব ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, ভগবানের ইচ্ছার ওপর মানুষের কোন চেষ্টা চলে না। হে ভগবান! তুমিই দিয়েছিলে, তুমিই আবার নিয়ে গেলে।··· "

ভারতের সেরা চিকিৎসক বিধানচন্দ্র। শুধু স্বদেশেই নয়, ইউরোপ-আমেরিকায়ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরূপে তাঁহার সুখ্যাতি আছে। বহু জনের ধারণা—বিধানচন্দ্র রোগীর ঘরে ঢুকিয়া রোগীর দিকে চাহিলেই রোগ সারিয়া যায়। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে কত সহস্র রোগীকে যে তিনি মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন রোগী কিংবা রোগীর আত্মীয়স্বজন রোগমুক্তির পরে ডাঃ রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আসিয়া যখনই বলিতেন যে, আপনিই তো বাঁচাইয়াছেন,

নইলে কি আর বাঁচিত, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিতেন—এতো ঠিক বলেন নি; আমার কি ক্ষমতা আছে যে, একজন মানুষকে বাঁচাতে পারি? বাঁচিয়েছেন ভগবান, আমি নিমিত্ত মাত্র। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি কলিকাতা ক্রীক রো-এর একটি রোগী সম্পর্কে। তখন ডাঃ রায় তাঁহার ৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। এক ভদ্র পরিবারের হিন্দু বিধবার একমাত্র পুত্রের গুরুতর অসুখ। ডাঃ রায় রোগীটিকে দেখিয়া দোতলা হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন। হঠাৎ কান্না শুনিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ওই বিধবা মহিলা তাঁহার পুত্রের অবস্থা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। রোগীর ঘরে আবার ফিরিয়া যাইয়া বলিলেন, কাল সকালে আমাকে যেন জানান হয় রোগী কি রকম থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কান্না থামিয়া গেল, ডাক্তারের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশা মনে জাগিল, সহৃদয় চিকিৎসক বলিয়াই তো মায়ের কান্নায় তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। সান্ত্বনার একটা উপায় তাঁহার চিন্তায় উদয় হওয়া মাত্রই তিনি পুনরায় রোগীর ঘরে যাইয়া ওইভাবে কথা বলিলেন। কয়েক বৎসর পরের কথা। ওই মহিলা তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ডাঃ রায়কে নিমন্ত্রণ-চিঠি দিতে গেলেন পুত্রের শুভবিবাহে। মৃত্যুপথ-যাত্রী কিশোর রোগী কঠিন ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। আজ সে সুস্থ সবল কর্মঠ যুবক। ভদ্রমহিলা ডাঃ রায়ের হাতে নিমন্ত্রণ-চিঠি দিয়া এবং তাঁহার পুত্রকে দেখাইয়া পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কহিলেন—আপনিই তো বাঁচিয়েছেন আমার ছেলেকে, ওর বিয়েতে আপনাকে আসতেই হবে। ডাঃ রায় তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে কহিলেন—আপনি যখন ছেলেকে নিয়ে এসেছেন, তখন আমাকে যেতেই হবে। তবে একটা কথা কিন্তু ঠিক বলেন নি, আমি বাঁচাবার কে? আপনার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন পরমেশ্বর; আমি নিমিত্ত মাত্র। মহিলা বলিলেন—তা বাবা, ঠিকই বলেছেন, পরমেশ্বরই তো বাঁচিয়েছেন, আপনি নিমিত্ত। ডাঃ রায় ওই ভদ্রমহিলা ও তাঁহার একমাত্র পুত্রকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। যথা সময়ে তিনি বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া নববধূকে মূল্যবান উপহার দিলেন। তাঁহার জীবনে এই প্রকারের ঘটনা যে কত ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে।

প্রতিদিন ডাঃ রায়ের কাজ আরম্ভ হইত ভোর ৬টায়। প্রায় দশ বৎসর কাল তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে কাজ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের চিকিৎসা-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকে তিনি প্রত্যহ ২৫।৩০ জন রোগীকে দেখিতেন। পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করার কার্যে তিনি আনন্দ পাইতেন সবাপেক্ষা বেশী। রাত্রি দশটা পর্যন্ত (মধ্যাহ্নে বিশ্রামের কতক সময় বাদে) তাঁহাকে রাশি রাশি কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হইত— প্রায় পনর ঘণ্টা কাল। এই মহা কর্মযোগীর কর্মানুষ্ঠানের ধারা লক্ষ্য

করিলেই মনে হইতেন—যেন এক প্রবীণ তপস্বী তপোমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জীবন-দর্শনের বিচার-বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, কর্তব্যকর্ম সম্পাদনকে তিনি ধর্ম-সাধনা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না। ইহা তাঁহার ধর্ম-জীবনেরই অঙ্গীভূত। তাহা না হইলে পরিণত বার্ধক্যে তিনি এইভাবে একাগ্রচিত্ত হইয়া কর্মের মধ্যে কখনও নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার কর্ম ছিল—দেশ ও দেশের সেবা। ডাঃ রায় তাঁহার ৭৫তম জন্মদিনে (১৯৫৬খ্রীঃ, ১লা জুলাই) জনগণের অভিনন্দনের উত্তর দিবার কালে ভাবাবেগে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা জানান যে, তিনি যেন তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ ও দশের সেবা করিতে পারেন। এইভাবে প্রার্থনা নিবেদনের মধ্য দিয়া কেবল যে তাঁহার সদিচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা নহে, ঈশ্বরে তাঁহার ঐকান্তিক নির্ভরও প্রকাশ পাইয়াছিল। ডাঃ রায় আরও বলিয়াছেন—"ভারতবাসী বিশ্বাস করেন তাঁহার উপরে আরও একজন আছেন, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন ও সবকিছু নির্দেশ দেন। ···ভারত ধর্মপরায়ণ দেশ। সর্বমঙ্গলময় ভগবানই আমাদের একমাত্র পরমাত্মা, ভগবানের প্রতি বিশ্বাসই আমাদের সুখ-শান্তির সহায়ক।"

সোভিয়েট নেতৃযুগল মিঃ বুলগানিন এবং মিঃ খ্রুশ্চেভ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন ডাঃ রায়ের সহিত তাঁহাদের কথা প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে তর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই সোমবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

"ঈশ্বর আছেন কি না ?"

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অবস্থানকালে একজন সোভিয়েট নেতার সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন লইয়া বন্ধুত্বপূর্ণ বাক্য-বিনময় হয়। এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় সোভিয়েট নেতার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সোভিয়েট নেতার ধারণা যে, ডাঃ রায় যদি রুশ-দেশবাসী হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই গোঁড়া নাস্তিক হইতেন।

"ডাঃ রায় তদুত্তরে বলেন, বাঙালী হইলে তাঁহারা (সোভিয়েট নেতৃদ্বয়) নিশ্চয় ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতেন।

"ব্যাপারটি এইভাবে সুরু হয়। সোভিয়েট নেতৃদ্বয় ডাঃ রায়কে রাশিয়ায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি কবে তথায় যাইতে পারিবেন, তাহা জানিতে চাহেন। ডাঃ রায় বলেন, একমাত্র ভগবানই জানেন, কবে তিনি রাশিয়ায় যাইতে পারিবেন।

"ডাঃ রায়ের এই উক্তিতে বিস্মিত হইয়া নেতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—"আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?"

"ডাঃ রায়—'হ্যাঁ, করি।' 'কিন্তু আপনি তো তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছেন না।' সোভিয়েট নেতা মন্তব্য করেন।

"ডাঃ রায় বলেন—তাঁহারা শুধু আলো দেখিতে পান, বিদ্যুৎ অদৃশ্য থাকে। তৎসত্ত্বেও বিদ্যুতের অস্তিত্বে সকলেই বিশ্বাস করেন। সুতরাং এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি এই অনুমান সত্য। অনুরূপভাবে জগৎ আছে, জন্ম ও পুনর্জন্মের ধারা চলিতেছে ; মানুষ, গাছপালা এবং পুষ্পাদির নিয়মিত উন্নতি হইতেছে ; এক্ষেত্রে এমন কেহ একজন নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহার নিয়মে এইসকল চলিতেছে। সেই একজনই পরম পুরুষ। তাঁহাকে যদি প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলেও তিনি আপত্তি করেন না।

"স্মিতহাস্যে সোভিয়েট নেতা বলেন—রুশ-দেশবাসী হইলে আমি আপনার মতের পরিবর্তন করিতে পারিতাম।

"হাস্য-ধ্বনির মধ্যে ডাঃ রায় উত্তর করেন—বাঙালী হইলে আপনিও স্বতঃই ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতেন।

"রবিবার ডাঃ রায় তাঁহার জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে ঐ ঘটনা বিবৃত করিয়া জোরের সহিত বলেন, যত দিন পর্যন্ত জনসাধারণ ভগবানে বিশ্বাস করিবে, ততদিন কম্যুনিস্ট হইবে না। ঈশ্বরহীন দেশের কথা এদেশের জনসাধারণ কল্পনাও করিতে পারিবে না।"

অর্ধশতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল ডাঃ রায় চিকিৎসকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আসীন থাকাকালেও (১৯৪৮ খ্রীঃ জানুআরি মাস হইতে) তিনি সেই কাজ করিয়াছিলেন, তবে রোগীদের নিকট হইতে কোন ফী লইতেন না। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরেও প্রত্যহ সকালবেলা ২৫।৩০ জন রোগীকে দেখা তাঁহার প্রথম কার্য ছিল। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন :

"একদিন আমাকে বলেছিলেন, মন্ত্রী হয়ে আগেকার সব কাজই তো সরিয়ে রাখতে হয়েছে সরকারী কাজের জন্য। তা হলেও আমার নিজস্ব কাজটা হাতছাড়া করি নি। আমার নিজস্ব কাজটাই রোগী দেখা। রুগ্ণ মানুষকে সুস্থ করার মধ্যেই আমার প্রকৃত আনন্দ।"

চিকিৎসকরূপে কাজ করার কালে তিনি বহু মুমূর্ষ রোগীকে আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের মধ্যে কতকগুলির সম্বন্ধ রহিয়াছে তাঁহার ধর্মজীবনের সঙ্গে। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর যাত্রা রোধ করিয়াছেন তিনি ইন্টিউইসন

(Intuition) বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া। ইন্টিউইসন বলিতে বুঝায় মনের একটা শক্তি যদ্দ্বারা বিনা যুক্তিতে বা বিচার-বিশ্লেষণে সঙ্গে সঙ্গেই সত্যোপলব্ধি হইয়া থাকে। খুব কম মানুষই ওইরূপ শক্তির অধিকারী হন। অনেকের মতে, এই প্রকার শক্তি ঈশ্বরদত্ত। সুতরাং ইহাকে ধর্মজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। ওই শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া তিনটি মুমূর্ষু রোগীর প্রাণরক্ষার কাহিনী নিম্নে বিবৃত করা হইল :

(১)

কলিকাতার এক শিক্ষিত ধনী পরিবারের একটি ২১।২২ বৎসরের যুবককে একদিন ভোরবেলায় তাঁহার শয্যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখা যায়। যুবক বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। ভৃত্যের জবানি হইতে জানা গেল যে, যুবকটি অধিক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়া শুইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক হইল মহানগরীর তিন জন বড় ডাক্তারকে। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জি এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আসিয়া রোগীকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। চিকিৎসকপ্রধানত্রয়ের মধ্যে আলোচনাও হইল । রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অতি ক্ষীণ। নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন তিন জনই মুমূর্ষু রোগীর শয্যার পার্শ্বে। অকস্মাৎ ডাঃ রায় ইন্টিউইসন হইতে অবগত হইলেন যে, রোগীর লাম্বার পাংচার (Lumber puncture) করিলে জীবন রক্ষা পাইবে। তিনি বারংবার অনুভব করিতেছেন ভিতর হইতে কে যেন বলিতেছে উহাতেই রোগী সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাঁহার প্রিয়বন্ধু ডাঃ ব্যানার্জিকে চোখের ইসারায় ডাকিয়া রোগীর ঘরের বাহিরে আনিলেন। ইন্টিউইসনের কথা না বলিয়া তিনি কেবল তাঁহার নিজের মত জানাইলেন এবং ডাঃ ব্যানার্জি তাঁহার মতের সমর্থন করিলেন। তারপর দুই জনে মিলিয়া 'স্যার'কে তাঁহাদের অভিমত জানান। ডাঃ নীলরতন সরকারকে তাঁহারা 'স্যার' বলিয়া ডাকেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত একমত হন। তখন ডাঃ রায় রোগীর মাতাকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে—রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে তিনি সম্মতি দিলে তাঁহারা লাম্বার পাংচার করিয়া শেষ চেষ্টা করিতে পারেন; তাহাতে রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে, কিংবা ভগবানের ইচ্ছায় বাঁচিয়া যাইতেও পারে। মাতা সম্মতি দিলেন। ডাঃ ব্যানার্জি রোগীর লাম্বার পাংচার করিলেন। আধ ঘণ্টা পরে রোগীর নাড়ীর অবস্থা ভালর দিকে পরিবর্তন হইল, ইহারও কিছুকাল পরে রোগীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। রোগীর জীবন নষ্ট হইল না। ওই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে।

(২)

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ডাঃ রায় তখন থাকিতেন ৮৪ নং হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) ভাড়াটে বাড়ীতে। বিকাল পাঁচটায় তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিজের মোটরগাড়ীতে উঠিয়া স্টার্ট দিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, একটি লোক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহার গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়া ডাঃ রায়কে জানাইল যে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের (বি. সি. ঘোষের) বাড়ীতে এখনই যাইয়া একটি কলেরা রোগীকে স্যালাইন ইঞ্জেক্‌সন দিতে হইবে। ডাঃ ঘোষ তখন আপার সার্কুলার রোডের একটা বাড়ীতে থাকিতেন। সেই বাড়ীতে এক সময়ে স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও ব্যারিস্টার স্বর্গত পি. মিত্র বাস করিতেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিকটে বলিয়া ডাঃ রায় স্যালাইন ইঞ্জেক্‌সনের যন্ত্রপাতি সেখান হইতে চাহিয়া লইবেন স্থির করিলেন। তিনি সেই দিকেই গাড়ী চালাইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ অনুভূতি হইল—ওখানে সেসব পাওয়া যাইবে না, ডাঃ লালবিহারী গাঙ্গুলীর বাড়ীতে পাওয়া যাইবে। ডাঃ লালবিহারী তখন ছিলেন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতালের (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) কলেরা ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। পূর্বোক্ত আত্মানুভূতি অর্থাৎ ইন্টিউইসনের দ্বারা চালিত হইয়া তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে না যাইয়া গেলেন সোজাসুজি ডাঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, সাধারণতঃ তিনি ওই সময়ে উপরের ঘরে চলিয়া যান। ডাঃ রায় তাঁহার নিকট যাইয়া বিষয়টি জানাইলে তিনি বলিলেন যে, সমস্ত প্রস্তুত আছে, লইয়া যাইতে পারেন; একটা কলেরা রোগীকে স্যালাইন ইঞ্জেক্‌সন দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন; এইমাত্র খবর আসিল রোগীর অবস্থা ভালর দিকে, স্যালাইন ইঞ্জেক্‌সন লাগিবে না। তৎক্ষণাৎ ডাঃ রায় গাঙ্গুলীকে সঙ্গে লইয়া যন্ত্রপাতি সহ ডাঃ বি. সি. ঘোষের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে ঠিক সময়েই রোগীকে স্যালাইন ইঞ্জেক্‌সন দেওয়া হইল, রোগী মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইল।

(৩)

কর্নেল ডিয়ার আই. এম. এস. ছিলেন তৎকালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহার স্ত্রী গুরুতর পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। শিলঙের একটি নার্সিং হোমে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা করানো হইতেছিল। কর্নেল ওয়াটার্স আই. এম. এস. রোগিণীকে চিকিৎসা করিতেছিলেন, অবস্থা খারাপের দিকেই যাইতেছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক সভায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে কর্নেল ডিয়ার ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে, তিনি কবে শিলঙে যাইতেছেন? ডাঃ রায় বলিলেন—পরের সপ্তাহে। তখন মিসেস্ ডিয়াবের অবস্থার কথা জানাইয়া ডাঃ রায়কে অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য। ডাঃ রায় যেদিন শিলঙে পৌছিলেন সেইদিন রোগিণীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, ৭২ ঘণ্টা কাল রোগিণী অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছিলেন। কর্নেল ডিয়ার ডাঃ রায়কে সঙ্গে লইয়া যাইয়া রোগিণীকে দেখাইলেন। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক কর্নেল ওয়াটার্সের সহিত ডাঃ রায় যোগাযোগ করিয়া রোগিণী সম্পর্কে কথা বলিলেন। কর্নেল ওয়াটার্স মিসেস্ ডিয়ারের বাঁচিবার আশা অনেক আগেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ডাঃ রায় ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউসন করার প্রস্তাব করিলে কর্নেল এইরূপ মন্তব্য করেন যে—তাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগ সাফল্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, উহার বেশী কিছু নহে। তাঁহাকে ব্লাড ট্রান্স্ফিউসন (দেহে রক্ত দিবার) করার কালে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি ডাঃ রায়কে বলেন যে—তাঁহার পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হইবে না, কেননা গবর্নরের সঙ্গে ১১ টায় তাঁহাকে গল্ফ্ খেলিতে হইবে। ডাঃ রায় রোগিণীকে দেখামাত্র স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞান (ইন্টিউইসন) হইতে অবগত হইলেন যে, ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউসন তাঁহার জীবন রক্ষা করিবে। নার্সিং হোমে দেহে রক্ত দিবার যন্ত্রপাতি ছিল না। ডাঃ রায় কর্নেল ডিয়ারকে সঙ্গে লইয়া গেলেন স্থানীয় আমেরিকান মিশনারী হাসপাতালে। সেখান হইতে যন্ত্রপাতি আনিয়া তিনি মুমূর্ষু রোগিণীর দেহে ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউসন করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে মিসেস্ ডিয়াবের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তিনি চক্ষু মেলিয়াই তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কোথায় আছি? রোগিণী সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সারা শিলঙ শহরে প্রচারিত হইল ডাঃ বিধান রায়ের চিকিৎসার অপূর্ব সাফল্যের সংবাদ। স্থানীয় ভারতীয় সমাজে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য লইয়া কত গল্প চলিল কয়েক দিন ধরিয়া। ইউরোপীয়ান সমাজে—এমন কি গবর্নরের ভবনে পর্যন্ত কর্নেল ডিয়ারের স্ত্রীর বিস্ময়কর আরোগ্যলাভের সংবাদ লইয়া আলোচনা হইল।

ডাঃ রায়ের চিকিৎসা-সংক্রান্ত কার্যে এই প্রকারের ইন্টিউইসনের ঘটনা আরও অনেক আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনা ডাঃ রায়ের নিকট হইতেই শুনিয়াছি, তৃতীয় ঘটনা বলিয়াছেন তাঁহার বড় দাদা। পরে সেই বিষয়ে ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্তারিতভাবে জানিয়া লইয়াছি। প্রথম ঘটনা বলিবার দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র এবং বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নরেশচন্দ্র মুখার্জিও সেক্রেটারিয়েটে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে উপস্থিত ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন—গান্ধীজী একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি রোগী দেখিবার পূর্বে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন কিনা। তিনি কাহার নিকট হইতে ওই কথা শুনিয়াছেন, ডাঃ রায় জানিতে

চাহেন। গান্ধীজী কহিলেন যে, একজন পত্রলেখক তাঁহাকে পত্রযোগে উহা জানাইয়াছেন। গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় বলেন যে—তিনি রোগী দেখিবার পূর্বে উপাসনা করেন না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্টিউইসন হইতে নির্দেশ পাইয়া থাকেন এবং সেই নির্দেশ মতে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া একটি ক্ষেত্রেও বিফল হন নাই।

ডাঃ রায়ের ধর্মজীবন সম্বন্ধে 'শিক্ষাব্রতী'-সম্পাদক ও এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক যাহা অবগত আছেন তাহা জীবনী-লেখকের অনুরোধে লিখিয়া দিয়াছেন। নিম্নে প্রদত্ত হইল :

চব্বিশ পরগনা জেলার কলিকাতার অনতিদূরে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ পদ-রজঃপূত খড়দহে গঙ্গাতীরে সুন্দর মনোরম পরিবেশে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির। এক সুবিস্তৃত ভূমির উপর ঐ মন্দির এবং আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মচক্র, পাঠাগার, বিদ্যালয়, ছাপাখানা এবং হাসপাতাল। কিছু দিন আগে এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র।

যিনি এগুলি গড়ে তুলেছেন তিনিও সেইখানে বাস করেন। তিনি ছিলেন কলিকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁর গার্হস্থ্য নাম ইন্দুভূষণ বসু, এম. ডি.। এখন তিনি সংসারত্যাগী পরম বৈষ্ণব,—অযোধ্যার "শ্রী" সম্প্রদায়ভুক্ত, শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস নামে পরিচিত।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর নিজের জায়গায় অধ্যাপকের পদে ডাঃ বসুকে বসিয়ে এসেছিলেন। তিনি ডাঃ রায়ের ছাত্র এবং সহকর্মী। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ডাঃ বসুর আয় ছিল প্রচুর, খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। সংসারিক জীবনে অর্থ, যশঃ, সম্মান অনেক কিছু তিনি পেয়েছেন। সবদিকে প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁকে ভগবান রাখেন তাঁকেই তিনি আবার তাঁরই কাজের জন্য ডেকে ঘরছাড়া করেন। তাই কলিকাতার একজন সেরা ডাক্তার আজ গৃহত্যাগী ভক্ত পরম বৈষ্ণব—নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ লোকসেবায় ব্রতী। সেবা তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে একদিন শ্রদ্ধাস্পদ বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে সেই তীর্থ দর্শনে গেলাম। সঙ্গে বন্ধু শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। সেখানে গিয়ে সত্যই আমাদের মনে হল যেন তীর্থে এসেছি। যেমনি মন্দির, তেমনি বিগ্রহ, তেমনি ঐ পরম বৈষ্ণব সেবক। দেখে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি আপনা হতেই জেগে উঠল। সেবক শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস-এর সঙ্গলাভে আমরা ধন্য হলাম। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউকে বারবার প্রণাম জানালাম। আর প্রণাম জানালাম ঐ পরম বৈষ্ণবকে। আমরা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর প্রসাদ পেলাম।

অল্প সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা নানা আলোচনায় বুঝতে পারলাম কত কি জানেন তিনি। কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের ধর্মজীবন সম্পর্কে কথা উঠল। বুঝলাম তাঁর সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানেন এবং তাঁর কথা বলতে ভালোবাসেন। দুইজনের মধ্যে প্রীতি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক দীর্ঘকালের, এবং আজও তা অক্ষুন্ন আছে।

বললেন—"একদিন খড়দহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ডাঃ রায় যখন ডাঃ ইন্দুবাবুর নিকট শুনলেন যে, তিনি Practice (চিকিৎসা ব্যবসা) ছেড়ে দিচ্ছেন, তখন ডাঃ রায় আনন্দের সঙ্গেই বললেন যে, 'তুমি ভালই করছ, কারণ তিনটে P এক সঙ্গে চলে না। তিনটি P-র অর্থ Profession (প্রফেশান), Practice (প্র্যাকটিস) and Prayer (প্রেয়ার)'।"

আর একদিন যখন ডাঃ রায় শুনলেন, ইন্দুবাবু মেডিকেল কলেজ, Practice, এমন কি কলিকাতার সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে খড়দহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ-এর মন্দিরে চলে যাচ্ছেন, তখন ইন্দুবাবুকে একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করেছিলেন, সে কথাও বললেন। ডাঃ রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা ইন্দু! তুমি কি তোমার নিজের কল্যাণের জন্য সব ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ? না, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য?"

দুই জনের মধ্যে আর একদিন কথাবার্তা হচ্ছিল বড় ডাক্তারের প্রসঙ্গ নিয়ে। ডাঃ রায় ইন্দুবাবুকে বলেছিলেন, "জান ইন্দু। লোকে আমাকে বড় চিকিৎসক বলে, সব রোগ সারাবার সাধ্য আমার নাই, তাঁর যেটা ইচ্ছা সেটাই সারে, বাকি সারে না। আর কি জান, যেখানে চিকিৎসায় সমস্যা আসে, আমি সেখানে ভগবানের নাম করে ঔষধ দিই।"

ডাঃ রায়ের ধর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু কথা তুললাম—ইন্দুবাবু বলেন—'ডাঃ রায়ের ধর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা তাঁর সঙ্গে বহু হয়েছে।' ডাঃ রায় ইন্দুবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছেন—"দেখ ইন্দু, আমি যেসব কাজ করার চেষ্টা করি, তাঁর সেবা মনে করেই সব সময় করে থাকি।"

এইসব কথার শেষে ঐ পরম বৈষ্ণব ইন্দুবাবু বললেন—"কীর্তনের প্রতি ডাঃ রায়ের যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তিনি কীর্তন এবং ভগবদ্‌বিষয়ক সঙ্গীত শুনতে খুবই ভালবাসেন।"

সেদিন ঐ বৈষ্ণব সাধুর নিকট হতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউকে প্রণাম জানিয়ে আমরা মুক্ত মনে ফিরে আসবার সময় শুধু মনে হতে লাগল—ঐ কর্মব্যস্ত দীর্ঘাকার, রাশভারী রাজনৈতিক নেতার জীবন গড়ে উঠেছে সেবার মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে। ডাঃ রায়ের জীবনে সেবাই ধর্ম, সেবাই কর্ম। তাঁর জীবনে ভগবানই সবার উপরে।

২৭

মানুষ বিধানচন্দ্র

আমরা বিধানচন্দ্রকে দেখিলাম বাল্য ও কৈশোর হইতে যৌবন ও পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্যার্থী, যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, যোগ্য অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলার), কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান ও মেয়র, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, চিকিৎসক, সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ্‌, রাজনৈতিক নেতা, মুখ্যমন্ত্রী ইত্যাদি রূপে তাঁহার কর্মের পরিচয় পাইলাম। এখন আমরা মানুষ বিধানচন্দ্রকে দেখিতে ও বুঝিতে প্রয়াসী হইব। তাঁহার সংবেদনশীল মন, করুণাসিক্ত হৃদয়, দুঃখী ও দুর্গত জনের দুঃখ-দুর্গতিতে বেদনাবোধ, আর্তত্রাণে আগ্রহ এবং প্রকৃত মানুষের মতো মনোভাব ও কার্য তাঁহার মানুষ রূপটি সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং মানুষ বিধানচন্দ্র আমাদের দৃষ্টিতে সহজেই প্রতিভাত হইবেন। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ওই মানুষটি। পারিশ্রমিক দিতে অসমর্থ বলিয়া কোন রোগী ডাঃ রায়ের চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এইরূপ অখ্যাতি তাঁহার সম্পর্কে কখনও শোনা যায় নাই। রোগীর বাড়ীতে যাইয়া যখনই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন রোগী এত দরিদ্র যে, ফী লইলে রোগীর ঔষধ-পথ্যের খরচ কুলাইবে না, তখনই তিনি ফীর টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই রকমের ঘটনার অন্ত নাই ডাঃ রায়ের জীবনে। এককালে ডাঃ রায়ের শিলঙে নিজের বাড়ী ছিল। বায়ুপরিবর্তন ও বিশ্রামের জন্য তিনি বৎসরের মধ্যে দেড়মাস কি দুই মাস সেখানে যাইয়া থাকিতেন। তথায় অবস্থানকালে একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি যাইয়া দেখিতে পাইলেন —রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। রোগীর মৃত্যু হইলে দুঃস্থ ব্রাহ্মণসন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার মতো স্বজন-বান্ধব কেহ নিকটে ছিল না। ডাঃ রায় ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজে উদ্যোগী হইয়া সে ব্যবস্থা করিলেন। অর্থের ব্যবস্থা এবং লোক জোগাড় করা হইল। তিনি শব-বাহকদের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজেও শব বহন করিয়া শ্মশানে গেলেন। অত বড় একজন চিকিৎসককে শ্মশান-বন্ধুরূপে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন। ওই মৃত ব্যক্তি ছিলেন বাংলার বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে সন্ন্যাসী সোহং স্বামী) আত্মীয়।

ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম. বি. সিউড়ীর (বীরভূম) একজন যশস্বী ডাক্তার,

লোকসেবক এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী। ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘকালের পরিচয়। তাঁহার নিজের জানা কয়েকটি ঘটনা তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ওই সমুদয়ের মধ্য দিয়াও মানুষ বিধানচন্দ্রকে জানিবার সুযোগ হইবে। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ঘটনাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১)

৩৬ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে বীরভূমের এক রোগিণী তার ভাইয়ের সঙ্গে এসেছেন ভোরে। ডাঃ রায়কে দেখাবেন। সাতটা বেজে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী তখন রোগী দেখছেন। হঠাৎ শব্দ কানে গেল ভীষণ আর্তনাদের। পুলিশ রুখল, বললে—"মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে—আমার দারুণ যন্ত্রণা।" সিউড়ী হাসপাতাল হতে রোগিণী ফিরে এসেছে। ডাঃ রায়ের কানে গেল। তিনি পরিচারকদের বললেন—"ওর কি বলবার আছে জেনে এসো।" সিউড়ী হাসপাতালের একটা হলদে টিকেটে লেখা—নাকে malignant tumour অর্থাৎ Cancer জাতীয়। সেইটি নিয়ে ডাঃ রায়ের সামনে ধরতেই তিনি লিখে দিলেন—"Admit Cancer Institute." রোগিণীকে সঙ্গে সঙ্গেই ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

(২)

সকাল আটটা। ঘরের রোগী দেখা হয়ে গেছে। পার্সন্যাল অ্যাসিস্টান্ট সরোজ বাবু এসেছেন ফাইলের স্তূপ নিয়ে। সঙ্গে ঢুকলেন এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—"ওঁর কি চাই?" সরোজবাবু একখানা দরখাস্ত বের করে বললেন—এঁর স্বামী টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কেরানী, যক্ষ্মারোগে ভুগছেন। যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যে কয় দিন বেতন পেয়েছিলেন, হাসপাতালে মাসিক প্রায় দুই শত টাকা দিয়েছেন। তার পরেও সর্বস্ব বিক্রি করে হাসপাতালে দিয়েছেন। এখন ওঁর স্বামী বেতনও পান না, সংসারও চলে না। ডাঃ রায় সেই দরখাস্তের উপর লিখলেন—"Admit free bed." এই করুণার স্রোত তাঁর অন্তরে-বাইরে নিত্যই প্রবাহিত হচ্ছে।

(৩)

একটি কুলী তার ছেলেকে নিয়ে এক কোণে বসেছিল; সঙ্গে তার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রিপোর্ট। ছেলেটির পায়ে ছিল বৃহৎ Sarcoma জাতীয় অর্বুদ। ডাঃ রায় নিজেই বললেন—কি চাও? দেখলেন দিন সাত এই দরিদ্রকে; তিনি নিজেই লিখে দিয়েছেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

রোগীটিকে ভর্তি করে রোগীর এক্স্‌রে ও রক্তাদির পরীক্ষার রিপোর্ট পাঠাতে। কাগজপত্র পড়ে বললেন—আবার কি, কি আর হবে! শুনে কুলীব মুখ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হল। তা দেখে ডাঃ রায় বললেন—আচ্ছা দেখছি। বলেই রোগীকে ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

(৪)

একটি সুদর্শন সুবেশ যুবক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, কেবল উঁকিঝুঁকি মারছেন। তিনি দেখলেন—ভিতরে বসে আছেন হরিকুমার চক্রবর্তী। ছেলেটি ছুটে এসে বললে—"হরিদা! ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন?" হরিদা বললেন—"কি দরকার? এখন আর নয়, দুপরে পারব।" ছেলেটি বললে—স্টেট্ ট্র্যান্স্‌পোর্টে ক্যাশিয়ারেব চাকরি পেয়েছি। কিন্তু এক হাজার টাকার জামিন দিতে পারছি না। গ্রিণ্ড্‌লে ব্যাঙ্ক আমার বাড়ী বন্ধক রেখে surety হতে চেয়েছিল, কিন্তু ডিরেক্টার তাতে রাজী নন।" হরিদা বললেন—"আইন ভাই।" ছেলেটি বললে—"তা হলে দাদা, আমার চাকরিটা চলে যাবে।" হরিদা বললেন—"আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।" শুনলাম—ডাঃ রায় লিখে দেওয়ায় ডিরেক্টার বাড়ী বন্ধকীতেই জামিন নিতে রাজী হলেন। ছেলেটির চাকরি হয়ে গেল। এই রকমের সহৃদয়তার ফল্গুধারা বয়ে যেত তাঁর প্রাণের মধ্যে; কিন্তু সব তো আমরা দেখতে পাই নি।

ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। কলিকাতায়, ইংলণ্ডে এবং আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্রে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র-জীবন হইতে তিনি ডাঃ রায়ের সহিত পরিচিত। 'মানুষ বিধানচন্দ্র' নামক তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ দৈনিক বসুমতীর ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুলাইয়ের সংখ্যায় ডাঃ রায়ের ৭৪তম জন্মদিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে কতক উদ্ধৃতি দিতেছি:

"উনিশ কুড়ি কি একুশ সাল। আমি তখন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আদর্শে পিতৃদেবের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বাড়ী থেকে চলে এসেছি। একটা চাকরি জোগাড় ক'রে কায়ক্লেশে কলেজের মাইনেটা জোগাড় হ'ল। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বইয়ের দরকার, কেনার টাকা কোথায়? এমনিই চলছিল। হঠাৎ একদিন ডিসেকসন-হলে পরিচালকের নির্দেশ এল—কানিংহামের প্র্যাকটিক্যাল এ্যানাটমির বই সঙ্গে না আনলে তিনি আর আমাকে ডিসেকসন করতে দেবেন না। মহা সমস্যায় পড়লুম। আমার সঙ্গে একই বাড়ীতে ডিসেকসন করত বর্তমানে পি. জি. হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্নেল এন. সি. চ্যাটার্জী। তার বই নিয়ে মাসখানেক চালালুম। ইতিমধ্যে জনকয়েক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিল—আমার সমস্যা

সমাধানের একমাত্র উপায় কোন রকমে একবার ডাঃ বিধানচন্দ্রকে ধরা। এক নতুন সমস্যা জাগল—তাঁর কাছে যাই কি ক'রে? যাই হোক, অবশেষে দ্বিধা কাটিয়ে ভয়ে ভয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখা হ'লে সমস্ত কথা খুলে বললুম। স্বল্পভাষী বিধানচন্দ্র উত্তরে আমাকে ক'টি কথা বলেছিলেন। তাঁর সেই দরদী কণ্ঠের ধ্বনি আজও আমি শুনতে পাই—যা জীবনের বহু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে আমায় প্রেরণা জুগিয়েছে। —"তুমি বিদ্রোহী। বাবার সঙ্গে মতের মিল হয়নি, তাই চলে এসেছ বাড়ী থেকে। বেশ! মনে রেখো, বিদ্রোহীর জ্বালা অনেক। দেখ, আমরা ব্রাহ্ম, ছেলেবেলা থেকেই আমরা বিদ্রোহী, আমরা জানি।"—আর কিছু না ব'লে তখনই একটি স্লিপ লিখে দিলেন এক বইয়ের দোকানে। সেখানে স্লিপটি দেখাতেই সঙ্গে সঙ্গে কানিংহামের দু' ভলিউমের প্র্যাকটিক্যাল এ্যানাটমি বার করে দিল আমাকে। বই দু'খানা হাতে পেয়ে সেদিন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এসে গেছল। পরের দিন কলেজে এসে সকলকে জানালুম সমস্ত ব্যাপারটা। তখন কথায় কথায় জানা গেল, শুধু আমিই নয়, আমার মত অজানা অভাবী আরও দুর্দশাগ্রস্ত অনেক ছাত্রকেই ডাঃ রায় তাঁর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর নামে বই কিনে দিয়ে, স্কুল-কলেজের মাইনে দিয়ে নানাভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। আজকের কৃতী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা ছাত্রাবস্থায় এমনিভাবে ডাঃ রায়ের কাছে সাহায্য পেয়েছেন।

"১৯৩৮। একটি ছাত্রের সাহায্যের জন্যে ডাঃ রায়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে একদিন হাজির হলুম তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মাখনবাবুর কাছে। মাখনবাবু কী একটা খাতা পড়ছিলেন। হঠাৎ কোন্ এক কাজে মাখনবাবু বাইরে যেতে চোখ পড়ল খাতার ওপর। দেখি, ডাঃ রায়ের কাছ থেকে মাসিক দশ টাকা থেকে দেড় শ' টাকা সাহায্য পাওয়া ব্যক্তিদের এক বিরাট তালিকা।

"এই ত সেদিনের কথা। শুভ ঠাকুর যাবে ইউরোপ-আমেরিকার নানা দেশে তার শিল্পকলার নিদর্শন দেখাতে। প্রস্তুতির জন্য কয়েক হাজার টাকার প্রয়োজন। বেচারা বহু চেষ্টার পর প্রায় হতাশ হয়েই একদিন আমার বাড়ীতে এসে হাজির হল। শেষে শ্রীসারদা দাস আর আমি তাকে পরামর্শ দিলুম—তুমি আর এখানে সেখানে সময় নষ্ট না ক'রে একবার ডাঃ রায়ের কাছে যাও, দেখবে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সে ত শুনেই চমকে উঠল। এও কি সম্ভব? তা ছাড়া শুধু আমার কথার ওপর বিশ্বাস করে এত টাকা দেবেনই বা কেন? সবচেয়ে বড় কথা—তাঁর মত রাশভারী লোকের কাছে গিয়ে একথা বলব কি ক'রে। এইটেই আসল কথা। আমার বহুদিন আগের নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ল। তাকে বললুম—'দেখ, একথা বহু কাল আগে আমারও একদিন মনে হয়েছিল। আজও তোমরা ঐ মানুষটিকে চিনলে না।'

"দিন পাঁচেক পরে হঠাৎ শুভ এসে হাজির। দেখা হ'তেই মহানন্দে আমাকে জানালো যে, ডাঃ রায় দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সমস্ত চিন্তা দূর ক'রে দিয়েছেন।"

আরও দুইটি ঘটনা ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জির প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) প্রতিষ্ঠার পর বহুদিন পর্যন্ত সেই কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হইত কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাইয়া। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহারা পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকেও কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাইতে হইত পরীক্ষা লইতে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল কি করিয়া সে সম্বন্ধে ডাঃ মুখার্জি লিখিয়াছেন :

"ডাঃ রায় একবার হঠাৎ বলে বসলেন, পরীক্ষা দু' কলেজেই হবে। যতদূর মনে পড়ে এই ব্যাপারে আর একটি লোক তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ প্রমথ নন্দী। আই. এম. এস.-রা গেলেন ক্ষেপে, বললেন, এ অসম্ভব। ডাঃ রায়ও বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, 'ওঁরা যদি আমাদের কলেজে এসে পরীক্ষা নিতে রাজী না হন, তাহলে আমরাও তাঁদের কলেজে যাব না। অবশেষে ডাঃ রায়েরই জয় হল। ব্রিটিশ আই. এম. এস.-রা বাধ্য হয়ে কারমাইকেল কলেজে গিয়ে পরীক্ষা নিতে রাজী হলেন।

"আমার বন্ধু হুগলীর সিভিল সার্জন ডাঃ ভূপেন মুখার্জি তখন School of Tropical Medicine-এর ডেপুটি ডাইরেক্টর। ডাইরেক্টর আর ডাঃ ভূপেন দুজনে মিলে বহু পরিশ্রমে প্রায় তিন মাস ধরে হাসপাতালের বাজেট তৈরি ক'রে ফেললেন। আত্মপ্রসাদ হোল, বাজেট তাঁদের নির্ভুল। এতে গোলমালের আর কোন অবকাশ নেই। যাই হোক, একদিন সন্ধ্যায় বিধানচন্দ্রের কাছে হাজির হ'লেন ওঁরা। বিধানচন্দ্র তখন সবেমাত্র ফিরেছেন ক্লান্তদেহে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে মনও শ্রান্ত। প্রথমে ত বাজেট দেখতেই চাইলেন না। পরে বহু পীড়াপীড়িতে বসে গেলেন বাজেট পরীক্ষায়। সে কী অখণ্ড মনোযোগ! পাঁচ মিনিট পরেই বিধানচন্দ্র আবিষ্কার করলেন এক বিরাট গণ্ডগোল। ওঁরা ত অবাক! যে বাজেট ওঁরা তৈরি করলেন তিন মাস ধ'রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে, তার ভুল তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিধানচন্দ্রের চোখে পড়ল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।"

ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জি বর্ণনা করিয়াছেন আর একটি ঘটনা—যাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, এক দল ছাত্রের আত্মমর্যাদাবোধের অভাব দেখিতে পাইয়া ডাঃ রায় কিরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন ; তবে বিরক্তি সত্ত্বেও ছাত্রদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত জানিয়া প্রতিকার করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই :

"চিরদিনই ডাঃ রায় ছাত্রদের দরদী বন্ধু। আমরা তখন ছাত্র। একবার হোল কি,

মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ মনস্থ করলেন ছ'মাসের ছুটি নিয়ে বিলেত যাবেন। আমাদের পরীক্ষা সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ের দু' মাস এগিয়ে এল। ছেলেদের মাথায় অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। এখনও যে লেকচার, ডিসেকসন অর্ধেক বাকী। দলের পাণ্ডা বর্তমানে সিউড়ির ডাক্তার কালীগতি ব্যানার্জী বাৎলালেন, একবার যদি ডাঃ রায়ের পা জড়িয়ে সব কথা নিবেদন করা যায় তা হ'লেই এই বিপদ থেকে মুক্তি। পরের দিন দল বেঁধে হাজির হলুম ডাঃ রায়ের বাড়ীতে। দলে ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান ডেপুটি মেয়র ডাঃ অমরনাথ মুখার্জী, পি. জি. হাসপাতালের কর্নেল এন. সি. চ্যাটার্জি, আরও অনেকে। সবাই ভিড় না ক'রে জনকয়েক তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ে পড়লুম। তাঁর পায়ে পড়তেই মহা চটে গেলেন। কয়েক হাত দূরে পিছিয়ে গিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "উঠে দাঁড়িয়ে মানুষের মত কথা বল, তোমাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেখাও।" আমরা ত ভয়ে যা বলবার ছিল কোন রকমে সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। এত জল্পনা-কল্পনা সব মাটি। এক রকম নিরাশ হয়েই ফিরলুম সেদিন। তারপর হঠাৎ খবর এল যে, পরীক্ষার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যথা সময়েই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেদিন ডাঃ রায়ের কাছ থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষার শিক্ষাই নিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু আজ আরও বুঝেছি যে, ন্যায়নিষ্ঠ বিধানচন্দ্র যখনই বুঝলেন, নিরীহ ছাত্রদের ওপর একজন কর্তৃপক্ষের খেয়ালের জন্যে অন্যায় অবিচার হচ্ছে, তখনই তিনি তার প্রতিকার করেছিলেন ন্যায় আর সত্যের খাতিরে।"

রাজনীতিক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্রতি বিধানচন্দ্রের ব্যবহারের মধ্য দিয়াও মানুষ বিধানচন্দ্রের বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। পীড়িত রাজনৈতিক কর্মীদের নিকট হইতে তিনি চিকিৎসার জন্য ফী লইতেন না। দরিদ্র কিংবা দুর্দশাগ্রস্ত বুঝিতে পারিলে রুগ্ণ দেশকর্মীকে বিনা-পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করা ব্যতীতও তিনি নানাভাবে সাহায্য করিতেন। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশসেবকদের প্রয়োজন যে কত বেশী, তাহা ডাঃ রায়ের অজানা ছিল না। যাহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে নির্যাতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার তুলনা ছিল না। সেই মনোভাব সহকর্মীদের সহিত তাঁহার সাধারণ ব্যবহারেও প্রকাশ পাইত। এই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। উনবিংশ অধ্যায়ে ("ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনঃ-প্রবর্তন প্রসঙ্গ") লিখিয়াছি যে, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন উপলক্ষে আমি ডাঃ রায়ের সঙ্গে রাজসাহী বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি জেলায় পরিভ্রমণ করিয়াছি। প্রতিযোগিতা ছিল নব-গঠিত ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে। রাজসাহী বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আত্মীয় ও সতীর্থ বিপ্লবী নেতা স্বর্গত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির মনোনীত

প্রার্থী স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্ত। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে আমি ডাঃ রায়ের সহিত রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর এবং জলপাইগুড়ি শহরে প্রচারকার্যে যাই। একই গাড়ীতে আমরা যাতায়াত করিয়াছি এবং অবস্থানকালে একই গৃহে বাস করিয়াছি। তখন ডাঃ রায়ের বয়স ৫২ বৎসর, আমার বয়স ৪৫ বৎসর। আমি তাঁহার সাত বৎসরের ছোট হইলেও তিনি আমার সুখ-সুবিধা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাঁহার ওই সজাগতায় আমি অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিতাম। তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণে বা ব্যবহারে মনে হইত—যেন আমি তাঁহার অতিথি হইয়া সঙ্গে চলিয়াছি। সহকর্মীর প্রতি এমনই ছিল তাঁহার আচরণ বা ব্যবহার।

জলপাইগুড়ি শহরে আমরা পৌঁছিলাম ৭ই অক্টোবর (১৯৩৪ খ্রীঃ) সন্ধ্যায়। স্থানীয় আর্য নাট্য-সমাজ হলে এক জনসভায় ডাঃ রায় কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কিত প্রস্তাবের সমর্থনে এক ঘণ্টার অধিক কাল বক্তৃতা দিলেন। আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল স্থানীয় কংগ্রেসনেতা ও যশস্বী চিকিৎসক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের বাড়ীতে। সভার কার্য সমাপ্ত হইতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের চারুবাবুর বাড়ীতে যাইয়া আহার করার সময় ছিল না। দুইজন ভৃত্য আহার্য দ্রব্যাদি স্টেশনে আনিয়া আমাদের প্রথম শ্রেণীর নির্দিষ্ট গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। তাহারা বাসনগুলি লইয়া যাইবার জন্য অন্য গাড়ীতে উঠিল এবং কয়েকটি স্টেশনের পরে গাড়ী থামিলে ওইগুলি লইয়া যাইবে বলিয়া গেল। ডাঃ রায় বাথ-রুমে যাইয়া হাত-মুখ ধুইয়া আসিলেন। আমাকে য়্যান্টিসেপ্টিক লোশনের শিশিটা দেখাইয়া বলিলেন—"যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো, লোশন দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিও।" আমি বাথ-রুম হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, একটি ছোট টেবিলের উপর তিনি খাবার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুইজনের পৃথকভাবে খাইবার বাসনাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যবস্থা করিলেন একই থালায় একই সঙ্গে খাইবার। বলিলেন—"এসো, খেতে বসে যাও।" দেখিলাম, খাওয়ার বেলায়ও ডাঃ রায়ের লক্ষ্য আমার খাওয়ার দিকেই। ভাত, ডাল, মাছ, ভাজি, মাছের ঝোল, তিন-চার রকমের তরকারি, টক, দই, মিষ্টি—এইগুলি ছিল আহার্য। দুইজনই আমরা পরিশ্রান্ত, তৃপ্তির সঙ্গে খাইলাম। খাইতে খাইতে যে পদ তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, সেইটির দিকে তৎক্ষণাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তখনকার দিনে আহারকালে তাঁহার বাচবিচার দেখি নাই। আহারে বসিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত আমি অনুভব করিলাম অতিথির সমাদর আমি পাইতেছি। বিধানচন্দ্র ভারত-বিশ্রুত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিক নেতা, কলিকাতার অভিজাতশ্রেণীর সম্মানিত ব্যক্তি। রাজনীতিক-ক্ষেত্রে আমি তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ একজন সহকর্মী—বড় জোর মফঃস্বলের একটি ছোট জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং কংগ্রেসের প্রচারকার্য উপলক্ষে যাতায়াত এবং আহারাদি ব্যাপারে নেতার সুখ-সুবিধার

প্রতি দৃষ্টি রাখা তো আমারই প্রাথমিক কর্তব্য। সেই বোধ থাকা সত্ত্বেও আমার নেতার সস্নেহ আচার বা ব্যবহার আমাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল।

বিধানচন্দ্রের সঙ্গে যাতায়াতকালে কিংবা কোন কাজ করার সময়ে আমার মতো অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য হয়তো আরও অনেকের হইয়া থাকিবে। সেই শ্রেণীর অন্ততঃ একজনের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি হইলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ইউনাইটেড্ প্রেস অব্ ইণ্ডিয়ার পরিচালক-সম্পাদক বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। তাঁহার একটা প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি:

"একদিন গল্প করেছিলেন বিধানচন্দ্র। দিল্লী যাবার পথে ট্রেনে তাঁর কামরায় আমাকে সহযাত্রী করে নিয়েছিলেন। তাঁকে সেবার নিবিড়ভাবে দেখবার ও একান্তভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁর পথযাত্রার শ্রান্তি দূর করে দেবো। কিন্তু সারা পথ তিনিই আমার যত্ন নিলেন, কামরাটি পরিষ্কার করে রাখলেন।"

এই স্থলে উল্লেখ করিব ডাঃ রায়ের জীবনের একটি ছোট ঘটনা—যাহার মধ্য দিয়াও মানুষ বিধানচন্দ্রের সাক্ষাৎ মিলিবে। বিলাত হইতে শিক্ষাসমাপনান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুকাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবোধচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার ল্যানস্‌ডাউন রোডের বাড়ীতে বাস করিতেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার দাদা দেখিতে পাইলেন যে, বিধান ঘরে নাই। অত রাত্রিতে সে কোথায় গেল ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন এবং তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রিতে বিধান ফিরিয়া আসিলে দাদার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে,—াক্র স্কুল স্ট্রীটে একটি রোগীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে একটা ঔষধের মাত্রা ঠিকমতো দিয়াছিলেন কিনা দেখিতে। ঔষধটার মাত্রা খুব কম না হইলে রোগীর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে হঠাৎ সে কথা বিধানের মনে জাগায় তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হইলেন রোগীর বাড়ীর দিকে। সৌভাগ্যক্রমে ব্যবস্থাপত্রে ভুল হয় নাই। ৪৭।৪৮ বৎসর পূর্বের কলিকাতা শহর—ট্যাক্সি, রিক্সা কিছুই ছিল না; তারপর অত রাত্রিতে ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডের মতো অঞ্চলে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীও দুষ্প্রাপ্য ছিল। যাওয়া-আসায় প্রায় ছয় মাইল পথ তাঁহাকে হাঁটিতে হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে শুধু বিধানচন্দ্রের তীক্ষ্ণ কর্তব্যবোধের পরিচয় মিলিবে তাহা নহে, একটি দরদী অন্তঃকরণেরও সন্ধান পাওয়া যাইবে।

মানুষ বিধানচন্দ্র সম্বন্ধে একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল:

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দরদী অন্তঃকরণের পরিচয় দিতে হলে বহুদিন পূর্বের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২২৮ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, ১২ নং ফ্ল্যাটে এক সময় ভাড়াটে ছিলেন মনোরঞ্জন চৌধুরী। স্ত্রী ও দুটি মেয়ে নিয়ে তিনি সেখানে বাস করতেন।

তাঁর হলো কঠিন ব্যাবাম। জ্বর ও খুশ্‌খুশে কাশি। অনেক বড় বড় ডাক্তার দিয়ে তাঁর চিকিৎসা হলো। প্রথমে হলো জ্বরের চিকিৎসা, তারপর হলো নিউমোনিয়া।

দীর্ঘকাল চিকিৎসা হলো, কিন্তু 'কেস্' ক্রমশঃ খারাপ হয়ে চললো। অবশেষে স্থির হলো ডাক্তার রায়কে 'কল্' দেওয়া হবে। কিন্তু সমগ্র পরিবার তখন দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে নেমে এসেছে। উপার্জনকারী ছিলেন মনোরঞ্জনবাবু একা। দীর্ঘকাল তিনি শয্যাগত, তার ওপর চিকিৎসার খরচ। কাজেই ডাক্তার রায়কে 'কল্' দেওয়ার মত সামর্থ্য তাঁদের ছিল না বললেই চলে। তবু স্ত্রী ইন্দুলেখা চৌধুরীর একান্ত আগ্রহ—ডাঃ রায়কে 'কল্' দিবেনই, তবু যদি স্বামীকে বাঁচানো যায়!

অবশেষে অনেক-কিছু বিক্রি করে ডাঃ রায়কে কল্ দেওয়া হলো। ডাঃ রায় এলেনও যথাসময়ে।

ছোট্ট ফ্ল্যাট, তেতলার ওপর। ডাঃ রায় তাঁর স্বাভাবিক হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন। মনে হলো, রোগীর অর্ধেক জ্বালা-যন্ত্রণা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেলো! মনোরঞ্জন বাবু শুয়ে শুয়েই হাত তুলে তাঁকে স্বাগত নমস্কার করলেন।

ডাঃ রায়ের সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি সারা ঘরখানির ওপর দিয়ে বিদ্যুতের মত চলে গেল, সম্ভবতঃ রোগীর রুচি ও আর্থিক অবস্থা বুঝতে তাঁর কিছুমাত্র দেরী হলো না।

মনোরঞ্জনবাবু শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র; তাঁর পত্নীও ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল খুবই সুখের। মনোরঞ্জনবাবু নিজেও ছিলেন মার্জিতরুচি ও সুপুরুষ। এতদিন ব্যাবামে ভুগেও তাঁর স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই।

ডাঃ রায় রোগীকে পরীক্ষা করলেন, তাঁর যেসব চিকিৎসা হয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার সবকিছু জেনে নিলেন ও প্রেসক্রিপশন্‌গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রীকে, আপনাদের পুরুষ-আত্মীয় আশেপাশে কেউ নেই কি?

"আছেন, তিনি আমার দেবর, শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চৌধুরী। কালীঘাটে থাকেন। মাঝে মাঝে এখানে আসেন ও দেখেশুনে যান।"

ঐ সামান্য দুটি কথাতেই বোধ হয় ডাঃ রায় অনেক কিছু বুঝে নিলেন। সম্ভবতঃ বুঝে নিলেন যে, মনোরঞ্জনবাবু বড্ড বেশী অসহায়। তিনি বললেন, তাঁকে একবার

এখানে ডাকিয়ে আনুন না। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, আপনার মেয়েদের একটিকে নিয়ে সে সরোজবাবুর বাড়ীতে চলে যাক্, ও তার কাকাকে ডেকে নিয়ে আসুক। আমি ততক্ষণ রোগীর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি।

ইন্দুলেখা দেবী বিস্ময়ে অবাক্। এত বড় ডাক্তার, বিধান রায়, তিনি তাঁর নিজের গাড়ী দিচ্ছেন রোগীর ভাইকে আনানোর জন্য? যাহোক, সেই ব্যবস্থাই হলো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সরোজবাবু এসে উপস্থিত হলেন।

পরস্পর সম্ভাষণের পর, ডাঃ রায় তাকে বললেন, সরোজবাবু! আপনি রোগীর ছোট ভাই। আপনার দাদা দীর্ঘকাল ব্যারামে ভুগছেন। আপনার অসুবিধা হলেও, এমন সময় একটু ঘন ঘন তার খোঁজখবর নেওয়াই আপনার পক্ষে সঙ্গত হবে। কারণ, আমি দেখছি, এঁরা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

আপনাকে ডাকিয়েছি এইজন্য যে, রোগীর সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা আপনাকে—মানে, কোন male member-কে বলব বলে।

আমি বুঝতে পারছি যে, মনোরঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ভক্ত। এত দুর্যোগেও তাঁরা এলিয়ে পড়েন নি। শেষকালে আমায় 'কল' দিয়েছেন, আমি যদি কোন সুরাহা করতে পারি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি কোন আশাই দিতে পারছি না। রোগীকে আমি পরীক্ষা করেছি, তাঁর যা চিকিৎসা হয়েছে, তারও সব-কিছুই দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আগাগোড়া এঁর একটা ভুল চিকিৎসাই হয়েছে।

রোগীর চিকিৎসা হয়েছে নিউমোনিয়ার। কিন্তু রোগীর হয়েছে 'গ্যাংগ্রীন', ও তা হয়েছে lungs-এর ওপরে। রোগী কাশছে, আপনারা দেখছেন দুর্গন্ধ গয়ের বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এ জিনিস গয়ের নয়, এ পুঁজ, ফুসফুসে যে গ্যাংগ্রীন হয়েছে তারই pus, কাজেই এত দুর্গন্ধ।

আমার মতে, অপারেশন ছাড়া এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের আর কিছু করবার নেই। অপারেশন হলেও বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। সে অবস্থায় এখন অন্য কোন চিকিৎসা করাতে পারেন, যাতে একটু শান্তিতে থাকতে পাবেন।

আর দিন পনেরো আগে পেলে আমি হয়তো এঁর কোন উপকার করতে পারতাম, কিন্তু এখন একেবারে অসাধ্য।

ডাঃ রায় ক্লান্ত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, কিছুকাল নীরব থেকে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন, আপনায় লুকিয়ে কোন লাভ নেই। কাজেই মর্মান্তিক হলেও আমাকে বলতে হচ্ছে। কিন্তু এতে ঘাবড়ানো আপনাদের সাজে না। যাঁরা বিশ্বকবির সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা অনেক উন্নত বলেই আমি বিশ্বাস করি।

বিশেষতঃ মরতে আমরা সকলেই বাধ্য। আমি ডাক্তার বিধান রায়, মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য লোকে আমায় ডেকে আনে। কিন্তু আমি কি নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? আমাকেও যে একদিন যেতে হবে নিশ্চয়।

কাজেই মৃত্যু আমাদের অবধারিত। আমরা কেউ তা এড়াতে পারি না। মনোরঞ্জনবাবুরও সে সময় এসে গেছে। এতে আর দুঃখ করে কোন লাভ নেই। বিশেষতঃ মনোরঞ্জনবাবু ভাগ্যবান পুরুষ। আমি এ বাড়ীর প্রতিটি আসবাবপত্র, প্রতিটি পুঁথি-পত্তর ও ছবি দেখেই বুঝতে পারছি, রুচি এঁদের কত মার্জিত। মুষ্টিমেয় আসবাবপত্র দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি কি কঠিন দৈন্য-দশা এঁদের ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে গেছে। সোফা আছে, তার বালিশটা নেই; সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে, তার আয়নাটা নেই। এসব সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিচায়ক। ভাগ্যবান তিনি এই হিসেবে, তিলে তিলে এমন ভাবে দারিদ্র্যবরণ ক'রেও তাঁর স্ত্রী তাঁকে বাঁচানোর জন্য কত চেষ্টাই না করেছেন। তাঁর ও বাচ্চা মেয়ে দুটির মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়, কি কঠোর সেবাই না এঁরা মনোরঞ্জনবাবুর করেছেন।

কাজেই মনোরঞ্জনবাবু ভাগ্যবান। দরিদ্র হলেও, এঁর সমগ্র পরিবার মনের দিক দিয়ে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী।

যাহোক, এখন আমার উপদেশ হচ্ছে, এলোপাথিক মতে আর কিছু না করাই ভালো। আপনারা এখন এঁকে শান্তিতে কাটাতে দিন। আর এ ক'টা দিন আপনি দু' বেলা এসে এঁদের তদারক করুন, এই হচ্ছে আমার অনুরোধ।"

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ডাঃ রায় সেখান থেকে চলে এলেন, আর সমস্ত ফী তিনি দিয়ে এলেন মনোরঞ্জনবাবুর মেয়েটিকে। বল্লেন, "এ তোমাদের কাজে লাগবে, মা। এ টাকা রেখে দাও। টাকা নিংড়ে নেবার party আমার যথেষ্ট আছে মা, তোমাদের কাছ থেকে পারি না।"

ডাঃ রায়ের সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের অন্তরালেও যে এমন এক মরুনদী লুকিয়ে আছে, সে খবর রাখে ক'জনা?

মানুষ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"গত প্রায় দশ বৎসর কাল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা তাঁহাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরূপে পাইয়া তাঁহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ কার্যধারা দেখিয়া এবং তাঁহার বিভিন্নরূপ কর্মপ্রতিভার সহিত পরিচিত হইয়া বিস্ময়াভিভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মুখ্যমন্ত্রীরূপে তিনি বিভিন্ন বিভাগের কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকটি

কাজ সুষ্ঠুভাবে পালনের দ্বারা দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। বিধানসভা ও বিধান-পরিষদের অধিবেশনে তিনি যে বাগ্মিতা ও বাচন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যেক শ্রোতাকে অভিভূত করে। তিনি এমনই ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্ন যে, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কার্যধারার আলোচনার সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বাক্যে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিধানচন্দ্র তখনই তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহুদিন সকাল ও বিকালে—দুই বেলাতে তাঁহাকে ৭৮ ঘণ্টা কাছে বিধানসভা-গৃহে অতিবাহিত করিতে হয়; তিনি কখনও প্রায় অনুপস্থিত থাকেন না, সভাগৃহে অনুপস্থিত থাকিলেও সেই সৌধের একাংশে নিজ নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়া তিনি সকল কথা শ্রবণ করেন এবং উত্তর প্রদানের প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক কথার ঠিকমত উত্তর দিয়া থাকেন। বহু সময়ে আমরা তাঁহাকে একসঙ্গে দুইটি কাজ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। তিনি বক্তৃতা শুনার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্রাদি পাঠ বা সরকারী কাগজপত্র পরিদর্শন করিয়া থাকেন—সে সময়ে বক্তৃতার যে অংশ উত্তরদানযোগ্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে অংশগুলিও নোট করিয়া থাকেন।"

১৩৬২ সালের শ্রাবণ মাসের 'জনশিক্ষা' পত্রিকায় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাঁহা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"তিনি যখন একই সময়ে ২টা কাজ করে যান, তখন আমরা আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারি না। একদিন যখন তাঁর কাছে একটা দরকারী বিষয় অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুঝিয়ে বলছিলাম, তখন দেখি তিনি আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাগজও পড়ছেন এবং তাতে দাগ দিচ্ছেন। আমার হঠাৎ মনে হল, তিনি হয়তো আমার কথা ঠিকমত শুনছেন না। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য যখন আমি কতকগুলো এলোমেলো কথা বলতে শুরু করলাম, তখন তিনি তা বুঝতে পেরে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি এসব বাজে কথা বলছ কেন, কাজের কথা বলে যাও। একদিকে যেমন তাঁর এই ক্ষমতা দেখে আমার মনে আনন্দ হল, আর একদিকে তেমনই নিজে ভুল বুঝেছিলাম বলে অত্যন্ত দুঃখ হল।"

এই বয়সে তাঁর স্মরণশক্তি কত প্রখর, তাহা ভাবিয়া সকল সময়েই অবাক হইয়া যাই। বিধানসভার সদস্য হইয়া প্রায়ই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইত এবং আমার কেন্দ্রের নানা সমস্যা লইয়া তাঁহার কাছে দরবার করিতে যাইতে হইত। তাহা ছাড়া হঠাৎ এমনই দেখা হইয়া গেলে, তিনি আমায় কোন সমস্যা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন ঐ রকম হঠাৎ দেখা হইলে আমি তাঁহাকে একটা হাসপাতাল-সমস্যার কথা বলেছিলাম। তারপর মাসখানেকের মধ্যে আর একদিন হঠাৎ দেখা হইলে—অন্য কোন সমস্যার কথা মনে না পড়ায়—সেই হাসপাতালের কথাই আবার উত্থাপন করি, সেদিন

তিনি আমার কথায় ভাল করে কর্ণপাত করেন নাই। তখন কারণটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, হয়তো কোন অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, তাই আমার কথা ভাল করিয়া শুনিবার সুযোগ পান নাই। তাহার প্রায় ২ মাস পরে একটি দরকারী কাজে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। সেদিন ঘরে বিশেষ ভিড় ছিল না- কাজেই অনেকক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল। দরকারী কথা ছাড়াও অন্য দুই-চারিটা কথা বলিবার সুবিধা হইয়াছিল। যখন সব কথা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন তিনি জিগির দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কিছু বলবার নেই? আমি বিস্মিতভাবে তাহার দিকে তাকাইলে তিনি বলিলেন—হাসপাতালটার কথা ভুলিয়া গিয়াছি কি না, তা তো পরীক্ষা করিয়া দেখিলে না? আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করিলাম। তাহার যে স্মরণশক্তি কত প্রখর, তা জানা না থাকায় সেদিন তাহাকে বিরক্ত করিয়া ছিলাম, তিনি সে কথা মনে রাখিয়াছেন—আমাকে সেদিন তাহা বুঝাইয়াও দিয়াছিলেন।

তাঁহাকে কোন দরকারী কাজের কথা একবারের বেশী দুই বার বলার প্রয়োজন হয় নাই—তাহা গত ১৯৫৭ সালের সাধারণ নিবাচনের সময়েও দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখন তিনি নিজের নির্বাচন ও সারা পশ্চিমবঙ্গের নিবাচন লইয়া সর্বদা ব্যস্ত। আমি একটি ব্যক্তিগত অভিযোগের কথা একদিন সকালে যাইয়া বলিয়া আসি। দুই-তিন দিন পরেই ঠিক জায়গা হইতে আমার আহ্বান আসে। গিয়া শুনিলাম—বিধানচন্দ্র আমার অভিযোগের কথা যথাস্থানে জানাইয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিধানচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া যাইল।

আমরা যৌবনেই বিধানচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশা করবার সৌভাগ্য লাভ করি। আমাদের ব্যারাকপুর অঞ্চল হইতে নির্বাচনে দাঁড়াইয়া ১৯২৩ সালে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আমি ত ছাত্রাবস্থাতেই সাংবাদিকের কাজ আরম্ভ করি এবং 'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা' হই। অর্থাৎ গ্রামের সকল প্রয়োজনেই আমার উপস্থিতি ও সহযোগিতার দরকার হইত। কাজেই ১৯২৩ সালে বিধানচন্দ্র রায় ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়াই পাড়ায় পাড়ায় ভোট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। সেটা বড় কথা নয়—তার কয়েক বৎসর পরেই একজন ছাত্রের প্রয়োজনে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিধানচন্দ্রের গৃহে যাইয়া হাজির হই। বিধানচন্দ্র সব কথা শুনিয়া তখনই ছাত্রটিকে সাহায্য করার জন্য তাঁহার এক বন্ধুকে এক পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ও সঙ্কোচের সঙ্গে ছাত্রবন্ধুকে বিধানবাবুর বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম। বিধানবাবু যে আমাদের মত লোককে মনে রাখিবেন এবং আমাদের কথা শুনিয়া আমাদের বন্ধুকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তা তখন ধারণা ছিল না। সেজন্য

সেদিন তাঁহার সহৃদয়তা ও উদারতা আমাদের মনকে উল্লাসত ও গৌরবান্বিত করিয়া দিয়াছিল। সাল ঠিক মনে নাই—তবে ১৯২৫—২৬ সাল হইবে।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ১৯নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট হইতে 'ফরোয়ার্ড' ইংরাজী দৈনিকের সঙ্গে 'বাংলার কথা' বাংলা দৈনিক প্রকাশিত হয়। সে সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে দৈনিক বসুমতীর কাজ ছাড়িয়া 'বাংলার কথা'র বার্তা-সম্পাদকের কাজ করিতে যাই। ঐ 'বাংলার কথা'র নাম ডানকুনি বো। তুলসীর মামলার সময়ে 'সঙ্ঘবাণী' হইয়াছিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখন কলিকাতার রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত -পাঁচজন প্রধানের একজন। পাঁচজন ছিলেন—(১) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (২) নলিনীরঞ্জন সরকার (৩) নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (৪) শরৎচন্দ্র বসু ও (৫) তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। 'বাংলার কথা'র কর্মী বলিয়া সে সময়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছিল। সে সময়ের একদিনের ঘটনা হইতে মানুষ বিধানচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৯৩০ সাল—আমার অগ্রজ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রথম অবস্থাতেই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় মহাশয়ের পরামর্শমত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে রোগী দেখানো হইয়াছে। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর আমার কনিষ্ঠ সহোদর নৃপেন্দ্রনাথকে ও আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন—তাঁহাদের গৃহে সেইজন্য আমাদের সর্বদা যাতায়াত ছিল—নৃপেন্দ্রনাথ প্রায়ই সে গৃহে বাস করিতেন। সেজন্য প্রথম দিনই ডাক্তার কুমুদশঙ্কর নিজে আমার দাদাকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই হইতে তিন মাস কাল রোগী ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চিকিৎসাধীন ছিল—ডাক্তার কুমুদশঙ্কর প্রায়ই আমাদের আগড়পাড়ার বাড়ীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্রের নিকট রিপোর্ট দিতেন—সে সময়েই একদিন শ্রদ্ধেয় (পরে মন্ত্রী) ভূপতি মজুমদার মহাশয় ডাক্তার কুমুদশঙ্করের সহিত আগড়পাড়ায় আসিয়াছিলেন—কয়েকবার তিনি সে কথা গল্প করিয়াছেন। সে যাহা হউক ঐ সময়ের এক দিনের ঘটনা এইরূপ—

প্রত্যহ বেলা ২টার সময় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে যাইয়া রোগীর অবস্থার কথা জানানো আমার কর্তব্য ছিল—সব কথা শুনিয়া ডাক্তার রায় প্রয়োজনবোধে ঔষধ পরিবর্তন করিয়া দিতেন। সে সময়ে জ্যৈষ্ঠ মাস—দারুণ গ্রীষ্ম। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ঐটুকু পথ—ট্রামে পয়সা দিতে মন যায় না—রোদে হাঁটিয়া যাইতেও কষ্ট হয়। তবু হাঁটিয়া যাই। পর পর ২।৩ দিন রোগীর অবস্থা একই রকম আছে ডাক্তার রায়কে খবর দিয়া আসিয়াছি। রোগীর উন্নতি বা অবনতি হইতেছে না বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে প্রায় একশত লোক আসিয়া ডাক্তার রায়ের সহিত দেখা

করিয়া যায়। আমি তাহাদের মধ্যে একজন। আমি ত ডাক্তার রায়কে টাকা দিই না—বিনা টাকায় রোগীর চিকিৎসা করাইতেছি। একদিন রৌদ্রের তেজ বেশী দেখিয়া মনে করিলাম—আজ আর যাইব না—কাল যাইয়া খবর দিব—সেদিন কোন নূতন খবরও ছিল না। কাজেই যাইলাম না। পরদিন যথাসময়ে ডাক্তার রায়ের কাছে যাইয়া হাজির হইলাম—আমাকে দেখিয়াই ডাক্তার রায় রোগী কেমন আছে জানিয়া লইলেন। তাহার পর ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া বলিলেন -"কাল তুমি না আসায় আমি রোগীর সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তুমি আজ না আসিলে আমি কুমুদশঙ্করকে টেলিফোন করিতাম।" আমি ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ডাক্তার রায় যে আমার অনুপস্থিতির কথা মনে রাখিয়াছেন—ইহাতে শুধু বিস্মিত হইলাম না—একজন দরিদ্র রোগীর সম্বন্ধে তাঁহার দরদ দেখিয়া এই মহাপুরুষের মহত্ত্বে অভিভূত হইয়া গেলাম। কত উদারতা, কত সহৃদয়তা থাকিলে তবে মানুষ এই ব্যবহার করিতে পারে। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে—ডাক্তার রায়ের স্মৃতিশক্তি কখনও একটুও কমে নাই। কিছুকাল পূর্বে বিধানসভায় একদিন স্বর্গত শিক্ষামন্ত্রী বক্তৃতা করার সময় একটি হিসাব পাঠ করিবার সময় অসাবধানতাবশতঃ একটা ভুল অঙ্ক বলিয়াছিলেন—নিকটেই ডাক্তার রায় বসিয়াছিলেন—তিনি সেই অঙ্কটি যে ভুল তাহা দেখাইয়া দিলে তখনই শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু মহাশয় নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী হইবার পূর্বেও তাঁহার কর্মক্ষেত্র ক্ষুদ্র ছিল না। তিনি দীর্ঘকাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (বর্তমান আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের (বর্তমান কুমুদশঙ্কর যক্ষ্মা হাসপাতাল) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সহিত তাহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ছিলেন। তাহা ছাড়া প্রায় আজীবন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল—হিসাব সমিতির সভাপতি রূপে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবপত্র নিখুঁতভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সময় হইতে এ কার্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজও করিতে হইয়াছিল। যাদবপুরস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিতও তিনি দীর্ঘকাল নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়া পরে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ রূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র রূপেও তাঁহাকে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিতে দেখা

গিযাছে। যে সময় তিনি মেয়বের কাজ করিতেন, সে সময়ে সভায় যোগদান করা ছাড়াও তিনি প্রত্যহ কিছু সময় কর্পোরেশন অফিসে মেয়রের ঘরে বসিয়া সকল অভাব-অভিযোগেব প্রতিকারের চেষ্টা কাবতেন। সে সময়ে আমাকে পর পর কয়েকদিন তাঁহার কাছে যাইতে হইযাছিল। এক এক দিন কিছু সময় কারয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া থাকিয়াছি ও দেখিযাছি, তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে সূক্ষ্ম কাগজপত্র দেখিতেন ও প্রত্যেক মানুষেব সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সম্পাদনেব সময তাহার অতীত ইতিহাসেব ঘনিষ্ঠ খবর লইতেন। সে সময়েও কোন কর্মচারী তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকাইতে পারিত না—তিনি এত বেশী স্মরণশক্তি রাখিতেন যে মিথ্যা কথা বলিলেই তাহা ধরা পড়িয়া যাইত।

প্রায় সাত বৎসর পূর্বের আর একটি ঘটনা এখানে বিবৃত করিব।

বিধানচন্দ্রকে এমনই দেখিলে অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আসলে তিনি তাহা নহেন। আমাদের অঞ্চলে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এক খণ্ড জমি এক ধনী কারখানার মালিক জমিসংগ্রহ আইন অনুসারে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করে। পণ্ডিত মহাশয়ের জমিটুকু এক পাশে ছিল—সেটুকু বাদ দিলে কারখানা বিস্তারের কোন অসুবিধা হইবে না বলিযা বৃদ্ধকে সঙ্গে লইযা একদিন তদানীন্তন রাজস্ব-মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়েব কাছে গেলাম। বিমলবাবু বলিলেন—সে বিষয়ে বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার নির্দেশ লিখিয়া দিযাছেন—এখন আর কিছু করা সম্ভব নহে। তবে আমি অন্য কাজে ডাক্তার রায়েব কাছে যাইব—আপনি সঙ্গে গিয়া নিজে তাঁহাকে এ বিষয়ে বলিতে পারেন। কাজেও তাহাই হইল। বিমলবাবু অন্য ফাইল হাতে লইয়া তাহা দেখাইবার জন্য বিধানচন্দ্রেব ঘরে ঢুকিলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম। জমির কথা বলিতেই তিনি স্বভাবসুলভ জোর গলায় উত্তর দিলেন—সে জমি কোম্পানি গ্রহণ করিয়াছে—এখন আর সে বিষয়ে কিছু করা যাইবে না। আমি তাঁহার পাশে বহুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম - খুব নীচু গলায় তাঁহাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলাম—আপনি যদি গরীবের স্বার্থ না দেখেন, তবে কে তাহা দেখিবে। ধনীর কোন অসুবিধা হইবে না—অথচ গরীব ব্যক্তি জমিটুকু ফিরাইয়া পাইবে। আপনি গরীবের বন্ধু—তাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ও বারবার একটা কথা বলার পর তিনি বিমলবাবুকে বলিলেন—ফণী অনেক কথা বলিয়াছে, তাহার কি করা যায় একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।

আমার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার পর অবশ্য বিমলবাবুই জমি সম্বন্ধে যাহা করিবার করিয়া দিয়াছিলেন। ঠিকভাবে তাঁহার নিকট আবেদন করিতে পারিলে যে ফল পাওয়া যায়, সেদিন তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। বাহির

হইতে হয়তো তাঁহাকে কঠোর প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে তিনি কত নরম প্রকৃতির লোক, তাহা এই সামান্য একটি ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

গত জানুআরি মাসে একদিন সকালে কামারহাটি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেলা ৮টার পরে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাসগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, ঢুকিয়া শুনিলাম, তিনি বাহির হইয়া যাইতেছেন, ভিতরের উঠানে মোটরে চড়িয়া বসিয়াছেন। চালককে ইঙ্গিত করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলাম ও আমার নিবেদন তাঁহাকে জানাইলাম। একটি সভায় তাঁহাকে যাইতে হইবে। তিনি কিছুতে রাজী হইবেন না—আমিও ছাড়িব না। গাড়ীতে বসিয়া দুই চারিবার না বলার পর শেষ পর্যন্ত আমার কথায় সম্মত হইলেন ও ডায়েরীতে তাহা লিখিয়া লইলেন। তাহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। বহু সময়ে আমরা বহুবার উহা লক্ষ্য করিয়াছি। অনুগতের প্রতি কৃপা করা মানুষের ধর্ম—তাঁহার মধ্যেও সে ধর্মের অভাব নাই। সে দিন অসময়ে যাইয়া—তাহাকে আটকাইয়াও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই—ইহাই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

ডাক্তার রায়ের সম্বন্ধে গল্প বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার মত লোককে আমরা আমাদের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, নেতা রূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, সে কথা বারবার শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এবং তাঁহার ৭৬তম জন্মদিনে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দুঃস্থ পশ্চিমবঙ্গকে সুপথে পরিচালিত করুন—আমরা এই দিনে তাঁহাকে শ্রদ্ধাপ্রণাম জানাইয়া ধন্য হই।"

ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

" ডাঃ রায়ের মতো পরিশ্রমী ও সময়নিষ্ঠ মানুষ আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর দেখি না। বিশ্রাম, অবকাশ বা আলস্য তার ধাতে নেই। অতি প্রত্যুষে তিনি ওঠেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত রকমারি ছোট-বড় কাজে ব্যাপৃত থাকেন। বয়স তাঁর সত্তর পার হয়ে গেছে—এ বয়সে এ দেশের বেশির ভাগ লোকই হয়ে যান অকর্মণ্য এবং কেউ কেউ পূজা আহ্নিক ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। অনেকেই আর কিছু করেন না, শুধু করেন যুগ-ধর্মের নিন্দা ও অতীত স্মৃতির রোমন্থন। এই একজন মানুষ দেখি, যিনি পুরানোকে আঁকড়ে না থেকে সাহস ও আগ্রহের সঙ্গে সবকিছু নূতনকে স্বাগত করতে জানেন। তাই চিত্তের সরসতা ও কর্মশক্তির বিচারে তিনি একজন যুবকই, তাঁর বয়স যতই হক। আর স্মৃতিশক্তিও তাঁর অসামান্য। মানুষ, ঘটনা ও দিন তারিখ, কিছুই তিনি ভুলে যান না।

কিন্তু এসবের চেয়ে বড় ছিল তাঁর সরস বাক্‌শক্তি। তাঁর প্রত্যেকটি কথা তিনি বলতেন হাসতে হাসতে এবং অনেক ভারী কথাকেও হাস্য-পরিহাসের আবরণে সাজিয়ে পরিবেশন করতেন। তাই তাঁর হুকুমও ধরত অনুরোধের চেহারা, ভৎসনাও হয়ে উঠত আদরের নামান্তর। এ জিনিসটাই হল তাঁর অন্তর-প্রকৃতির দর্পণ। বৃহৎ ব্যক্তি যাঁরা, যাঁরা বড় পদে ও বড় বাক্যে আছেন, সাধারণতঃ তাঁরা হন অতিশয় রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। তাই তাঁদের কাছে ক্ষুদ্র মানুষরা সর্বদাই থাকেন সঙ্কুচিত হয়ে—মনকে মুক্ত করে দিতে ভরসাই পান না। কিন্তু ডাঃ রায়ের সঙ্গে আকিঞ্চিৎকর মানুষও অবাধে গল্প করতে পারতেন। এমন কি, তর্ক করতেও ভয় পেতেন না। আর মজা এই যে তাঁর দাক্ষিণ্যের দরজা বিরুদ্ধ-কথা বললেও বন্ধ হত না কোন দিন কারুর মুখের ওপর।

রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র, বিশেষতঃ শাসকের আসন কোন-দিন সমালোচনা-অতীত নয়। ডাঃ রায়েরও সমালোচনা করেন অনেকে। কিন্তু কোলাহলময় রাজনীতিক জীবনের আড়ালে প্রতিদিনের মানুষটি যদি হন কর্মানন্দ, সহৃদয়, সদাজাগ্রত কৌতুকের আধার, তাহলে তাঁকে ভালো না বেসে পারেন কি কেউ? এই সর্বজনীন অনুরাগের অধিকারী হতে পেরেছিলেন ডাঃ রায় এবং এ ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সফলতা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাছাকাছি গেছি কয়েক-বার এবং প্রত্যেকবারই তাঁর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। এক যক্ষ্মারোগগ্রস্ত দরিদ্র যুবকের জন্যে একবার গিয়েছিলাম আবেদন করতে। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—শুধু তাই না, তাঁকে দাঁড়াবার মতো একটা জায়গাও করে দিয়েছিলেন। আর একবার গিয়েছিলাম সাহিত্যিকদের একটি দলের সঙ্গে—কোন কোন বইয়ের বিরুদ্ধে নীতি-বিরুদ্ধতার অভিযোগ উঠলো। সেবারও তিনি একই রকম উদারতা দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সুনীতির দুর্নীতির মাঝখানের লাইনটা বড় সূক্ষ্ম, কিন্তু আইনের বিধানটা মোটা। তাই এর জন্য বিশেষজ্ঞদের একটা উপদেষ্টা সমিতি থাকা ভাল। তবে ভাবনা নেই, সাহিত্যিকদের কোমরে কেউ দড়ি পরাবে না। তাতে বাংলাদেশই লজ্জা পাবে যে।

কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন তিনি, সাহিত্য আমি বুঝি-টুঝি না। কিন্তু দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে তিনি অতিশয় যত্ন করে পড়েছেন এবং কবিতা বা গান নয়, বহু গদ্যাংশও তাঁর কণ্ঠস্থ। পেশায় যিনি ডাক্তার, কর্মক্ষেত্র যাঁর প্রসারিত রাজনীতির রাজ্যে, তাঁর এই সাহিত্যানুরাগের খবরই বা কজন রাখেন? আর একবারের কথা, একালীন মেয়েদের প্রসঙ্গ বলতে বলতে তাঁর প্রসিদ্ধ উচ্চহাসি হেসে বললেন, মেয়েরা সত্যিই জেগেছে হে! আমাকে একজন সেদিন 'শালা' বলেছিল।

"এই বিচিত্র মানুষটিকে সমগ্রভাবে জানা ও জানানোর প্রয়োজন আছে।"

কবি ও সাহিত্যিক যুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"এই শালপ্রাংশু মহাকায় পুরুষটি একজন পুরুষসিংহ—এতে কোন সন্দেহ নেই। অসাধারণ মানুষদের খুব সান্নিধ্যে যেতে আমি স্বতঃই একটা কুণ্ঠা অনুভব করি। দূর থেকে ডাঃ রায়ের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করবার যেটুকু সুযোগ পেয়েছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, এই মানুষটি একজন অসাধারণ কর্মবীর। ওঁর অভিধানে অলসতা কথাটি নেই। তখন চোখ কাটানো হয় নি। ডাঃ রায়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ভালো করে দেখতে পান না। তবু কর্তব্যে অণুমাত্র শৈথিল্য নেই। মুখ্যমন্ত্রী মোটা লেন্স্ চোখের সামনে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাইল দেখে চলেছেন। শাসনবিভাগের সমস্ত ক্ষেত্র তাঁর নখদর্পণে। বিপক্ষের প্রশ্নের শরজালের সম্মুখে মেজাজ দেখিয়ে একটাও বেফাঁস কথা তিনি বলেন না। জবাবের মধ্যে মাঝে মাঝে খোঁচা থাকে; ব্যঙ্গোক্তি করেন না, এমন নয়। তাঁর রসবোধ প্রচুর; হাসির গানের ডি. এল. রায়ের সগোত্র। কিন্তু রুচি কি মার্জিত! সৌজন্যবোধ কি সুতীব্র! ইংরাজীতে যাকে বলে hitting below the belt—এ জিনিস ডাঃ রায়ের আচরণের মধ্যে কখনও দেখিনি। অশোভন কথা তাঁকে বলতে কখনও শুনিনি।

ভোটের ঘণ্টা বাজছে এবং ডাঃ রায় তাঁর আসনে অনুপস্থিত—এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ে না। বিধানসভার কংগ্রেসী দলের একজন সদস্য হিসাবে যা করণীয়—সেই কর্তব্য পালনে তাঁর ঔদাসীন্য কোনদিন দেখিনি। যাকে বলে beating about the bush—অনেক বক্তার বক্তৃতায় তারই অভিব্যক্তি শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। ডাঃ রায়ের ভাষণের মধ্যে বাজে কথা থাকে না। ওজন করে তিনি কথা বলেন। সেই ভাষণ আবেগে কখনও কখনও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বৈশিষ্ট্য ভাষার সংযমে, বিচারবুদ্ধির প্রতি অনুরাগে। তাঁর বক্তৃতা বন্যাবেগে শ্রোতাকে ভাসিয়ে দেয় না, যুক্তির ঘা মেরে মেরে বক্তব্যকে মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়। তার আবেদন সকল সময়ে শ্রোতার বুদ্ধির কাছে, তার হৃদয়াবেগের কাছে নয়।

আমরা যখন ছাত্রজীবনে স্কাউট ছিলাম, তখন আমাদের প্রত্যেককে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটা ছিল Be prepared. ডাঃ রায় এই অমূল্য আদর্শকে জীবনে সত্য ক'রে তুলেছেন। সব সময়েই তিনি প্রস্তুত। কোন কাজ ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখেন না। এইজন্যে বিপক্ষ পার্টির প্রশ্নবাণের সম্মুখে ডাঃ রায়কে কখনো অপ্রস্তুত হতে দেখিনি।

ডাঃ রায়ের অনেক ভাষণের মধ্যে মুমূর্ষু রাবণের সেই বিখ্যাত উপদেশবাক্যের বারংবার উল্লেখ দেখতে পাই। রাবণ রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—'আগামী কালের কাজ

আজ করো, আজ সন্ধ্যায় যা করবে বলে মনে করেছ, তা কর আজকের অপবাহ্নে। কর্তব্য কাজ কখনো ফেলে রাখতে নেই। কে জানে, কার জীবনে কখন সন্ধ্যা হয়।' আমার মনে হয় মুমূর্ষু রাবণরাজার এই অমূল্য উপদেশ বাক্যটি ডাঃ রায়ের জীবনের উপরে গভীর রেখাপাত করেছে। আমাদের জীবন বাড়িয়ে যায় আমাদের আদর্শের রঙে। কর্তব্যকাজ কখনো ফেলে রাখতে নেই—এই আদর্শের বীজ কোন দূর অতীতে ডাঃ রায়ের চিত্ত-ভূমিতে উপ্ত হয়েছিল জানিনে। কিন্তু বীজ ব্যর্থ হয় নি। আদর্শকে তিনি জীবনে ফলবান করেছেন। এরকম কর্মী-পুরুষ যথার্থই দুর্লভ।

আমরা বেশীর ভাগ মানুষই জড়ভাব বাছে হার মানি। এ কাজ করবো, সেকাজ করবো—এ রকমের সংকল্প ভাবাবেগে আমরা অনেকেই গ্রহণ করি—কিন্তু সেই সব সংকল্পকে কাজে পরিণত করি কয়জন? সদিচ্ছা মনের মধ্যে সদিচ্ছাই থেকে যায়,—আচরণে আর মূর্ত হয়ে ওঠে না। একটা গয়ংগচ্ছভাব আমাদের জাতীয় চরিত্রের যেন বৈশিষ্ট্য। হচ্ছে, হবে—এই রকমের একটা দীর্ঘসূত্রতার জন্যেই আমরা কোন কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারিনে। ঠাকুর বলতেন, 'ঢিমে তেতালা হলে হবে না।' অধিকাংশ নরনারীর কাজকর্মে, চালচলনে ঐ ঢিমে তেতালা ভাব। ঠাকুরের ভাষায়ঃ 'যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাদ্‌ভ্যাদ্ করছে।' ডাঃ রায় স্বতন্ত্র জগতের মানুষ, জীবনে কোথাও শৈথিল্য নেই।

ডাঃ রায়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু বার্ধক্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। কে বলে বয়স তাঁর সত্তরের সীমা পেরিয়ে গেছে? যেন সাতাশ বছরের যুবক। কোথাও একটু আড়ষ্টতা নেই। যাকে বলে Dynamic presonality.

যৌবনের গরিমাকে এইভাবে ধরে রাখতে পারা নিশ্চয়ই যে সে লোকের কর্ম নয়। এজন্যে discipline-এর, সংযমের প্রয়োজন আছে। ডাঃ রায় আহারে বিহারে সংযমী। পার্টি-মিটিং-এ মুখরোচক আহার্যের ব্যবস্থা থাকে। ডাঃ রায়ের টেবিলে খাবারের প্লেট পূর্ণই থাকতে দেখি। কেবল চা খান। জিহ্বার উপরে কী কন্‌ট্রোল? প্রজ্ঞার আলোতে জীবন নিয়ন্ত্রিত। বুদ্ধির লাগামে ইন্দ্রিয় সংযত।

সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর বলিষ্ঠ আশাবাদ। একটা আদর্শকে যদি তিনি দেশের ও দশের পক্ষে শুভ বলে একবার মনে করেন, তাকে ফলবান করবার জন্যে মরিয়া হতে তিনি ভয় পান না। জয়-পরাজয় তাঁর কাছে তখন তুচ্ছ। কারণ a courageous effort consecrates an unhappy end. সাহসের সঙ্গে কাজ করে যাব—ফল যাই হোক না। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্—গীতার এই শিক্ষা ডাঃ রায়ের জীবনে ফলবতী হয়েছে। তিনি যথার্থই কর্মবীর।"

ডাঃ রায় একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং কর্মব্যস্ত নেতা। তিনি রাষ্ট্র-পরিচালনার

গুরুত্বপূর্ণ কার্যে দিবরাত্রি ব্যাপৃত থাকেন। সেজন্য কাহারও কাহারও ধারণা যে, তাঁহার প্রাণে সরসতা নাই। কিন্তু ওই ধারণা একেবারেই ভুল। তিনি ক্রীড়ামোদী, সঙ্গীতানুরাগী এবং রহস্যপ্রিয়। ব্রীজ খেলিতে তিনি খুবই ভালোবাসেন এবং সেই খেলায় তিনি এত দক্ষ যে, তাঁহাকে কেহ হারাইতে পারে না। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে যাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে,—ডাঃ রায় এমন ভাগ্য নিয়া জন্মিয়াছেন যে, জীবনে কোন ক্ষেত্রেই তাঁহার অদ্যাবধি পরাজয় হয় নাই। তিনি রহস্যালাপে কিরূপ পটু, সেই বিষয়ে স্বনামখ্যাত সাংবাদিক মিঃ কে পি. টমাস তাঁহার প্রণীত জীবনীতে ('Dr B. C. Roy') একটি ঘটনার উল্লেখ করিযাছেন। এলাহাবাদে আনন্দভবনে স্বর্গত মতিলাল নেহরুর বাসভবনে গান্ধীজীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন ডাঃ রায়, ডাঃ আন্সারি এবং আরও জনকয়েক। স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুও তখন সেখানে ছিলেন। তিনি রহস্যালাপ করিতে খুব ভালোবাসিতেন। হঠাৎ মিসেস্ নাইডু ডাঃ রায়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ডাঃ রায়, আপনার বয়স তো পঞ্চাশের কাছে এসে পৌছল, কিন্তু তা হলে কি হবে; আপনার গালে দেখি এখনও টোল খায়। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ডাঃ রায়—আর আপনি ত পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন, এও আপনার চোখে পড়ে দেখছি। জবাব শুনিয়া গান্ধীজী প্রাণখোলা হাসি হাসিলেন। ডাঃ রায় যে একজন দক্ষ ও নিপুণ ব্যবস্থাপক বা পার্লামেণ্টারিয়ান-রূপে খ্যাতি ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন, ইহার অন্যতম কারণ তাঁহার রহস্যপ্রিয়তা। তিনি আইনসভায় কার্যরত থাকাকালে বিপক্ষদলের উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও ধৈর্যচ্যুত হইতেন না এবং নিজে সুযোগমত রহস্য করিতে এবং অপরের রহস্য উপভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। ওইরূপ একটা ঘটনার উপভোগ্য বর্ণনা আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০শে জুন (১৯৫৭ খ্রীঃ) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

মন্ত্রীরা কি কচ্ছপ ?

গতকল্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের জনৈক সদস্য রাজ্যের মন্ত্রীদের কচ্ছপের সহিত তুলনা করিলে সভাকক্ষে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

ঐ দিন সাধারণ শাসন খাতে ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে শ্রীযতীন চক্রবর্তী (আর. এস. পি.) পূর্বতন মন্ত্রিসভার কোন এক মন্ত্রীর উক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মন্ত্রীরা প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় গুটগুট করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আসেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় আসিয়া উহাদের চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখেন। তাঁহারাও চুপচাপ থাকেন। বেলা ৫টা বাজিলে মুখ্যমন্ত্রী আবার তাঁহাদের উল্টাইয়া দেন এবং তাঁহারা গুটগুট করিয়া চলিয়া যান। মন্ত্রীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বলিয়া কিছুই নাই—মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠেন,

বসেন—ইহাই বক্তা বলিতে চাহেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিতর্কের উত্তরদানকালে এক সময় বলেন যে, তিনি যখন রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ প্রবেশ করেন, তখন কোন মন্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না। শুধু ঝাড়ুদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে তখন ঘর ঝাঁট দিতে থাকে। রাইটার্স বিল্ডিংস্ ত্যাগ করার সময়ও ঐ ঝাড়ুদারের সঙ্গেই দেখা হয়। তখনও তাহাকে তিনি ঝাঁট দিতে দেখেন। মন্ত্রীরা তখন থাকেন না। শ্রীচক্রবর্তী তাঁহার বক্তৃতায় এক সময়ে যখন বলেন যে, রাজ্যসরকারের দুইজন ক্রীড়ামোদী মন্ত্রীর (শ্রীসিদ্ধার্থ রায় ও ভূপতি মজুমদার) ন্যায় তাঁহারও ক্রীড়ার প্রতি বিশেষ উৎসাহ আছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, দেখিবেন, আপনিও তাহা হইলে কচ্ছপ বনিয়া যাইবেন (হাস্য)।

১লা জুলাই ৭৬তম '৯৫৭ খ্রীঃ জন্মদিনে বিধানচন্দ্রের বাড়ীতে "একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একখানি জীবনী-গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় ডাঃ রায়কে মালা-চন্দনে ভূষিত করা হয়। জীবনী-গ্রন্থ-প্রণেতা নগেন্দ্রকুমার গুহরায় ও প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক 'ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত' গ্রন্থখানি ডাঃ রায়ের হাতে অর্পণ করেন।" (যুগান্তর)

জীবন-চরিত গ্রন্থখানি ডা. রায়ের হাতে অর্পন করিলে তিনি প্রচ্ছদপট দেখিয়া তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে মন্তব্য করেন—'বেশ ত দেখতে!' গ্রন্থকার বলেন—'বাইরে ত দেখতে বেশই।' ডাঃ রায় কহিলেন—'ভেতরের বিচার করবেন—পাঠক-পাঠিকারা।' ঠিক ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিলেন বিধানসভার সদস্য আরামবাগের ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এবং রাধা সিনেমার স্বত্বাধিকারী কিছু উপহার লইয়া। দুইজনই স্থূলকায়। ডাঃ রায় মৃদু হাসিয়া বলেন—'কি হে! সব রাধাই দেখছি যে একই রকমের।' শুনিয়া উপস্থিত দর্শনার্থী নরনারী সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

একবার তাঁহার এক সংবর্ধনা-সভায় ডাঃ রায় বলিলেন, তোমরা যাই বল, লোকে কিন্তু আমার সম্বন্ধে অন্য কথা বলে। শ্রোতারা সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। ডাঃ রায় মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, ছোট ভাই তার দিদিকে বলল, বিধান রায় তো মুখ্যু মন্ত্রী। দিদি বলল, দূর বোকা! মুখ্যু মন্ত্রী নয়, মুখ্য মন্ত্রী। ভাই বলল, ধ্যেৎ, তুই জানিস্‌নে। মা তো সবসময় বলে, বিধান রায় মুখ্যু মন্ত্রী।

শ্রোতারা হাস্য-রোলে ফাটিয়া পড়িল।

৩০

জীবন-সন্ধ্যায়

জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে বিধানচন্দ্র পঁচাত্তর বৎসর শেষ করিলেন। আজ ১লা জুলাই (১৯৫৭ খ্রীঃ) তাঁহার ৭৬তম জন্মদিন। এই বয়সেও তিনি দেহে-মনে অদ্যাবধি সুস্থ ও সবল আছেন। তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন দেখিলে মনে হইবে যে, তিনি জীবন মধ্যাহ্ন অতিক্রম করেন নাই। যুবকের মত উৎসাহ-উদ্যম, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি-সামর্থ্য লইয়া তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন। সেই কর্মপ্রেরণাই বয়োবৃদ্ধ বিধানচন্দ্রের মধ্যে আনিয়াছে যৌবনের জোয়ার। বার্ধক্য তাঁহার প্রবহমান কর্মস্রোতের দুর্বার গতি রোধ করিতে পারে নাই। সাধারণ মানুষ জীবনের সায়াহ্নবেলায় নিশিদিন শুনিতে পাইয়া থাকে পরপারের ডাক—মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া ক্ষণে ক্ষণে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। কিন্তু বিধানচন্দ্র ত সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি অসাধারণ মানুষ; তাই সে ডাক তাঁহার কানে পৌঁছে না, সে আশঙ্কা তাঁহার মনে জাগে না। তিনি জীবন-সন্ধ্যায় দেশ ও দশের সেবাকে ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত। পরমেশ্বরের নিকট এই নিষ্ঠাবান সেবকের প্রার্থনা—যেন সেবাব্রত পালনের মধ্য দিয়াই তাঁহার জীবনাবসান হয়।

বিধানচন্দ্র খাঁটি বাঙালী। বাংলা ও বাঙালীকে তিনি অন্তরের সহিত ভালোবাসেন। বাংলা এবং বাঙালী তাঁহার প্রিয় বলিয়াই ভারত এবং ভারতবাসীও তাঁহার প্রিয়। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গকে শ্রী, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শক্তির আকর করিয়া তোলা এবং বাঙালীকে একটা আদর্শ জাতি রূপে গঠন করা তাঁহার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন। সেই চিন্তাকে রূপায়িত করা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা,—জীবন-সন্ধ্যায় বিধানচন্দ্রের ঐকান্তিক কামনা। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে—বিশেষ করিয়া জন্মদিনের সংবর্ধনা-সভায় সেই কামনা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের লোকপ্রিয় নেতা, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক, কর্ম-শক্তির মূর্ত প্রতীক বিধানচন্দ্রের ৭৩তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে (১৯৫৪ খ্রীঃ, ১লা জুলাই) কালকাতায় কংগ্রেস-ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"জীবন কর্ম-সমষ্টি মাত্র। আজিকার কর্ম-সমষ্টি ও কালকের কর্ম-সমষ্টি এক নহে। নিত্য নূতন নূতন কর্ম-সমষ্টি আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। আমার জন্মদিনে সকলে একত্র হইয়া নূতন নূতন উদ্ভাবনা করিতে যদি না পারি, তাহা হইলে এ দিনের তাৎপর্য উপলব্ধি হইবে না। এই জন্মদিনে সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করিব। কবি গাহিয়াছেন—

"নীচুর কাছে নীচু হতে
শিখ্‌লি না রে মন,
সুখী জনের করিস্ পূজা
দুঃখীর অযতন।"

কবির ঐ কথাটি আমি সংসারের তীর্থযাত্রায় পাথেয় বলিয়া মনে করিয়াছি। এই তীর্থযাত্রায় যাঁহারা আমার সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহারা নূতন জীবনের সন্ধান পাইবেন।

"সেবাই মানুষের পরম সাধন। আমি দীনের সেবার তীর্থযাত্রী। যে প্রতিষ্ঠান এই সেবাকে মূর্ত করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানে আমার স্থান আছে—ইহা অস্বাভাবিক নহে। যদি তাঁহারা আমাকে কংগ্রেস-সদস্য না করিতেন, তবে কে আমার সেবার কাজ বন্ধ করিতে পারিবে? অশান্তির অবস্থায় সে কাজ চলিতে পারে না। একটা নূতন কথা আসিয়াছে—peaceful co-existence, অর্থাৎ তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি। কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, ভাবরাজ্যে ইহা নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। আপনিও বাঁচুন, আমিও বাঁচি—দুইটিকে মানিয়া নিয়া সেবাকার্য করিতে হইবে। সেবার কাজ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা আমার আছে, ইহা আমি স্বীকার করি না; আমার যথাসাধ্য আমি করিব, জগতের উদ্ধার যদি করিতে হয় আমাকে দিয়া হইবে, আর কাহাকেও দিয়া হইতে পারিবে না—এ ধারণা সাংঘাতিক। সেবা যদি আমাদের প্রধান সাধন হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডী আলাদা করিয়া দিতে হইবে। সেজন্য দরকার peaceful co-existence.

"আমার দৃঢ় ধারণা, শান্তির পথ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে উক্ত নীতি সার্থক হইতে পারে না। ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক—সকলেই যদি বলে আমি বড়, আর সকলে কিছু নয়, তাহা হইলে শরীর হয় রোগের আকর। ফুল, ফল, পত্র, কাণ্ড কিংবা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র প্রত্যেকেই যদি বলে আমি বড়, তুমি ছোট—তাহা হইলে সৃষ্টিতে বিপর্যয় ঘটে। সব ভাবের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য সাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে বিপদ হয় অনিবার্য। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ বিষয়ে গুরুত্ব সমধিক। সেবার কাজে যদি সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শান্তির প্রয়োজন। আমরা যে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি,

তাহাকে যদি গভীর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে চাই, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। আমি ছাড়া আর একজনও আছে—এ কথা ভাবিতে পারিব না? **সকলের কষ্টকে আমার কষ্ট বলিয়া যদি না ভাবি, তাহা হইলে আমি সার্থক চিকিৎসা করিতে পারিব না; জীবনে যত সমস্যা যত প্রশ্ন আসে, আমাকে ভাবিতে হইবে আমি যদি অনুরূপ অবস্থায় পড়িতাম তাহা হইলে কি করিতাম - ইহা যদি ভাবি সকল সমস্যার মীমাংসা হয়।** উচ্চাভিলাষ থাকিলে ঝগড়া-বিবাদ না হইয়া পারে না। **দীনের শ্রীচরণ পরম তীর্থ**---এ ভাব যদি মনে থাকে, তাহা হইলে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া আমরা কাজ করিতে পারি, দলা বিদ্বেষ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হইতে পারে না।

"পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে আমি সংসারারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই বনে যদি কাজ করিতে না পারি, কালিমা যদি দূর করিতে না পারি—অবশ্য সব জঙ্গল সাফ করিতে পারি, এ আশা আমি করি না—তবে দেশের অকল্যাণের জন্য দায়ী হইব। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহযাত্রী হউন। পরের অভাব ও দুঃখ যদি দূর করিতে পারি, তাহা হইলে বাংলা দেশের মুখোজ্জ্বল হইবে। আমি যদি কিছু করিয়া থাকি সে আপনাদেরই কৃতিত্ব। আজ সমবেত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। প্রত্যেক দিন নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করুন – ভগবানের আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হইবে।"

এই সেবাব্রতী মহান কর্মযোগীর জীবনের সায়াহ্ন-বেলায় তাঁহার চিন্তা-ধারা এবং কর্মের গতি কোন্ দিকে যাইতেছিল, জন্মদিনের ভাষণাবলীর মাধ্যমে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিধানচন্দ্র তাঁহার ৭৪তম (১৯৫৫ খ্রীঃ ১লা জুলাই) জন্মদিনে সংবর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন—

"..যিনি যেখানেই থাকুন না কেন এবং যে কোন সংস্থারই অন্তর্ভুক্ত থাকুন, **সেবার দ্বারা দেশকে বড় করার ইচ্ছা যদি আমাদের থাকে, তাহা দেশকে মঙ্গল ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবে।** এই সেবার আদর্শের দিক হইতেই আমি কংগ্রেস-সংস্থার উপর এত বেশী আস্থাশীল। এখানে কোন ব্যক্তি নহে, দেশের সমৃদ্ধির জন্য কংগ্রেসের প্রচেষ্টাই তাহার প্রকৃত পরিচয়। কংগ্রেসের জনসেবার আদর্শ পঞ্চশীল-নীতিরই অনুকূলে।

"গত ডিসেম্বর মাসে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার চিকিৎসকের গম্ভীর মুখ দেখিয়া দুই-তিন দিনের জন্য আমার মধ্যে কিছু হতাশা জাগিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরেই আমার এই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে যে, যতদিন আমার প্রয়োজন আছে, কেহই আমাকে নিষ্কর্মা করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমার কর্মানুরাগের জন্য সম্ভবতঃ বহু লোক বহু কথা ভাবিয়া থাকেন; কিন্তু জীবন যখন অনিশ্চিত, তখন আমাদের এ

কথা মনে রাখা দরকার যে, পূর্বাহ্নেই কাজ সম্পূর্ণ না করিলে আমাদের কর্তব্য কার্য অসম্পূর্ণ থাকারই সম্ভাবনা।"

বিধানচন্দ্র একজন বিজ্ঞানী—বহুদর্শী প্রবীণ বিজ্ঞানী। তাঁহার মধ্যে ভাবের অভাব না থাকিলেও কোন অবস্থায়ই ভাবাবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় নাই বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিধানচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হইলেও খাঁটি বাঙালী। সুতরাং বাঙালীর প্রকৃতিগত ভাবাবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাস হইতে মুক্ত থাকতে পারেন কি করিয়া? তাঁহার জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত-বক্তারূপে তিনি যে সকল ভাষণ দিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। সেদিনকার সংবর্ধনা-সভায় বিধানচন্দ্র ভাবোদ্বেল-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"**আমার সাধ্যমত আমি দেশের সেবা করিয়া যাইতেছি। যখন আমি থাকিব না তখনও আমার বিদেহী আত্মা দেশেরই জন্য চিন্তা করিবে।**"

সেদিন সেবাব্রতী দেশনায়কের অন্তরে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত এই বাণী উপস্থিত নরনারী সকলের প্রাণকেই স্পর্শ করিয়াছিল।

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও লোকসভার সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ রায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে বাংলা ও বাঙালীর পক্ষ হইতে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়া যে সারগর্ভ ভাষণ দিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের মধ্য দিয়াও জীবনসন্ধ্যায় দেশসেবা-নিরত কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের একটা বাস্তব রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ রায়ের ৭৩তম জন্মদিনের (১৯৫৪ খ্রীঃ) অনুষ্ঠানে বলিয়াছিলেন :

"উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ডাঃ রায় সমস্যাসঙ্কুল বাংলাদেশের সেবার কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। জনসাধারণের সেবক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য এই সেবাব্রতী মনীষীর জন্মদিনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ১৯৩৭ সাল হইতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার লইয়া দেশের যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ-কংগ্রেস ১৯৪৭ সালে দেশশাসনের ভার লইয়া তাহা অপেক্ষা কোন অংশে দেশের কম উন্নতি সাধন করে নাই।"......

পরবর্তী জন্মদিবসে (১৯৫৫ খ্রীঃ) অতুল্যবাবু যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য দিয়াও ডাঃ রায়ের একখানা নিখুঁত চিত্র আমরা দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছিলেন :

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। ৭৪ বৎসর বয়সে কিভাবে কাজ করা যায়, কিরূপে কর্মজীবনের মাঝে মানুষ নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, সেই কথা এই দিনে আমরা স্মরণ করি। ডাঃ রায়ের মাঝে একদিকে পুরাতন ভারতের ঐতিহ্য এবং অন্যদিকে নূতন ভারত গঠনের স্বপ্ন রূপায়িত হইয়াছে। ডাঃ রায় দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল ও জওহরলাল নেহরুর সহযোগী

ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশগঠনের কাজও করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বহু জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান আজ ডাঃ রায়ের সৃজনী-শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।"

পশ্চিমবঙ্গের লোকপ্রিয় রাজ্যপাল স্বর্গত ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি রাজনীতিক্ষেত্রে ডাঃ বিধান রায়ের দীর্ঘকালের সহকর্মী ছিলেন। বিধানচন্দ্রের ৭৫তম জন্মদিন (১৯৫৬ খ্রীঃ) উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কলিকাতায় 'কংগ্রেস ভবনে' আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে যাইয়া ঈশ্বরের নিকট ডাঃ রায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। তিনি বলেন—ডাঃ রায় বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা ত্রিশ কিংবা চল্লিশ ভাগের একাংশও উপার্জন করেন কিনা সন্দেহ। এক সময়ে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে জনতার ভিড় সারাক্ষণই লাগিয়া থাকিত। জনসাধারণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। আজ তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে বন্দুকধারী পুলিস। নানা সমালোচনা সত্ত্বেও ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন কেবলমাত্র দেশসেবার নিমিত্ত। দেশের ডাকে, দেশবাসীর সেবায় তিনি সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন। তিনি দেশকে ভালো-বাসিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি—তিনি যেন আরও অধিক দিন জীবিত থাকিয়া দেশের কল্যাণকার্যে নিয়োজিত থাকেন।"

সেই অনুষ্ঠানে (৭৫তম জন্মদিনে) ডাঃ রায় অভিনন্দনের মধ্য দিয়া দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভে মুগ্ধ হইয়া ভাবাবেগে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করেন যে—তিনি যেন তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। তাঁহার অন্তরের কামনা—'জয়-পরাজয়ে নিস্পৃহ হইয়া দেশসেবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে চাই।' ডাঃ রায় বলেন :

"প্রতি বৎসর জন্মদিনে আমি বহু উপহার, অসংখ্য শুভেচ্ছা পাইয়া থাকি। এ বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এইবার সকালে বছর আট নয়ের একটি ছেলে আমার নিকট আসিয়া পঁচিশটি টাকা দান করিয়াছে। ছেলেটিকে প্রশ্ন করিলে সে জানায় যে, প্রতিদিনের হাতখরচ হইতে বাঁচাইয়া সে এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। টাকা কিভাবে ব্যয় করিতে হইবে প্রশ্ন করিলে ছেলেটি অনুরোধ জানায় যে, গরীবের জন্য তিনি যেন কিছু করেন। এইরূপ নানা প্রকার দান আমি প্রতি বছর জন্মদিনে পাইয়া থাকি। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে—এই দানের কি অর্থ? এই দানের কি প্রতিদান আমি দিতে পারি?

"এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—'আমি কে?' নানা বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। দার্শনিকেরা 'আমি কে' সম্পর্কে গবেষণাও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গবেষণার সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নাই। আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে

বিষয়টি বিবেচনা করিতেছি। আমার কি শক্তি, কতখানি দুর্বলতা—সেই বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে। কর্মজীবনে আমি প্রশংসা পাইয়াছি, আবার সমালোচনাও পাইয়াছি। সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া যে সমালোচনা করা হয়, তাহা আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকি। কারণ এই সমালোচনার মধ্যেই নিজের দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়। নিজের দুর্বলতাকে দূর করিতে পারিলেই মানুষ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার মাতা-পিতা একটি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেছে—'পারিব না বলিও না।' শাস্ত্রেও আছে ফলাফলের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কোন কাজ করিতে যাইয়া যদি ব্যর্থ হইতে হয়, তবু তাহা ব্যর্থ নয়। কারণ, চেষ্টার মূল্য আছে। মানুষ যখন কাজ করিতে সক্ষম হয়, তখনি তাহার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অনেকের অনেক ক্ষমতা আছে। কিন্তু ব্যর্থ হইবার ভয়ে তাঁহারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চান না। এক বামপন্থী বন্ধু কিছুদিন আগে আমি কোন্ কোন্ জায়গায় পরাজিত হইয়াছি, তাহার তালিকা পেশ করেন। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, মানুষকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

"যতক্ষণ আমার শক্তি আছে, ততক্ষণ আমি কাজ করিয়া যাইব। জয়-পরাজয়ে কিছু আসে-যায় না। দেশবাসীর নিকটেও আমার আবেদন যে, দেশের উপকার হইবে কিনা চিন্তা করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

"বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে, অনেক বিষয়ে দেশ পিছাইয়া আছে। সেই দেশের কাজকে সামনে রাখিয়া কাজ করিলে দেশ বড় হইবে। কংগ্রেসকে আমি ছোট একটি গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে চাই না। কংগ্রেস দেশের জন্য কাজ করিয়া যাইবে—ইহাই আমার স্বপ্ন। যদি কোন কংগ্রেস-কর্মী দেশের কাজ না করেন, তবে তিনি কংগ্রেসে থাকিতে পারেন না। যতদিন কংগ্রেস দেশের সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবে, ততদিন কংগ্রেসের ধ্বংস হইবার কোন কারণ নাই।

"আজকের দিনে আমার প্রতিদান দেবার কিছুই নেই। আপনারা বলেছেন—আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকুন, যাতে দেশের কাজ করতে পারেন। আমিও স্বীকার করি, বেঁচে থাকার পক্ষে আমার কোন দাবি নেই। শুধু যেন দেশের কাজের জন্য বেঁচে থাকি। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' দেশের কাজেই আমি যেন বেঁচে থাকি।"

দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তান তাঁহার ওই অনবদ্য ভাষণের উপসংহারে গানের যে কলিটি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত স্বদেশ-সঙ্গীতের প্রথম কলি। বিধানচন্দ্রের ওই প্রিয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধন-রতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

ডাঃ রায়ের জন্মদিন পালন উপলক্ষে প্রতি বৎসর প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা উপহার দিতেন। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিতেন এবং সংবাদপত্রে উহার তালিকা প্রকাশিত হইত। ৭৬তম জন্মদিনে (১৯৫৭ খ্রীঃ) সেই কর্মসূচী পালনের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই জন্মদিনে তিনি ৭৭ বৎসরে পদার্পণ করিলে কলিকাতার সাংবাদিকগণের কয়েকটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁহার এই মহৎ বিশ্বাস আছে যে, বাঙালীরাই এই দেশের নেতৃত্ব করিবে। জাতির ভাগ্য সম্পর্কে বাঙালীদের এই আত্মবিশ্বাসের ভাব ফিরিয়া পাইতে হইবে।

একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, আজ এই জন্মদিনে কি চিন্তা তাঁহার মনে সর্বাধিক উদয় হইতেছে। উত্তরে তিনি জানান—"ঈশ্বর আমার জীবনের মেয়াদ আরও এক ধাপ বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি এই কামনা করি যে তাঁহার দেওয়া কর্তব্যভার যেন উপযুক্তভাবে পালন করিতে পারি।"

তিনি বাঙালী সম্পর্কে এই মন্তব্যও করেন—একটি প্রধান অন্তরায় এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের উদ্যম, আত্মপ্রত্যয় এবং চিন্তাশক্তিতে ঘাটতি দেখা দিয়াছে। অথচ এইগুলি যদি থাকে কেবল তাহা হইলেই নববঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব।

কি গুণাবলী থাকিলে সার্থক মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়?—এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় বলেন, 'আমি যখন থাকব না তখন আশা করি আর একজন প্রতিভাবান যুবক আগাইয়া আসিবেন এবং বাংলা দেশের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন

তিনি বলেন যে, সেই ব্যক্তিই মুখ্যমন্ত্রী রূপে সফলকাম হইতে পারেন, যিনি নিজের মন্ত্রিমণ্ডলীকে কখনোই ইহা স্মরণ করাইয়া দিবেন না যে, তিনিই মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই সহকর্মীদের সহযোগিতা লাভ করিবেন। যতদিন তিনি এইভাবে চলিবেন ততদিন তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী যুক্তদায়িত্বের নীতি সম্পর্কে সচেতন থাকিবেন।

ডাঃ রায়ের কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মনিষ্ঠা আমাদের জাতীয় জীবনে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি

করিয়াছে, তাহা অবিস্মরণীয়। মহাপ্রয়াণের প্রায় চারদিন পূর্বে ২৮শে জুন বৃহস্পতিবার তিনি রোগ-শয্যা হইতে রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের উপদেষ্টার (State Electricity Board's Adviser-এর) সঙ্গে ফোনে নয়া দিল্লীতে যোগাযোগ করিয়া তাঁহাকে আদেশ দিলেন যে,—তিনি (ডাঃ রায়) পর্ষদের কাটোয়া তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের সহিত মিলিত হইবেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করা হয়। উপদেষ্টা মহাশয় তখন সরকারী কার্যোপলক্ষে রাজধানীতে ছিলেন।

পূর্বোক্ত আদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একই সঙ্গে উপদেষ্টা মহাশয়কে আরও একটি আদেশ দিলেন,—যেন কাটোয়া প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য সত্বর প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের (Land Acquisition-এর) ব্যবস্থা করা হয়।

খুব সম্ভবতঃ মৃত্যুপথযাত্রী কর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের ইহাই ছিল সর্বশেষ আদেশ।

৩১

দীপ-নির্বাণ

দেশ ও জনগণের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাতন্ত্র দিবসে ডাঃ রায়কে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ওই বৎসরের ১লা জুলাই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় রওনা হইয়া যান; এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া কয়েক সপ্তাহ পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। মহানগরীর উন্নয়নকল্পে গঠিত সংস্থার মাধ্যমে সেই বৃহৎ জটিল ও কঠিন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একটি প্রকাণ্ড লবণ-হ্রদের পুনরুদ্ধার করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসতি নির্মাণের ব্যবস্থাও কার্যে পরিণত হইতেছে। মহানগরীর কয়েক মাইলের মধ্যে কয়েকটি শহরতলি গড়িয়া বৃহত্তর কলিকাতার বাসস্থান-সমস্যা সমাধানের কার্যও আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতার অনতিদূরে দুর্গাপুরে যে বৃহৎ শিল্পনগরী গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতেও 'নবীন বাংলার রূপকার' বিধানের প্রভাব ও প্রয়াসের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়াছে। দুর্গাপুর প্রকল্পই বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম বড় উদ্যোগ। কয়লাভিত্তিক শিল্পের সূচনা হিসাবে পরিকল্পিত এই উদ্যোগের প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, ইহা হইতে ভাবীকালে নানাবিধ শিল্পের সৃষ্টি হইবে।

১৯৬২ সনের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ রায় কলিকাতার চৌরঙ্গী নির্বাচন-কেন্দ্র ও বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে রাজ্য বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হইলেন। পরে শেষোক্ত কেন্দ্রের সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। সর্বসম্মতি-ক্রমে কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া ১১ই মার্চ চতুর্থ বারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। নির্বাচন-অভিযানে তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে কংগ্রেসের পক্ষে জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। নিজের নির্বাচন-কেন্দ্রে তাঁহার প্রচারকার্য সীমাবদ্ধ ছিল না। নির্বাচনী অভিযান পরিচালনায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর যে প্রতিক্রিয়া হইতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আর পারিলেও তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না।

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তাঁহার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পরে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। তাঁহার শারীরিক অবস্থা যে অবনতির দিকে, তাহা বুঝিয়াও তিনি কর্মে

বিরতি দেন নাই। ২৩শে জুন হইতে তিনি মহাকরণে যাওয়া বন্ধ করেন। বাড়িতে বসিয়া কাজ করিতে থাকেন। তাঁহার চিকিৎসক হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগেশ গুপ্ত, তাঁহার দীর্ঘকালের বন্ধু প্রখ্যাত সার্জন ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জি, স্বনামখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ শৈলেন সেন প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ডাঃ রায় হৃদরোগে ভুগিতেছেন বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়। তিনি সেই অভিমতের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কার্ডিওগ্রাফ করা হইল। তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসকদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

কিন্তু কার্যতঃ তিনি তাঁহর চিকিৎসকদের উপদেশ মানিয়া চলেন নাই। ২৯শে জুন তাঁহার বাসভবনে মন্ত্রিসভার অধিবেশনে কর্মসূচী অনুসারে সভার কায নিষ্পন্ন হইল। ডাঃ রায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ৩০শে জুন শনিবার সকালবেলা হাওড়া স্টেশন হইতে সোজাসুজি আসিলেন ডাঃ রায়ের বাসভবনে। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি পরিহাস করিয়া ডাঃ রায়কে বলেন যে, অন্যকে তিনি বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজের বেলায় কেন সে উপদেশ মানিয়া চলিতেছেন না। দশ মিনিট পরে নামিয়া আসিবার কালে সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি ডাঃ রায়কে বেশ প্রফুল্লই দেখিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই রাত্রিতে তাঁহার ভালো ঘুম হয় নাই। সারারাত্রি তিনি অস্বস্তিতে ছটফট করিয়াছেন।

পরদিন ১লা জুলাই রবিবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের একাশীতিতম জন্মদিবস। একতলায় বসিবার ঘরে তাঁহার স্বাক্ষরিত বাংলায় টাইপ-করা বিজ্ঞপ্তি টাঙাইয়া দিয়া জানানো হইল যে, আগন্তুকদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখিত। অবস্থা দ্রুতবেগে অবনতির দিকে যাইতেছিল। জরুরী ফোন পাইয়া ছুটিয়া গেলেন তাঁহার চিকিৎসক ডাঃ যোগেশ গুপ্ত। অন্যান্য চিকিৎসকরাও উপস্থিত ছিলেন। যন্ত্রণায় তিনি শয্যার উপরে এপাশ ওপাশ করিয়া ছটফট করিতেছিলেন। মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দেওয়া হইল, অক্‌সিজেন সিলিণ্ডারেরও ব্যবস্থা হইল। বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন, প্রাণ-প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ। কাতরস্বরে কহিলেন—যোগেশ, তোমরা সবই ত করলে, কিন্তু রাখতে ত পারলে না, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে সব। বলিতে বলিতে তিনি চক্ষু মুদিলেন। সেই চিরনিদ্রা আর ভাঙিল না। তখন বেলা বারোটা তিন মিনিট।

বিদ্যুদ্‌বেগে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল দেশ-বিদেশে আকাশ-বাণীর মাধ্যমে। শেষ দর্শনের জন্য হিন্দু মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ, পারসী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নাগরিক ৩৬ নং

নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটের বাসভবনের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জনতাকে পুলিস নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিল না। মুখ্যমন্ত্রীর শবদেহ সচন্দন পুষ্পমাল্যভূষিত হইয়া স্থানান্তরিত হইল বিধানসভার বিরাট ভবনে। সারা রাত্রি সেখানেও অবিরাম জনতার বন্যা।

১লা জুলাই কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের ৮১তম জন্মদিবসে হইল তাঁহার মৃত্যু।

পরদিবস ২রা জুলাই সোমবার অপরাহ্ণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে তাঁহার শবদাহ করা হয় কালীঘাটে কেওড়াতলা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চিতাচুল্লীতে। শবানুগমনের শোকমিছিলে যোগ দিয়াছিলেন দশ লক্ষাধিক নরনারী। রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয় সাত দিন।

কলিকাতা মহানগরীর ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু ইত্যাদি নানা ভাষার সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা ২রা জুলাই প্রকাশিত হয়। ১লা জুলাই তারিখেও কোন কোন সংবাদপত্র ছোট আকারে ওই শোকসংবাদ বহন করিয়া প্রকাশিত হয়।

"ডাঃ রায়ের মৃত্যু শুধু আমার ও আমার বন্ধুদের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি নয়, ইহা সমগ্র জাতির পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সারা দেশ আজ শোকাভিভূত। কারণ বাংলা দেশের আকাশে, শুধু বাংলা কেন সারা ভারতের আকাশে, যে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, তাহা সহসা নিভিয়া গেল। পথের দিশারী হারাইয়া গেলেন। কিন্তু কর্ম-দীপ্ত জীবনের যে স্মৃতির দীপ্তি তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা পথ দেখাইবে - আলো জ্বালিবে।

শ্রীসেন বলেন, নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আসিয়া মৃত্যু তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। আমরা হারাইলাম নেতা, দিশারী, বন্ধু, সচিব, সখা। বর্তমান বাংলা দেশ তাহার নির্মাতাকে হারাইল। ভারত হারাইল এক মহান সন্তানকে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ এতই মর্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না।

ডাঃ রায়ের দীর্ঘকালের সুহৃৎ ও মন্ত্রিসভার অন্যতম সহকর্মী শোকাভিভূত রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরীও কিছু বলিতে পারিলেন না।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ডাঃ রায়ের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাইয়া ১লা জুলাই তারিখে নয়া দিল্লী হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিলেন:

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর নাই, ইহা মনে করা কষ্টকর। পরিণত বয়সে এবং নানা কীর্তির অধিকারী হইয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

কিন্তু কার্যতঃ ডাঃ রায় ছিলেন একজন যুবক; শক্তি, উদ্যম এবং যুবজনোচিত উৎসাহে ভরপুর। কলিকাতা, বাংলা এবং ভারতের সম্পর্কে তাঁহার নানারূপ স্বপ্ন ছিল।

একজন মহান ব্যক্তি, একজন পুরুষসিংহের লোকান্তর ঘটিল। আমরা দুঃখিত এবং শোকাভিভূত। আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিব এবং তাঁহার জন্য আমরা দুঃখও করিব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের তাঁহার মহান সাফল্যের কথাও স্মরণ করিতে হইবে—দেশবিভাগের পর তিনি কিভাবে বাংলার দুরূহ সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং ক্রমে সেগুলি অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

তিনি সত্য-সত্যই আধুনিক বাংলার এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন।

একজন প্রিয় বন্ধু এবং সহকর্মী পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা নিঃসহায় হইয়া পড়িলাম।"

বিধানচন্দ্রের রাজনীতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত যে বাণীটি আনিয়াছিলেন, আমরা সেই বাণী দিয়া ভক্ত শিষ্যের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিতেছি—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

ডাঃ রায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ : ১লা জুলাই বেলা ১০টা ২০ মিনিটে পাটনা বাঁকিপুরে জন্ম।

১৮৯৬ „ ১০ই জুন পাটনা বাঁকিপুরে মাতৃদেবী অঘোরকামিনীর পরলোক গমন।

১৮৯৭ „ পাটনা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯৯ „ পাটনা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; পাটনা কলেজ হইতে

১৯০১ „ গণিত-শাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি; পিতৃদেব প্রকাশচন্দ্র রায়ের সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ; সর্ব-জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসারবাসিনীর মৃত্যু।

১৯০৫ „ ৭ই আগস্ট তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন (স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ)।

১৯০৬ „ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল. এম. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হইলেন; বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে সহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন রূপে কার্য আরম্ভ; কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ।

১৯০৮ „ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ।

১৯০৯ „ ২২শে ফেব্রুয়ারি উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য বিলাতযাত্রা; মার্চ মাসের শেষভাগে লণ্ডনে পৌছেন; তথায় মে মাসে বিশ্ববিখ্যাত সেণ্ট্ বার্থোলোমিউজ্ শিক্ষায়তনে ভর্তি।

১৯১১ „ এম. আর. সি পি. (লণ্ডন) এবং এফ. আর. সি. এস. (ইংলণ্ড) ডিগ্রি লাভ; প্রথমোক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন; ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন ও শিক্ষকের পদ গ্রহণ; ৭ই ডিসেম্বর পিতৃদেব প্রকাশচন্দ্রের পরলোকগমন।

১৯১৬ „ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের (Senate) সদস্য নির্বাচিত; ৩৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবন ক্রয়।

১৯১৯ „ সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ; বেঙ্গল ইমিউনিটির গোড়াপত্তন।

১৯২১ „ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইয়া ফ্যাকালটি অব্ মেডিসিনের সহিত সংযুক্ত।

১৯২২ „ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ : ৩০শে নভেম্বর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া উত্তর ২৪ পরাগনা মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক স্বতন্ত্রপ্রার্থী (স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক সমর্থিত) রূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯২৪ " ৩২শে ফেব্রুয়ারি ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে সর্বপ্রথম বক্তৃতা প্রদান; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২৫ " স্বরাজ্য দলে যোগদান; বাজেট অধিবেশনে (মার্চ মাসে) রোগশয্যায় শায়িত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান; অধিবেশনে তদানীন্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দল কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত; ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু; দেশবন্ধু-সম্পাদিত ট্রাস্ট-ডীডে ট্রাস্টী মনোনীত; চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৬ " তৃতীয়বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত।

১৯২৭ " আগস্ট মাসে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন এবং উহা সভায় গৃহীত।

১৯২৮ " কংগ্রেসের কলিকাতায় ৪৩তম অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯ " নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (৪৪তম) যোগদান।

১৯৩০ " কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্বপ্রথম অলডারম্যান নির্বাচিত; কর্পোরেশনের মে মাসের সভায় গান্ধীজীর কারাবরণে অভিনন্দন জ্ঞাপন; কর্পোরেশনের ফিনান্স স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত; লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে বে-আইনী ঘোষিত নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগস্ট অধিবেশনে যোগদান, গ্রেফতার ও ৬ মাসের জন্য কারাবরণ; সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত।

১৯৩১ " মেয়র নির্বাচিত; কর্পোরেশনের বাজেট স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান এবং সার্ভিসেস স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত; বিপ্লবী দধীচি দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসিতে কর্পোরেশনের সভায় অমর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কর্পোরেশনের পক্ষে সম্বর্ধনা।

১৯৩২ দ্বিতীয়বার কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে কর্পোরেশনের পক্ষে সম্বর্ধনা; কর্পোরেশনের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বেতন বৃদ্ধি; কুখ্যাত স্যার চার্লস্ টেগার্ট বিলাতে এক বক্তৃতায় কর্পোরেশন বিপ্লবীদের পালক বলিয়া আক্রমণ করায় কর্পোরেশনের সভায় মেয়রের বিবৃতি দান; গান্ধীজীর নির্দেশে কলিকাতায় 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী সঙ্ঘ'-এর প্রাদেশিক পর্ষদ গঠন এবং সভাপতির পদ গ্রহণ; ১৮ই ডিসেম্বর নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতায় টাউনহলের জনসভায় পৌরোহিত্য করণ।

১৯৩৩-৩৪ স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী এবং আন্সারীর সহযোগিতায় কার্যারম্ভ। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলোচনান্তে সেই প্রচেষ্টায় তাঁহার সম্মতি দান; নয়া দিল্লীতে ডাঃ আন্সারীর বাসভবনে সেই নীতির সমর্থক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্গের এক ঘরোয়া সম্মেলন এবং সকলে একমত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি সমর্থন; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৫-৩৬ বিগ-ফাইভ-এর (বৃহৎ পঞ্চকের) মধ্যে ভাঙ্গন; প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের ইলেক্‌শন কমিটি গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত, মনোনয়ন সম্পর্কে শরৎবাবুর সঙ্গে মতানৈক্য এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের দরুন সভাপতির পদত্যাগ; পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত।

১৯৩৮ পুনরায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত।

১৯৩৯ গান্ধীজীর অনুরোধে পুনরায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ; ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল-এর প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত; দ্বিতীয় মহা বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ এবং কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন, আইন-সভাগুলি বর্জনের নীতি গ্রহণে মতভেদ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা; আবার কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত।

১৯৪১ বার্মা প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল সিভিল প্রোটেক্‌শন কমিটি গঠন এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রস্তাবে সভাপতির পদ গ্রহণ; পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ : গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে যুদ্ধ উপলক্ষে ভারত সরকারের অনুরোধে সামরিক চিকিৎসক-বাহিনী গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা ; ওই বাহিনীর কর্মচারীদের কতকগুলি ন্যায্য দাবি পূরণের ব্যবস্থা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত।

১৯৪৩ „ ফেব্রুআরি মাসে গান্ধীজীর ২১ দিন অনশনের সময় উপস্থিতি ; মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে প্রথম অভিভাষণ ; বেঙ্গল রিলিফ কমিটি স্থাপন ও উহার কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৪ „ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি দান।

১৯৪৬ „ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মতে মালয়ের দুর্গত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য মেডিকেল মিশন প্রেরণ ও পরিচালনাদির ভার গ্রহণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুর্গত কলিকাতাবাসীগণের ত্রাণে সহকর্মীগণসহ সেবা-কার্য।

১৯৪৭ „ গান্ধীজীর অনুমতি লইয়া চক্ষু-চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় গমন ; ১৫ই আগস্ট ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর সংযুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপাল নিযুক্ত ; অনুপস্থিতিতে স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুকে সাময়িকভাবে নিয়োগ ; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যপালের পদ ত্যাগ ; ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচকমণ্ডলী হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৮ „ জানুআরি মাসে গান্ধীজী নয়া দিল্লীতে অনশন আরম্ভ করায় কলিকাতা হইতে তথায় গমন ; ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার পতনের পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত ও নূতন মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫২ „ স্বাধীন ভারতের নয়া শাসন-তন্ত্রের বিধান-মতে ভারতের প্রথম নির্বাচনে কলিকাতার বহুবাজার কেন্দ্র হইতে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত ; দ্বিতীয়বার সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নানাবিধ উন্নতিসাধন।

১৯৫৩ „ ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দান।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ — ১৫ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ-দান।

১৯৫৭ " — ১৪ই জানুআরি কলিকাতা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে সভাপতি; দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (মার্চ মাসে) বহুবাজার নির্বাচকমণ্ডলী হইতে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত; এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দলের নেতা নির্বাচিত এবং পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ।

১৯৫৮–৬০ — ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা গৃহীত। ১৯৫৮—৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর কলিকাতায় লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা, মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরবর্তী দীঘার উন্নয়ন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পরিকল্পনা।

গ্রন্থপঞ্জী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনী

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত

অঘোর-প্রকাশ—প্রকাশচন্দ্র রায়

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত—সত্যচরণ শাস্ত্রী

প্রতাপাদিত্য—নিখিলনাথ রায়

যশোহর-খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র

গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস

আমাদের গান্ধীজী—ধীরেন্দ্রলাল ধর

মানুষ চিত্তরঞ্জন—অপর্ণা দেবী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুকুমাররঞ্জন দাশ

সাংবাদিকের স্মৃতি-কথা—বিধুভূষণ সেনগুপ্ত

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে—সরোজ চক্রবর্তী

A Nation In Making—Surendranath Banerjee

Dr. B. C. Roy—K. P. Thomas

Towards a Frosperous India

The Bengal Legislative Council. Proceedings: 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929

The Calcutta Municipal Gazette—July 7,

Amrita Bazar Patrika

Hindusthan Standard

আনন্দবাজার পত্রিকা

যুগান্তর

দৈনিক বসুমতী

জনসেবক

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁরা সাহায্য করেছেন

১. সুবোধচন্দ্র রায় (ডাঃ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)
২. শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি
৩. শ্রীঅশোক সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ)
৪. শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য, কলানবগ্রাম, বর্ধমান
৫. ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী
৬. শ্রীঅনিলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৭. ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ী, বীরভূম
৮. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৯. ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, ভারতবর্ষ
১০. সজনীকান্ত দাস, সম্পাদক শনিবারের চিঠি
১১. কালিদাস রায়, কবিশেখর
১২. চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী
১৩. যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক
১৪. শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক
১৫. কুমুদশঙ্কর রায়, যক্ষ্মা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ
১৬. চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের কর্তৃপক্ষ
১৭. বেঙ্গল ইমিউনিটির কর্তৃপক্ষ
১৮. আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ
১৯. কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ
২০. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ
২১. ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জি
২২. শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য
২৩. শ্রীভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী
২৪. শ্রীআলোকনাথ চক্রবর্তী
২৫. শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
২৬. শ্রীমান সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৭. শ্রীকিশোরচন্দ্র সামন্ত